অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞানের ভূমিকা

অরুণকুমার সেন

সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট · কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
দি সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সীর পক্ষে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, বি. এস্-সি.
১৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—আগষ্ট, ১৯৬০
দ্বিতীয় সংস্করণ—জুলাই, ১৯৬১
তৃতীয় সংস্করণ—জুলাই, ১৯৬২
চতুর্থ সংস্করণ—জুলাই, ১৯৬৩
পঞ্চম সংস্করণ—আগষ্ট, ১৯৬৪

মূল্য ছয় টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান সংস্করণে সকল অধ্যায়েরই, বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত অধ্যায়গুলির, প্রয়োজনীয় পরিমার্জনা করা হইয়াছে। ইহার ফলে অবশ্য গ্রন্থখানির আকার মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। কারণ, এই সংস্করণে পাঠ্য-সূচীর্ঠিক অন্তর্ভুক্ত নহে এরূপ বিষয়গুলিকে হয় বাদ দেওয়া হইয়াছে, না হয় পূর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হইয়াছে।

পরিমার্জনাকার্যে আমি অধ্যাপক শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুশীলকুমার সেনের নিকট হইতে পূর্বের ন্যায়ই সহায়তালাভ করিয়াছি, এবং এই সুযোগে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি—

সিটি কলেজ, কলিকাতা
১০ই আগষ্ট, ১৯৬৪

অরুণকুমার সেন

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় (Pre-University) এবং বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা (Entrance) পর্যায়ের পাঠক্রম অনুসারে গ্রন্থখানি প্রণীত হইয়াছে। প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রবেশিকা পর্যায়ের পাঠক্রম পরবর্তী ত্রিবার্ষিকী স্নাতক পর্যায়ের (Three-year Degree Course) পাঠক্রমের সহিত সংগতিসাধন করিয়াই রচিত। ফলে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রবেশিকা পর্যায়ে অর্থবিদ্যার পাঠ্যসূচীতে জাতীয় আয়, দাম-নির্ধারণ তত্ত্ব, সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছি। যদিও ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ বিদ্যালয় হইতে অর্থবিদ্যা ও পৌরবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু ধারণা লইয়া আসিতেছে তবুও প্রথম পাঠপ্রদানের ন্যায় সরল ব্যাখ্যার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করিয়াছি। এই উদ্দেশ্যে চিত্র ও রেখাচিত্রের সাহায্য লওয়া ছাড়াও প্রতি অধ্যায়ের শেষে একটি করিয়া সংক্ষিপ্তসার যোগ করিয়া উহাতে অধ্যায়ের মূল বক্তব্য বিবৃত করিয়াছি।

* * * * *

প্রাথমিক রচনাকার্যে যাঁহাদের নিকট হইতে আমি অকুণ্ঠ সাহায্য লাভ করিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে আমার সহকর্মী অধ্যাপক শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুশীলকুমার সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতি—

সিটি কলেজ, কলিকাতা
২রা আগষ্ট, ১৯৬০

অরুণকুমার সেন

Syllabus on
ELEMENTS OF ECONOMICS & CIVICS

[PRE-UNIVERSITY EXAMINATION OF C. U. AND UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION OF B. U.]

ECONOMICS

Scope and subject matter of Economics.

National Income and its determinants—Factors of Production.

Population.

Capital—Factors governing accumulation of Capital. Forms of Business Organisation.

Large-scale and Small-scale Industries—Division of Labour.

Money—Functions of Money—Functions of Banks—Functions of Central Banks—Changes in Price level and their effects.

Factors governing Demand—Elasticity of Demand—Factor's governing supply and supply price. Price determination. Price determination under Competition and Monopoly.

Determination of Wages, Interest, Rent and Profit.

Economic functions of the Government—Taxation and Expenditure.

India's Five-Year Plans in outline with reference to Agriculture. Small Industries, Large-scale Industries, Co-operation and Community Development Projects.

CIVICS

The State—its origin and characteristics—Government—Forms of Government—Democracy and Dictatorship—Unitary and Federal Government.

Parliamentary and Presidential Governments.

Organs of Government—Separation of Powers—Bicameralism—Nationality and Nation—Right of Self-determination—Citizenship—Modes of acquiring Citizenship—Rights and duties of Citizens—Hindrances to good Citizenship—Relation between rights and duties.

Law and Liberty—Relation between Law and Liberty.

Party System—its merits and defects.

Public Opinion—Organs of Public Opinion.

Suffrage—Universal Adult Suffrage.

সূচীপত্র

অর্থবিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

উনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

পৌরবিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এই পুস্তকের প্রশ্নোত্তরে ব্যবহৃত প্রশ্নপত্রসমূহে যে-সকল সংকেত-অক্ষর ব্যবহার করা হইয়াছে ইহাদের ব্যাখ্যা নিম্নলিখিতরূপ:

C. U.	Calcutta University (Intermediate)
B. U.	Burdwan University (Intermediate)
P. U.	Pre-University (Calcutta University)
En.	University Entrance (Burdwan University)

অর্থবিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু ও আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি

(Subject Matter and Scope of Economics)

ভূমিকা : অল্প কথায় বলা যায়, আমাদের দৈনন্দিন খাওয়া-পরা, বাঁচিয়া থাকার সমস্যা লইয়াই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। জীবনধারণের জন্য আমরা অনেক কিছুরই অভাববোধ করি। আমরা চাই খাদ্যবস্ত্র আশ্রয় ইত্যাদি। কিন্তু কেবলমাত্র জীবনধারণ করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। আমরা চাই ভালভাবে বাঁচিতে, উন্নততর জীবন উপভোগ করিতে। তাই আমরা সাধারণ খাদ্যবস্ত্র আশ্রয় ছাড়াও নানা প্রকার আরাম ও বিলাসের সামগ্রীও কামনা করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল যে এই সকল কাম্য দ্রব্য সকলের অভাব মিটাইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। এই অপ্রাচুর্যের দরুন দেখা দেয় নানাবিধ অর্থনৈতিক সমস্যা। অর্থবিদ্যা অপ্রাচুর্যজনিত এই সকল অর্থনৈতিক সমস্যারই পর্যালোচনা করে।

অর্থবিদ্যা অপ্রাচুর্য সংক্রান্ত সমস্যার পর্যালোচনা করে

আরব্য উপন্যাসের আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের গল্প আমরা প্রায় সকলেই জানি। আলাদিন প্রদীপটিকে একটু ঘষিলেই এক দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইত। দৈত্যটিকে আলাদিন যাহা আদেশ করিত তাহাই সে সংগ্রহ করিয়া আনিত। ফলে আলাদিনের অভাব বলিয়া কিছু ছিল না।

এইরূপ আমাদের যদি প্রত্যেকের একটি করিয়া আশ্চর্য প্রদীপ থাকিত তবে আমাদের অভাবমোচনের কোন সমস্যাই থাকিত না, এবং ফলে আমাদের পক্ষে অর্থবিদ্যা চর্চারও কোন প্রয়োজন হইত না।

মানুষের অভাববোধ হইতেই অর্থবিদ্যার আলোচনা শুরু। অভাববোধের ফলে মানুষ কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং কর্মপ্রচেষ্টার ফলে তাহার অভাব পরিতৃপ্ত হয়। পরিতৃপ্তির পর আবার দেখা দেয় অভাব। এইভাবে অভাব, কর্মপ্রচেষ্টা ও পরিতৃপ্তির মধ্যে একটি বৃত্তাকার সম্বন্ধ রহিয়াছে :

মানুষের অভাববোধ হইতেই অর্থবিদ্যার আলোচনা শুরু
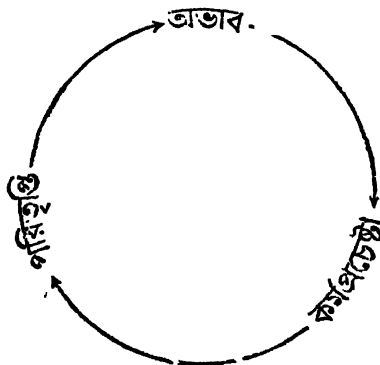
আদিম যুগে মানুষ প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে ফলমূল আহরণ এবং পশুপক্ষী মৎস্য শিকার করিয়া, স্বয়ং গৃহনির্মাণ করিয়া, জীবজন্তুর চামড়া হইতে পোশাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারি করিয়া সরাসরি অভাবমোচন করিত। তখন তাহার অভাবও ছিল সংখ্যায় অত্যল্প এবং বিশেষ সরল প্রকৃতির। সামান্য খাদ্য, সামান্য পরিচ্ছদ এবং কোনমতে বসবাস করিবার একটু স্থান হইলেই তাহার চলিয়া যাইত।

কিন্তু ক্রমে তাহার অভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার ফলে সে অভাব-মোচনের জন্য অপরের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল, এবং সুরু হইল দ্রব্য-বিনিময় (barter)। যাহার বেশী ধান্য ছিল সে ধান্যের পরিবর্তে বস্ত্র লইতে লাগিল, ইত্যাদি। তারপর একদিন বিনিময়কার্য সম্পাদন করিবার জন্য প্রবর্তন করা হইল টাকাকড়ির। এখন হইতে মানুষ আর সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় না করিয়া টাকাকড়ির মাধ্যমে ক্রয়বিক্রয় করিতে লাগিল। যেমন, কৃষক অর্থের বিনিময়ে ধান্য বিক্রয় করিয়া ঐ অর্থ দিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে লাগিল।

এইভাবে অর্থ বা টাকাকড়ির মাধ্যমে যে বিনিময়কার্য সুরু হইল ক্রমশ তাহাকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিল বর্তমান দিনের অর্থনৈতিক জীবন। এই জীবনে মানুষকে অভাবমোচনের জন্য সরাসরি দ্রব্যাদি সংগ্রহের পরিবর্তে অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টাতেই লিপ্ত থাকিতে হয় এবং অর্জিত অর্থ অধিকাংশ সময়ই সকল অভাব মিটানোর পক্ষে যথেষ্ট হয় না বলিয়া বিচারবিবেচনার সহিত ব্যয় করিতে হয়।

বর্তমান দিনের অর্থনৈতিক জীবনে অর্থ বা টাকাকড়ির ভূমিকা এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও টাকাকড়ির মাধ্যমে অভাবমোচনের প্রচেষ্টা এবং পূর্বেকার সরাসরি দ্রব্যাদি সংগ্রহের মাধ্যমে অভাবমোচনের প্রচেষ্টার মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই। উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যার প্রকৃতি এক, এবং এই সমস্যাই বর্তমানে 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্বে' (theory of scarcity and choice) পরিণত হইয়া অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

'অপ্রাচুর্য ও বিনিময় তত্ত্ব'ই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু

নিম্নে এই বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ (Analysis of the Subject Matter): অপ্রাচুর্য মানুষের মৌলিকতম অর্থনৈতিক সমস্যা। কিন্তু এই অপ্রাচুর্যের প্রকৃতি আমরা সকল সময় ঠিক অনুধাবন করিতে পারি না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এই দেশে আমরা শুধু টাকাকড়িরই অভাববোধ করিতাম। হাতে টাকা থাকিলে সব জিনিসই ইচ্ছামত কেনা যাইত। খাদ্যদ্রব্য জামাকাপড় ঔষধপত্র গাড়ীঘোড়া কোন কিছুরই যোগান অপ্রচুর বলিয়া মনে হইত না। লোকে কথায় বলিত, পয়সা দিলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়—অর্থাৎ, সব জিনিসই যথেষ্ট পরিমাণে মিলে। এইভাবে যখন

অপ্রাচুর্যের প্রকৃতি

আমাদের নিকট জিনিসপত্র প্রচুর বলিয়া মনে হইত তখনই অর্থবিদ্যাবিদগণ বলিতেন, উহাদের যোগান অপ্রচুর। ইহা দ্বারা তাঁহারা বলিতে চাহিতেন যে জিনিসপত্র চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর।

জিনিসপত্র যে চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর তাহা আমরাও ভালভাবে বুঝিতে পারি ঐ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। তখন হাতে টাকা থাকিলেও অনেক জিনিসপত্র ইচ্ছামত ক্রয় করিতে পারিতাম না। চাউল-গম-চিনির জন্য আমাদিগকে কণ্ট্রোলের দোকানে লাইন দিতে হইত, কুপনের বদলে কণ্ট্রোলের ধুতি-শাড়ী যোগাড় করিতে হইত, ঔষধ যোগাড় করিতে নানা দোকান ঘুরিতে হইত, ইত্যাদি।

বর্তমানে আমরা এই অবস্থা হইতে অনেকটা মুক্ত হইলেও বেশ কিছুটা যে অপ্রাচুর্যের সম্মুখীন আছি, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। অর্থবিদ্যাবিদগণ অবশ্য বলেন, আমরা পূর্বের মতই অপ্রাচুর্যের সম্মুখীন আছি, এবং চিরকালই থাকিব; এই অপ্রাচুর্যের সমস্যা কোনদিনই মিটিবে না—মিটিতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে, একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে অপ্রাচুর্যের সমস্যা কোনদিন মিটিতে পারে না। কারণ, মানুষের অভাব সীমাহীন ও ক্রমবর্ধমান, কিন্তু অভাবমোচনের উপকরণগুলি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। কিভাবে এই সীমাবদ্ধ উপকরণগুলিকে কাজে লাগাইয়া সীমাহীন ও ক্রমবর্ধমান অভাবের সর্বাধিক পরিতৃপ্তি সাধন করা যায়, তাহাই আমাদের সমস্যা—আমাদের মৌলিকতম অর্থনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যাই আধুনিক অর্থবিদ্যার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আছে।

অপ্রাচুর্যের সমস্যা চিরন্তন

অপ্রাচুর্যের সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাভাবিকভাবেই আমরা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রকে যথাসম্ভব সুপ্রচুর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করি (make them less scarce)। অর্থবিদ্যায় ইহাকে ব্যয়সংক্ষেপ করা (economising) বলা হয়। ব্যয়সংক্ষেপের জন্য আমরা যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করি তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল নির্বাচন (choice)।

বস্তুত, অপ্রাচুর্যের সমস্যা হইতেই যে নির্বাচনের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে তাহা একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি করা যায়। বর্তমান দিনে আমরা অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয়ের মাধ্যমেই অভাবমোচনের প্রচেষ্টা করি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা প্রয়োজনমত উপার্জন করিতে পারি না বলিয়া ব্যয় সম্বন্ধে আমাদিগকে পদে পদে বিচার বা নির্বাচন করিয়া চলিতে হয়। যেমন, যে-দরিদ্র ছাত্রের পিতা একই মাসে পুস্তক ও পরিচ্ছদ কিনিয়া দিতে পারেন না, তাঁহাকে পুস্তক ও পরিচ্ছদের মধ্যে নির্বাচন করিতে হয়—দেখিতে হয় যে ঐ মাসে কোন্‌টি অধিক প্রয়োজনীয়। মাত্র ব্যক্তি নহে, জাতিকেও সর্বদা ঐরূপ বিচার করিতে হয়। কারণ, ব্যক্তির ন্যায় জাতিরও সংগতি বা অভাবমোচনের উপকরণগুলি সীমাবদ্ধ। উদাহরণ-

এই সমস্যা হইতে নির্বাচন-সমস্যা

স্বরূপ, জাতির পক্ষে হয়ত একটি যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহ ও একটি নূতন রেলপথ খোলা—উভয়ই প্রয়োজনীয়; কিন্তু অর্থে না কুলাইলে জাতিকে উভয়ের মধ্যে নির্বাচন করিতে হয়।

আবার অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে নহে, অর্থোপার্জনের বেলাতেও আমাদিগকে এইরূপ হিসাব করিয়া চলিতে হয়। আমাদের সময় ও সামর্থ্য অপ্রচুর বলিয়া উহাদিগকে এইভাবে নিয়োগ করিতে হয় যাহাতে উপার্জন সর্বাধিক হয়। অনুরূপভাবে জাতিকেও দেখিতে হয় যে সীমাবদ্ধ উপকরণগুলিকে কিভাবে নিয়োগ করিলে সর্বাধিক জাতীয় কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

এইভাবে অপ্রাচুর্যের সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন' এবং উহাদের সহিত সম্পর্কিত সমস্যাসমূহই আধুনিক অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহার সহিত বিনিময় (exchange) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যা যোগ না করিলে অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর বর্ণনা পূর্ণাংগ হয় না। কারণ, বর্তমান দিনে আমরা বিনিময়ের মাধ্যমেই অপ্রাচুর্যের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা করিয়া থাকি, নির্বাচনকার্য সম্পাদন করিয়া থাকি। অবশ্য চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর এমন অনেক সেবামূলক কার্য (services) আছে যাহা আমাদের বিশেষ অভাবমোচন করিলেও বিনিময়ের সহিত সম্পর্কিত নহে—যেমন, পিতামাতা বা পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের স্নেহযত্ন ইত্যাদি। অর্থবিদ্যায় অবশ্য এগুলিকে লইয়া আলোচনা করা হয় না। কারণ প্রথমত, এগুলির পরিমাপ করা যায় না, এবং দ্বিতীয়ত, এগুলির ফলে কোন সামাজিক সমস্যারও উদ্ভব ঘটে না। অর্থবিদ্যা অন্যতম বিজ্ঞান। বিজ্ঞান পরিমেয় (measurable) বস্তু লইয়াই কারবার করে। অর্থবিদ্যায় এই পরিমাপ করা হয় টাকাকড়ির অংকে। পিতামাতার স্নেহযত্ন ইত্যাদির জন্য কোন অর্থমূল্য দেওয়া হয় না বলিয়া অর্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে এগুলি অপরিমেয়, এবং ফলে ইহা আলোচনা-বহির্ভূত। উপরন্তু, আমার পিতামাতা আমাকে সেবাযত্ন করিলেন কি না, তাহাতে সমাজের কিছু যায় আসে না। যাহাতে সমাজের কোন লাভক্ষতি হয় না, সেরূপ কোন ব্যাপার অর্থবিদ্যার ন্যায় সামাজিক শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং এই কারণেও বিনিময়ের সহিত সম্পর্করহিত এই সকল সেবামূলক কার্যকে অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর বহির্ভূত রাখা হয়।

অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন এবং উহাদের সম্পর্কিত সমস্যাসমূহই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু

ইহাদের সহিত আবার বিনিময় ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহও জড়িত

অতএব, সামাজিক শাস্ত্র অর্থবিদ্যায় মানুষের অভাবমোচনের সেই সকল প্রচেষ্টার আলোচনাই করা হয় যাহা প্রথমত নির্বাচন ও দ্বিতীয়ত বিনিময়ের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই দিক দিয়া অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে: অপ্রচুর উপকরণ

অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা

দ্বারা সীমাহীন অভাবের সর্বাধিক পরিতৃপ্তিসাধনের জন্ম মানুষ নির্বাচন ও বিনিময়ের মাধ্যমে যে-সকল কাজকর্ম সম্পাদন করে, তাহাদের পর্যালোচনা-কেই অর্থবিদ্যা বলে।

অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি (Scope of Economics) : বিষয়বস্তুর উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা হইতেই অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। দেখা যায় যে অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি বিভিন্ন দিক দিয়া সীমাবদ্ধ। প্রথমত, অর্থবিদ্যা অন্যতম সামাজিক শাস্ত্র বা বিজ্ঞান। সুতরাং, ইহা মাত্র সমাজভুক্ত লোকের কাজকর্ম লইয়াই আলোচনা করে। সমাজের বাহিরে যাহারা বাস করে তাহাদের কাজকর্ম অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নহে। কারণ, তাহাদের কাজকর্মের ফলে কোন অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয় না। সমাজে যদি কিছু লোক খাদ্য মজুত করে তবে খাদ্যের দাম চড়িয়া গিয়া খাদ্য-সমস্যার উদ্ভব হয়; বিপরীত দিকে সমাজভুক্ত কিছু কৃষক যদি অধিক উৎপাদন করে তবে যোগান বাড়িয়া খাদ্যশস্যের দাম কমিয়া যায়। কিন্তু রবিনসন্ ক্রুসোর মত কোন সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি যদি খাদ্য মজুত করে তাহাতে সমাজের কোন ক্ষতি হয় না; আবার রবিনসন্ ক্রুসো অধিক খাদ্য উৎপাদন করিলে সমাজের কোন লাভও হয় না। যে-সকল কাজকর্মের ফলাফল ব্যক্তি নিজেই ভোগ করে, যাহাতে সমাজের কোন লাভক্ষতি হয় না তাহা সামাজিক শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইতে পারে না। এই কারণে সমাজবহির্ভূত ব্যক্তির কাজকর্ম অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুভুক্ত হয় নাই।

পরিধির সীমাবদ্ধতা :

১। অর্থবিদ্যা সমাজবদ্ধ লোকের কাজকর্ম লইয়াই আলোচনা করে

দ্বিতীয়ত, আবার সমাজবদ্ধ লোকের অভাবমোচনের সকল প্রচেষ্টাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নহে। আমাদের অনেক অভাব আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সেবাযত্নের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়। এগুলি অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নহে—কারণ, ইহাদের পরিমাপ করিবার কোন উপায় নাই। পরিমাপ করিবার উপায় নাই বলিয়া শৃংখলিতভাবে ইহাদের আলোচনা করা যায় না। শৃংখলিতভাবে যাহার আলোচনা করা যায় না তাহা কোন বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইতে পারে না।

২। অর্থবিদ্যা টাকাকড়ির সহিত সম্পর্কিত কাজকর্মেরই আলোচনা করে

সুতরাং সামাজিক বিজ্ঞান অর্থবিদ্যায় অভাবমোচনের প্রচেষ্টায় রত মানুষের সেই সকল কাজকর্মেরই আলোচনা করা হয় যাহা পরিমেয়। এই পরিমাপ করা হয় টাকাকড়ির মাধ্যমে। অতএব, যে-সকল কাজকর্মের সহিত টাকাকড়ির সম্পর্ক আছে অর্থবিদ্যায় মাত্র তাহাদেরই আলোচনা করা হয়।

৩। অর্থবিদ্যা অভাব-মোচনের সমস্যার পর্যালোচনা করে

তৃতীয়ত, আপাতদৃষ্টিতে অর্থবিদ্যায় টাকাকড়ির সহিত সম্পর্কিত কাজকর্মের আলোচনা করা হইলেও মূলত করা হয় সমস্যার পর্যালোচনা।

এই সমস্যা হইল অপ্রচুর উপকরণগুলির সাহায্যে সীমাহীন অভাবমোচনের সমস্যা। সংক্ষেপে ইহাকে অর্থনৈতিক সমস্যা (economic problem) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই সমস্যার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আছে অপ্রাচুর্য। অপ্রাচুর্য হইতেই নির্বাচন এবং বিনিময়ের প্রশ্ন ও সমস্যাসমূহ আসিয়া পড়ে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, অপ্রাচুর্য ও তৎপ্রসূত সমস্যাসমূহের পর্যালোচনাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু।*

অপরদিকে কিন্তু সমস্যার পর্যালোচনাই যথেষ্ট নয়; সমস্যার সমাধানকল্পেও অর্থবিদ্যার আলোচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের জীবনযাত্রার মান

পরিধির বিস্তৃতি

উন্নয়নের উদ্দেশ্য লইয়াই ব্যবহারিক শাস্ত্র (applied science) হিসাবে অর্থবিদ্যার আলোচনা সুরু হইয়াছিল। এই প্রসংগে একজন লেখক বলিয়াছেন যে অর্থবিদ্যাবিদ শুধু রোগ নির্ণয় করেন না, রোগের নিরাময়ের ব্যবস্থাও করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অর্থ-বিদ্যাবিদ শুধু জিনিসপত্রের দাম কেন বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, কিভাবে দামবৃদ্ধি রোধ করা যায় তাহারও নির্দেশ দিয়া থাকেন। অতএব, অর্থবিদ্যা আলোক-সম্পাতক (light-bearing) এবং ফলপ্রদায়ী (fruit-bearing) উভয় প্রকার শাস্ত্রেরই পর্যায়ভুক্ত। উহা অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি কি তাহা ব্যাখ্যা ক'র, আবার কিভাবে ঐ সমস্যার সমাধান করা যায় তাহারও নির্দেশ দেয়। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, এই

কল্যাণের পথনির্দেশই অর্থবিদ্যা আলোচনার উদ্দেশ্য

নির্দেশ প্রদানের কার্যই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থবিদ্যা অর্থ-নৈতিক সমস্যার সমাধানের নির্দেশ দিয়া মানুষের কল্যাণ-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে। এইখানেই অর্থবিদ্যা আলোচনার সার্থকতা এবং এই কারণেই অর্থবিদ্যার আলোচনা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

অর্থ-ব্যবস্থা ও ইহার কার্যাবলী (Economic System and its Functions): বর্তমানে প্রত্যেক সভ্য দেশেই রাষ্ট্রশক্তি মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ,

অর্থ-ব্যবস্থা কাহাকে বলে

এই দেশে আমরা ইচ্ছামত মদের দোকান খুলিয়া, বাস-ট্যাক্সি চালাইয়া, বিদেশ হইতে মালপত্র আমদানি করিয়া অর্থোপার্জন করিতে পারি না। ইহাদের জন্য সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হয়। উপরন্তু, সমাজবদ্ধ লোক সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পাদন করে। যেমন, কৃষক

* 'Economics is fundamentally a study of scarcity and of the problems to which scarcity gives rise.' Stonier and Hague

দেখে যে দেশে গম না চাউলের চাহিদা বেশী। যাহার চাহিদা বেশী সাধারণত সে সেই শস্য উৎপাদনেই মনোযোগী হয়। এইভাবে সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে একটা শৃংখলা দেখা যায়। এইরূপ শৃংখলিত কাজকর্মকেই সংক্ষেপে 'অর্থ-ব্যবস্থা' (economic system) বলা হয়।

অর্থ-ব্যবস্থার কার্যাবলী প্রধানত পাঁচটি :

অর্থ-ব্যবস্থার পাঁচটি কার্য

(১) অর্থ-ব্যবস্থাকে প্রথমেই নির্ধারণ করিতে হয় যে, কোন্ কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে।

(২) উহাকে দেখিতে হয় যে উৎপাদনের উপাদানগুলি কিভাবে বণ্টন করিলে সর্বাধিক ফল লাভ করা সম্ভব হয়। যেমন, জমিতে গৃহনির্মাণ ও শস্য উৎপাদন উভয়ই করা যাইতে পারে। কোন্‌টি করা যাইবে তাহা সমাজকে বিচার করিয়া দেখিতে হয়।

(৩) কোন ভোগ্যদ্রব্যের যোগান চাহিদার তুলনায় স্বল্প হইলে সমাজকে উহার ন্যায্য বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে দেশে খাদ্যে ঘাটতি পড়িলে রেশনিং প্রথা চালু করিতে হয়, ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলিতে হয়, ইত্যাদি।

(৪) ইহার পর আসে আয় (income) বণ্টনের সমস্যা। যে-কোন প্রকার উৎপাদনকার্যেই নানা শ্রেণীর লোক অংশগ্রহণ করে। যেমন, কল-কারখানায় উৎপাদনে ধনীরা যোগায় মূলধন এবং শ্রমিকরা যোগায় শ্রম। এখন কারখানায় যে আয় হইল তাহার মধ্যে মূলধন-মালিক কতটা পাইবে আর শ্রমিকরা কত পাইবে তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। অর্থ-ব্যবস্থার ইহাও অন্যতম কার্য।

(৫) ইহা ছাড়াও আর একটি সমস্যা আছে। ইহা হইল সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের সমস্যা। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে (economic condition) বজায় রাখিতে হইবে এবং সকল সময় উহার উন্নয়নে সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

বলা হইয়াছে যে বর্তমানে রাষ্ট্রশক্তি অর্থনৈতিক কাজকর্মকে 'অল্পবিস্তর' নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এই নিয়ন্ত্রণের মাত্রা যদি 'অল্প' হয় তবে ঐ-রূপ অর্থ-ব্যবস্থাকে অপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা (unplanned economy) বলা যায়। অপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্যকরূপে সম্পাদিত হয় না। দেখা যায়, অনেক অকাম্য দ্রব্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, ঘাটতির সময় সকলে প্রয়োজনমত ভোগ্যদ্রব্য পাইতেছে না, শ্রমিক উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও দুই বেলা অন্ন জুটাইতে পারিতেছে না, অর্থনৈতিক অবস্থাও ঠিকমত বজায় থাকিতেছে না বা উন্নয়নের পথে চলিতেছে না। এইজন্য বর্তমান দিনে ঝোঁক দেখা দিয়াছে 'অধিক' নিয়ন্ত্রণের প্রতি। অধিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত অর্থ-ব্যবস্থাকে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা (planned economy) বলে। ইহাতে পরিকল্পিত কর্মসূচী

অপরিকল্পিত ও পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা

অনুসারে লোকের অর্থনৈতিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করিয়া অর্থ-ব্যবস্থার কার্যাবলী সম্যকভাবে সম্পাদনের প্রচেষ্টা করা হয়।

ভারতের বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থা অন্যতম পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা। শিল্প-বাণিজ্য সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার পরিচালনাধীনে থাকে বলিয়া এই ধরনের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা (mixed economy) বলা হয়। এ-সম্বন্ধে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রসংগে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

সংক্ষিপ্তসার

বিষয়বস্তু: আমাদের দৈনন্দিন খাওয়া-পরা, বাঁচিয়া থাকার সমস্যা লইয়াই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। এই সমস্যার উদ্ভব হয় অপ্রাচুর্য হইতে, এবং ইহার সহিত 'নির্বাচন' ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং বলা হয়, 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্ব'ই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু।

বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ: অপ্রাচুর্য শুধু যে মৌলিকতম অর্থনৈতিক সমস্যা তাহাই নহে, ইহা চিরন্তন সমস্যাও বটে—ইহা কোনদিনই মিটিতে পারে না, কারণ মানুষের অভাব সীমাহীন ও ক্রমবর্ধমান, কিন্তু অভাবমোচনের উপকরণগুলি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ।

অপ্রাচুর্যের সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদিগকে পদে পদে নির্বাচন করিতে হয়। এইজন্যই 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্ব' অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু বর্তমান দিনে অপ্রাচুর্যের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা ও নির্বাচনকার্য সম্পাদন—উভয়ই করা হয় বিনিময় বা অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয়ের মাধ্যমে। সুতরাং 'বিনিময়'কেও অর্থবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে অর্থবিদ্যার পূর্ণাংগ সংজ্ঞায় ইহাই করা হয়। এইরূপ পূর্ণাংগ সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে: অপ্রচুর উপকরণ দ্বারা সীমাহীন অভাবের সর্বাধিক পরিতৃপ্তিসাধনের জন্য মানুষ নির্বাচন ও বিনিময়ের মাধ্যমে যে-সকল কাজকর্ম সম্পাদন করে, তাহাদের পর্যালোচনাকেই অর্থবিদ্যা বলে।

আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি: অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি নানা দিক দিয়া সীমাবদ্ধ—১। অর্থবিদ্যা মাত্র সমাজবদ্ধ লোকের কাজকর্ম লইয়াই আলোচনা করে; ২। ইহা টাকাকড়ির সহিত সম্পর্কিত কাজকর্ম লইয়াই আলোচনা করে; এবং ৩। ইহা অভাবমোচনের অপ্রচুর উপকরণগুলি লইয়াই আলোচনা করে। সংক্ষেপে বলা যায়, অপ্রাচুর্যের দিক হইতে অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। অপরদিকে অর্থবিদ্যা শুধু সমস্যার পর্যালোচনাই করে না, সমস্যা সমাধানেরও ইংগিত দেয়। সুতরাং অর্থবিদ্যা আলোক-সম্পাতক ও ফলপ্রদায়ী উভয় শাস্ত্রেরই পর্যায়ভুক্ত। বর্তমানে এইরূপ ফলপ্রদায়ী শাস্ত্র হিসাবেই, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পথনির্দেশক হিসাবেই অর্থবিদ্যার চর্চা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

অর্থ-ব্যবস্থা ও ইহার কার্যাবলী: রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া এবং সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজবদ্ধ লোক অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পাদন করে। এইরূপ শৃংখলিত কাজকর্মকে সংক্ষেপে অর্থ-ব্যবস্থা বলা হয়।

অর্থ-ব্যবস্থার কার্যাবলী প্রধানত পাঁচটি: ১। কোন্ কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপাদন করা হইবে তাহা নির্ধারণ করা; ২। উৎপাদনের উপাদানগুলিকে বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রের মধ্যে বণ্টন করা; ৩। অপ্রচুর ভোগ্যদ্রব্যের ন্যায্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা; ৪। আয়ের বণ্টন করা; ৫। অর্থনৈতিক অবস্থার সংরক্ষণ ও উহার উন্নয়ন সাধন করা।

অর্থ-ব্যবস্থা (ক) অপরিকল্পিত, এবং (খ) পরিকল্পিত—এই দুই রকমের হয়। ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা। এইরূপ পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার উদ্যোগে পরিচালিত হয় বলিয়াই ইহাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বলা হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. **Discuss the subject matter of Economics.**

অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু লইয়া আলোচনা কর। [১-৫ পৃষ্ঠা]

2. **How would you define Economics ? Give reasons for your answer.**

কিভাবে অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

[ইংগিত: 'অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন তত্ত্ব'ই আধুনিক অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু বলিয়া অভিহিত। কিন্তু ইহার সহিত বিনিময় যোগ না করিলে বিষয়বস্তুর বর্ণনা পূর্ণাংগ হয় না। অতএব, অপ্রাচুর্য, নির্বাচন ও বিনিময়— এই তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতেই অর্থবিদ্যার সংজ্ঞা প্রদান করা প্রয়োজন।...(১-৫ পৃষ্ঠা)]

3. **Discuss the scope of Economics.**

অর্থবিদ্যার আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি সম্বন্ধে আলোচনা কর। [৫-৬ পৃষ্ঠা]

4. **What is an Economic System ? What are its functions ?**

অর্থ-ব্যবস্থা কাহাকে বলে ? ইহার কার্যাবলী কি কি ? [৬-৮ পৃষ্ঠা]

দ্বিতীয় অধ্যায়

কতকগুলি মৌলিক ধারণা

(Some Fundamental Concepts)

বর্ণপরিচয় না করিয়া যেমন কোন ভাষা শিক্ষা করা চলে না, তেমনি মৌলিক ধারণাগুলির অর্থ সুস্পষ্টভাবে না বুঝিয়া কোন বিজ্ঞান বা শাস্ত্রও চর্চা করা যায় না। অর্থবিদ্যা অন্যতম বিজ্ঞান বলিয়া আলোচনার সুরুতেই কতকগুলি মৌলিক ধারণার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

অর্থবিদ্যার মৌলিক ধারণার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দ্রব্য (Goods): মানুষ তাহার অভাবমোচনের দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়, এবং অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হইল মানুষের এই কর্মপ্রচেষ্টা। এখন প্রশ্ন, 'দ্রব্য' বলিতে কি বুঝায় ?

দ্রব্য কাহাকে বলে

সংক্ষেপে বলা যায়, যাহা কিছু মানুষের অভাববোধকে পরিতৃপ্ত করে তাহাই দ্রব্য। ইহা 'বস্তুগত' (material) এবং 'অ-বস্তুগত' (non-material) উভয়ই হইতে পারে। চালডাল, তরিতরকারি, ঘরবাড়ী, বইপত্র, আলোবাতাস প্রভৃতি বস্তুগত দ্রব্যের উদাহরণ। অপরপক্ষে ব্যবসায়ীর দক্ষতা, ডাক্তার গায়ক মিস্ত্রী প্রভৃতির পেশাগত কর্মকুশলতা, ব্যবসায়ের সুনাম (goodwill) ইত্যাদি হইল অ-বস্তুগত দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। ডাক্তার যখন চিকিৎসা করেন, শিক্ষক যখন শিক্ষাদান করেন, গায়ক যখন সুকণ্ঠ সংগীতের দ্বারা লোককে আনন্দ দান করেন তখন ঐরূপ কার্যকে অর্থবিদ্যার ভাষায় 'সেবা' (service) বলা হয়।

বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য: ১। বস্তুগত ও অ-বস্তুগত দ্রব্য

দ্রব্যাদিকে অন্যভাবে 'বাহ্যিক' (external) এবং 'আভ্যন্তরীণ' (internal) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, আলোবাতাস, ব্যবসায়ের সুনাম প্রভৃতি হইল মানুষের বাহিরের জিনিস; কিন্তু ব্যবসায়ীর দক্ষতা, গায়কের গান গাহিবার কুশলতা, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের দক্ষতা প্রভৃতি মানুষের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সুতরাং ইহাদিগকে আভ্যন্তরীণ দ্রব্য বলা হয়।

২। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দ্রব্য

আবার দ্রব্যাদি 'হস্তান্তরযোগ্য' (transferable) অথবা 'হস্তান্তরযোগ্যতাহীন' (non-transferable) হইতে পারে। ঘরবাড়ী, ক্ষেতখামার, ধানচাল, ব্যবসায়ের সুনাম প্রভৃতি একজনের নিকট হইতে অপরের নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয় করা যায়। ইহাদের বলা হয় হস্তান্তরযোগ্য দ্রব্য। কিন্তু কোন লোকের ব্যক্তিগত গুণাবলী যেমন, গায়কের সুকণ্ঠ, খেলোয়াড়ের নৈপুণ্য, চিকিৎসকের দক্ষতা ইত্যাদি, একজন অপরকে দিতে অথবা বিক্রয় করিতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন স্থানের আলোবাতাস স্বাস্থ্যকে অন্য এক স্থানে লইয়া আসা যায় না। সুতরাং এগুলি হইল হস্তান্তরযোগ্যতাহীন দ্রব্য।

৩। হস্তান্তরযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্যতাহীন দ্রব্য

'অবাধলভ্য' (free) ও 'অর্থনৈতিক' (economic) এইভাবেও দ্রব্যসমূহের আর এক শ্রেণীবিভাগ করা হয়। অবাধলভ্য দ্রব্য হইল সেইগুলি যেগুলি প্রকৃতি এত প্রচুর পরিমাণে দিয়াছে যে উহাদের ইচ্ছামত ব্যবহারে কোন বাধা নাই। প্রকৃতিদত্ত আলোবাতাস, অরণ্যে কাষ্ঠ, মরুভূমিতে বালুকা, নদীতে জল প্রভৃতি অবাধলভ্য দ্রব্যের দৃষ্টান্ত। ইহাদের সম্পর্কে হিসাব করিয়া ব্যবহার করিবার কোন প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ দ্রব্যই অবাধলভ্য নয়। অধিকাংশ দ্রব্যেরই সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর এবং মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারাই উহাদিগকে সংগ্রহ করিতে হয়। এই সকল অপ্রচুর (scarce) দ্রব্যকেই অর্থনৈতিক দ্রব্য (economic goods) বলা হয়। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কোন দ্রব্য অবাধলভ্য বা অর্থনৈতিক দ্রব্য কি না তাহা অবস্থার উপর নির্ভর করে। নদীতীরে জল অবাধলভ্য দ্রব্য, কারণ চাহিদার তুলনায় প্রচুর বলিয়া উহার জন্য কাহাকেও দাম দিতে হয় না; কিন্তু যখন কলিকাতার মত সহরাঞ্চলে নদী হইতে গৃহে গৃহে ঐ জল সরবরাহ করা হয় তখন উহা অর্থনৈতিক দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্রব্য হিসাবে জলের এই পরিবর্তনের মূলে আছে মানুষের প্রচেষ্টা (human effort) বা পরিশ্রম। অর্থাৎ, পরিশ্রমই অবাধলভ্য দ্রব্যকে অর্থনৈতিক দ্রব্যে পরিণত করে।

৪। অবাধলভ্য ও অর্থনৈতিক দ্রব্য

অর্থবিদ্যায় অর্থনৈতিক দ্রব্যকে সংক্ষেপে 'সম্পদ' (wealth) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

সম্পদ

উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে আবার দ্রব্যসমূহকে 'ভোগ্যদ্রব্য' (consumers' or consumption goods) এবং 'মূলধন-দ্রব্য' (producers' or production or capital goods) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যে-সকল দ্রব্য সরাসরি আমাদের অভাব বা আকাংক্ষা মিটায় তাহাদের বলা হয় ভোগ্যদ্রব্য। যেমন, চালডাল জামা-কাপড় ঘরবাড়ী ইত্যাদি। মূলধন-দ্রব্য হইল সেগুলি যাহা অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করিয়া পরোক্ষভাবে আমাদের চাহিদা মিটায়। যেমন, কলকারখানা যন্ত্রপাতি কাঁচামাল প্রভৃতি। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রত্যক্ষ ভোগের দ্রব্য হইল ভোগ্যদ্রব্য, আর উৎপাদনের জন্য উৎপাদকের হাতে যে-দ্রব্য থাকে তাহা হইল মূলধন-দ্রব্য। তবে একই দ্রব্য এক অবস্থায় ভোগ্যদ্রব্য এবং অন্য অবস্থায় মূলধন-দ্রব্য হইতে পারে। যখন আমরা বাড়ীর রান্নাবান্নার জন্য কয়লা ব্যবহার করি তখন কয়লা ভোগ্যদ্রব্য, কিন্তু কারখানায় যে-কয়লা ব্যবহার করা হয় তাহা মূলধন-দ্রব্য, কারণ উহাকে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে। সুতরাং কোন দ্রব্য মূলধন-দ্রব্য না ভোগ্যদ্রব্য তাহা ব্যবহারের উপর নির্ভর করে।

৫। ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধন-দ্রব্য

স্থায়িত্ব অনুসারেও দ্রব্যাদিকে 'একবার ব্যবহার্য দ্রব্য' (single-use goods) এবং 'স্থায়ী দ্রব্য' (durable goods) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যে-সকল দ্রব্য একবার মাত্র ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হইয়া যায় তাহাদিগকে 'একবার ব্যবহার্য দ্রব্য' বলা হয়। যেমন, যে-কয়লা একবার পোড়ানো হইল তাহাকে দ্বিতীয়বার আর পোড়ানো চলে না, যে-লেবুটি একবার খাওয়া হইল তাহা আর দ্বিতীয়বার খাওয়া যায় না। অপরদিকে এরূপ দ্রব্য আছে যাহাদের একাধিকবার ব্যবহার করা চলে—যেমন, যে-কলমটি দিয়া আমি লিখিতেছি তাহা দিয়া একবার লিখিলেই তাহার ব্যবহার শেষ হয় না—একই কলম দ্বারা বেশ কিছুদিন লেখা চলে। কারখানায় যে-সকল যন্ত্রপাতির দ্বারা উৎপাদন করা হয় তাহা একাধিকবার ব্যবহারযোগ্য। এই ধরনের একাধিকবার ব্যবহার্য দ্রব্যকে 'স্থায়ী দ্রব্য' বলা হয়।

৬। 'একবার ব্যবহার্য দ্রব্য' এবং 'স্থায়ী দ্রব্য'

উপযোগ (Utility) : অর্থবিদ্যায় 'উপযোগ' বলিতে অভাব মিটাইবার ক্ষমতাকে বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, উপযোগ হইল মানুষের অভাববোধ পরিতৃপ্ত করিবার জন্য দ্রব্যের গুণ বা ক্ষমতা। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে কোন দ্রব্যের তৃপ্তিদান করিবার ক্ষমতাই উপযোগ, দ্রব্যটি উপযোগ নহে। যে-কলম দিয়া আমি লিখি সেই কলমটি উপযোগ নহে, আমার লেখায় সহায়তা করার জন্য ইহার যে-ক্ষমতা তাহাই উপযোগ। লেখায় সহায়তা করে বলিয়াই আমি কলমের আকাংক্ষা করি। এইজন্য উপযোগকে আকাংক্ষা বা কাম্যতা (desiredness) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

অভাব মিটাইবার ক্ষমতাই উপযোগ

অর্থবিদ্যায় 'উপযোগ' শব্দটি ব্যবহার করিবার সময় দুইটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। প্রথমত, উপযোগ শব্দটির সহিত কোন নৈতিক প্রশ্ন জড়িত নাই। নীতির দিক দিয়া ভাল হউক বা মন্দ হউক, কোন দ্রব্যের জন্য মানুষের আকাংক্ষা থাকিলেই ঐ দ্রব্যের উপযোগ আছে বলিয়া ধরিতে হইবে। আকাংক্ষা উচুদরের না নীচুদরের, অথবা দ্রব্যটি উপকারী না ক্ষতিকারক তাহা আমাদের দেখিবার কথা নয়। দুগ্ধ উপকারী এবং মদ্য ক্ষতিকারক। কিন্তু দুগ্ধের যেমন আমাদের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে, মদ্যপায়ীর নিকট মদেরও সে-ক্ষমতা আছে। সুতরাং উভয়েরই উপযোগ বা অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে।

উপযোগের সহিত নৈতিক প্রশ্ন জড়িত নাই

দ্বিতীয়ত, উপযোগ একটি আপেক্ষিক (relative) ও মানসিক (subjective) ধারণা। কোন দ্রব্য হয়ত একজনের আকাংক্ষা তৃপ্তি করিতে পারে, অপর একজনের পারে না। যেমন, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একজনের জল হইলেই চলিতে পারে, অপর একজনের কিন্তু লেমনেডের প্রয়োজন হয়; অথবা আহারের জন্য কেহ কেহ ভাত, আবার কেহ কেহ রুটি পছন্দ করে। এইভাবে একই দ্রব্য দুই ব্যক্তির আকাংক্ষা সমানভাবে পূরণ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া সময়ের ব্যবধানে কোন জিনিসের জন্য একই ব্যক্তির আকাংক্ষার তারতম্য দেখা যায়। যেমন, তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়িলে পানীয় জলের জন্য আকাংক্ষা খুব তীব্র থাকে, কিন্তু জলপানের পর তৃষ্ণা মিটিলে সাময়িকভাবে পানীয় জলের জন্য আকাংক্ষা আর থাকে না। সুতরাং দ্রব্যের উপযোগ বা পরিতৃপ্তিদানের ক্ষমতা সকল সময় সকল অবস্থায় সকলের নিকট সমান নহে।

উপযোগ অন্যতম আপেক্ষিক ও মানসিক ধারণা

উপযোগের প্রকারভেদ (Different Kinds of Utility): মোটামুটিভাবে উপযোগ পাঁচ প্রকারের হইতে পারে:

(১) স্বাভাবিক উপযোগ (Elementary or Natural Utility): প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যের যে-উপযোগ থাকে তাহাকে 'স্বাভাবিক' উপযোগ বলা হয়। যেমন, আমাদের কাছে প্রকৃতিদত্ত আলোবাতাস-জলের যে উপযোগ আছে তাহা স্বাভাবিক উপযোগ।

(২) রূপগত উপযোগ (Form Utility): কোন দ্রব্যের রূপান্তর ঘটাইয়া উহার উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। এই প্রকারের উপযোগকে 'রূপগত' উপযোগ বলা হয়। কাঠ হইতে ছুতার-মিস্ত্রী যখন চেয়ার টেবিল আলমারি প্রভৃতি আসবাবপত্র তৈয়ারি করে তখন সে কাঠকে রূপান্তরিত করিয়া কাঠের উপযোগ বৃদ্ধি করে। আবার যখন তুলা হইতে বস্ত্র তৈয়ারি করা হয় তখন তুলাকে নূতন রূপ দিয়া উহার উপযোগ বৃদ্ধি করা হয়। এইভাবে নূতন রূপ দেওয়ার ফলে যে উপযোগ সৃষ্টি হয় তাহাই রূপগত উপযোগ।

(৩) স্থানগত উপযোগ (Place Utility): একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণ করিয়া কোন দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি বা সৃষ্টি করা যায়। যেমন, খনি হইতে কয়লা নগরাঞ্চলে ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করিয়া কয়লার উপযোগ বৃদ্ধি করা হয়; অথবা দার্জিলিং হইতে কমলালেবু কলিকাতায় চালান দিয়া উহার উপযোগ বৃদ্ধি করা হয়।

(৪) সময়গত উপযোগ (Time Utility): একসময় হয়ত কোন জিনিসের জন্য মানুষের আকাংক্ষা কম, অন্যসময় উহার জন্য আকাংক্ষা অধিক। সময়ের ব্যবধানে দ্রব্যের উপযোগ বাড়িয়া যাইতে পারে। পূজার সময় ছেলেমেয়েদের নূতন জামাকাপড়ের যে-আকাংক্ষা থাকে, অন্যসময় তাহা থাকে না। অর্থাৎ, পূজার সময় জামাকাপড়ের উপযোগ বাড়িয়া যায়। সুতরাং যে-সময় যে-দ্রব্য আকাংক্ষিত হয় সে-সময় সেই দ্রব্যের যোগান দিয়া সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়।

(৫) সেবাগত উপযোগ (Service Utility): কতকগুলি দ্রব্য বস্তুর আকার ধারণ না করিয়া সরাসরি আমাদের আকাংক্ষা পরিতৃপ্ত করে। ইহাদের তৃপ্তিদানের ক্ষমতা বা উপযোগকে সেবাগত উপযোগ বলা হয়। যেমন, চিকিৎসকের চিকিৎসা, শিক্ষকের শিক্ষাদান, ভৃত্যের পরিচর্যা ইত্যাদি।

সম্পদ (Wealth): অর্থবিদ্যায় সম্পদ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। সম্পদ বলিতে সেই সকল বস্তুগত দ্রব্যকে বুঝায় যাহাদের বিনিময়-মূল্য আছে—অর্থাৎ, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসমষ্টিকেই সম্পদ বলা হয়। এখন কোন বস্তুগত দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য থাকিতে হইলে উহাকে নিম্নলিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইতে হইবে:

সম্পদ কাহাকে বলে

(১) উহার উপযোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতা থাকিবে; (২) উহার যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর (scarce) হইবে; এবং (৩) উহা বিক্রয়যোগ্য (marketable) হইবে। এখন এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

সম্পদের তিনটি বৈশিষ্ট্য:

প্রথমত, ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, উপযোগ না থাকিলে কোন জিনিসের বিনিময়-মূল্য থাকিতে পারে না। যাহার অভাবমোচন বা আকাংক্ষাপূরণের ক্ষমতা নাই তাহা কেহই চাহিবে না, টাকা দিয়া ক্রয় করা ত দূরের কথা। সুতরাং সম্পদ হইতে হইলে প্রথমেই বস্তুটির পক্ষে উপযোগ থাকা প্রয়োজন।

১। উপযোগ

দ্বিতীয়ত, মাত্র উপযোগ থাকিলেই কোন জিনিস সম্পদ বলিয়া গণ্য হয় না। যে-সকল দ্রব্য অবাধলভ্য, যাহা চাহিলেই পাওয়া যায় তাহাদের বিনিময়ে কেহ কোন মূল্য দেয় না। আমরা নিত্য যে প্রকৃতিদত্ত আলোবাতাস ভোগ করি তাহা আমাদের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের তুলনায়

২। অপ্রাচুর্য

ইহাদের যোগান এতই প্রচুর যে ইহাদের ক্রয়বিক্রয়ের কোন প্রশ্নই উঠে না। বিনামূল্যেই ইহাদের আমরা ভোগ করিয়া থাকি। অনুরূপভাবে নদীতীরে চাহিদার তুলনায় জলের যোগান এতই প্রচুর যে জল ক্রয়বিক্রয়ের কথা কেহ চিন্তাই করে না। সুতরাং অবাধলভ্য দ্রব্যাদি সম্পদের পর্যায়ে পড়ে না।

এক অবস্থায় যে-দ্রব্য সুপ্রচুর অন্য অবস্থায় তাহা অপ্রচুর হইতে পারে

তবে মনে রাখিতে হইবে যে যাহা এক অবস্থায় অবাধলভ্য তাহা অন্য অবস্থায় চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর হইতে পারে; ফলে উহার জন্য দাম দিতে হইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, নদীতীরে জল অবাধলভ্য দ্রব্য, কিন্তু সহরে বাড়ীতে বাড়ীতে কর্পোরেশন কিংবা মিউনিসিপ্যালিটি যে-জল সরবরাহ করে তাহা অবাধলভ্য নয়; ইহার জন্য নগরবাসীদের নিকট হইতে কর আদায় করা হয়। সুতরাং এই অবস্থায় জল সম্পদের পর্যায়ে পড়ে। বায়ুর বেলায় অনুরূপ উক্তি খাটে। প্রকৃতিদত্ত বায়ু আমরা অবাধে ও বিনামূল্যে শ্বাসপ্রশ্বাসে লই; কিন্তু সিনেমাগৃহে যখন কৃত্রিম উপায়ে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা করা হয় তখন উহার জন্য সিনেমা-মালিককে অর্থব্যয় করিতে হয় এবং ঐ খরচ দর্শকদের নিকট হইতে সিনেমা-টিকিটের দামের মধ্য দিয়া তুলিয়া লওয়া হয়। এ-ক্ষেত্রে বায়ুও অপ্রচুর সামগ্রী এবং সম্পদের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং কোন দ্রব্য সম্পদ কি না তাহা বিচারের সময় দেখিতে হইবে যে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর বা সীমাবদ্ধ কি না। সীমাবদ্ধ না হইলে উহা সম্পদের পর্যায়ে পড়িবে না।

৩। বিক্রয়যোগ্যতা

তৃতীয়ত, আবার উপযোগ থাকিলে এবং সীমাবদ্ধ হইলেই কোন দ্রব্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হয় না। উপযোগ ও সীমাবদ্ধতা ছাড়াও দ্রব্যটির আর একটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। দ্রব্যটিকে বিক্রয়যোগ্য হইতে হইবে। অর্থাৎ, দ্রব্যটি ক্রয়বিক্রয়ের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন।

বিক্রয়যোগ্য হওয়ার জন্য হস্তান্তরযোগ্য হওয়া প্রয়োজন

বিক্রয়যোগ্য হইতে হইলে দ্রব্যের পক্ষে আবার হস্তান্তরযোগ্য হওয়া আবশ্যক। যেমন, ঘরবাড়ী চালডাল পোশাকপরিচ্ছদ বইপত্র ইত্যাদি একজন আর একজনের নিকট বিক্রয় করিতে পারে। সুতরাং ইহারা বিক্রয়যোগ্য বা হস্তান্তরযোগ্য। 'হস্তান্তর' শব্দটির দ্বারা মালিকানার হস্তান্তরই বুঝায়, স্থানান্তর বুঝায় না। যেমন, যখন জমি বা বাড়ী বিক্রয় করা হয় তখন উহা একস্থান হইতে অন্য কোন স্থানে স্থানান্তরিত হয় না। জমি বা বাড়ীর মালিকানা একজনের নিকট হইতে অপর একজনের নিকট হস্তান্তরিত হয় মাত্র। হস্তান্তর করা যায় না বলিয়াই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পাসের সার্টিফিকেট বা চিকিৎসকের পারদর্শিতা সম্পদ বলিয়া গণ্য হয় না।

হস্তান্তর বলিতে মালিকানার হস্তান্তর বুঝায়

অতএব, যে-সকল দ্রব্য হস্তান্তর করা যায় না এবং বিক্রয়যোগ্য নয় সে-সকল দ্রব্যকে সম্পদ আখ্যা দেওয়া হয় না। যেমন, মানুষের স্বাস্থ্য, গায়ক-গায়িকার সংগীত-নৈপুণ্য, চিকিৎসকের পারদর্শিতা, শিল্পীর শিল্পকৌশল প্রভৃতি ব্যক্তিগত গুণাবলীর উপযোগ আছে এবং উহাদের যোগানও অপ্রচুর; কিন্তু এই জিনিসগুলি একজন অপরের নিকট হস্তান্তরিত করিতে পারে না বলিয়া উহারা সম্পদ বলিয়া গণ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, চলতি কথায় আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'। কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহার স্বাস্থ্যকে অপরের নিকট হস্তান্তরিত করিতে পারে না; সুতরাং অর্থবিদ্যায় স্বাস্থ্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

অর্থবিদ্যায় স্বাস্থ্য সম্পদ বলিয়া গণ্য নয়

দেখা গেল, কোন দ্রব্য সম্পদ হইতে হইলে উহাকে বিক্রয়যোগ্য হইতে হইবে। কিন্তু বিক্রয়যোগ্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে উহাকে বাস্তবিকপক্ষে বিক্রয় করিতে হইবে। সমাজের এমন সকল সাধারণ সম্পদ আছে—যথা, রাস্তাঘাট পুল রেলপথ উদ্যান স্কুলকলেজ চিড়িয়াখানা ইত্যাদি যাহা বেচাকেনা করা হয় না। তবুও এগুলি সম্পদের পর্যায়ভুক্ত।

পরিশেষে, 'সম্পদ' শব্দটি বস্তুগত দ্রব্যকে (material goods) বুঝাইতেই ব্যবহার করা হয়। অনেকে অবশ্য অ-বস্তুগত দ্রব্যকেও সম্পদ বলিয়া অভিহিত করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু এইরূপ করায় অসুবিধা আছে।

সম্পদ বলিতে বস্তুগত দ্রব্যই বুঝায়

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সম্পদ হইতে গেলে দ্রব্যকে হস্তান্তরযোগ্য হইতে হইবে। অ-বস্তুগত দ্রব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হস্তান্তরযোগ্য নয় বলিয়া উহারা সম্পদের পর্যায়ে পড়ে না। উপরন্তু, অ-বস্তুগত দ্রব্যকে সম্পদ বলিয়া গণ্য করিলে সম্পদ পরিমাপ করিবার ব্যাপারেও অসুবিধা দেখা যায়। সম্পদ হইল কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে (at a certain point in time) অবস্থিত বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসমষ্টি (a stock of marketable goods)। ডাক্তারের সেবা, উকিলের পরামর্শ, শিক্ষকের শিক্ষাদান, বাসের কণ্ডাক্টরের কার্য, সিনেমা-থিয়েটারের অভিনেতার কার্য (services) আমাদের অভাবপূরণ করে সত্য। ইহারা চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর এবং বাজারে ইহাদের বিনিময়-মূল্যও আছে। কিন্তু ইহাদের উৎপাদন ও ভোগ একই সময় সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে এবং ইহারা বস্তুগত দ্রব্যের আকার ধারণ করিতেছে না। অতএব, কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে ইহাদের পরিমাণ কত তাহা নির্ধারণ করা যায় না। এই কারণে আমরা অ-বস্তুগত সেবাকে সম্পদের পর্যায়ে ফেলিব না; সম্পদ বলিতে মাত্র নির্দিষ্ট মুহূর্তে অবস্থিত দ্রব্যসমষ্টিকেই বুঝিব।

নির্দিষ্ট মুহূর্তে অবস্থিত দ্রব্যসমষ্টিকেই সম্পদ বলা হয়

সম্পদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Wealth): মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে 'ব্যক্তিগত সম্পদ' (individually owned wealth) এবং

'সমষ্টিগত সম্পদ' (collectively owned wealth) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

যে-সকল সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা-স্বত্ব থাকে তাহাদিগকে ব্যক্তিগত সম্পদ বলা হয়। যেমন, ব্যক্তিবিশেষের ঘরবাড়ী, ধনসম্পত্তি,আসবাবপত্র, বই, কাপড় ইত্যাদি। অপরদিকে সাধারণে যে-সকল সম্পদের মালিক তাহাদিগকে সমষ্টিগত সম্পদ বলা হয়। যেমন, রাস্তাঘাট, পার্ক, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, জাতীয় লাইব্রেরী, সরকারী ঘরবাড়ী ইত্যাদি। ইহা ছাড়া বর্তমান সময়ে সরকার অনেক ব্যবসায় ও শিল্প নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে—যেমন, রেলপথ, নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা, অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা, সরকারী পরিবহণ ইত্যাদি। এগুলিও সমষ্টিগত সম্পদের উদাহরণ।

ব্যক্তিগত সম্পদ

সমষ্টিগত সম্পদ

আবার 'জাতীয়' (national) বা 'সামাজিক' সম্পদ কথাটিও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ইহার দ্বারা কোন সমাজ বা দেশের সমগ্র সম্পদকে বুঝায়। সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পদ ও সমষ্টিগত সম্পদ লইয়াই এই জাতীয় বা সামাজিক সম্পদ। উদাহরণস্বরূপ, সকল ভারতবাসার ব্যক্তিগত সম্পদ ও ভারত-রাষ্ট্রের সমষ্টিগত সম্পদ—উভয়ে মিলিয়াই হইল ভারতের জাতীয় সম্পদ।

'জাতীয়' বা 'সামাজিক' সম্পদ

জাতীয় সম্পদ পরিমাপ করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি যখন তাহার নিজস্ব সম্পদের হিসাব করে তখন সে তাহার ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, গহনা, বই ইত্যাদি ছাড়াও কোম্পানীর শেয়ার, বণ্ড, ডিবেঞ্চার, সরকারী ঋণপত্র (যেমন, সেভিংস সার্টিফিকেট), টাকাকড়ি (নোট ও মুদ্রা), অপরকে প্রদত্ত ঋণ ইত্যাদিও তাহার সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করে। শেয়ার বণ্ড ঋণপত্রকে ব্যক্তি যে তাহার সম্পদ বলিয়া মনে করিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক, কারণ এই সকল কাগজপত্র বিক্রয় করিয়া সে যে-কোন সময় অভাবমোচনের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারে। সম্পদের যে-বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহা এই সকল কাগজপত্রের আছে। অর্থাৎ, ইহাদের উপযোগ আছে, ইহারা চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর, ইহারা হস্তান্তরযোগ্য ও বিক্রয়যোগ্য এবং ইহারা বস্তুগত দ্রব্য। কিন্তু এই সকল কাগজপত্রের নিজস্ব কোন মূল্য নাই—ইহারা 'প্রকৃত সম্পদে'র মালিকানার নির্দেশক বলিয়াই মানুষ ইহাদের আকাংক্ষা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন কোন ব্যক্তি যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের (joint stock company) শেয়ার ক্রয় করে তখন তাহার ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির আংশিক মালিকানা জন্মায়। তাহার শেয়ারপত্র ঐ কোম্পানীর উপর তাহার আংশিক মালিকানা নির্দেশ করে বলিয়াই ব্যক্তির নিকট উহা

জাতীয় সম্পদের হিসাব কিভাবে করিতে হইবে

মূল্যবান। কিন্তু সমাজের নিকট উহার কোন মূল্য নাই; এই শেয়ারপত্রের পশ্চাতে কোম্পানীর যে-সম্পত্তি থাকে তাহাই আসলে সম্পদ। এই কারণে সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে শেয়ার বণ্ড প্রভৃতি সম্পদ বলিয়া গণ্য নহে; সম্পদ হইল ঐ প্রতিষ্ঠানের ঘরবাড়ী যন্ত্রপাতি মালমসলা ইত্যাদি দ্রব্য।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে শেয়ার বণ্ড ইত্যাদি সম্পদ নহে

অনুরূপভাবে ব্যক্তির দিক হইতে সরকারী ঋণপত্র সম্পদ বিবেচিত হইলেও সমাজের দিক হইতে উহা সম্পদ নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার কর সংগ্রহের দ্বারা ঋণ পরিশোধ বা ঋণের উপর সুদ প্রদান করে। ইহার অর্থ হইল দেশের একজনের নিকট হইতে অপরের নিকট অর্থ হস্তান্তরিত করা। আবার এক ব্যক্তি যখন অপর আর এক ব্যক্তিকে ঋণদান করে তখন ঐ ঋণপত্র সামাজিক দিক হইতে সম্পদ নয়—তবে ঐ ঋণের সাহায্যে প্রকৃত সম্পত্তি সৃষ্ট হইলে ঐ সম্পত্তি সম্পদের পর্যায়ভুক্ত হয়।

টাকাকড়ির ক্ষেত্রেও একই রকম যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত টাকাকড়ির মধ্যে নোট ও ধাতব মুদ্রা আছে। এইগুলি যে উপযোগসম্পন্ন, অপ্রচুর, হস্তান্তরযোগ্য এবং বস্তুগত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু নিজস্ব মূল্যের জন্য ইহাদের কেহ চাহে না; চাহে উহাদের দ্বারা অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করা যায় বলিয়া। অতএব টাকাকড়ি সম্পদের প্রতীক মাত্র, সম্পদ নহে। ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রে মুদ্রার ধাতুটুকু মাত্র সম্পদ, তাহার বেশী নহে। টাকাকড়ি যদি দেশের বা সমাজের সম্পদ হইত তাহা হইলে যে-কোন দেশ মাত্র নোট ছাপাইয়াই সম্পদশালী হইতে পারিত; খাদ্যের উৎপাদন, শিল্পের প্রসার, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতির কোন প্রয়োজনই হইত না।

সামাজিক দিক হইতে টাকাকড়ি সম্পদ নহে

জাতীয় সম্পদের হিসাবের সময় আমাদের আর এক বিষয়ও মনে রাখিতে হইবে। কোন দেশই আজ অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। নানাভাবে দেনাপাওনার সূত্রে এক দেশ অন্যান্য দেশের সহিত সম্পর্কিত। জাতীয় সম্পদ হিসাবের সময় দেশের নিকট বিদেশের পাওনাকে সমগ্র সম্পদ হইতে বাদ দিতে হইবে, আবার বিদেশের নিকট দেশের কোন পাওনা থাকিলে উহাকে দেশের সম্পদের সংগে যোগ করিতে হইবে।

জাতীয় সম্পদ হিসাবের সময় বিদেশের নিকট দেনাপাওনার হিসাব ধরিতে হইবে

আয় (Income): আয়কে সম্পদ হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। সম্পদ হইল মানুষের অভাবমোচনের জন্য কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে অবস্থিত দ্রব্যসমষ্টি বা মানুষের অভাবপূরণের সঞ্চিত উপযোগ; অপরপক্ষে আয় বলিতে বুঝায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পদ ও ব্যক্তি দ্বারা উৎপাদিত উপযোগ বা তৃপ্তিপ্রবাহ। সুতরাং সম্পদ হইল 'উপযোগের তহবিল' (store of utility); আর আয় হইল

আয় কাহাকে বলে

'উপযোগের স্রোত' (flow of utility)। দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে। আমরা যে-বাড়ীতে বসবাস করি সেই বাড়ীটি হইল 'সম্পদ', কিন্তু মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর ঐ বাড়ী আমাদিগকে যে-আশ্রয়দান করে তাহা হইল ঐ বাড়ী হইতে প্রবাহিত 'আয়'। আবার কাহারও মোটরগাড়ি থাকিলে উহা হইল তাহার সম্পদ ; কিন্তু ইহার পরিবহণকার্য—অর্থাৎ, একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইয়া তাহার স্থানান্তরগমনের যে-প্রয়োজন মিটায় তাহা হইল আয়। কেবলমাত্র সম্পদ হইতেই আয় সৃষ্টি হয় না। চিকিৎসক শিক্ষক উকিল চিত্রতারকা প্রভৃতিও আমাদের অভাবপূরণ করেন; সুতরাং ইঁহাদের সেবামূলক কার্যকেও আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। অতএব, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন লোক যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উপভোগ করিতে সমর্থ তাহাই হইল ঐ ব্যক্তির প্রকৃত আয়। ঐ সময়ের মধ্যে সে যদি তাহার পূর্বেকার সম্পদের বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে তবে তাহাও আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। যেমন, সে যদি ঐ সময়ের মধ্যে একখানি নূতন বাড়ী করিয়া থাকে তাহা আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। আবার সে যদি ঐ সময়ের মধ্যে পূর্ব-সম্পদের কোন অংশ ভাঙিয়া ভোগ করিয়া থাকে তাহা আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। যেমন, সে যদি পূর্বেকার কোন বাড়ী বিক্রয় করিয়া বা জমা টাকা ভাঙিয়া খাইয়া থাকে তবে তাহা আয়ের মধ্যে ধরা হইবে না।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোগ্য উপযোগই আয়

উপরি-উক্ত আলোচনা একটু জটিল মনে হইতে পারে, কারণ সাধারণত অর্থের হিসাবেই আমরা সম্পদ ও আয়কে দেখিয়া থাকি। কাহারও যদি কলিকাতায় একখানা বাড়ী থাকে এবং উহার দাম যদি বিশ হাজার টাকা হয় তাহা হইলে ঐ বিশ হাজার টাকাকে আমরা তাহার ব্যক্তিগত সম্পদ বলিয়া থাকি। আবার ঐ বাড়ী হইতে যদি সে ৩০০ টাকা করিয়া মাসিক ভাড়া পায় তবে উহা তাহার বাড়ী হইতে মোট আয় বলিয়া ধরি। আবার কোন লোক অফিসে বা কারখানায় কাজ করিয়া যদি মাসে মাসে ৩০০ টাকা করিয়া পায় তাহা হইলে আমরা বলিয়া থাকি লোকটির মাসিক আয় হইল ৩০০ টাকা। এইভাবে টাকাকড়ির অংকে আয়কে হিসাব করা হইলে তাহাকে বলা হয় আর্থিক আয় (money income)। কিন্তু টাকাকড়ির অংকে আয়কে হিসাব করা হইলেও আসলে ঐ টাকাকড়ির সাহায্যে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উপভোগ করিতে পারা যায় তাহাই হইল প্রকৃত আয় (real income)।

আর্থিক আয় ও প্রকৃত আয়

এই প্রসংগে আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, আর্থিক আয়ের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে সকল সময় প্রকৃত আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি এবং লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয় না। যেমন, কোন ব্যক্তির আর্থিক আয় দ্বিগুণ হইতে পারে, কিন্তু ইতিমধ্যে জিনিসপত্রের দামও চতুর্গুণ হইয়া যাইতে পারে। ফলে

ঐ ব্যক্তির আর্থিক আয় বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও তাহার প্রকৃত আয় অর্ধেক হইয়া যাইবে এবং অর্থনৈতিক অবস্থারও অবনতি ঘটিবে। সুতরাং প্রকৃত আয় একদিকে যেমন আর্থিক আয়ের উপর নির্ভর করে, অপর দিকে তেমনি দ্রব্যমূল্যের উপরও নির্ভর করে। যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় আমাদের অনেকেরই বর্তমান আর্থিক আয় কিছু কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বহুগুণ বর্ধিত হওয়ায় প্রকৃত আয় মোটেই বাড়ে নাই ; বরং কমিয়াছে।

প্রকৃত আয় আর্থিক আয় ও দ্রব্যমূল্যের উপর নির্ভরশীল

আয়কে আবার দুইভাবে দেখা যাইতে পারে—যথা, মোট আয় (gross income) এবং নীট আয় (net income)। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আয়-উপার্জনের জন্য ব্যয় বহন করিতে হয়। এই ব্যয় বাদ না দিয়া যদি আয় হিসাব করা হয় তাহা হইলে উহাকে বলা হয় মোট আয়। আর এই ব্যয় বাদ দিয়া আয় হিসাব করা হইলে তাহাকে নীট আয় বলিয়া অভিহিত করা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি বাড়ী ভাড়া দিয়া বৎসরে মোট ৫০০ টাকা পায় ; কিন্তু তাহাকে বাড়ী মেরামত, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, ভাড়া আদায় প্রভৃতির জন্য ব্যয় করিতে হয়। ইহা ব্যতীত বাড়ী যত পুরাতন হইতে থাকে উহা তত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। ক্ষয়ও একপ্রকার ব্যয়। তাই ক্ষয়পূরণের জন্যও বাড়ীর মালিককে বাৎসরিক একটা টাকা বাদ দিয়া রাখিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে এই সকল খাতে উপরি-উক্ত বাড়ীর মালিকের ২৫০ টাকার মত খরচ হয়, তাহা হইলে ঐ মালিকের মোট আয় ৫০০ টাকা হইলেও তাহার নীট আয় হইল ২৫০ টাকা। প্রকৃতপক্ষে 'আয়' বলিতে নীট আয়কেই বুঝায়।

মোট আয় ও নীট আয়

জাতীয় আয় (National Income): জাতীয় আয় নির্ধারণের বেলাতেও ঐ একই পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। উৎপাদনের দিক হইতে দেখিলে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (সাধারণত এক বৎসরের মধ্যে) দেশে উৎপাদিত সমগ্র দ্রব্য ও সেবার নীট অর্থমূল্য ধরিয়া জাতীয় আয় হিসাব করা হয়। জাতীয় আয়কে আয়ের দিক হইতেও দেখা যায়। আয়ের দিক হইতে জাতীয় আয় হইল নির্দিষ্ট সময়ে মজুরি, সুদ, খাজনা ও মুনাফার আকারে দেশের সমুদয় ব্যক্তি যে-আয় করে তাহার সমষ্টি। আবার দেশের সকল ব্যক্তির ব্যয় এবং সঞ্চয় যোগ করিলেও জাতীয় আয়ের হিসাব পাওয়া যায়। একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, একদল স্কুলের ছাত্র শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে সন্দেশ, আম ও কেক লইয়া পিকনিক করিতে গেল। তাহারা কত সন্দেশ, আম ও কেক লইয়া গিয়াছিল তাহা তিনটি উপায়ে জানা যাইতে পারে। প্রথমত, আমরা সন্দেশ ও কেকের দোকানে এবং আমওয়ালার নিকট হইতে সংবাদ লইতে পারি যে তাহারা কত কত সন্দেশ, কেক ও আম সরবরাহ করিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি যে কয়টি করিয়া সন্দেশ, আম ও কেক পাইয়াছে। তৃতীয়ত, তাহাদের ইহাও জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাহারা কে কয়টি আম, সন্দেশ ও কেক খাইয়াছে এবং কে কয়টি পকেটে পুরিয়া লইয়া আসিয়াছে। এই তিন প্রকার অনুসন্ধানের ফলই এক হইবে। একটু পরেই আমরা জাতীয় আয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিব।

উৎপাদন (Production): মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে তাহার অভাবমোচনের তাগিদ। প্রকৃতি আমাদের অনেক জিনিস দিয়াছে। কোন কোন্ ক্ষেত্রে এই সকল দ্রব্য সরাসরি আমাদের অভাবপূরণ করে। যেমন, প্রকৃতিদত্ত আলোবাতাস আমরা সরাসরি ভোগ করিয়া থাকি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃতির দান সরাসরি আমাদের অভাবমোচন করিতে পারে না। আমাদের অন্নবস্ত্র আসবাবপত্র-বাড়ীঘর যানবাহন বইপত্র প্রভৃতি অসংখ্য দ্রব্যের অভাব আছে। প্রকৃতি এইগুলি সরাসরি মানুষের হাতে তুলিয়া দেয় না। এইজন্যই প্রয়োজন হয় উৎপাদনের। মানুষ প্রকৃতির দানকে রূপান্তরিত করিয়া তাহার অভাব-আকাংক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিবার উপযোগী করিয়া তুলে। যেমন, প্রকৃতি বনেজংগলে গাছপালা দিয়াছে। মানুষ নিজে পরিশ্রম করিয়া গাছপালা কাটিয়া কাঠ হইতে আসবাবপত্র তৈয়ারি করে। আবার প্রকৃতি অসংখ্য নদনদী দিয়াছে। মানুষ তাহার পরিশ্রম ও কলাকৌশলের সাহায্যে নদনদীতে বাঁধ বাঁধিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করে। প্রকৃতি জমি দিয়াছে। মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় ঐ জমি হইতে খাদ্য ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং উৎপাদনের অর্থ হইল তৃপ্তিদান-ক্ষমতা সৃষ্টি করা। অর্থাৎ, উপযোগ-সৃষ্টিকেই (the creation of utility) অর্থবিদ্যায় উৎপাদন বলা হয়।

তৃপ্তিদান-ক্ষমতা বা উপযোগ-সৃষ্টিকেই অর্থবিদ্যায় উৎপাদন বলে

অনেক সময় উৎপাদনকে পদার্থ-সৃষ্টির অর্থে ব্যবহার করা হয়। এ-ধারণা কিন্তু ভুল। মানুষ কোন নূতন পদার্থ সৃজন করিতে পারে না। সে প্রকৃতিদত্ত পদার্থের কাম্যতা সৃষ্টি করিয়া আকাংক্ষা নিবৃত্তির ব্যবস্থা করে। যেমন, গাছ কাটিয়া তাহার কাঠ হইতে মানুষ যখন চেয়ার টেবিল আলমারি প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ারি করে তখন সে গাছের ও কাঠের কাম্যতা বা তৃপ্তিদান-ক্ষমতাই বৃদ্ধি করে।

উৎপাদন বলিতে পদার্থ-সৃষ্টি বুঝায় না

আবার অনেকে আছেন যাঁহাদের মতে, উপযোগ-সৃষ্টি বস্তুগত দ্রব্যের আকার ধারণ না করিলে তাহাকে উৎপাদন বলা যায় না। এই মতানুসারে যাহারা খাদ্য বস্ত্র ঘরবাড়ী প্রভৃতি বস্তুগত দ্রব্য উৎপাদন করে তাহাদের শ্রম উৎপাদনশীল ; কিন্তু শিক্ষক গায়ক বাদক ডাক্তার উকিল বিচারক অভিনেতা

প্রভৃতির কার্য অনুৎপাদনশীল। কারণ, ইঁহাদের শ্রমের ফল কোন বস্তুগত দ্রব্যের আকার ধারণ করে না এবং উহা উৎপাদনের সংগে সংগেই ধ্বংস বা নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু যে-ব্যক্তি হারমোনিয়াম তৈয়ারি করে সে যেমন মানুষের আকাংক্ষা মিটায় তেমনি যে-গায়ক ঐ হারমোনিয়ামের সাহায্যে গান করিয়া অর্থোপার্জন করে সেও মানুষকে পরিতৃপ্তি দান করে। সুতরাং হারমোনিয়াম-বাদকের শ্রমও উৎপাদনশীল।

উৎপাদনশীল শ্রম ও অনুৎপাদনশীল শ্রম

মোটকথা উপযোগ-সৃষ্টি মাত্রই উৎপাদন—তাহা এই উপযোগ সেবা বা বস্তুগত দ্রব্য যে-কোন আকারেই সৃষ্ট হউক না কেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে মানুষ বিভিন্ন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করিতে পারে—যেমন, রূপগত উপযোগ, স্থানগত উপযোগ, সময়গত উপযোগ ও সেবাগত উপযোগ। ইহার যে-কোনটির সৃজনকেই আমরা উৎপাদন বলিব।

উপযোগ-সৃষ্টি মাত্রই উৎপাদন

ভোগ (Consumption): উৎপাদন বলিতে যেমন উপযোগের সৃষ্টি বুঝায়, তেমনি আকাংক্ষার প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্তির জন্য ব্যবহার করিয়া উপযোগকে নিঃশেষ করাই হইল ভোগ। আমরা যেমন কোন পদার্থ নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারি না তেমনি পদার্থকে ধ্বংস করিতে পারি না; যাহা পারি তাহা হইল কোন দ্রব্যকে ব্যবহার করিয়া তাহার অভাবমোচনের ক্ষমতাকে শেষ করিয়া ফেলিতে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। যখন আমরা চেয়ার ক্রয় করি বা তৈয়ারি করাই তখন উহা বসিবার সুবিধার জন্যই করি। তারপর উহাকে ব্যবহার করিতে থাকি। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে একসময়ে ঐ চেয়ার ভাঙিয়া গিয়া কতকগুলি পুরাতন কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত হয়। তখন আর উহা আমাদের বসিবার প্রয়োজন মিটাইতে পারে না—অর্থাৎ, উহার উপযোগ ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হইয়া যায়। তেমনি আবার জামাকাপড় ব্যবহার করিতে করিতে একসময় উহা অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু সকল জিনিসের উপযোগই ধীরে ধীরে শেষ হয় না। অনেক দ্রব্য আছে যাহার উপযোগ একবার ব্যবহারের ফলেই শেষ হইয়া যায়; উহা আর দ্বিতীয়বার ব্যবহারযোগ্য থাকে না। যেমন, কোন ব্যক্তি যখন একটি কমলালেবু খায়, তখন কমলালেবুটির উপযোগ একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হইয়া যায়। অনুরূপভাবে সেবামূলক কার্যের উপযোগ উৎপাদনের সংগে সংগেই শেষ হইয়া যায়।

আকাংক্ষা তৃপ্তির জন্য উপযোগের ধ্বংসই ভোগ

মূল্য ও দাম (Value and Price): 'মূল্য' শব্দটি সাধারণত দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, কোন কোন সময় জিনিসের 'ব্যবহার-মূল্য'

(value-in-use) বুঝাইবার জন্য মূল্য শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। যেমন, আমরা বলিয়া থাকি যে জল মানুষের জীবনের পক্ষে অতি মূল্যবান। ইহার অর্থ হইল, জলের ব্যবহার-মূল্য বা অভাবপূরণের ক্ষমতা অপরিসীম।

ব্যবহার-মূল্য

দ্বিতীয়ত, মূল্য শব্দটি 'বিনিময়-মূল্য' (value-in-exchange) বুঝাইবার জন্যও ব্যবহার করা হয়। বিনিময়-মূল্য বলিতে এক দ্রব্যের পরিবর্তে যে-পরিমাণ অপর একটি দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা বুঝায়। যেমন, এক কুইণ্টাল চাউলের বদলে যদি দুই কুইণ্টাল আটা বিনিময় করা যায়, তাহা হইলে এক কুইণ্টাল চাউলের মূল্য হইল দুই কুইণ্টাল আটা, আর এক কুইণ্টাল আটার মূল্য হইল আধ কুইণ্টাল চাউল। আবার চারিটি কুমড়ার বদলে যদি এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈল পাওয়া যায় তাহা হইলে একটি কুমড়ার মূল্য হইল আড়াই শ' গ্রাম সরিষার তৈল, আর এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের মূল্য হইল চারিটি কুমড়া। দ্রব্যের সংগে দ্রব্যের বিনিময়-হারকেই বিনিময়-মূল্য বলা হয়। অর্থবিদ্যায় 'মূল্য' শব্দটি বিনিময়-মূল্যের অর্থেই ব্যবহার করা হয় এবং 'ব্যবহার-মূল্য' বা পরিতৃপ্তিদানের ক্ষমতা 'উপযোগ' শব্দটি দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

বিনিময়-মূল্য

কোন দ্রব্যের ব্যবহার-মূল্য অধিক হইলেই যে উহার বিনিময়-মূল্য অধিক হইবে এমন কোন কথা নাই। জলের ব্যবহার-মূল্য অত্যধিক হইলেও উহার বিনিময়-মূল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাই। বিনিময়-মূল্যের জন্য ব্যবহার-মূল্যের সহিত থাকা চাই অপ্রাচুর্য এবং হস্তান্তরযোগ্যতা।

বিনিময়-মূল্য একমাত্র ব্যবহার-মূল্যের উপর নির্ভর করে না

বিনিময়-মূল্যকে টাকাকড়ির অংকে প্রকাশ করা হইলে উহাকে দাম (price) বলা হয়—যেমন, এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম ২ টাকা। দামের সহিত মূল্যের একটি বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। সকল দামই একসংগে বাড়িতে পারে কিন্তু সকল মূল্য একসংগে বাড়িতে পারে না। মূল্য হইল বিনিময়-হার—যথা, কুমড়া ও সরিষার তৈলের মধ্যে বিনিময়-হার। পূর্বে চারিটি কুমড়ার বিনিময়ে এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈল পাওয়া যাইত; এখন যদি তিনটি কুমড়ার বিনিময়ে এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈল পাওয়া যায় তবে কুমড়ার মূল্য বাড়িল এবং সরিষার তৈলের মূল্য কমিল। কিন্তু কুমড়া ও সরিষার তৈল উভয়েরই দাম একসংগে বৃদ্ধি পাইতে পারে।

দাম কাহাকে বলে

সকল দামই একসংগে বাড়িতে পারে কিন্তু সকল মূল্য পারে না

সংক্ষিপ্তসার

কোন ভাষা শিক্ষার জন্য যেরূপ বর্ণপরিচয় প্রয়োজন, তেমনি কোন শাস্ত্রচর্চা করিবার জন্যও কতকগুলি মৌলিক ধারণা অনুধাবন করা প্রয়োজন।

অর্থবিদ্যার মৌলিক ধারণাসমূহের মধ্যে দ্রব্য (goods), উপযোগ (utility), সম্পদ (wealth), আয় (income), উৎপাদন (production), ভোগ (consumption) এবং মূল্য ও দাম (value and price)—এই কয়টিই প্রধান।

দ্রব্য: যাহা কিছু মানুষের অভাববোধকে পরিতৃপ্ত করে তাহাকেই দ্রব্য বলা হয়। দ্রব্য বিভিন্ন প্রকারের হয়—যথা, (ক) বস্তুগত ও অ-বস্তুগত দ্রব্য, (খ) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দ্রব্য, (গ) হস্তান্তরযোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্যতাহীন দ্রব্য, (ঘ) অবাধলভ্য ও অর্থনৈতিক দ্রব্য, (ঙ) ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধন দ্রব্য, (চ) একবার ব্যবহার্য ও স্থায়ী দ্রব্য, ইত্যাদি।

উপযোগ: উপযোগ বলিতে বুঝায় মানুষের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা; যাহাই অভাবমোচন করে তাহারই উপযোগ আছে ধরিতে হইবে। উপযোগের সহিত কোন নীতির প্রশ্ন জড়িত নাই। দ্বিতীয়ত, উপযোগ একটি আপেক্ষিক ও মানসিক ধারণা। সুতরাং একই দ্রব্যের উপযোগ সকলের নিকট এক নহে।

উপযোগ মোটামুটি পাঁচ প্রকারের হয়—(১) স্বাভাবিক উপযোগ, (২) রূপগত উপযোগ, (৩) স্থানগত উপযোগ, (৪) সময়গত উপযোগ, এবং (৫) সেবাগত উপযোগ।

সম্পদ: বস্তুগত অর্থনৈতিক দ্রব্যকেই সম্পদ বলা হয়। বস্তুগত হওয়া ছাড়া সম্পদের আরও তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—(১) উপযোগ, (২) অপ্রাচুর্য, এবং (৩) বিক্রয়যোগ্যতা। বিক্রয়যোগ্য হইবার জন্য দ্রব্যকে হস্তান্তরযোগ্য হইতে হইবে।

সম্পদের তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়—যথা, (১) ব্যক্তিগত সম্পদ, (২) সমষ্টিগত সম্পদ, এবং (৩) জাতীয় সম্পদ।

আয়: আয় বলিতে বুঝায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপযোগপ্রবাহ। সম্পদ ও সেবামূলক কার্যাদি হইতে আয় সৃষ্ট হয়। টাকাকড়ির মাধ্যমে যে-আয়ের হিসাব করা হয় তাহাকে 'আর্থিক আয়' বলে। আর্থিক আয়ের বিনিময়ে যে-সকল ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা হয় তাহাকেই প্রকৃত আয় বলা হয়।

আয় 'মোট' ও 'নীট' উভয়ই হয়। ব্যক্তির আয়কে ব্যক্তিগত আয় এবং দেশের ব্যক্তিসমুদয়ের আয়কে জাতীয় আয় বলা হয়। আয় ছাড়া উৎপাদন এবং ভোগ ও সঞ্চয়—এই দুই দিক হইতেও জাতীয় আয়ের হিসাব করা যাইতে পারে।

উৎপাদন: তৃপ্তিদান-ক্ষমতা বা উপযোগ-সৃষ্টিকেই অর্থবিদ্যায় উৎপাদন বলে।

ভোগ: অভাবমোচনের জন্য উপযোগের ধ্বংসই হইল ভোগ।

মূল্য ও দাম: মূল্য বলিতে ব্যবহার-মূল্য বা বিনিময়-মূল্য যে-কোনটি বুঝাইতে পারে। অর্থবিদ্যায় অবশ্য 'মূল্য' বলিতে বিনিময়-মূল্যই বুঝায় এবং ব্যবহার-মূল্য বুঝাইবার জন্য উপযোগ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বিনিময়-মূল্যকে টাকাকড়ির অংকে প্রকাশ করা হইলে উহাকে দাম (price) বলে।

মূল্য ও দামের মধ্যে একটি পার্থক্য স্মরণ রাখিতে হইবে। সকল দামই একসংগে বাড়িতে পারে কিন্তু সকল মূল্য একসংগে বাড়িতে পারে না।

প্রশ্নোত্তর

1. **How would you define Wealth? Illustrate your answer.** (C. U. 1943, '46)

কিভাবে সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে? উদাহরণের সাহায্যে উত্তর দাও। [১৩-১৫ পৃষ্ঠা]

2. **Define Income. Distinguish between (a) Money Income and Real Income; and (b) Gross Income and Net Income.**

আয়ের সংজ্ঞা নির্দেশ কর: কিভাবে (ক) আর্থিক আয় ও প্রকৃত আয়; এবং (খ) মোট আয় ও নীট আয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাইবে? [১৭-১৯ পৃষ্ঠা]

3. **Define National Wealth. How would you measure National Wealth?**

জাতীয় সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কিভাবে জাতীয় সম্পদের পরিমাপ করিবে? [১৬-১৭ পৃষ্ঠা]

4. Distinguish between (*a*) Value-in-use and Value-in-exchange; and (*b*) Value and Price.

(ক) ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য ; এবং (খ) মূল্য ও দামের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

[২১-২২ পৃষ্ঠা]

5. Define Wealth. Are the following Wealth ?—(*a*) a ten-rupee note, (*b*) a School Final Examination Certificate, (*c*) a motor car, (*d*) a beggar's bowl, and (*e*) service of a teacher. Give reasons for your answer.

সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। নিম্নলিখিতগুলি কি সম্পদ ?—(ক) একটি দশ-টাকার নোট, (খ) একখানা স্কুল ফাইন্যাল পাসের সার্টিফিকেট, (গ) একখানি মোটরগাড়ি, (ঘ) ভিখারীর ভিক্ষাপাত্র, এবং (ঙ) শিক্ষকের শিক্ষাদানকার্য। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [১৩-১৫ পৃষ্ঠা]

6. What do you understand by Utility ? Distinguish between different kinds of Utility.

উপযোগ বলিতে কি বুঝ ? বিভিন্ন প্রকারের উপযোগের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [১১-১৩ পৃষ্ঠা]

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় আয় *

(National Income)

ব্যক্তিগত জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রধানত নির্ভর করে ব্যক্তিগত আয়ের উপর। আয় অনুসারেই সে ব্যয় ও সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়। যাহার আয় যথেষ্ট তাহাকে অন্নবস্ত্র-আশ্রয়ের জন্য চিন্তা করিতে হয় না; ইহাদের পূরণ করিয়াও সে আরাম ও বিলাসের দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারে। আর যাহার আয় সামান্য তাহার পক্ষে কোনমতে খাওয়াপরার ব্যবস্থা করিতেই কষ্ট হয়, আরামভোগ করা ত দূরের কথা।

জাতীয় আয়ের গুরুত্ব

দেশ বা জাতির জীবন সম্বন্ধেও অনুরূপ উক্তি করা যায়। যে-কোন দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে জাতীয় আয়ের উপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশকে আমরা যে ধনী বলিয়া থাকি ইহার কারণ হইল ইহাদের জাতীয় আয় অধিক। অপরদিকে ভারতের মত দেশগুলি দরিদ্র দেশ বলিয়া অভিহিত হয়, কারণ ইহাদের জাতীয় আয় অতি সামান্য। এই কারণেই স্বাধীন ভারত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে জাতীয় আয় বাড়াইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিতেছে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি করিয়া দেশের আয় না বাড়াইতে পারিলে ভারতের দুঃখদৈন্য দূর করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং জাতীয় আয় কাহাকে বলে, জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার পদ্ধতি কি, কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর জাতীয় আয় নির্ভরশীল, জাতীয়

ইহা জাতীয় সমৃদ্ধির নির্দেশক

জাতীয় আয় সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়

* জাতীয় আয় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসভুক্ত নহে।

আয়ের ভিত্তিতে লোকের মাথাপিছু আয় কত?—ইত্যাদি প্রশ্নের আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

জাতীয় আয় বলিতে কি বুঝায়? (What is National Income?): জাতীয় আয় সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।* উৎপাদন হইতেই আয় হয়। দেশের বিভিন্ন দিকে এই উৎপাদনকার্য অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে। জমিতে কৃষিকার্য হইতেছে, কলকারখানায় বিভিন্ন দ্রব্য তৈয়ারি হইতেছে, খনি হইতে খনিজ পদার্থ উত্তোলন করা হইতেছে, শিক্ষক শিক্ষাদান করিতেছেন, চিকিৎসক চিকিৎসা করিতেছেন, উকিল-মোক্তার মামলা লড়িতেছেন, পুলিস শান্তিশৃংখলা রক্ষা করিতেছে, ইত্যাদি। এইরূপ বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মানুষের অভাবপূরণের অনেক রকমের উপকরণ উৎপন্ন হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি হইল বস্তুগত দ্রব্য আর কতকগুলি অ-বস্তুগত দ্রব্য বা সেবা। ইহাদের অর্থমূল্যের সমষ্টিই জাতীয় আয়।

বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনকার্য হইতেই আয় হয়

দ্বিতীয়ত, যাহারা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে তাহাদের হাতেই উৎপন্ন দ্রব্য আয় হিসাবে গিয়া পৌছায়। উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী উপাদানগুলিকে সাধারণত চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—যথা, শ্রম, জমি, মূলধন ও সংগঠন। কোন কারখানার কথা ধরিলে দেখা যায় যে উৎপাদনের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করিতে হয়, কারখানার জন্য জায়গার প্রয়োজন হয়, ব্যয়-বহনের জন্য মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়, এবং পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা বা সংগঠকের প্রয়োজন হয়। এই কারখানায় উৎপাদনকার্যের ফলে যে-আয় হয় তাহার একাংশ শ্রমিকরা পায় মজুরি হিসাবে, একাংশ পায় জমির মালিক খাজনা হিসাবে, একাংশ যায় মূলধন সরবরাহকারীদের নিকট সুদ হিসাবে, এবং বাকিটা সংগঠক মুনাফা হিসাবে ভোগ করে। এইভাবে কলকারখানা ক্ষেতখামার খনি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণ করিয়া দেশের লোক মজুরি, খাজনা, সুদ ও মুনাফা অর্জন করিতেছে। এইভাবে উৎপাদনকার্যের ফলে অর্জিত দেশের সমস্ত লোকের আয়কে যোগ দেওয়া হইলে দেশের সামগ্রিক বা জাতীয় আয় পাওয়া যাইবে।

আয় চারি প্রকারের ১। মজুরি, ২। খাজনা, ৩। সুদ, ৪। মুনাফা

দেশের সকলের মজুরি, খাজনা, সুদ ও মুনাফা যোগ দিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়

তৃতীয়ত, দেশে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তাহার একাংশ দেশের লোক ভোগ করে এবং অপরাংশ সঞ্চয় করিয়া রাখে। যেমন, পিকনিকের ছাত্ররা সন্দেশ, কেক ও আমের কিছুটা খাইতে পারে এবং কিছুটা পকেটে পুরিয়া বাড়ী লইয়া আসিতে পারে।

---

* ১৯-২০ পৃষ্ঠা।

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সহজেই বলা যায় যে, দেশের বা জাতীয় আয়কে তিনটি দিক হইতে দেখা যাইতে পারে—যথা, (১) জাতীয় উৎপাদন বা দেশের সকলের উৎপন্নের সমষ্টি (National Product) হিসাবে, (২) দেশের সকলের আয়ের সমষ্টি (Incomes Received) হিসাবে, এবং (৩) জাতীয় ব্যয় বা দেশের সকলের ভোগ ও সঞ্চয়ের সমষ্টি (National Outlay) হিসাবে। এই তিন দিক দিয়াই জাতীয় আয়ের হিসাব বাৎসরিক ভিত্তিতে করা হয়।

তিনটি দিক হইতে জাতীয় আয়কে দেখা যাইতে পারে

(১) জাতীয় উৎপাদন : উৎপাদনের উপাদানগুলির—অর্থাৎ, শ্রম, জমি, মূলধন ও সংগঠনের সাহায্যে এক বৎসরে দেশে মোট যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূলক কার্য উৎপাদন করা হয় তাহাকেই জাতীয় উৎপাদন বলা হয়। জাতীয় উৎপাদন জাতীয় আয়ের নামান্তর মাত্র। টাকাকড়ির অংকে ছাড়া এই উৎপাদন হিসাব করা যায় না। এক বৎসরে উৎপন্ন চালডাল, তরিতরকারি, কাপড়চোপড়, কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, ডাক্তারের চিকিৎসা, শিক্ষকের শিক্ষাকার্য ইত্যাদি দ্রব্যকে সরাসরি যোগ করিয়া বলা যায় না যে দেশের উৎপাদনের পরিমাণ এত। কিন্তু ইহাদের নীট অর্থমূল্য যোগ করিয়া আমরা সহজেই বলিতে পারি যে কোন বৎসরে জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ এত টাকা। অর্থাৎ, মোট উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবার অর্থমূল্যই জাতীয় উৎপাদন। ইহা আমাদের পূর্ববর্তী উদাহরণের মোট সন্দেশ, কেক ও আমের দামের মত।*

বৎসরের উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের অর্থমূল্যই জাতীয় উৎপাদন

(২) আয়ের সমষ্টি : জাতীয় উৎপাদন মজুরি, খাজনা, সুদ ও মুনাফার আকারে শ্রমিক জমির মালিক মূলধন-মালিক ও সংগঠকের মধ্যে বণ্টিত হয়। এক বৎসরে দেশের সকল লোক শ্রমিক মূলধন-মালিক ইত্যাদি হিসাবে উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণ করিয়া যাহা উপার্জন করে তাহার সমষ্টিই হইল জাতীয় আয়।

উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন লোকের বাৎসরিক আয়ের সমষ্টিই জাতীয় আয়

(৩) জাতীয় ব্যয় : কোন নির্দিষ্ট বৎসরে যে-পরিমাণ আয় হয় তাহা দেশের লোক দুইভাবে ব্যবহার করিতে পারে। তাহারা আয়ের সম্পূর্ণটা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করিতে পারে, অথবা আয়ের একাংশ দ্বারা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া অপরাংশ সঞ্চয় বা বিনিয়োগ (invest) করিতে পারে। সুতরাং এক বৎসরের মধ্যে দেশের সকলের ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের সহিত তাহাদের সঞ্চয় বা বিনিয়োগকে (investment) যোগ করিলেই জাতীয় ব্যয় পাওয়া যায়। এইভাবে জাতীয় ব্যয়ের হিসাবের মধ্য দিয়াও জাতীয় আয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

সকল ব্যক্তির ব্যয় ও সঞ্চয়ের সমষ্টিই জাতীয় ব্যয়

---

* ১৯-২০ পৃষ্ঠা।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Measurement of National Income) : উপরি-উক্ত তিনটি দিক হইতে জাতীয় আয়ের হিসাব করিবার সময় কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। এইজন্য জাতীয় আয় গণনা করিবার তিনটি পদ্ধতি সম্পর্কে আরও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমে আমরা বিদেশের সহিত ব্যবসাবাণিজ্যের কথা বাদ দিয়া এই আলোচনা করিব। কারণ, তাহা না হইলে আলোচনা জটিল হইয়া পড়িবে।

(১) উৎপাদন-পদ্ধতি (The Output Method) : উৎপাদন-পদ্ধতিতে দেশে মোট উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবার হিসাব করা হয়। ইহাতে প্রথমে নির্দিষ্ট বৎসরে কোন দেশে কৃষি শিল্প খনি প্রভৃতিতে যে-সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন প্রকারের সেবামূলক কার্য সম্পাদিত হয়, তাহাদের অর্থমূল্যের সমষ্টি পরিমাপ করা হয়। এই অর্থমূল্যের সমষ্টিকে বলা হয় 'মোট জাতীয় উৎপাদন' (Gross National Product)।

এই পদ্ধতিতে সকল উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবার অর্থমূল্য যোগ দেওয়া হয়

এখন উৎপাদিত দ্রব্যের অর্থমূল্য গণনা করিবার সময় দেখা যায় যে অর্থের বিনিময়ে অনেক দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের কেনাবেচা হয় না। এখন প্রশ্ন হইল যে, ইহাদের জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে কি না, যদি করা হয় ইহাদের মূল্য স্থির করার উপায় কি? অনেক সময় দেখা যায় যে, উৎপাদক বিক্রয় না করিয়া উৎপন্ন দ্রব্য নিজেই ভোগ করে—যেমন, আমাদের দেশে কৃষকেরা ক্ষেতখামারে যে-শস্য উৎপাদন করে তাহার একাংশ বিক্রয় না করিয়া নিজেরাই ভোগ করে। এ-ক্ষেত্রে উৎপাদকগণ যে-সকল দ্রব্য নিজেরা ভোগ করে বাজার-দামের হিসাবে তাহাদের অর্থমূল্য জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। আবার অনেকেই নিজের বাড়ীতে বসবাস করে। ইহারা বাড়ীভাড়া না দিলেও বাড়ীর আশ্রয় ভোগ করিতেছে বলিয়া প্রচলিত ভাড়ার হিসাবে তাহাদের বাড়ীর আশ্রয়দানের অর্থমূল্য ঠিক করিতে হইবে এবং উহাকে জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে ধরিতে হইবে। সরকারও বিনামূল্যে বহুপ্রকারের সেবামূলক কার্য সরবরাহ করিয়া থাকে—যথা, পথঘাট সংরক্ষণ, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি। এ-ক্ষেত্রেও সেবামূলক কার্যাদি সরবরাহ করার জন্য সরকারের যে-ব্যয় হয় তাহা জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে ধরিতে হইবে।

অর্থমূল্য যোগ দেওয়ার সময় যে-সকল দ্রব্য ও সেবা বাজারে বিক্রীত হয় না তাহাদেরও ধরিতে হইবে

ইহা ব্যতীত, আমরা নিজেরাই আমাদের অনেক কাজ করিয়া লই—যেমন, মুচি না ডাকিয়া আমরা নিজের জুতায় নিজেরাই কালি দিতে পারি। আবার মা-বোনেরা আমাদের অনেক সেবাযত্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু এ-সকল কার্যের অর্থমূল্য ঠিক করা কঠিন বলিয়া ইহাদিগকে জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

কিন্তু নিজেরা যে-সকল কাজ করিয়া লই তাহাদের বাদ দিতে হইবে

জাতীয় উৎপাদন পরিমাপের আর একটি স্মরণীয় বিষয় হইল যে, একই দ্রব্য যেন দ্বিতীয়বার গণনা (double counting) না করা হয়। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় উৎপাদনের হিসাবের সময় চূড়ান্ত বা সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্যের (final products) অর্থমূল্যই ধরা হয়। অর্ধসমাপ্ত বা কাঁচামালের অর্থমূল্য ধরা হয় না, কারণ সম্পূর্ণ দ্রব্যের মধ্যেই উহা রহিয়া গিয়াছে। যেমন, কাপড়ের দামের মধ্যেই কাপড় তৈয়ারির সুতার দাম রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং কাপড়ের দামের সহিত আবার সুতার দাম পৃথকভাবে যোগ দেওয়া হইলে সুতার দাম দুইবার করিয়া গণনা করা হইবে। আবার একখানি পাঁউরুটির দামের সহিত যদি উহা তৈয়ারি করিবার জন্য যে-ময়দা লাগিয়াছে তাহার দামও পৃথকভাবে ধরা হয় তাহা হইলে ময়দার দাম দুইবার করিয়া ধরা হইবে। কারণ, পাঁউরুটির দামের মধ্যেই ময়দার দাম রহিয়া গিয়াছে। অতএব, জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্য পরিমাপ করিবার সময় যাহাতে একই জিনিসের মূল্য একাধিকবার গণনা করা না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জাতীয় উৎপাদন পরিমাণ সম্পর্কে স্মরণযোগ্য বিষয়

১।. একই দ্রব্য দুইবার গণনা করা চলিবে না।

দ্বিতীয়বার গণনার সমস্যা ছাড়াও জাতীয় উৎপাদন পরিমাপের অন্য একটি প্রশ্ন রহিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন নির্দিষ্ট বৎসরে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদি উৎপন্ন হয় তাহার অর্থমূল্যের সমষ্টি 'মোট জাতীয় উৎপাদন' (Gross National Product বা সংক্ষেপে GNP) বলা হয়। কিন্তু উৎপাদনকার্য সম্পাদনের সময় যেমন কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় তেমনি আবার কলকারখানা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূলধনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কোন দর্জির দোকানে জামা তৈয়ারির জন্য যেমন কাপড় ব্যবহার হইতেছে তেমনি ব্যবহারের ফলে সেলাই-কলও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। এইভাবে কলকারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যবস্থা না করা হইলে উৎপাদন একদিন কমিয়া যাইবে।* তাই মূলধন-দ্রব্যকে অটুট রাখিয়াই বৎসরের উৎপন্নের হিসাব করিতে হইবে। এইজন্য দেখা যায়, কারখানার মালিক প্রভৃতি প্রত্যেক বৎসর ক্ষয়ক্ষতি বাবদ আলাদাভাবে আয়ের একাংশ 'অবপূর্তি তহবিলে' (depreciation fund) জমা রাখে। একটি সেলাই-কলের দাম যদি ২৭০ টাকা হয় এবং কলটি যদি ১০ বৎসর চলে তবে দর্জির দোকানের মালিকের পক্ষে বৎসরে ২৭ টাকা করিয়া জমা রাখা উচিত। নচেৎ ১০ বৎসর পরে তাহাকে সেলাই-কলের অভাবে দোকান বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এইভাবে

২। মোট জাতীয় উৎপন্ন হইতে ক্ষয়ক্ষতি বাবদ বাদ দিতে হইবে

* একটি সহজ-দৃষ্টান্ত লওয়া যাইতে পারে। বাড়ীর মালিক যদি ভাড়াটে-বাড়ী একেবারে না সারাইয়া সমস্ত ভাড়াটাই ভোগ করিতে থাকে, তবে এমন একদিন আসিবে যে ঐ বাড়ী কেহ ভাড়া লইতে চাহিবে না, কারণ উহা বাসোপযোগী থাকিবে না।

বৎসরে মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে ঐ সময়ে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ অর্থ বাদ দিয়া জাতীয় উৎপাদনের হিসাব করা হইলে তাহাকে বলা হয় 'নীট জাতীয় উৎপাদন' (Net National Product বা সংক্ষেপে NNP)। সংক্ষেপে নীট জাতীয় উৎপাদনকে নিম্নের চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায়:
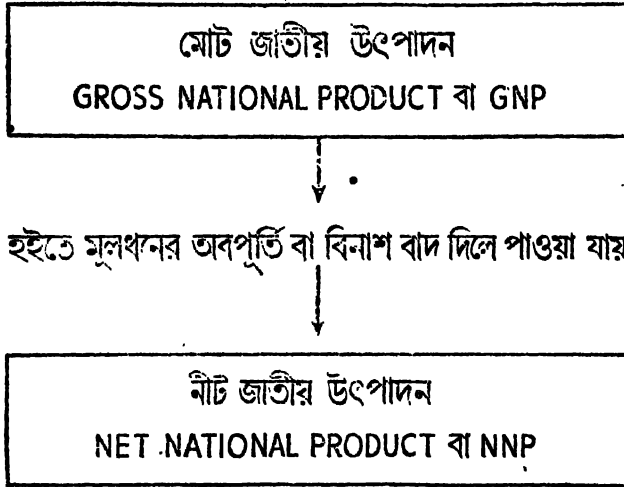
জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্যের সমষ্টির হিসাব আবার বাজার-দামে (at market prices) অথবা উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামে (at factor prices) করা যাইতে পারে। যখন বাজার-দামে জাতীয় উৎপাদনের হিসাব করা হয় তখন উহার মধ্যে পরোক্ষ কর থাকে—যেমন, চিনির বাজার-দামের মধ্যে উৎপাদন-শুল্কও থাকে।* এই পরোক্ষ কর সরকারের হাতেই যায়, উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে আয় হিসাবে বণ্টিত হয় না। পরোক্ষ কর বাদ দিয়া জাতীয় উৎপাদনের হিসাব করা হইলে তাহাকে বলা হয় উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামের হিসাবে জাতীয় উৎপাদন। ধরা যাউক, ১ কিলোগ্রাম চিনির বাজার-দাম ১ টাকা। ইহার মধ্যে ২৫ নয়া পয়সা উৎপাদন-শুল্ক রহিয়াছে যাহা সরকারের প্রাপ্য। সুতরাং, মাত্র ৭৫ নয়া পয়সা বা ১২ আনা ইক্ষু-উৎপাদনকারী, চিনির কারখানার শ্রমিক, চিনির কারখানার মালিক প্রভৃতির মধ্যে বণ্টিত হইবে। অতএব, এই ৭৫ নয়া পয়সাই উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামে উৎপাদন।

জাতীয় উৎপাদনের অর্থমূল্যের হিসাব বাজার-দামে অথবা উৎপাদনের উপাদান-সমূহের দামে করা যাইতে পারে

* উৎপাদনের উপর করকে উৎপাদন-শুল্ক বা অন্তঃশুল্ক (Excise Duties) বলা হয়।

(২) আয়-পদ্ধতি (The Incomes Received Method) : এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট বৎসরে দেশের লোকে উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহন করিয়া যাহা উপার্জন করে তাহারই সমষ্টি গণনা দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ইহাতে উৎপাদনের সকল উপাদানের—অর্থাৎ, শ্রম, জমি, মূলধন ও সংগঠনের বার্ষিক অর্থ-আয় যোগ দিয়া জাতীয় আয় গণনা করা হয়।

এই পদ্ধতিতে দেশের উৎপাদনকার্যে অংশ-গ্রহণকারী সকলের আয় যোগ দেওয়া হয়

উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় বলিতে বুঝায়—(১) মজুরি বেতন ও ভাতা ; (২) নীট খাজনা ; (৩) নীট সুদ ; এবং (৪) নীট মুনাফা। ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মুনাকার কোন অংশ অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন না করিয়া জমা রাখা হইলে উহাকেও জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। সরকারী উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের যে-মুনাফা অথবা রাষ্ট্রাধীন সম্পত্তি হইতে যে-আয় হয় তাহাও জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। মালিক নিজস্ব বাড়ীতে বসবাস করিলে উহার যে-ভাড়া হইতে পারে তাহাও জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। উৎপাদক তাহার উৎপন্নের একাংশ নিজে ভোগ করিলে উহার অর্থমূল্য জাতীয় আয়ের মধ্যে গণনা করিতে হইবে। ভারতের ন্যায় অনগ্রসর কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিজ উৎপন্নের একটা মোটা অংশ কৃষকেরা সরাসরি নিজেরাই ভোগ করে। অতএব, ইহাকে বাদ দিলে জাতীয় আয়ের হিসাব অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সরকারী কর্মচারীদের বেতন জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হয়। কারণ, ইহারা উৎপাদনশীল কার্য সম্পাদন করিয়াই অর্থোপার্জন করে।

কোন্ কোন্ আয়কে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে

অপরদিকে অর্থ-আয়ের হিসাব করিবার সময় কতকগুলি আয়কে ধরা হয় না। হস্তান্তর-পাওনাকে (transfer payments) জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। ধরা যাউক, কোন ব্যক্তি বৎসরে ২০০০ টাকা করিয়া উপার্জন করে এবং ঐ অর্থ হইতে বার্ষিক ১০০ টাকা এক আত্মীয়কে সাহায্য করে। এ-ক্ষেত্রে আত্মীয়ের সাহায্যস্বরূপ প্রাপ্তি ১০০ টাকাকে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। কারণ, উহা কোন উৎপাদনকার্যের ফলে অর্জিত হয় নাই, মাত্র একজনের নিকট হইতে অপরের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে সরকার আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তুদের যে-অর্থসাহায্য করে তাহাকেও জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হয় না। কারণ, উদ্বাস্তুরা উৎপাদনকার্য সম্পাদন করিয়া ঐ অর্থ আয় করে না। পূর্বেকার কোন সম্পত্তি—যেমন, পূর্বেকার কোন বাড়ী বিক্রয় করিয়া যে-অর্থ পাওয়া যায় তাহাও জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে সম্পত্তির হস্তান্তর হয় মাত্র, জাতীয় উৎপাদন উহার দ্বারা বৃদ্ধি পায় না। জালজুয়াচুরির সাহায্যে কোন অর্থ উপার্জিত হইলে

কোন্ কোন্ আয়কে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হইবে না

যাহার সহিত উৎপাদন-কার্যের সম্পর্ক নাই সে-আয়কে ধরা হইবে না

তাহাকেও জাতীয় আয় হইতে বাদ দিতে হইবে। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সরকারকে ঋণ করিতে হয় এবং ঐ ঋণ বাবদ ঋণদাতাদের সুদ দিতে হয়। এই সুদকেও জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে ধরা হয় না। কারণ, কোন উৎপাদনশীল কার্যের ফলে উহা উৎপন্ন হয় না ; সরকার মাত্র কর ধার্য করিয়া এক দল লোকের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া ঋণদাতাদের প্রদান করে। মোটকথা, উৎপাদনকার্য সম্পাদন না করিয়া কোন অর্থ-আয় করা হইলে তাহাকে জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে ধরা হইবে না।

(৩) ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতি (The Consumption and Savings Method) : প্রতি বৎসর দেশে উৎপাদনকার্যের ফলে যে-আয় সৃষ্টি হয় তাহা অংশত ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হয় এবং অংশত সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চয় হইতেই মূলধন সংগঠিত হইয়া থাকে। যেমন, কোন ব্যক্তির বৎসরে ৬০০০ টাকা আয় হইলে সে হয়ত ৪০০০ টাকা চালডাল, তরিতরকারি, জামাকাপড়, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির জন্য ব্যয় করিতে এবং বাকী ২০০০ টাকা জমাইতে পারে। এই জমা টাকা সে সরকারকে নির্দিষ্ট সুদে ঋণ দিতে পারে। সরকার আবার এই ঋণের টাকা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কার্যে নিয়োগ করিতে পারে। এই-ভাবে দেশের সর্বক্ষেত্রে যে বার্ষিক আয় হয় তাহার একাংশ ভোগ এবং একাংশ সঞ্চয়কার্যে নিয়োগ করা হয়। সুতরাং নির্দিষ্ট বৎসরে দেশে ভোগ্যদ্রব্য ও সেবামূলক কার্য ক্রয় করিতে যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয় এবং যে-পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইয়া মূলধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে তাহাদের যোগ দিলেই জাতীয় ব্যয়ের (National Outlay) হিসাব পাওয়া যায়। এইজন্য ইহাকে ব্যয়-পদ্ধতিও (Outlay Method) বলা যাইতে পারে।

বৎসরে মোট ব্যয়িত ও সঞ্চিত অর্থই জাতীয় ব্যয়

এখন আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, জাতীয় আয়কে যে-পদ্ধতিতেই পরিমাপ করা যাউক না কেন ফল আমরা একই পাইব, কারণ একই জিনিসকে তিনটি বিভিন্ন দিক হইতে দেখা হইবে। বৎসরে যে-পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূলক কার্য উৎপন্ন হয় তাহাই ঠিক করিয়া দেয় দেশের ব্যক্তিসমুদয় কতটা ভোগ ও সঞ্চয় করিতে পারিবে। যাহা উৎপন্ন হয় তাহার অর্থমূল্য—শ্রম মূলধন জমি ও সংগঠনের মধ্যে মজুরি সুদ খাজনা ও মুনাফা হিসাবে বণ্টিত হইয়া যায়। সুতরাং জাতীয় উৎপাদন জাতীয় আয়ের সমান। আবার দেশের ব্যক্তিসমুদয় যাহা মজুরি সুদ খাজনা ও মুনাফা হিসাবে আয় করে তাহা অংশত ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করা হয় এবং অংশত সঞ্চয় করা হয়। সুতরাং জাতীয় আয় জাতীয় ব্যয়ের সমান। দেশের উৎপাদন আয় ও ব্যয়ের সমতা বুঝাইবার জন্য পরবর্তী চিত্রে ছকটি দেওয়া হইল

উৎপাদন, আয় বা ব্যয়—যেদিক হইতেই জাতীয় আয়কে দেখা হউক না কেন, ফল একই পাওয়া যাইবে
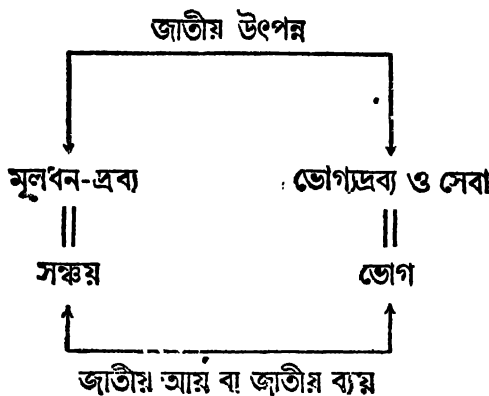
উপরের ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে জাতীয় উৎপাদন বা উৎপন্ন দুইভাগে বিভক্ত—(ক) মূলধন-দ্রব্য, (খ) ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা। মূলধন-দ্রব্য সঞ্চিত হয় এবং ভোগ্যদ্রব্য ও সেবা ভোগ করা হয়। অপরদিকে জাতীয় আয়ের একাংশ সঞ্চয় ও একাংশ ভোগ করা হয়। এই সঞ্চয় ও ভোগ উভয়ে মিলিয়াই হইল জাতীয় ব্যয় (National Outlay)।

জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয় এবং জাতীয় ব্যয় যে পরস্পরের সমান তাহা বুঝাইবার জন্য আরও একটি সহজ উদাহরণের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।*

একটি সহজ উদাহরণ

ধরা যাউক, একটি নূতন আবিষ্কৃত দ্বীপে ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচজন মাত্র লোক বাস করে এবং উহারা কেবলমাত্র ধান্য উৎপাদন করে। এই পাঁচজনের মধ্যে দ্বীপের সমস্ত জমি ক-এর দখলে এবং একমাত্র খ-এরই গরু-লাঙল (মূলধন-দ্রব্য) আছে। কিন্তু খ নিজে চাষ করে না; গ ক-এর নিকট হইতে জমি এবং খ-এর নিকট হইতে গরু-লাঙল ভাড়া লইয়া সমস্ত জমিই চাষ করে। ঘ এবং ঙ দিন-মজুর হিসাবে গ এর কাছে কাজ করে। ঐ দ্বীপে টাকাকড়িরও প্রচলন আছে।

এখন দ্বীপের সমস্ত জমি হইতে যদি ১০০ কুইণ্টাল ধান্য উৎপন্ন হয় এবং প্রতি কুইণ্টাল ধান্যের দাম যদি ৬ টাকা হয় তবে ঐ দ্বীপের 'মোট' (gross) জাতীয় উৎপাদন হইবে ৬০০ টাকা। ইহা হইতে বীজধানের জন্য এবং ভবিষ্যতে নূতন গরু-লাঙল কিনিবার জন্য ১০০ টাকা বাদ দিয়া রাখা হইলে 'নীট' (net) জাতীয় উৎপাদন হইবে ৫০০ টাকা।

এই ৫০০ টাকাই ক খ গ ঘ ঙ-র মধ্যে জমির মালিকানা, মূলধন-সরবরাহ, সংগঠন এবং শ্রমের জন্য বণ্টিত হইবে। অর্থাৎ, এই টাকা দ্বীপবাসী পাঁচজন খাজনা, সুদ, মুনাফা ও মজুরি হিসাবে পাইবে। সুতরাং ৫০০ টাকা হইল ঐ দ্বীপের জাতীয় আয় (National Income)।

---

* প্রথম উদাহরণের জন্য ১৯-২০ পৃষ্ঠা দেখ।

আবার কখগঘঙ এই ৫০০ টাকার একাংশ ব্যয় ও একাংশ সঞ্চয় করিবে।* সুতরাং ৫০০ টাকাই হইবে ঐ দ্বীপের জাতীয় ব্যয় (National Outlay)।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাতীয় আয় (International Trade and National Income) : আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা লেনদেনের কথা বাদ দিয়া জাতীয় আয়ের আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু কোন দেশই আজ অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন নয়; অল্পবিস্তর প্রত্যেক দেশই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাউক। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, জার্মানী, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশের সহিত ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া থাকি। জাতীয় আয় হিসাব করিবার সময় এই বৈদেশিক বাণিজ্যের কথা ধরিতে হইবে। আমরা বিদেশের নিকট যে দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকি তাহার জন্য অন্যান্য দেশের নিকট হইতে আমাদের পাওনা হয়; অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশের নিকট হইতে আমরা যে দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যাদি ক্রয় করিয়া থাকি তাহার দরুন আমাদের নিকট বিদেশের পাওনা হয়। যখন বিদেশের নিকট আমাদের প্রাপ্যের তুলনায় আমাদের নিকট বিদেশের প্রাপ্য অধিক হয় তখন আমাদের জাতীয় আয় হইতে ঐ উদ্বৃত্তাংশকে বাদ দিতে হইবে। আবার বিদেশের প্রাপ্যের তুলনায় আমাদের প্রাপ্য অধিক হইলে ঐ উদ্বৃত্তাংশকে আমাদের জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে দেনাপাওনা দেখিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব করিতে হইবে

আর্থিক এবং প্রকৃত জাতীয় আয় (Money and Real National Income) : অর্থের মাপকাঠিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। কিন্তু ইহার একটি বিশেষ অসুবিধা আছে। ইহাতে কোন বৎসরে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আয় বাড়িল না কমিল তাহা নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে, কারণ অর্থের নিজস্ব মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা পরিবর্তিত হইয়া থাকে। ধরা যাউক, কোন বৎসরে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুণ হইল, কিন্তু দ্রব্যাদির উৎপাদনের পরিমাণ সমান রহিল। এ-ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যাদির অর্থমূল্য যোগ করিলে জাতীয় আয় দ্বিগুণ হইবে এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু টাকাকড়ির অংকে বাড়িলেও প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আয় বা উৎপাদন বাড়ে নাই এবং দেশের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। আমরা যদি অনুমান করিয়া লই যে প্রথম বৎসরে মোট উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ছিল ১০ কোটি টাকা, তাহা হইলে দ্বিতীয় বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ

অর্থের মাপকাঠিতে জাতীয় আয়ের হিসাবে দেশের উন্নতি-অবনতি বুঝা যায় না

* এই সঞ্চয় হইল নীট সঞ্চয় (net saving)। অর্থাৎ, গরু লাঙল ইত্যাদি মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ যে ১০০ টাকা রাখা হইয়াছে তাহার উপর যে অতিরিক্ত সঞ্চয় হইয়াছে তাহা।

সমান থাকিলেও টাকার অংকে জাতীয় আয় ২০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। কিন্তু কার্যত দুই বৎসরে দেশের প্রকৃত আয়—অর্থাৎ, উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণ সমানই রহিয়াছে। আবার উৎপন্ন দ্রব্য দুই বৎসরে সমান থাকিয়া দ্বিতীয় বৎসরে জিনিসপত্রের দাম যদি অর্ধেক হইয়া যায় তাহা হইলে টাকার অংকে প্রথম বৎসরের জাতীয় আয় ১০ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় বৎসরে ৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। এই অবস্থায় আমরা যদি দেশের উৎপাদন প্রকৃতপক্ষে বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাহা জানিতে চাই—অর্থাৎ, প্রকৃত জাতীয় আয়ের (Real National Income) হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছে কি না তাহার সন্ধান করিতে চাই, তাহা হইলে অর্থের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হিসাব করিয়া জাতীয় আয়ের অর্থমূল্যের সমষ্টিকে সংশোধিত করিয়া লইতে হইবে। যেমন, এক বৎসরের তুলনায় অন্য বৎসরে জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুণ হইয়া থাকিলে দ্বিতীয় বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্যাদির অর্থমূল্যের সমষ্টিকে অর্ধেক করিয়া লইতে হইবে; আবার জিনিসপত্রের দাম কমিয়া অর্ধেক হইয়া থাকিলে দ্বিতীয় বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্যাদির অর্থমূল্যের সমষ্টিকে বাড়াইয়া দ্বিগুণ করিয়া লইতে হইবে। এইভাবে সংশোধিত জাতীয় আয়ই দেশের প্রকৃত আয়; এবং ইহা হইতেই দেশের উন্নতি-অবনতির ইংগিত পাওয়া যায়।

ইহার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত বা আসল জাতীয় আয়ের হিসাবের

টাকাকড়ির মূল্য পরিবর্তিত হইলে সংশোধন করিয়া আসল জাতীয় আয়ের হিসাব করিতে হইবে

মাথাপিছু আয় (Per Capita Income): এইভাবে প্রকৃত জাতীয় আয় নির্ধারণ করার পর আমাদের দেখিতে হইবে, জনসংখ্যার তুলনায় জাতীয় আয়ের পরিমাণ কত এবং জনসংখ্যার মধ্যে এই আয় সমানভাবে বণ্টন করিয়া দিলে প্রত্যেকের ভাগে কত পড়ে। সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে নির্দিষ্ট বৎসরের জাতীয় আয়কে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিলে মাথাপিছু যতটা করিয়া পড়ে তাহাকেই ঐ বৎসরের মাথাপিছু জাতীয় আয় (Per Capita National Income) বলা হয়। এই মাথাপিছু বা গড়পড়তা আয়ের হিসাব হইতেই ভালভাবে বুঝা যায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হইতেছে কি না এবং কতটা হইতেছে, বিভিন্ন বৎসরের মাথাপিছু আয় তুলনা করিয়া তাহারও কতকটা ইংগিত পাওয়া যায়। আবার এক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনাও এই মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে করা হয়।

মাথাপিছু আয় কাহাকে বলে ও ইহার গুরুত্ব

এই সকল ব্যাপারে মাত্র দেশের জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণের দিকে লক্ষ্য দিলে ভুল হইবে। ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে ১৯৬২-৬৩ সালে আমাদের জাতীয় আয় ছিল ১৩৩৭০ কোটি টাকা। টাকাটা বিশেষ অল্প নয়; কিন্তু দেশের লোকসংখ্যাও ছিল ৪৫ কোটির মত; সুতরাং মাথাপিছু

বার্ষিক আয় ছিল মাত্র ২৯৪ টাকার কিছু উপর—অর্থাৎ, মাসিক আয় ২৪·৫০ টাকার মত।* আজকালকার দিনে মাসিক এই ২৪·৫০ টাকাতে যে কোনমতে খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকা যায় না, তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। দ্বিতীয়ত, ধরা যাউক কোন দেশের জাতীয় আয় বাড়িয়া দশ বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ হইল। ইতিমধ্যে জনসংখ্যাও বাড়িয়া দ্বিগুণে দাঁড়াইল। এইরূপ অবস্থায় লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে, কারণ জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয় সমানই রহিয়া গিয়াছে। আমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ৪৪ ভাগ কিন্তু জনসংখ্যা ৩৬ কোটি হইতে ৪৩·৫ কোটির উপর পৌছানোর জন্য মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল মাত্র শতকরা ১৮ ভাগ। আবার এক দেশের তুলনায় অন্য আর এক দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ হয়ত দ্বিগুণ। ইহা হইতে মনে হইতে পারে, দ্বিতীয় দেশটির লোকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু দ্বিতীয় দেশের জনসংখ্যা যদি প্রথম দেশটির তুলনায় দ্বিগুণ হয়, তাহা হইলে উভয় দেশের মাথাপিছু আয় সমান হইবে। সুতরাং মাথাপিছু বা গড়পড়তা আয়ের হিসাবই অর্থনৈতিক অবস্থার ইংগিত দিয়া থাকে।

মাথাপিছু আয় হইতেই দেশের অবস্থার ইংগিত পাওয়া যায়

এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, মাথাপিছু আয়ের পরিমাপ টাকার অংকে করা হয়। কিন্তু টাকার ক্রয়শক্তি অনবরত পরিবর্তিত হয়—যেমন, যুদ্ধের পূর্বে আমাদের দেশে এক টাকায় যাহা পাওয়া যাইত তাহা এখন আর পাওয়া যায় না। সুতরাং কোন বৎসরে টাকার অংকে মাথাপিছু আয় অধিক হইলেই প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায় না। উদাহরণস্বরূপ, কোন বৎসরের তুলনায় অন্য আর এক বৎসরে টাকার অংকে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হইতে পারে; কিন্তু ইতিমধ্যে যদি জিনিসপত্রের দামও দ্বিগুণ হইয়া থাকে তবে জনসংখ্যার প্রকৃত মাথাপিছু আয় মোটেই বাড়িবে না। আমাদের কাছে এই প্রকৃত মাথাপিছু জাতীয় আয়ের (Real Per Capita National Income) হিসাবই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্য এক বৎসরের তুলনায় অন্য বৎসরে জিনিসপত্রের দাম কতটা বাড়িয়াছে তাহার হিসাব করিয়া প্রকৃত মাথাপিছু আয় বাড়িল কি কমিল তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে। এই কারণে কোন বিশেষ বৎসরের দামের ভিত্তিতেই পরবর্তী বৎসরসমূহের জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয়। আমাদের দেশে বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতেই জাতীয় আয়ের গণনা করা হয়। কোন

প্রকৃত মাথাপিছু আয়—ইহাই দেশের অবস্থার নির্দেশ করে

* ১৯৬২-৬৩ সালের দামের ভিত্তিতে হিসাব করা হইলে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৩৩৯ টাকা এবং মাসিক আয় ২৭·৫০ টাকার মত দাঁড়ায়।

কোন সময় অবশ্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সুরুর ঠিক পূর্বে (১৯৫০-৫১ সাল) অথবা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দশম বৎসরে (১৯৬০-৬১ সাল) যে দাম ছিল তাহার ভিত্তিতেও জাতীয় আয়ের হিসাব করা হইয়া থাকে।

মাথাপিছু বা গড়পড়তা আয় সম্পর্কে আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা মোটামুটিভাবে দেশের অবস্থার ইংগিত দিলেও জনসাধারণের অবস্থার সঠিক খবর দেয় না, কারণ মোট জাতীয় আয়কে সমানভাবে ভাগ করিয়াই মাথাপিছু আয়ের হিসাব করা হয়। অর্থাৎ, জাতীয় আয় সমানভাবে বণ্টিত হইলে জনসংখ্যার প্রত্যেকে বৎসরে যাহা পাইত তাহাই মাথাপিছু বা গড়পড়তা আয়। কিন্তু দেশে আয়গত বৈষম্য রহিয়াছে এবং বেশীর ভাগ লোকের আয় মাথাপিছু আয় হইতে অনেক কম হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের মাথাপিছু আয় ২৯৪·৭ টাকা। ইহার অর্থ এই নয় যে প্রত্যেকে বৎসরে ২৯৪·৭ টাকা করিয়া পায়। অনেকের আয় ইহা অপেক্ষা অনেক কম। বৎসরে ৫০ টাকা করিয়াও আয় করিতে পারে না এরূপ লোকও সংখ্যায় অল্প নহে।

কিন্তু ইহা জনসাধারণের অবস্থার নির্দেশ করে না

ভারতের জাতীয় আয় (National Income of India): ভারতের জাতীয় আয়ের গতি ও প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় প্রথম ছকটি দেওয়া হইল।

ছকটি হইতে দেখা যাইতেছে যে ভারতের জাতীয় আয় প্রধানত চারিটি সূত্র হইতে অর্জিত হয়—যথা, (১) কৃষি ও অনুরূপ কার্য, (২) খনি এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প, (৩) ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ, এবং (৪) অন্যান্য সেবামূলক কার্য। বিদেশ হইতে অর্জিত নীট আয় ধনাত্মক (positive) নহে, ঋণাত্মক (negative)। সুতরাং ইহাকে জাতীয় আয়ের অন্যতম সূত্র বলিয়া গণ্য করা চলে না। এখন সূত্রগুলির সামান্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

ভারতের জাতীয় আয়ের চারিটি প্রধান সূত্র:

কৃষি ও অনুরূপ কার্য বলিতে বুঝায় কৃষিকার্য, পশুপালন, মৎস্যের চাষ, অরণ্যজাত দ্রব্য উৎপাদন ইত্যাদি। এগুলিই সামগ্রিকভাবে ভারতের জাতীয় আয়ের সর্বপ্রধান সূত্র। মোট জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ (১৯৬২-৬৩ সালে ৪৩ ভাগ) এই সূত্র হইতেই অর্জিত হয়। ভারত যে কৃষিপ্রধান দেশ ইহা তাহারই পরিচায়ক।

১। কৃষি ও অনুরূপ কার্য—ইহাই সর্বপ্রধান সূত্র

জাতীয় আয়ের দ্বিতীয় প্রধান সূত্র হইল খনিজ দ্রব্য উৎপাদন এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প। এই সূত্র হইতে মোট শতকরা ১৬-১৭ ভাগের মত জাতীয় আয় অর্জিত হয়। ভারত যে শিল্পে অনুন্নত দেশ তাহা ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায়। তবে শিল্পপ্রসারের ফলে এই সূত্র হইতে আয়ের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

২। খনিজ ও শিল্প দ্রব্য উৎপাদন

অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীন প্রথম বার বৎসরে (১৯৫১-৬৩ সাল)
ভারতের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি
(হিসাব কোটি টাকায়—১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে)

জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান সূত্র	১৯৫০-৫১ সাল (ভিত্তি বৎসর)	১৯৬২-৬৩ সাল*	শতকরা বৃদ্ধি
১। কৃষি ও অনুরূপ কার্য	৪৩৩০	৫৮০০	
২। খনি এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প	১৪৮০	২৩১০	
৩। ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ	১৬৬০	১৬৭০	
৪। অন্যান্য সেবামূলক কার্য	১৩৯০	২৭০০	
৫। বিদেশ হইতে অর্জিত নীট আয়	—১০	—৮০	
মোট	৮৮৫০	১৩৩৭০	৫১
মাথাপিছু আয় (টাকা)	২৪৭.৫	২৯৪.৭	১৯.১

জাতীয় আয়ের তৃতীয় সূত্র হইল ব্যবসাবাণিজ্য (Commerce), পরিবহণ ও সংসরণ (Transport and Communications)। ইহা হইতে আয়ের পরিমাণ কিছুটা বেশী—মোট শতকরা ২০ ভাগের মত।

৩। ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ

অন্যান্য সেবামূলক কার্য বলিতে বুঝায় ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি বিভিন্ন পেশা এবং সকল প্রকারের চাকরি ইত্যাদি। এই সূত্র হইতে আয়ের পরিমাণ ঐ তৃতীয় সূত্রেরই মত শতকরা ২০ ভাগ।

৪। অন্যান্য সেবামূলক কার্য

নিম্নের ছকটিতে ভারতের মোট জাতীয় আয়ে বিভিন্ন সূত্রের অংশ (শতকরা ভাগ) একসংগে দেখানো হইল।

জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান সূত্র	১৯৫০-৫১ সাল	১৯৬২-৬৩ সাল
১। কৃষি ও অনুরূপ কার্য	৫১	৪৩
২। খনি এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প	১৬	১৭
৩। ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ	১৮	২০
৪। অন্যান্য সেবামূলক কার্য	১৫	২০
	১০০	১০০

* ১৯৬২-৬৩ সালের হিসাব প্রাথমিক হিসাব (preliminary estimates)।

ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, মোট জাতীয় আয়ে কৃষি ও অনুরূপ কার্যের অংশ হ্রাস পাইয়া খনি ও শিল্পের অংশ কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশে যে শিল্পপ্রসার ঘটিতেছে ইহা তাহাই নির্দেশ করে। তবুও মোট জাতীয় আয় অর্জনে কৃষি ও অনুরূপ কার্যেরই প্রাধান্য রহিয়াছে, এবং শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির অংশ অতি সামান্য। ইহা জীবনযাত্রার নিম্ন মানেরই লক্ষণ।

ভারতের জাতীয় আয় হইতে কি জানা যায়: ১। দেশে শিল্পপ্রসার ঘটিতেছে ২। তবুও কৃষির প্রাধান্য রহিয়াছে

ভারতে জীবনযাত্রার মান বা স্তর যে বিশেষ নিম্ন এবং উহার উন্নয়নের গতি যে অতি মন্থর তাহা মাথাপিছু আয়ের দিকে লক্ষ্য করিলেই অতি সহজে বুঝা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে (১৯৬০-৬১ সাল) ভারতে মাথাপিছু বা গড়পড়তা আয় ছিল মাত্র ২৯২ টাকা। তুলনায় ঐ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৯৮০০ টাকা ও ৪৩০০ টাকার মত। উপরন্তু, অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীন সময় হইতে জাতীয় আয় বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু মাথাপিছু আয়ের সম্প্রসারণ ততটা দ্রুত হারে হইতেছে না। প্রথম ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে পরিকল্পনাধীন প্রথম ১২ বৎসরে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল শতকরা ৫১ ভাগ, কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল মাত্র শতকরা ১৯ ভাগ। অতএব, মাথাপিছু আয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে—(১) জাতীয় আয়বৃদ্ধির হারকে আরও বাড়াইতে হইবে, এবং (২) সংগে সংগে জনসংখ্যাকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত না হইলে বর্ধিত জাতীয় আয় বর্ধিত জনসংখ্যাকে খাওয়াইতে পরাইতেই ব্যয় হইয়া যাইবে; লোকের জীবনযাত্রার মানে কোন উন্নতি দেখা দিবে না।

৩। ভারতে জীবনযাত্রার স্তর অতি নিম্ন

৪। মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি জাতীয় আয়বৃদ্ধি অপেক্ষা কম

৫। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অতি প্রয়োজনীয়

সংক্ষিপ্তসার

ব্যক্তির ন্যায় জাতীয় আয়ও জাতীয় সমৃদ্ধির নির্দেশক। এই কারণেই জাতীয় আয় সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়—যথা, জাতীয় আয়ের অর্থ, জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার পদ্ধতি, জাতীয় আয়ের উৎপাদন-ব্যবস্থা, মাথাপিছু আয় প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

জাতীয় আয় কাহাকে বলে? দেশে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদন হইতেই জাতীয় আয় হয়। মোট উৎপন্ন দ্রব্যাদি দেশের লোকের মধ্যে মজুরি, খাজনা, সুদ ও মুনাফা হিসাবে বণ্টিত হয়। সুতরাং মজুরি খাজনা ইত্যাদি যোগ দিলেই জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

জাতীয় আয়কে তিনটি দিক হইতে দেখা যাইতে পারে—(ক) ব্যক্তিসমুদয়ের উৎপন্নের সমষ্টি হিসাবে, (খ) ব্যক্তিসমুদয়ের আয়ের সমষ্টি হিসাবে, এবং (গ) ব্যক্তিসমুদয়ের ভোগ ও সঞ্চয়ের সমষ্টি হিসাবে।

(ক) ব্যক্তিসমূহের উৎপন্নের সমষ্টি হিসাবে জাতীয় আয়: ইহা হইল বৎসরে দেশে মোট উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবামূলক কার্যের অর্ঘমূল্যের সমষ্টি।

(খ) ব্যক্তিসমূহের আয়ের সমষ্টি হিসাবে জাতীয় আয়: ইহা হইল উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী সকল লোকের বাৎসরিক আয়ের সমষ্টি।

(গ) ব্যক্তিসমূহের ভোগ ও সঞ্চয়ের সমষ্টি হিসাবে জাতীয় আয়: ইহা হইল বৎসরে সকল ব্যক্তির ব্যয় ও সঞ্চয়ের সমষ্টি।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ: উপরি-উক্ত তিনটি দিকের যে-কোনটি হইতেই দেখা যাউক না কেন ফল একই পাওয়া যাইবে, কারণ একই জিনিসকে তিনটি বিভিন্ন দিক হইতে দেখা হয়। যাহা হউক, জাতীয় আয়ের পরিমাপের সময় তিনটি পদ্ধতির যে-কোনটি অবলম্বনে সতর্কতার প্রয়োজন আছে।

(ক) উৎপাদন-পদ্ধতি: উৎপাদন-পদ্ধতি অবলম্বনের সময়—অর্থাৎ, সকলের উৎপাদনের সমষ্টি হিসাব করিবার সময় এই কয়টি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে:

১। যে জিনিস বাজারে বিক্রয় হয় না তাহাদেরও ধরিতে হইবে; কিন্তু নিজেরা যে-সকল কাজকর্ম করিয়া লই বা পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ যে স্নেহযত্ন করেন, তাহা ধরা হইবে না;

২। একই দ্রব্যের দুইবার গণনা করা চলিবে না;

৩। মোট উৎপন্ন হইতে ক্ষয়ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা বাদ দিতে হইবে।

মোট উৎপাদনের অর্ঘমূল্যের হিসাবে বাজার-দামে (at market prices) অথবা উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামে (at factor prices) করা যাইতে পারে। উৎপাদনের উপাদানসমূহের দামে হিসাবের সময় উহা হইতে উৎপাদন-শুল্ক বাদ দিতে হইবে।

(খ) আয় পদ্ধতি: আয়-পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সময়—অর্থাৎ, মজুরি খাজনা সুদ ও মুনাফা যোগ দিবার সময় যে আয় উৎপাদনশীল কার্য হইতে অর্জিত হয় না তাহা ধরা চলিবে না; হস্তান্তর-পাওনাকে বাদ দিতে হইবে।

(গ) ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে সকলের ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় ও সঞ্চয় যোগ দিতে হইবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাতীয় আয়: বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে দেনাপাওনা দেখিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব করিতে হইবে। এইরূপ করিলেই তবে প্রকৃত জাতীয় আয় সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

আর্থিক আয় ও প্রকৃত আয়: উক্ত তিনটি পদ্ধতির প্রত্যেকটিতেই অর্থের মাপকাঠিতে জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয়। কিন্তু ইহার দ্বারা দেশের উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়াছে কি না তাহা বুঝা যায় না। এইজন্য প্রয়োজন হইল প্রকৃত জাতীয় আয়ের হিসাবের। টাকাকড়ির মূল্য পরিবর্তিত হইয়া থাকিলে তাহা ধরিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব করিলে তবেই প্রকৃত জাতীয় আয় সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

মাথাপিছু আয়: মাথাপিছু আয় হইতেই দেশের অবস্থা বুঝা যায়। কারণ, জাতীয় আয়ের পরিমাণ বিরাট হইলেও জনসংখ্যাও বিরাট বলিয়া প্রত্যেকের ভাগে অতি সামান্য পরিমাণ জুটিতে পারে। কিন্তু মাথাপিছু আয় হইতে জানিতে পারা যায় না যে প্রত্যেকে ঠিক কতটা করিয়া পায়।

ভারতে মাথাপিছু আয় অত্যন্ত অল্প, তবে ইহা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের জাতীয় আয়ের আর একটা বৈশিষ্ট্য হইল যে জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধাংশ কৃষি ও অনুরূপ কার্য হইতেই অর্জিত হয়। ইহা দেশের জীবনযাত্রার নিম্ন মানই নির্দেশ করে।

প্রশ্নোত্তর

1. **Explain the concept of National Income. How is such income calculated?** (En. 1961)

জাতীয় আয় সম্বন্ধে ধারণার ব্যাখ্যা কর। কিভাবে জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয়?

[ইংগিত: বিভিন্ন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হিসাবের সময় যে-সকল সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহাদেরও উল্লেখ করিতে হইবে।...(২৫-২৬ এবং ২৭-৩৩ পৃষ্ঠা)]

2. "The best way to get a general picture of the economic life of a country is to study detailed estimates of its National Income." Elucidate.

"কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সাধারণ চিত্র পাইবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল উহার জাতীয় আয়ের বিভিন্ন দিকের পর্যালোচনা করা।" উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

[ইংগিত: আয়ের বিভিন্ন দিক বলিতে মোট আয়, উহার বণ্টন-পদ্ধতি, উহার হ্রাসবৃদ্ধি, মাথাপিছু জাতীয় আয়, প্রকৃত জাতীয় আয় প্রভৃতি সকলই বুঝায়। এইগুলি পর্যালোচনা দ্বারাই দেশের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে।...(২৪-২৫ এবং ৩৩-৩৬ পৃষ্ঠা)]

3. What is meant by National Income? Give a brief account of the principal sources of India's National Income.

জাতীয় আয় বলিতে কি বুঝায়? ভারতের জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান উৎসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [২৫-২৬ এবং ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা]

4. Write notes on : (*a*) Per Capita National Income ; (*b*) Real Per Capita National Income.

টীকা রচনা কর: (ক) মাথাপিছু জাতীয় আয়; (খ) প্রকৃত মাথাপিছু জাতীয় আয়। [৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা]

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান উপাদান

(Main Factors determining National Income)

জাতীয় আয়ের দুইটি মূল উপাদান

জাতীয় উৎপাদন হইতেই দেশের আয় সৃষ্টি হয়। জাতীয় আয় জাতীয় উৎপাদনেরই নামান্তর মাত্র। এই জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে একদিকে দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য এবং অপরদিকে দেশ ঐ ঐশ্বর্যকে কতদূর পরিমাণে কাজে লাগাইতে পারিয়াছে তাহার উপর।

এই দুইটি মূল বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া জাতীয় আয়ের উপাদানগুলিকে এইভাবে দেখানো যাইতে পারে: প্রথমত, জাতীয় উৎপাদন নির্ভর করে দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের উপর। প্রকৃতির দানকেই শ্রমের সাহায্যে রূপান্তরিত করিয়া মানুষ তাহার আকাংক্ষা তৃপ্তির উপকরণ সৃষ্টি করিয়া থাকে। জমি,

জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উপাদান:

১। প্রাকৃতিক সম্পদ

খনিজ সম্পদ, বন, নদনদী, জলবায়ু, প্রাণিসম্পদ প্রভৃতি প্রকৃতির দান। দেশে দেশে ইহাদের পরিমাণ ও গুণের পার্থক্য দেখা যায়। কোন দেশের জমি হয়ত অপেক্ষাকৃত অনুর্বর; এমনকি কোন অঞ্চল মরুভূমিও হইতে পারে। এই ধরনের দেশে কৃষিজ উৎপাদন সাধারণতই কম হইবে। আবার উৎপাদন বৃষ্টিপাতের উপরও নির্ভরশীল। বর্তমানে অবশ্য মানুষ নানা উপায়ে জলসেচ ও জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিয়াছে। কৃষিকার্য উন্নত ধরনের হইলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মালমসলা সহজেই পাওয়া যায়। আবার কয়লা লোহ তৈল প্রভৃতি খনিজ সম্পদে কোন দেশ সমৃদ্ধ হইলে শিল্পোৎপাদন

বৃদ্ধি করা সহজসাধ্য হয়। নদনদীও দেশের মধ্যে গমনাগমন ও বিদ্যুৎ-উৎপাদনের সহায়তা করিয়া ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করে। অনুরূপভাবে বনসম্পদ, প্রাণিসম্পদ প্রভৃতিও দেশের উৎপাদনের অগ্রগতিতে সহায়তা করে।

উপরি-উক্ত সকল দিক হইতেই আমাদের দেশ অন্যান্য অনেক দেশ হইতেই অধিকতর সুবিধা ভোগ করে। ভারতে কয়লা, লৌহ-আকর (iron-ore), অভ্র, ম্যাংগানীজ-আকর, বক্সাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অন্যান্য খনিজ পদার্থও খুব কম সঞ্চিত নাই। ভারতে অসংখ্য নদনদী রহিয়াছে; বন-সম্পদ ও প্রাণিসম্পদের প্রাচুর্য রহিয়াছে। তৎসত্ত্বেও ভারতবর্ষ স্বল্পোন্নত দেশ। ইহার কারণ, সেদিন পর্যন্ত এইগুলিকে দেশের উন্নতিসাধনের কাজে লাগাইবার কোন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল না।

ভারত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান

দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের সাহায্যে অভাবপূরণের দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করিবার জন্য প্রয়োজন হইল জনবল—অর্থাৎ, জনসম্পদ। কিন্তু লোকসংখ্যা যথেষ্ট হইলেই যে উৎপাদন অধিক হইবে এরূপ মনে করা ভুল। লোকের কর্ম-দক্ষতা ও কর্মস্পৃহার উপরই জাতীয় উৎপাদন নির্ভর করে। যে-দেশের লোক সুস্থ, সবল, পরিশ্রমী, জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন এবং শিল্পগত নিপুণতার অধিকারী সে-দেশের লোক স্বভাবতই অধিকমাত্রায় উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। তবে কর্মদক্ষতার সহিত থাকা চাই কর্মস্পৃহা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আকাংক্ষা থাকিলে তবেই দ্রুত উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব হয়। ভারতের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমনি প্রচুর, জনসংখ্যাও তেমনি পর্যাপ্ত। কিন্তু ইহাদিগকে শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হইল কারিগরি বা শিল্প শিক্ষার অভাব। এই কারণে জাতীয় উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র এই সকল লোককে শিল্প-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টাই চলিয়াছে।

২। জনসম্পদ

ভারতে জনসংখ্যা প্রচুর হইলেও জনসম্পদ পর্যাপ্ত নহে

তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও জনবল ব্যতীত জাতীয় উৎপাদন নির্ভর করে দেশের মূলধনের পরিমাণ ও উৎপাদন-পদ্ধতির কলাকৌশলের উপর। যে-দেশের যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, বিদ্যুৎ-উৎপাদন প্রতিষ্ঠান, যানবাহন প্রভৃতি মূলধন-দ্রব্যের সংগতি অধিক সে-দেশের উৎপাদনও বেশী। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে উৎপাদনের কলাকৌশলের নিত্যনূতন উন্নতি সাধিত হইতেছে। এই সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশলের প্রয়োগ দ্বারা যত অধিক পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব, পুরাতন পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে তত

৩। মূলধনের পরিমাণ ও উৎপাদনের কলাকৌশল

পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব নহে। সুতরাং উৎপাদনের কলাকৌশলের উপরও জাতীয় আয় নির্ভর করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের অন্যতম সমস্যা হইল, কিভাবে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের কলাকৌশলের উন্নতিসাধন করা যায়? সরকার দেশের লোকের সঞ্চয়সংগ্রহ করিয়া, কর প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারী আয় বৃদ্ধি করিয়া এবং বিদেশ হইতে ঋণ সংগ্রহ করিয়া দেশের মূলধনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিতেছে।

৪। সংগঠন-নৈপুণ্য

চতুর্থত, সংগঠন-নৈপুণ্যের উপরও জাতীয় আয়ের পরিমাণ অনেকখানি নির্ভরশীল। সংগঠকই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, শ্রম ও যন্ত্রপাতিকে একত্রিত করিয়া উৎপাদনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। সংগঠক যেভাবে উৎপাদনের উপাদানগুলি ব্যবহার করে তাহার উপরই উৎপাদন অধিক হইবে কি অল্প হইবে, তাহা নির্ভর করে। সংগঠক যদি সুদক্ষ হয় তবেই উৎপাদনের উপাদানগুলির সম্যক ব্যবহার সম্ভব হয়। ফলে উৎপাদনও অধিক হয়। আমাদের দেশে শিল্পবাণিজ্য অংশত বেসরকারী এবং অংশত সরকারী পরিচালনাধীন। এই দুই ক্ষেত্রের পরিচালনা ও সংগঠনদক্ষতার উপরই আমাদের দেশের জাতীয় আয় নির্ভরশীল।

৫। সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা

পঞ্চমত, সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং সামাজিক প্রথা জাতীয় উৎপাদনের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সমাজ-ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক হইতে পারে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় জমিদারশ্রেণী ক্ষেত-খামারে কৃষকদের খাটাইয়া তাহাদের শোষণ করিতে থাকে। আমাদের দেশে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত জমিদারী প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্প্রতি ইহার বিলোপ-সাধন করা হইয়াছে। এইরূপ জমিদারী বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষি কিংবা শিল্পের বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয় না। এই অবস্থায় জাতীয় উৎপাদন যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি বণ্টন-ব্যবস্থাও হয় অত্যন্ত বৈষম্যমূলক।

সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে জাতীয় আয়কে প্রভাবান্বিত করে

ধনতান্ত্রিক (capitalistic) সমাজ-ব্যবস্থায় কলকারখানা, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি সকলই ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে এবং এই মালিকশ্রেণী একমাত্র মুনাফা লাভের জন্যই উৎপাদনকার্য পরিচালনা করে। ইহাতে সমাজের কল্যাণ হইতেছে কি অকল্যাণ হইতেছে তাহার দিকে দৃষ্টিপাতই করে না। মানুষ দেখিয়াছে যে ধনতন্ত্রের যত প্রসার ঘটিয়াছে মালিকের সংখ্যা ততই কমিয়া যাইয়া ক্রমশ একচেটিয়া কারবারের (monopolies) উদ্ভব হইয়াছে। একচেটিয়া কারবারী উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া জিনিসপত্রের দাম চড়া করিয়া রাখে, মানুষকে বেকারাবস্থার মধ্যে ফেলিয়া রাখে এবং দেশের সম্পদের অপচয় করিয়া মুনাফার লোভে অপ্রয়োজনীয় এমনকি অহিতকর দ্রব্যাদিও

উৎপাদন করে। কেবলমাত্র মুনাফার জন্য উৎপাদন করে বলিয়া শিল্পের সুষম উন্নয়ন (balanced development) সম্ভব হয় না; এবং এই কারণে দেশে সর্বাধিক পরিমাণে জাতীয় আয় সৃষ্ট হয় না। ভারতের মত অনগ্রসর দেশে জনসাধারণ অত্যন্ত দরিদ্র। তাহাদের বিশেষ ক্রয়ক্ষমতা নাই। তাই শিল্প-প্রসারের দিকে ধনী মূলধন-মালিকদের বিশেষ উদ্যোগ ও উৎসাহ ছিল না। কতকটা এইজন্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও ভারত শিল্পে অনগ্রসর রহিয়া গিয়াছে।

ভারতের ন্যায় যে-দেশে এইভাবে মূলধন-মালিকদের উদ্যোগ ও উৎসাহের অভাবে শিল্পবাণিজ্য অনগ্রসর রহিয়া গিয়াছে সেখানে সরকারকেই উদ্যোগী হইয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভার গ্রহণ করিতে হয়। দেখা যায়, বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিকল্পে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে; পূর্বের ন্যায় আর নিষ্ক্রিয় ও নির্লিপ্তভাবে ব্যক্তিগত মালিকদের হাতে জাতীয় উৎপাদনের ভার ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া নাই। সুতরাং জাতীয় উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রের প্রভাব বিশেষ অধিক। শাসন-ব্যবস্থা শক্তিশালী, দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত না হইলে জাতীয় উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব হয় না; চোরাকারবার, বিশৃংখলা ও জনসাধারণের অবিশ্বাস উৎপাদনকার্যকে ব্যাহত করিতে থাকে। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে ইহা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সমস্যা।

রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কিভাবে জাতীয় আয়কে প্রভাবান্বিত করে

সামাজিক প্রথা এবং প্রতিষ্ঠানও জাতীয় উৎপাদনকে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানে জাতিভেদ প্রথা, সাম্প্রদায়িকতা, অদৃষ্টবাদিতা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থা কোন-না-কোন ভাবে জাতীয় উৎপাদনের প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য করিয়াছে। যেমন, জাতিভেদ প্রথা শ্রমের যোগান হ্রাস করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধিকে ব্যাহত করিয়াছে। উন্নত দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী যে-কোন স্থানে যে-কোন কার্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকে। আমি ব্রাহ্মণ—অতএব আমি জুতা তৈয়ারির কাজ করিব না; আমি ভদ্রলোক—অতএব আমি কলকারখানায় হাতের কাজ লইব না; অমুক মুচি বা মেথরের সন্তান—অতএব সে অন্য কোন উচ্চতর পেশায় নিয়োজিত হইতে পারিবে না—এইরূপ মনোভাব ও প্রথা অর্থনৈতিক উন্নতি ও জাতীয় উৎপাদনবৃদ্ধির পথে বিরাট বাধাস্বরূপ। আবার অদৃষ্টের দোহাই দিয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে এবং যৌথ পরিবারে অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা আছে বলিয়া উদ্যোগহীন ও অলসভাবে জীবনযাপন করিলেও উৎপাদনকার্য ব্যাহত হয়। ফলে জাতীয় আয়ও কম হয়। সুখের কথা যে বর্তমানে আমাদের

সামাজিক প্রথা কিভাবে জাতীয় আয়কে প্রভাবান্বিত করে

দেশে জাতিভেদ প্রথা, অদৃষ্টবাদ, কর্মবিমুখতা প্রভৃতি সামাজিক বাধাগুলি ক্রমশ দূরীভূত হইতেছে।

উৎপাদনের উপাদান (Factors of Production) : উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে উৎপাদনের উপাদান কি কি তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে উৎপাদনকার্য সম্পাদন করিতে হইলে কতকগুলি উপকরণের প্রয়োজন হয়। এই উপকরণগুলিকেই অর্থবিদ্যায় 'উৎপাদনের উপাদান' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। আমরা ইহাও জানি যে প্রকৃতিদত্ত ঐশ্বর্যকে মানুষ নিজের চেষ্টায় অভাব মিটাইবার উপযোগী করিয়া তুলে। কোন উৎপাদনই প্রকৃতির দান ব্যতীত সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতির দানই হইল উৎপাদনের প্রথম উপাদান। অর্থবিদ্যাবিদগণ প্রকৃতির দানকে জমি (Land) বলিয়া অভিহিত করেন। জমি বলিতে কেবলমাত্র ভূখণ্ডকেই বুঝায় না; কৃষি ও ঘরবাড়ীর জন্য জমি ছাড়াও খনি, বন, মৎস্যধৃতকরণের উপযোগী নদী, সমুদ্র, জলবিদ্যুতের উৎস ইত্যাদি সকল প্রাকৃতিক সম্পদকেই বুঝায়।

উৎপাদনের উপাদান কাহাকে বলে

উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান : ১। প্রকৃতির দান বা জমি

কিন্তু উৎপাদনের জন্য প্রকৃতির দানই যথেষ্ট নহে। মানুষের শ্রম ব্যতীত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারোপযোগী হয় না। এমনকি সুদূর অতীতে মানুষ যখন বনজংগলে বসবাস করিত তখনও তাহাকে পরিশ্রম করিয়া ফলমূল আহরণ করিয়া জীবনধারণ করিতে হইত। বর্তমান যুগে মানুষ তাহার শ্রমের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে আকাংক্ষা মিটাইবার নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া থাকে। এই শ্রম (Labour) হইল উৎপাদনের দ্বিতীয় উপাদান। শ্রম বলিতে শুধু দৈহিক শ্রমই বুঝায় না, মানসিক শ্রমও বুঝায়।

২। শ্রম

কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য কোন উপাদানের সাহায্য না লইয়া মাত্র জমি ও শ্রমের সহযোগে উৎপাদন করা সম্ভব হইলেও সেই উৎপাদন অতি সাধারণ ও সামান্য হইতে বাধ্য। তাই মানুষ উৎপাদনের জন্য নানাবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। প্রাচীন যুগে মানুষ যখন বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত, তখনও সে তীর ধনুক বর্শা প্রভৃতির সাহায্যে শিকার সংগ্রহ করিত। এই সকল অস্ত্রশস্ত্রই ছিল তখনকার দিনে মূলধন। বর্তমান যুগে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই অসংখ্য রকমের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের দ্বারা উৎপাদনকার্য চলিতেছে। এই সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের ব্যবহারের ফলে উৎপাদন আশাতীতভাবে বাড়িয়া গিয়াছে এবং মানুষের শ্রমেরও লাঘব হইয়াছে। বাটা কোম্পানীর ন্যায় জুতার কারখানায় গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সেখানে যন্ত্রের সাহায্যে দৈনিক শত শত জুতা তৈয়ারি হইতেছে; কোন কাপড়ের কলে গেলে দেখিতে পাওয়া

যাইবে যে সেখানে প্রত্যহ শত শত মিটার কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং দেখা যায়, উৎপাদনের জন্য প্রকৃতির দান বা জমি ও শ্রম ব্যতীত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামেরও প্রয়োজন। অর্থবিদ্যায় এই যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামকেই মূলধন (Capital) বলা হয় ; ইহা উৎপাদনের তৃতীয় উপাদান। মূলধনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা মানুষের অতীত শ্রমের ফল এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। যেমন, কৃষক যে-লাঙল ব্যবহার করে তাহা অতীতে মানুষ তাহার শ্রমের দ্বারা তৈয়ারি করিয়া বর্তমানে শস্যাদি উৎপাদন করিবার জন্য উহাকে ব্যবহার করিতেছে। মূলধনের সহিত জমির পার্থক্য এইখানেই। জমি প্রকৃতির দান, আর মূলধন মানুষ নিজের পরিশ্রমের দ্বারা গড়িয়া তুলে। এইজন্য জমিকে বলা হয় উৎপাদনের মৌলিক উপাদান (original factor of production) এবং মূলধনকে আখ্যা দেওয়া হয় উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান (produced means of production)।

৩। যন্ত্রপাতি বা মূলধন

জমি ও মূলধনের মধ্যে পার্থক্য

আবার জমি, শ্রম ও মূলধন থাকিলেই চলে না ; ভালভাবে উৎপাদনের জন্য এই তিনটি উপাদানকে একত্রিত ও সংগঠিত করা প্রয়োজন। এই কার্য সম্পাদন করে উদ্যোক্তা (Entrepreneur) বা সংগঠক (Organiser)। সংগঠক বা উদ্যোক্তার সংগঠন-নৈপুণ্যের উপরই উৎপাদনকার্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে। বর্তমান যুগে এই কর্মকর্তা বা সংগঠকের গুরুত্ব বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে, কারণ উৎপাদন-পদ্ধতি ক্রমশই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। অনেক অর্থবিদ্যাবিদ উদ্যোগ বা সংগঠনকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে স্বীকার করিতে চাহেন না। ইঁহাদের মতে, সংগঠনকার্য একপ্রকার শ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং প্রত্যেক শ্রমিককেই কিছু-না-কিছু সংগঠনমূলক কার্য করিতে হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলা হয় যে, সংগঠক বা উদ্যোক্তার কার্য বিশেষ ধরনের এবং বর্তমানের জটিল উৎপাদন-পদ্ধতিতে তাহার বিশেষ স্থান রহিয়াছে। এইজন্যই সংগঠনকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা যায়। অন্যান্য উপাদানের বিশদ আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে করা হইবে।

৪। সংগঠন

সংগঠকের কার্যাবলী (Functions of the Entrepreneur or Business Organiser) : উদ্যোক্তা বা সংগঠকের কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ : (১) তাহাকে প্রথমেই স্থির করিতে হয় যে কোন্ শিল্প বা ব্যবসায়ে সে প্রবেশ করিবে এবং কত পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে। এই উৎপাদনের জন্য তাহাকে স্থান নির্বাচন করিতে এবং মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়।

সংগঠকের কার্যাবলী :
১। উৎপাদন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

(২) সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব করিবার জন্য কি হারে জমি, শ্রম ও মূলধন উৎপাদনকার্যে ব্যবহার করা হইবে সেই সম্পর্কেও উদ্যোক্তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। উৎপাদন-পদ্ধতি ও শ্রমবিভাগ নির্ধারণ করাও তাহার দায়িত্ব। (৩) যাহাতে পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথভাবে কাজকর্ম চলে তাহাও তাহাকে দেখিতে হয়। অবশ্য এই কার্য মাহিনা-করা ম্যানেজারের হাতে কতকটা ছাড়িয়া দেওয়া যায়। (৪) উদ্যোক্তার প্রধান দায়িত্ব হইল ঝুঁকি (risk) বহন করা। বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সে দ্রব্যাদি উৎপাদন করে। কিন্তু বাজার বড় অনিশ্চিত এবং চাহিদাও অনবরত পরিবর্তিত হয়। কোন দ্রব্যের উৎপাদনের আরম্ভ হইতে উৎপাদন সমাপ্ত হইয়া উহা বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করিবার মধ্যে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে চাহিদার পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব, লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা সকল সময়েই রহিয়াছে। উদ্যোক্তাকে এই অনিশ্চয়তার দায়িত্ব বা ঝুঁকি বহন করিয়াই উৎপাদন করিতে হয়।

২। অন্যান্য উপাদানকে যথোপযুক্ত নিযুক্ত করা

৩। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্য পরিচালনা

৪। ঝুঁকি বহন করা

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানকে এই ঝুঁকি লইতে হয় না, কারণ চুক্তি অনুসারে শ্রমিক নির্দিষ্ট হারে মজুরি, জমির মালিক খাজনা এবং বিনিয়োগকারী সুদ পাইয়াই থাকে। এই সকল প্রাপ্য মিটাইয়া উদ্বৃত্ত কিছু থাকিলে তবে তাহাই উদ্যোক্তা মুনাফা হিসাবে ভোগ করে। যে-সকল অর্থবিদ্যাবিদ উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করিতে রাজী নহেন তাঁহারা অবশ্য বলেন যে, উদ্যোক্তার যেমন ঝুঁকি রহিয়াছে, অন্যান্য উপাদানেরও তেমন ঝুঁকি রহিয়াছে। যেমন, শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িতে পারে, কলকারখানার মধ্যে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। আবার জমির মালিক অনিশ্চয়তার ঝুঁকি লইয়া এক কাজ (use) হইতে জমিকে ছাড়াইয়া লইয়া অন্য কাজে ব্যবহার করিতে পারে। সুতরাং ঝুঁকি বহনের জন্য যদি মুনাফা পাওয়া যায় তাহা হইলে সুদ, খাজনা ও মজুরির একাংশকেও মুনাফা বলিয়াই ধরিতে হয়। ইহার উত্তরে বলা হয় যে, অন্যান্য উপাদানের পক্ষে কিছুটা ঝুঁকি বহন করিতে হইলেও উদ্যোক্তার ঝুঁকির পরিমাণ অধিক এবং প্রকৃতিও ভিন্ন। যাহা হউক, উদ্যোক্তার কার্য বিশেষীকৃত (specialised) হওয়ায় আমরা সংগঠনকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে ধরিয়াই আলোচনা করিব।

সংগঠক ঝুঁকি বহন করে বলিয়াই সংগঠনকে পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়

সংক্ষিপ্তসার

জাতীয় আয়ের মূল উপাদান দুইটি—(ক) দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, এবং (খ) ঐশ্বর্যকে কাজে লাগাইবার জন্য দেশের লোকের ইচ্ছা ও ক্ষমতা। এই দুইটি মূল বিষয়ের বিশ্লেষণ করিলে জাতীয় আয়ের

নিম্নলিখিত উপাদানগুলির সন্ধান পাওয়া যায়: (১) প্রাকৃতিক সম্পদ, (২) জনসম্পদ, (৩) মূলধনের পরিমাণ ও উৎপাদনের কলাকৌশল, (৪) সংগঠন-নৈপুণ্য এবং (৫) সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও সামাজিক প্রথা।

উৎপাদনের উপাদান: উৎপাদনের উপাদান সংখ্যায় চারিটি—যথা, (১) প্রকৃতির দান বা জমি, (২) শ্রম, (৩) মূলধন এবং (৪) সংগঠন। অনেকে সংগঠনকে পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করিতে চাহেন না। কিন্তু সংগঠকের কার্য শ্রমিকদের কার্য হইতে ভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া ইহাকে পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা উচিত।

সংগঠকের কার্যাবলী: সংগঠককে নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে হয়—১। উৎপাদন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ২। অন্যান্য উপাদানকে যথোপযুক্ত নিযুক্ত করা, ৩। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্য পরিচালনা, ৪। ঝুঁকি বহন করা।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the main factors that determine the National Income of a country.

যে যে উপাদান জাতীয় আয় নির্ধারণ করিয়া থাকে তাহাদের বর্ণনা কর। [৪০-৪৪ পৃষ্ঠা]

2. What is meant by Production? Describe the different Factors of Production. (C. U. 1953)

উৎপাদন বলিতে কি বুঝায়? উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনা কর। [২০-২১ এবং ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা]

3. What are the functions of the business organiser? Can organisation be regarded as a separate factor of production? Give reasons for your answer.

ব্যবসায় সংগঠকের কার্যাবলী কি কি? সংগঠনকে কি উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা যায়? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা]

পঞ্চম অধ্যায়

জমি

(Land)

জমির সংজ্ঞা (Definition of Land): সাধারণ ভাষায় জমি বলিতে ভূ-ত্বক বা মৃত্তিকাকে বুঝায়—যেমন, চাষবাস ও কলকারখানার জমি। অর্থবিদ্যায় কিন্তু 'জমি' শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা শুধু ভূখণ্ডের উপরিভাগটুকুই বুঝায় না—খনি, বন, জীবজন্তু, আলোবাতাস, নদনদী, সমুদ্র প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকেই বুঝায়।* প্রখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদ মার্শালের (Alfred Marshall) ভাষায় বলা যায়, "জমি হইল সেই সকল শক্তি ও সম্পদ যাহা প্রকৃতি মানুষের

জমি বলিতে কি বুঝায়

* ৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।

সাহায্যার্থে জল স্থল বায়ু আলোক ও উত্তাপের মাধ্যমে মুক্তভাবেই দান করে।" অবশ্য অনেক অর্থবিদ্যাবিদ মানুষের নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানায় নাই এরূপ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে 'জমি'র সংজ্ঞার মধ্যে ধরিতে চাহেন না। উদাহরণ-স্বরূপ, সূর্যালোক বৃষ্টিপাত বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

জমির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Land): উৎপাদনের উপাদান হিসাবে জমির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করা হয়:

(১) **জমির যোগান অপরিবর্তনশীল (Supply of land is fixed):** প্রকৃতিদত্ত বলিয়া জমির যোগান বা পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য রহিয়াছে তাহা আমরা ইচ্ছা করিলেই বাড়াইয়া লইতে পারি না। তবে এ-কথা বলা ঠিক নয় যে জমির পরিমাণ সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তনশীল। উপকূল ভংগ অথবা জমি জলমগ্ন হওয়ার ফলে পৃথিবীর স্থলভাগ হ্রাস পাইতে পারে; আবার বৃষ্টিপাত, বায়ু-প্রবাহের ফলে মৃত্তিকার উৎপাদিকাশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে। অপরপক্ষে, মানুষ আবার বাঁধ দিয়া, পতিত জমি পুনরুদ্ধার করিয়া, সেচ-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া জমির যোগান কতক পরিমাণে বাড়াইতে পারে। কিন্তু এইভাবে কৃষি-জমির কতকটা হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব হইলেও আমরা জলবায়ু, আলোবাতাস, বৃষ্টিপাত, অবস্থান প্রভৃতির পরিবর্তন করিতে পারি না। সুতরাং সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে, অন্যান্য উপাদানের তুলনায় জমির সরবরাহ অপেক্ষাকৃত নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনশীল।

জমির বৈশিষ্ট্য:
১। ইহার যোগান অপরিবর্তনশীল

(২) **জমির উৎপাদন-ব্যয় নাই (Land has no cost of production):** জমি প্রকৃতির দান। কেহ ব্যয় করিয়া প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে নাই। বলিতে পারা যায়, উহা মানুষের কাজে নিয়োজিত হইবার জন্যই পড়িয়া আছে। শ্রম কিংবা মূলধনের বেলায় এ-কথা খাটে না। লালনপালন, শিক্ষাদীক্ষার মধ্য দিয়া শ্রমিক কর্মক্ষম হইয়া উঠে; বিনা আয়াসে শ্রমিক তৈয়ারি হয় না। মূলধনও সম্পদের সঞ্চয় হইতে আসে; অতএব উহার জন্যও মানুষকে পরিশ্রম করিতে ও বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে হয়। কিন্তু জমির প্রকৃতিদত্ত উর্বরতা, জলবায়ু, অবস্থান প্রভৃতির পিছনে মানুষের কোন ব্যয় বা শ্রম নাই।

২। ইহার উৎপাদন-ব্যয় নাই

(৩) **জমি বিভিন্ন জাতীয় (Land is heterogeneous):** উর্বরতার দিক হইতে বিভিন্ন জমির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কোন জমি হয়ত অতি উর্বর আবার কোন জমির উর্বরাশক্তি অতি সামান্যই। কোন কোন জমির অবস্থান ব্যবসাবাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক, আবার কোন জমি হয়ত ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত। ইহা ব্যতীত, কতকগুলি জমি আছে যাহাতে

৩। জমি একই প্রকারের হয় না

উৎপাদনকার্য সকল সময়েই লাভজনক হয়, কারণ উহাতে উৎপাদন খুব বেশী হয়; অপরদিকে কতকগুলি জমি আছে যাহাতে উৎপাদন কোন সময়েই লাভজনক হয় না। সুতরাং আমরা উৎপাদনক্ষমতা অনুসারে জমিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। অবশ্য মূলধন ও শ্রমিকের বেলায়ও জমির এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। জমির মত শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির উৎপাদন-ক্ষমতাতেও তারতম্য দেখা যায়।

(৪) জমি স্থানান্তর করা যায় না (Land is immovable): যতই উপযোগী হউক না কেন অথবা যতই উর্বর হউক না কেন জমিকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান করা যায় না। এইজন্যই কলিকাতার ন্যায় সহরে জমির দাম এত বেশী এবং পল্লীগ্রামে জমির দাম এত কম।

৪। জমি স্থানান্তরযোগ্য নহে

(৫) জমি হইতে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের নিয়মাধীন (Production from Land is subject to the Law of Diminishing Returns): পরিশেষে, বলা হয় যে জমির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করে। ইহার অর্থ হইল, একই জমিতে অধিক-মাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা করিলে উৎপাদনের হার ক্রমশ কমিতে থাকে। প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করিতেন যে এই নিয়ম কৃষির ক্ষেত্রেই অধিক প্রযোজ্য। কিন্তু দেখা যায়, এই নিয়ম অর্থবিদ্যার অন্যতম সাধারণ নিয়ম এবং অবস্থা বিশেষে ইহা শিল্পের ক্ষেত্রেও কার্যকর। সুতরাং এই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

৫। জমি হইতে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে হয়

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (The Law of Diminishing Productivity or Returns): ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি উদ্ভূত হয় কৃষকের অভিজ্ঞতার ফলে। অভিজ্ঞতা হইতে কৃষক দেখিয়াছে যে একই জমিতে অধিকমাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া চলিলে ফসলের উৎপাদন সমপরিমাণে বৃদ্ধি না পাইয়া ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াই সমহারে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমাদের দেশে খাদ্যাভাবের সমস্যাই থাকিত না—এক বিঘা জমিতে শত শত কৃষক নিযুক্ত করিয়াই দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যাইত। ওয়েষ্ট ও রিকার্ডোর ন্যায় প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ কৃষকের এই অভিজ্ঞতাকেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি নাম দিয়া অর্থবিদ্যার সূত্রে পরিণত করেন। কৃষির ক্ষেত্রে

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির মূল বক্তব্য

বিধিটির সংজ্ঞা

উপরি-উক্ত সূত্রকে মার্শাল (Marshall) এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন : "জমিতে কৃষিকার্যের জন্য শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বৃদ্ধি করা হইলে 'সাধারণত' উৎপাদনবৃদ্ধির পরিমাণ সমানুপাত অপেক্ষা কম হইবে—অবশ্য ইতিমধ্যে যদি না কৃষির পদ্ধতিতে কোন উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।"

বিধিটির ব্যাখ্যা

উক্ত সংজ্ঞাটি সম্পর্কে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইহাতে জমির মোট উৎপন্নের কথা বলা হইতেছে না, অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধনের নিয়োগের ফলে যতটুকু অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হইতেছে, তাহার কথাই বলা হইতেছে। সুতরাং ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির অর্থ হইল —শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ কম হইবে। যেমন, যদি এক বিঘা জমিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনসহ ৩ জন শ্রমিক নিয়োগ করিলে ৯ কুইন্টাল (১ কুইন্টাল=১০০ কিলোগ্রাম) ধান্য, ৪ জন শ্রমিক নিয়োগে ১৩ কুইন্টাল ধান্য এবং ৫ জন শ্রমিক নিয়োগ করিলে ১৫ কুইন্টাল ধান্য পাওয়া যায় তাহা হইলে ৩ জনের স্থলে ৪ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে পূর্বের তুলনায় ৪ কুইন্টাল এবং ৪ জনের স্থলে ৫ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে পূর্বের তুলনায় ২ কুইন্টাল অতিরিক্ত ধান্য পাওয়া যাইতেছে। অতএব, অতিরিক্ত উৎপন্নের পরিমাণ পূর্বের অনুপাতে হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে।

অতিরিক্ত উৎপাদন হ্রাস পায়, মোট উৎপাদন নহে

অনেক সময় অবশ্য প্রথম প্রথম শ্রম ও মূলধনবৃদ্ধির তুলনায় উৎপন্ন ফসল-বৃদ্ধির হার সমানুপাতের অধিকও হইতে পারে—অর্থাৎ, ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন দেখা দিতে পারে। ইহার কারণ, কৃষক হয়ত প্রথমদিকে জমিতে কম মূলধন ও শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছে এবং উপযুক্তভাবে কৃষিকার্য পরিচালনা করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রথম প্রথম ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন দেখা দিলেও একসময় না একসময় ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর হইবেই। সাময়িকভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি যে কার্য নাও করিতে পারে, তাহা বুঝাইবার জন্যই মার্শাল উপরি-উক্ত সংজ্ঞায় 'সাধারণত' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। আর একটি কারণেও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্য সাময়িকভাবে স্থগিত থাকিতে পারে। মার্শালের উপরি-উক্ত সংজ্ঞায় পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে যে, কৃষিকার্যের পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর নাও হইতে পারে।

দুইটি কারণে প্রথম প্রথম অতিরিক্ত উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাইতে পারে

উন্নত ধরনের কৃষি-যন্ত্রপাতি, সার, বীজ, সেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রবর্তনের ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে পারে। কিন্তু নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইবার পর ক্রমাগত অধিক পরিমাণে শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করা হইতে থাকিলে আবার ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে সুরু করিবে।

কিন্তু একসময় না একসময় ইহা কার্যকর হইবেই

সুতরাং সাময়িকভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি স্থগিত রাখা সম্ভব হইলেও স্থায়ীভাবে উহাকে বন্ধ করিয়া রাখা যায় না।

উপরি-উক্ত ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ব্যাখ্যা নিম্নের ছকটির সাহায্যে করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, বিঘা প্রতি জমিতে নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিক নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন (বীজ সার লাঙল প্রভৃতি) লইয়া কাজ করে। তাহা হইলে এই জমিতে ক্রমাগত মূলধনসহ শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি করা হইলে অতিরিক্ত উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ নিম্নের ছকে বর্ণিত হারে হ্রাস পাইতে পারে :

উদাহরণ

বিঘা প্রতি শ্রমিকসংখ্যা (মূলধনসহ)	মোট উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ (কুইণ্টাল হিসাবে)	অতিরিক্ত উৎপাদন বা প্রান্তিক শ্রমিকের উৎপাদন
১	১	১
২	৪	৩
৩	৯	৫
৪	১৩	৪
৫	১৫	২
৬	১৬	১
৭	১৪	−২

ছকটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ১ জন শ্রমিকের স্থলে ২ জন এবং ২ জনের স্থলে ৩ জন নিয়োগ করা পর্যন্ত প্রান্তিক (marginal) বা অতিরিক্ত উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। একজন শ্রমিক বাড়াইলে মোট উৎপাদনের যতটা বৃদ্ধি পায় তাহাকে প্রান্তিক উৎপাদন বা অতিরিক্ত উৎপাদন বলা হয়। প্রদত্ত হিসাবে ১ জনের স্থলে ২ জন শ্রমিক নিযুক্ত করার ফলে মোট উৎপাদন ১ কুইণ্টাল হইতে বাড়িয়া ৪ কুইণ্টাল হয়। সুতরাং, অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপাদন হইল ৩ কুইণ্টাল ধান্য। আবার শ্রমিকসংখ্যা ২ জন হইতে ৩ জন করা হইলে মোট উৎপাদন ৪ কুইণ্টাল হইতে বাড়িয়া ৯ কুইণ্টাল হয়; অতএব অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপাদন হইল ৫ কুইণ্টাল। ইহার পর শ্রমিকসংখ্যা যত বাড়ানো হইয়াছে প্রান্তিক উৎপাদন তত হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে; এবং যখন শ্রমিকসংখ্যা ৭ জন তখন অতিরিক্ত উৎপাদন ত কিছুই হয় নাই, বরং পূর্বের তুলনায় মোট উৎপাদনের পরিমাণ ২ কুইণ্টাল কমিয়া গিয়াছে। যখন হইতে প্রান্তিক উৎপাদন কমিতে সুরু করে তখন হইতেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া ধরা হয়। উপরি-উক্ত উদাহরণে ৪ জন শ্রমিকের নিয়োগের স্তর হইতেই জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে সুরু করিয়াছে এবং ৩ জন শ্রমিকের নিয়োগের স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। মোট উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য করিলে

দেখা যায় যে ৬ জন শ্রমিক নিয়োগ পর্যন্ত উহা বাড়িয়াই চলিয়াছে ; কিন্তু ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ক্রমাগত কার্য করিতে থাকায় সপ্তম শ্রমিকের নিয়োগের ফলে মোট উৎপাদনও কমিয়া গিয়াছে। নিম্নের চিত্রটি হইতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা সহজেই ধরা পড়িবে :
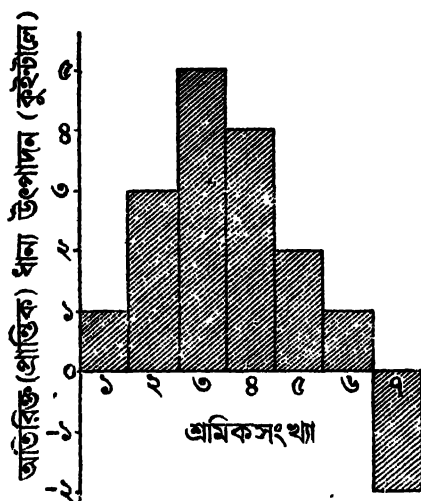
চিত্রটির প্রত্যেক স্তম্ভের দ্বারা বুঝানো হইয়াছে—একজন করিয়া শ্রমিক বাড়াইলে কত পরিমাণ অতিরিক্ত ধান্য পাওয়া যায়—অর্থাৎ, প্রত্যেকটি স্তম্ভ প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাপ করিতেছে। সকল স্তম্ভ এক-সংগে যোগ করিলে মোট উৎপাদনের হিসাব পাওয়া যায়। সর্বশেষ স্তম্ভটি নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে সপ্তম শ্রমিক নিয়োগের ফলে উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বাড়ে নাই, বরং কমিয়া গিয়াছে।

রেখাচিত্রের ব্যাখ্যা

এতক্ষণ আমরা একই জমিতে ক্রমাগত অধিকমাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগের কথা বলিয়াছি। ইহাকে বলা হয় গভীর বা আত্যন্তিক চাষ (intensive cultivation)। আত্যন্তিক চাষ ছাড়া ব্যাপক চাষের (extensive cultivation) ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর হয়। জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে কৃষিজ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উৎকৃষ্ট জমিতে আত্যন্তিক চাষের দ্বারাও যখন অভাব পূরণ করা যায় না, তখন নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর জমি চাষের অধীনে আনয়ন করিতে হয়। ইহাকে 'ব্যাপক চাষ' বলে। কিন্তু উৎকৃষ্ট জমিতে অধিকমাত্রায় শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হইতে

বিধিটি আত্যন্তিক ও ব্যাপক—উভয় প্রকার কৃষিকার্যের ক্ষেত্রেই কার্যকর

থাকিলে যেমন উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়, তেমনি যতই নিকৃষ্টতর জমিতে কৃষিকার্য প্রসারিত করা হয় ততই এই বিধি কার্যকর হইতে থাকে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? (Where does the Law of Diminishing Returns apply?): কৃষিকার্য ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি প্রযোজ্য। গৃহ-নির্মাণের বেলায় দেখা যায় যে, বাড়ীর তলার পর তলা নির্মাণ করিয়া চলিলে এমন একসময় আসে যখন উচ্চতর তলা নির্মাণের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং বসবাসের অসুবিধা হয়। তাহা না হইলে কলিকাতার মত সহরে বাড়ীগুলির তলা ক্রমাগত বৃদ্ধি করিয়া বাসগৃহের অভাব সহজেই মিটানো যাইত।

ইহা উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

খনির ক্ষেত্রেও এই বিধি প্রযোজ্য। খনি হইতে যত কয়লা তোলা হইবে খনি ততই গভীর হইবে। ফলে কয়লা তুলিবার ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। কারণ, খাদ গভীর হইলে কয়লা উত্তোলনের জন্য উন্নত ধরনের সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং প্রতি টন কয়লা উত্তোলনে শ্রমিকদের অধিক সময় লাগিবে। মাছের চাষের ক্ষেত্রে বলা হয় যে, পুকুর দিঘি জলা প্রভৃতিতে যত বেশী মাছ ছাড়া হয় অতিরিক্ত মাছের পরিমাণ তত কমিতে থাকে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে ক্রম-হ্রাসমান উৎপন্নের বিধির জন্য সাধারণত ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় (increasing cost of production) দেখা দেয়। যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে ক্রমাগত শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে ক্রমশ কম হারে উৎপাদন হইতে থাকে তাহা হইলে উৎপাদনের ব্যয় ক্রমশই বাড়িয়া চলে। ধরা যাউক, চাষের জন্য মজুরি ও মূলধন বাবদ শ্রমিকপিছু খরচ হইল ৪০ টাকা। আমাদের পূর্বের ছকটিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে চতুর্থ শ্রমিক নিয়োগের ফলে অতিরিক্ত ৪ কুইণ্টাল ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ৪ কুইণ্টাল ধান্যের উৎপাদন-ব্যয় হইল ৪০ টাকা। অর্থাৎ, প্রতি কুইণ্টাল অতিরিক্ত ধান্য উৎপাদন করিতে ১০ টাকা করিয়া খরচ পড়িয়াছে। পঞ্চম শ্রমিক নিয়োগের ফলে ২ কুইণ্টাল অতিরিক্ত ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে দেখা যায়। এই ২ কুইণ্টাল ধান্যের জন্য ব্যয় হইয়াছে ৪০ টাকা। অর্থাৎ, কুইণ্টাল প্রতি উৎপাদন-ব্যয় হইল ২০ টাকা। এইভাবে অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ বাড়িয়াই চলে।

ক্রমহ্রাসমান বিধির ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় দেখা যায়

প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করিতেন যে কৃষি, খনি, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি যে-সকল ক্ষেত্রে প্রকৃতির দান বা জমির প্রাধান্য রহিয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বিশেষ-ভাবে প্রযোজ্য; অপরপক্ষে শিল্পক্ষেত্রে যেখানে মূলধনের প্রাধান্য অধিক সেখানে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিয়া থাকে।

বিধিটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক ধারণা

কিন্তু আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ বলেন, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কৃষি ও শিল্পে ক্রমহ্রাসমান বা ক্রমবর্ধমান—উভয় নিয়মই কার্যকর হইতে পারে। ইঁহাদের মতে, ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি উৎপন্নের হ্রাসবৃদ্ধির সাধারণ নিয়মের একটি বিশেষ দিক। কৃষি হউক আর শিল্পই হউক প্রত্যেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্য জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন—উৎপাদনের এই চারিটি উপাদানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে-কোন রূপে এই উপাদানগুলির প্রয়োগ করিলেই কাম্যভাবে উৎপাদনকার্য সম্পাদিত হয় না। উপযুক্ত অনুপাতে শ্রম মূলধন জমি ও সংগঠন সংযুক্ত করা হইলে তবেই উৎপাদন সন্তোষজনক হয়।

উৎপাদনের উপাদান-সমূহের কাম্য অনুপাতই উৎপন্নের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ধারণ করে

বিভিন্ন উপাদানের সংযোগের উপযুক্ত অনুপাত কি হইবে তাহা পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে ঠিক করিয়া লইতে হয়। কখনও বা শ্রম বাড়াইয়া, কখনও বা মূলধন বাড়াইয়া আবার কখনও বা জমি বাড়াইয়া সংগঠক 'কাম্য অনুপাত' (optimum proportion) ঠিক করিয়া লন। যখন কোন একটি উপাদানের পরিমাণ কাম্য অনুপাতের তুলনায় কম থাকে তখন উক্ত উপাদান বৃদ্ধি করিয়া চলিলে যতক্ষণ-পর্যন্ত-না কাম্য অনুপাতে পৌছানো যাইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন হইতে থাকিবে। কিন্তু এই কাম্য অনুপাতে পৌছিবার পরও যদি ঐ উপাদানটি অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অধিকমাত্রায় নিয়োগ করা হইতে থাকে তখন উৎপাদনবৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকিবে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো যাইতে পারে।

ধরা যাউক, কোন কারখানায় কাম্য উৎপাদনের জন্য ৪ কাঠা জমি, ৫০০ টাকার মূলধন, ২০ জন শ্রমিক ও একজন দক্ষ সংগঠকের প্রয়োজন হয়। এখন অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। এই অবস্থায় উৎপাদনবৃদ্ধির হ্রাস পাইবে—কারণ, অন্যান্য উপাদানের তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িবে।

শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে উৎপাদনের সকল উপাদানকে সমানভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। যেমন, কোন দ্রব্যের চাহিদা হঠাৎ বাড়িয়া গেলে অধিক উৎপাদনের জন্য সংগে সংগেই কারখানা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি মূলধন এবং সংগঠন বাড়ানো সম্ভব হয় না। তখন সীমাবদ্ধ যন্ত্রপাতি ও একই সংগঠনের সহিত অধিকমাত্রায় শ্রম জুড়িয়া দিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হয়। ফলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে সুরু করে এবং উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

কৃষির ক্ষেত্রেও শ্রম মূলধন জমি ও সংগঠনের যে-কোনটিকে অন্যান্যগুলির অনুপাতে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হইলে উৎপাদনবৃদ্ধির হার ক্রমশ কম হইবে। যেমন, শ্রম মূলধন ও সংগঠনের তুলনায় জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইলে উৎপাদনবৃদ্ধির হার ক্রমশ কমিতে থাকিবে। তবে অধিকাংশ দেশেই জমির যোগান অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অপ্রচুর। অতএব, খাদ্য ও অন্যান্য শস্যের

উৎপাদন বাড়াইবার জন্য যখন সীমাবদ্ধ জমিতে অধিকমাত্রায় শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হইতে থাকে তখন উৎপন্ন ফসলের বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কৃষি শিল্প ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে পারে এবং ইহা অর্থবিদ্যার একটি সাধারণ সূত্র।

উপসংহার: ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য

সাধারণ সূত্র হিসাবে আমরা ইহার সংজ্ঞা এইভাবে দিতে পারি: উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া কোন একটি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে একটা সময়ের পর হইতে অতিরিক্ত উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া চলিবে। অর্থাৎ, প্রান্তিক উৎপাদন (marginal product) ক্রমশ কমিতে থাকিবে।

সংক্ষিপ্তসার

অর্থবিদ্যায় মানুষের নিয়ন্ত্রণে আসিতে পারে এরূপ সকল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে সংক্ষেপে 'জমি' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

জমির বৈশিষ্ট্য: জমি বা প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য উৎপাদনের অন্যতম উপাদান। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান হইতে ইহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়: ১। জমির যোগান অপরিবর্তনশীল, ২। জমির উৎপাদন-ব্যয় নাই, ৩। জমি বিভিন্ন জাতীয়, ৪। জমি স্থানান্তরিত করা যায় না, ৫। জমি হইতে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির অধীন।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি: দেখা যায় যে একই জমিতে ক্রমাগত শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করিয়া গেলে অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাকেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বলা হয়। দুইটি কারণে অবশ্য প্রথম প্রথম অতিরিক্ত উৎপাদনের হার বৃদ্ধিও পাইতে পারে—যথা, (ক) যদি পূর্বে ঠিকমত কৃষিকার্য পরিচালনা করা না হইয়া থাকে, এবং (খ) যদি কৃষিকার্যে উন্নত ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়া থাকে। তবে বলা যায় যে একসময়-না-একসময় বিধিটি কার্যকর হইবেই।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি গৃহনির্মাণ, খনিজ শিল্প, মাছের চাষ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সাধারণত ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ফলে ক্রমবর্ধমান ব্যয় দেখা যায়। প্রাচীন লেখকগণ মনে করিতেন যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ প্রযোজ্য নহে। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, ইহা কৃষি ও শিল্প উভয় ব্যাপারেই কার্যকর হইতে পারে। ইঁহারা বলেন, উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে কাম্য অনুপাতই উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ধারণ করে। যতক্ষণ না কাম্য অনুপাতে পৌঁছানো যায় ততক্ষণ কোন উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে ক্রমবর্ধমান হারেই উৎপাদন দেখা দিবে। কিন্তু কাম্য অনুপাতে পৌঁছানোর পরও যদি ঐ উপাদানের পরিমাণ বাড়ানো হয় তবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে সুরু করিবে।

সুতরাং ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি অর্থবিদ্যার একটি সাধারণ সূত্র। ইহা সকল প্রকার উৎপাদনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by Land in Economics ? In what respects does it differ from other factors of production ?

অর্থবিদ্যায় জমি বলিতে কি বুঝায়? কোন্ কোন্ দিক দিয়া জমি উৎপাদনের অপর উপাদানসমূহ হইতে পৃথক? [৪৪, ৪৭-৪৮ এবং ৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা]

2. Explain with illustration the Law of Diminishing Returns. Does the Law apply to (a) mines, (b) fisheries and (c) manufacture ? (C. U. 1951, '57)

উদাহরণসহ ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ব্যাখ্যা কর। বিধিটি কি (ক) খনিজ শিল্প, (খ) মাছের চাষ এবং (গ) যন্ত্রচালিত শিল্পের ক্ষেত্রে কার্যকর? [৪৯-৫৩ এবং ৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা]

3. Write a note on the Law of Diminishing Returns. (Ec. 1964)

[৪৯-৫০ পৃষ্ঠা এবং উপরের সংক্ষিপ্তসার দেখ।]

ষষ্ঠ অধ্যায়

জনসংখ্যা ও শ্রম

(Population and Labour)

মাত্র প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য থাকিলেই চলে না; প্রকৃতির দানকে সম্পদে রূপান্তরিত করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য প্রয়োজন হয় মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা বা শ্রমের। এই শ্রমের পরিমাণ ও দক্ষতাই হইল দেশের অগ্রগতির অন্যতম সর্ত। দেশের শ্রমিকসংখ্যা প্রধানত নির্ভর করে মোট জনসংখ্যার উপর। মোট জনসংখ্যা অধিক হইলে শ্রমিক-সংখ্যাও সাধারণত অধিক হইবে; জনসংখ্যা বাড়িতে কিংবা কমিতে থাকিলে শ্রমিকসংখ্যাও বাড়িবার কিংবা কমিবার দিকে ঝোঁক দেখা দিবে।

জনসংখ্যার গুরুত্ব

জনসংখ্যাতত্ত্ব (Theories of Population): দেশের পক্ষে জন-সংখ্যার গুরুত্ব অনুভব করিয়া বহুদিন হইতেই পণ্ডিতদের মধ্যে ইহা লইয়া আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। দেড়শত বৎসরের উপর হইল টমাস রবার্ট ম্যালথাস (Malthus) নামক একজন ইংরাজ ধর্মযাজক 'জনসংখ্যা নীতির উপর রচনা' নামক পুস্তকে জনসংখ্যা সম্পর্কে এক তত্ত্ব প্রচার করেন। সংক্ষেপে ম্যালথাসের বক্তব্য হইল এইরূপ: প্রত্যেক দেশেই জনসংখ্যা এরূপ দ্রুতগতিতে বাড়ে যে ২৫-৩০ বৎসরের মধ্যেই উহা দ্বিগুণ হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে (geometric progression)—অর্থাৎ, ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, .. এই হারে বাড়িতে থাকে। অপরদিকে দেশের খাদ্যের উৎপাদন এতটা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় না। উহা বৃদ্ধি পায় পাটীগাণিতিক প্রগতিতে (arithmetical progression)—যথা, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি

জনসংখ্যা সম্বন্ধে ম্যালথাসের তত্ত্ব

খাদ্য ও জনসংখ্যা - ম্যালথাসের তত্ত্ব
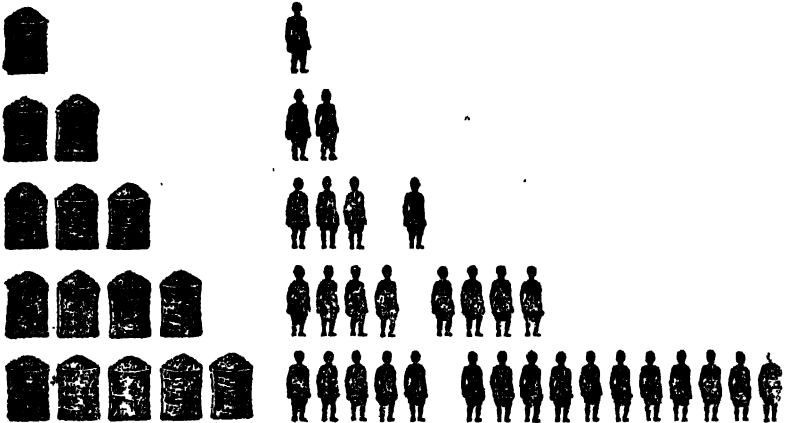
হারে। মন্থরগতিতে খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি পাইবার হেতু হইল কৃষিকার্যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা। সুতরাং দেখা যায় যে খাদ্যের উৎপাদনবৃদ্ধি জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত তাল রাখিতে পারে না। ফলে জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য-সরবরাহ কম হইয়া পড়ে।

জনসংখ্যার পক্ষে খাদ্য কম হইয়া পড়িলে তাহাকে জনাধিক্যের অবস্থা (overpopulation) বলা হয়। খাদ্যাভাবের জন্য তখন দুর্ভিক্ষ, মহামারী, শিশুমৃত্যু, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি দেখা দেয় এবং জনসংখ্যার একাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়; মৃত্যুর ফলে অতিরিক্ত জনসংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় এখন আবার খাদ্যের যোগান জনসংখ্যার কাছে পর্যাপ্ত হয়। কিন্তু এখানেই সমস্যার সমাধান হয় না। জনসংখ্যা আবার খাদ্যোৎপাদনের তুলনায় অধিকমাত্রায় বাড়িয়া চলিতে থাকে এবং আবার রোগ, অনাহার, মহামারী প্রভৃতি আসিয়া জনসংখ্যা কমাইয়া উহাকে খাদ্য-সরবরাহের সমান করিয়া দেয়। মহামারী, অনাহার, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায় (positive checks) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণের হাত হইতে রেহাই পাইতে হইলে—অর্থাৎ, মহামারী, অনাহার, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দুঃখদুর্দশা এড়াইতে হইলে—মানুষকে স্বেচ্ছায় বেশী বয়সে বিবাহ করিয়া, অবস্থা ভাল না হইলে বিবাহ একেবারে না করিয়া সন্তানসন্ততির সংখ্যা কম রাখিতে হইবে। এই সকল স্বেচ্ছামূলক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকে প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণ (preventive checks) বলা হয়। প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে মহামারী, অনাহার প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণকে রোধ করা সম্ভব। অন্যথায় প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ নির্মমভাবে কার্য করিতে থাকিবে।

জনাধিক্যের অবস্থা

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

ম্যালথাসের তত্ত্বকে একটি চক্রাকার রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝানো যাইতে পারে। এইরূপ চক্র ম্যালথুসীয় চক্র (Malthusian Cycle) নামে অভিহিত:

চক্রটি হইতে দেখা যাইতেছে, খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা হইতে সুরু করা হইলেও শীঘ্রই জনাধিক্য ঘটে। তখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহ কার্য করিতে থাকে। উহার দ্বারা বর্ধিত জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া আবার খাদ্য ও

জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য আসে। কিছুদিন পরেই কিন্তু আবার জনাধিক্য দেখা দেয়।

নানাভাবে ম্যালথাসের এই মতবাদের সমালোচনা করা হইয়াছে। ম্যালথাস তাঁহার মতবাদ প্রচার করিবার পর দেখা যায় যে ব্রিটেন ও অন্যান্য উন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জীবনযাত্রার মান উন্নতিলাভ করিয়াছে। শিল্প-বিপ্লব, উন্নত ধরনের যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতি, যানবাহনের উন্নতি ও নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের ফলেই এই উন্নতি সাধিত হয়। অতএব বলা হয়, ম্যালথাস জনসংখ্যা সম্পর্কে যে হতাশাব্যঞ্জক অভিমত করিয়াছেন তাহা ভিত্তিহীন ও অতিরঞ্জিত।

ম্যালথাসের মতবাদের সমালোচনা

ম্যালথাসের মতবাদের নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

(১) জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের ফলে কৃষিকার্যের কলাকৌশলে সুদূরপ্রসারী উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই সকল কলাকৌশল প্রয়োগের সাহায্যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিকে স্থগিত রাখিয়া খাদ্যোৎপাদন বহুগুণে বর্ধিত করা সম্ভব। অতএব, খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির সম্ভাবনা কম।

ম্যালথাস বৈজ্ঞানিক উন্নতির সম্ভাবনার বিচার করেন নাই

(২) ম্যালথাস মাত্র খাদ্য-সরবরাহের সহিত তুলনা করিয়া জনসংখ্যার সমস্যাকে বিচার করিয়াছেন। কিন্তু লোকের জীবনযাত্রার মান শুধু খাদ্য-দ্রব্যের যোগানের উপরই নির্ভর করে না। ভোগের অন্যান্য দ্রব্য—যথা, শিল্পজাত দ্রব্য, সেবা প্রভৃতির সরবরাহের উপরও নির্ভর করে। ইহা ব্যতীত, সামগ্রিকভাবে দেশের জাতীয় আয় বা উৎপাদন অধিক হইলে অন্যান্য দেশে শিল্প-জাত দ্রব্য রপ্তানির বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্যাদি আমদানি করিয়া দেশের খাদ্যাভাব দূর করা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইংলণ্ডের কথা উল্লেখ করা যায়। ইংলণ্ড প্রধানত তাহার শিল্পজাত দ্রব্য অন্যান্য দেশে রপ্তানি করিয়াই দেশের লোকের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে। সুতরাং, মোট জাতীয় উৎপাদন ও উহার বণ্টনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জনসংখ্যার সমস্যার বিচার করিতে হইবে। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির তুলনায় জাতীয় উৎপাদন অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি করিয়া উহাকে উপযুক্তভাবে সকলের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে লোকের অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটিবে।

তিনি মাত্র খাদ্য-সরবরাহের সহিত জনসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনা করিয়াছেন

জনসংখ্যার সমস্যা প্রধানত জাতীয় আয়বৃদ্ধি ও বণ্টনের সমস্যা

(৩) মানুষের শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের ফলে জন্মের হার কমিতে থাকে। মানুষ তখন জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার জন্য বেশী বয়সে বিবাহ করিয়া সংসারকে ছোট রাখিতে চায়। আমাদের দেশে পূর্বে লোকে বাল্যাবস্থাতেই বিবাহ করিত। এখন শিক্ষিত যুবকগণ

সংসার প্রতিপালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ করিতে চাহে না। এই কারণে ইংলণ্ড ও অন্যান্য উন্নত পাশ্চাত্য দেশে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি অপেক্ষা জনসংখ্যাহ্রাসের আশংকা দেখা দিয়াছে। অতএব জনসংখ্যা সকল সময়েই জ্যামিতিক প্রগতিতে দ্রুত বাড়িয়া চলিবে—ম্যালথাসের এই মতবাদকে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না।

শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের সংগে সংগে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হারও কমিয়া যায়

ম্যালথাসের মতবাদের উপরি-উক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও এমন অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁহারা মনে করেন যে পৃথিবীর জনসংখ্যা যেভাবে বাড়িতেছে তাহাতে খাদ্যাভাব দেখা দিতে বাধ্য। এমনকি জাতি-সংঘের খাদ্য ও কৃষি-সংগঠন (FAO)* ঘোষণা করিয়াছে যে সমগ্র পৃথিবীতে মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় বর্তমানে কমিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, তর্ক-বিতর্কের ভিতর না যাইয়াও আমরা বলিতে পারি যে ভারতের ন্যায় অনেক স্বল্পোন্নত দেশেই জনাধিক্য রহিয়াছে এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য-যোগানের ব্যবস্থা অন্যতম প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ-সম্পর্কে একটু পরেই বিস্তৃততর আলোচনা করা হইতেছে।

তবুও বলা যায়, জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যোৎপাদন কম বৃদ্ধি পায়

জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় (Population and National Income) : আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ জনসংখ্যার সমস্যাকে জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয়ের পটভূমিকায় বিচার করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে, কোন দেশের যে-পরিমাণ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও মূলধনের সংগতি থাকে তাহা সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাইতে হইলে নির্দিষ্ট জনসংখ্যার প্রয়োজন হয়। এই জনসংখ্যাকে ঐ দেশের পক্ষে 'কাম্য জনসংখ্যা' (optimum population) বলিয়া অভিহিত করা যায়। কারণ, ইহার ফলে দেশের উৎপাদনের হার ও মাথাপিছু জাতীয় আয় (per capita national income) সর্বাধিক হয়।

বর্তমানে জাতীয় আয়ের পটভূমিকায় জনসংখ্যার বিচার করা হয়

জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম হইলে দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও মূলধন যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না বলিয়া মাথাপিছু জাতীয় আয় সর্বাধিক হয় না। অপরদিকে আবার জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার অধিক হইলে মাথাপিছু জাতীয় আয় কমিয়া যায়—কারণ, উৎপাদন যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহা অপেক্ষা অধিক হারে। একমাত্র জনসংখ্যা কাম্যাবস্থায় থাকিলেই দেশের উৎপাদন সর্বাধিক দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতে পারে এবং মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদনও সর্বাধিক হয়। বিষয়টিকে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে :

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

---

* পৌরবিজ্ঞানের সপ্তম অধ্যায় দেখ।

রেখাচিত্রটিতে দেখা যাইতেছে, জনসংখ্যা যে-পর্যন্ত-না ক থ পরিমাণ হয় সে-পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মাথা-পিছু উৎপাদন বাড়িয়াই চলে। অপরপক্ষে জন-সংখ্যা ক থ পরি-মাণের অধিক হইলে মাথাপিছু উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে। যখন জনসংখ্যা ক থ পরিমাণ হয় তখন মাথাপিছু উৎপাদন সর্বাধিক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং ক থ পরিমাণ জনসংখ্যাই হইল কাম্য জনসংখ্যা।
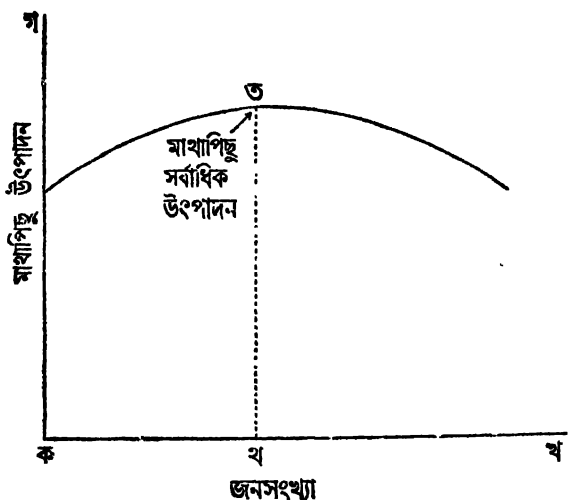
এই মতবাদ অনুসারে যখন কোন দেশের জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা কম থাকে তখন ঐ দেশটিকে জনবিরল (underpopulated) বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহার লক্ষণ হইল মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়া। যে-পর্যন্ত-না জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে ততক্ষণ মাথাপিছু আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে। জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যাকে ছাড়াইয়া গেলেই মাথাপিছু আয় কমিতে থাকিবে। তখন দেশে জনাধিক্য (over-populated) ঘটিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে।*

কাম্য জনসংখ্যার বিচারে জনাধিক্য ও জনবিরলতা

* একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে কাম্য জনসংখ্যার এই ধারণাকে বুঝানো যাইতে পারে। আমাদের পূর্বের উদাহরণে (৩২ পৃষ্ঠা) নবাবিষ্কৃত দ্বীপে মাত্র পাঁচজন লোক আছে, এবং উৎপাদন হইল ১০০ কুইণ্টাল ধান্য। এখানে ধরা যাউক যে, ঐ ৫ জনই শ্রমিক হিসাবে কাজ করে! সুতরাং মাথাপিছু উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় হইল ২০ কুইণ্টাল ধান্য। এখন লোকসংখ্যা বাড়িয়া যদি ৬ জন হয় এবং মোট উৎপাদন যদি ১১৪ কুইণ্টাল হয় তবে মাথাপিছু উৎপাদন বা মাথাপিছু আয় (১১৪÷৬=১৯ কুইণ্টাল) হ্রাস পাইতেছে। সুতরাং জনসংখ্যা কাম্য স্তরকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। অপরদিকে জনসংখ্যা ৫ হইতে কমিয়া যদি ৪-এ দাঁড়ায় তবে মোট উৎপাদন কমিয়া ৭৬ কুইণ্টালে পরিণত হইতে পারে। এ-ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক (২০ কুইণ্টাল) অপেক্ষা কম (৭৬÷৪=১৯ কুইণ্টাল) হইতেছে। মোট উৎপাদন ১০০ কুইণ্টাল হইতে ৭৬ কুইণ্টালে কমিবার কারণ হইল যে ৪ জন লোক ঐ দ্বীপের সমস্ত জমি ভালভাবে চাষ করিতে পারে না। ইহার জন্য ঠিক ৫ জন লোকই দরকার। সুতরাং ৫ জনই ঐ দ্বীপের কাম্য জনসংখ্যা। ইহাতেই মাথাপিছু আয় সর্বাধিক (আমাদের উদাহরণে ২০ কুইণ্টাল) হয়।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বেরও বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে ইহা একটি তত্ত্বগত ধারণা মাত্র, বাস্তবে ইহাকে প্রয়োগ করা কঠিন। কোন দেশের কাম্য জনসংখ্যা কি, তাহা হিসাব করিয়া বলা যায় না। ইহা ছাড়া উৎপাদন-পদ্ধতি, মূলধন প্রভৃতিও পরিবর্তনশীল। এই সকল বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে কাম্য জনসংখ্যাও পরিবর্তিত হয়। যেমন, দেশের মধ্যে যদি নূতন খনির সন্ধান পাওয়া যায় তবে পূর্বের কাম্য জনসংখ্যা আর কাম্য থাকে না। কারণ, এখন জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অল্প হইয়া পড়ে।

সমালোচনা

তবে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব শিখাইয়াছে যে দেশের জনসংখ্যাকে সামগ্রিক উৎপাদনের সহিত তুলনা করিয়াই জনসংখ্যার সমস্যা বিচার করিতে হইবে। দেশের উৎপাদনের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ করিতে পারিলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও আশংকার কারণ থাকে না। উপরন্তু, দেশের উন্নতি হইতেছে কি না তাহা আমরা মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ হইতে কতকটা বুঝিতে পারি।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের উপযোগিতা

শ্রমের যোগান (Supply of Labour): আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, কোন দেশের শ্রমের যোগান তিনটি জিনিসের উপর নির্ভর করে—(১) জনসংখ্যা, (২) শ্রমিকের কার্যের সময়, এবং (৩) শ্রমিকের দক্ষতা।

শ্রমের যোগান কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

(১) জনসংখ্যা: জনসংখ্যা যত অধিক হইবে শ্রমের যোগানের সম্ভাবনাও তত অধিক হইবে। জনসংখ্যা কম বলিয়া অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় নূতন দেশে শ্রমিকসংখ্যাও অল্প। অপরদিকে ভারতের জনসংখ্যা অধিক বলিয়া শ্রমের যোগানও অধিক। জনসংখ্যার আয়তন দুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়—(ক) জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার, এবং (খ) স্থানান্তরগমন (migration)। স্থানান্তরগমন বলিতে বুঝায় এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমন। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই বিদেশীদের প্রবেশ ও বসবাস সম্পর্কে নানাপ্রকার বাধানিষেধ আরোপ করে; সুতরাং স্থানান্তরগমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে। অতএব বলা যায়, জনসংখ্যার আয়তন প্রধানত জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

১। জনসংখ্যার আয়তন

জনসংখ্যার আয়তন কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়

শ্রমের যোগান পরিমাপ করিবার সময় মোট জনসংখ্যাকে হিসাবের মধ্যে ধরিলে ভুল হইবে। জনসংখ্যার সমগ্রটাই উৎপাদনশীল কার্যে ব্যাপৃত থাকে না; একেবারে শিশু এবং অত্যধিক বৃদ্ধদের শ্রমিকশ্রেণীর বহির্ভূত বলিয়া ধরা হয়। আমাদের দেশে ১৫ বৎসর হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্কদের শ্রমকারী জনসংখ্যা বলিয়া ধরা হয়। বিগত দুই জনগণনার হিসাব অনুসারে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগের

জনসংখ্যার সকলেই শ্রমের যোগান দেয় না

কিছু বেশী লোক এই পর্যায়ে পড়িত। অবশ্য শ্রমের যোগান হিসাবের সময় যে-সকল স্ত্রীলোক গৃহে পরিবারের সেবাযত্ন প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের বাদ দেওয়া হয়।

(২) কার্যের সময়: শ্রমশীল লোক সপ্তাহে বা দৈনিক কত ঘণ্টা খাটে তাহার উপরও শ্রমের যোগান নির্ভর করে। যেমন, দুইটি দেশের শ্রমিকসংখ্যা যদি এক হয় কিন্তু যদি প্রথম দেশে সাপ্তাহিক ৪০ ঘণ্টা এবং দ্বিতীয় দেশে সাপ্তাহিক ৪৮ ঘণ্টা শ্রমের নিয়ম প্রবর্তিত থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় দেশের শ্রমের মোট যোগান প্রথম দেশ অপেক্ষা অধিক হইবে। বর্তমানে প্রায় সকল সভ্য দেশেই শ্রমের সময় ও ছুটির দিন আইন করিয়া স্থির করিয়া দেওয়া হয়। শ্রমের সময় অত্যধিক হইলে পরিশ্রান্ত শ্রমিকের কার্যের পরিমাণ কমিয়া যায়। আমাদের দেশে কারখানায় প্রাপ্ত-বয়স্ক শ্রমিকদের সপ্তাহে কার্য করিবার সময় ৪৮ ঘণ্টা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৪ বৎসর হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক শ্রমিকদের কারখানায় দৈনিক ৪½ ঘণ্টার বেশী খাটানো যায় না।

২। কার্যের সময়

(৩) শ্রমিকের দক্ষতা: শ্রমিকের দক্ষতা বলিতে বুঝায় শ্রমিকের উৎপাদন-শীলতা বা কাজ করিবার ক্ষমতা। যেমন বলা হয় যে ল্যাংকাশায়ারের কাপড়ের কলে নিযুক্ত একজন শ্রমিক ভারতের কলে নিযুক্ত ছয়জন শ্রমিকের সমান কাজ করিতে পারে। অর্থাৎ, ল্যাংকাশায়ারের শ্রমিকের দক্ষতা ভারতীয় শ্রমিকের ছয় গুণ। আবার বলা হয়, মার্কিন কয়লাখনি-শ্রমিক ভারতীয় কয়লাখনি-শ্রমিকের পাঁচ গুণ অধিক কয়লা উত্তোলন করিতে সমর্থ। অর্থাৎ, ঐ শ্রেণীর মার্কিন শ্রমিকের দক্ষতা ভারতীয় শ্রমিকের পাঁচ গুণ। তবে এইভাবে শ্রমিকের দক্ষতা বিচারের সময় দেখিতে হইবে যে যন্ত্রপাতি, পরিচালনা ইত্যাদি একই প্রকারের কি না। যাহা হউক, ইহা সত্য যে কোন বিশেষ দেশে শ্রমের যোগান শ্রমিকের দক্ষতার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। যেমন, দুইটি দেশের শ্রমিকসংখ্যা এক হইতে পারে কিন্তু প্রথম দেশটির তুলনায় দ্বিতীয় দেশটির শ্রমিকদের দক্ষতা যদি অপেক্ষাকৃত অধিক হয় তবে দ্বিতীয় দেশটির শ্রমের যোগান অধিক হইবে। কারণ, দক্ষতা অধিক হওয়ায় দ্বিতীয় দেশে উৎপাদন অধিক হইবে।

৩। শ্রমিকের দক্ষতা

শ্রমিকের দক্ষতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

শ্রমিকের দক্ষতা মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে:

(ক) জাতিগত বৈশিষ্ট্য (Racial Qualities): অনেক সময় বলা হয় যে দৈহিক শক্তি ও মানসিক উৎকর্ষ হইল সম্পূর্ণভাবে জাতিগত বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এক জাতির লোক অপর এক জাতির লোক হইতে স্বাভাবিক কারণেই অধিক দক্ষ হয়। কিন্তু এ-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইলে সকল জাতির লোকই দক্ষ হইয়া উঠিতে পারে।

জাতিগত বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব

(খ) জলবায়ু (Climate): শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতার উপর দেশের জলবায়ুরও বিশেষ প্রভাব থাকে। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া শ্রম করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল। অতিশয় গ্রীষ্মতাপ এবং স্যাঁৎ-সেঁতে আবহাওয়া সহজেই শ্রমিকদের মধ্যে ক্লান্তি ও অবসাদের ভাব আনিয়া দেয়। এ-দিক হইতে ভারতের জলবায়ু শ্রমদক্ষতাকে অনেকটা ব্যাহত করে। তবে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই অসুবিধা আর একেবারে দুরপনেয় নয়। যেমন, তাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সাহায্যে কলকারখানাগুলিতে গ্রীষ্মতাপের অসহনীয় অবস্থার অবসান করা যাইতে পারে।

জলবায়ুর প্রভাব দুরপনেয় নয়

(গ) আয় ও জীবনযাত্রার মান (Income and Standard of Living): শ্রমিকের দক্ষতার উপর তাহার আয়ের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। আয়ের পরিমাণ দ্বারা জীবনযাত্রার মান নির্ধারিত হয়। অন্নবস্ত্র, আশ্রয় এবং কিছুটা আমোদপ্রমোদের জন্য আয় পর্যাপ্ত না হইলে মানুষের কর্ম-শক্তি ও উৎপাদনক্ষমতা পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না। ভারতের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকের আয় সুস্থ ও সবল জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তবে সম্প্রতি এ-বিষয়ের প্রতি কিছু দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে এবং সমাজসেবামূলক কার্যাদি (social services) প্রসারের জন্য সরকার অধিক ব্যয় করিতেছে।

ভারতে শ্রমিকের আয়

(ঘ) কার্যের সর্তাবলী (Working Conditions): যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ও সর্তাধীনে শ্রমিক কার্য করে তাহা দ্বারাও শ্রমিকের দক্ষতা প্রভাবান্বিত হয়। কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশ ভাল হইলে, কার্যের সময় অতিরিক্ত না হইলে, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক মধুর হইলে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়া যায়। এইজন্যই কলকারখানায় প্রচুর আলোবাতাস, পানীয় জল, স্নানাগার, স্বল্প দামে পুষ্টিকর খাদ্য-সরবরাহ, চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সংগে সংগে শ্রমের সময় যাহাতে অত্যধিক না হয়, শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে যাহাতে বিরোধ লাগিয়াই না থাকে তাহার দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। ভারতে এই সকল দিক হইতে অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা হইলেও অনেক কলকারখানাতেই এখনও আভ্যন্তরীণ পরিবেশ শ্রমদক্ষতার পক্ষে অনুকূল নহে।

কার্যের সর্তাবলী বলিতে কি বুঝায়

(ঙ) সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা (General and Technical Education): শিক্ষার উপর শ্রমিকের দক্ষতা অনেকখানি নির্ভর করে। সাধারণ শিক্ষার ফলে শ্রমিকদের বুদ্ধিমত্তা ও দৃষ্টিভংগি প্রসারিত হয়। এই সাধারণ শিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়াই অন্যান্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। কারিগরি দক্ষতা অর্জন করিতে হইলে

সাধারণ শিক্ষার গুরুত্ব

সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন। বস্তুত, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে শিল্প প্রসারের অপরিহার্য সর্ত হইল কারিগরি শিক্ষার প্রসার।

(চ) উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের উৎকর্ষ (Efficiency of Other Factors): উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান উৎকৃষ্ট ধরনের হইলেও শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কৃষির ক্ষেত্রে জমি যদি উর্বর হয় তবে মাথাপিছু উৎপাদন অধিক হইবে। অনুরূপভাবে, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল উৎকৃষ্ট ধরনের হইলে শ্রমিকের উৎপাদনও অধিক এবং উৎকৃষ্ট হইবে। এ-দিক হইতে ভারতীয় শ্রমিককে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পরিচালক বা কর্মকর্তার দক্ষতার উপরও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভরশীল। পরিচালকের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও উদার দৃষ্টিভংগি থাকিলে শ্রমিকের উৎপাদন অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। উন্নত দেশগুলিতে যে স্বল্প ব্যয়ে অধিক উৎপাদন হয় তাহার মূলে রহিয়াছে এই সুদক্ষ পরিচালনা। আমাদের দেশে শিল্প-পরিচালনার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত শ্রম-বিভাগের ফলেও শ্রমিকের দক্ষতা বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়।

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানও শ্রমিকের কর্মদক্ষতা নির্ধারণ করে

(ছ) পরিশেষে, শ্রমিকের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রেরণা যোগাইতে হইবে। ইহা করিতে হইলে কর্মক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্তসার

সম্পদ সৃষ্টি দ্বারা জাতীয় আয়বৃদ্ধি শ্রমিকসংখ্যার উপর নির্ভর করে, এবং শ্রমিকসংখ্যা নির্ভর করে জনসংখ্যার উপর। সুতরাং যে-কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবনের পর্যালোচনায় জনসংখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

জনসংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন তত্ত্ব: জনসংখ্যা সম্বন্ধে মোটামুটি দুইটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে—(ক) ম্যালথাসের তত্ত্ব, এবং (খ) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব।

ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুসারে যে-কোন দেশের জনসংখ্যা খাদ্যোৎপাদন অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে একদিন দেশে খাদ্য-সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প হইয়া পড়ে। তখন মহামারী, অনাহার, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ প্রভৃতি দেখা দেয় এবং বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইজন্য ম্যালথাসের মতে বেশী বয়সে বিবাহ করিয়া, অবস্থা ভাল না হইলে আদৌ বিবাহ না করিয়া, ইত্যাদি পন্থার দ্বারা দেশের জনসংখ্যাকে কম রাখিতে হইবে।

নানাদিক দিয়া ম্যালথাসের তত্ত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে—যথা, ১। তিনি বৈজ্ঞানিক উন্নতির সম্ভাবনার কথা বিচার করেন নাই; ২। তিনি মাত্র খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধির সহিত জনসংখ্যাবৃদ্ধির তুলনা করিয়াছেন; ৩। শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের সংগে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার যে কমিয়া আসে সে-ধারণা তাঁহার ছিল না; ইত্যাদি।

তবুও বলা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যোৎপাদন কম বৃদ্ধি পায়।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে মাথাপিছু জাতীয় আয়বৃদ্ধির সহিত তুলনা করা হয়। ইহাতে, যদি দেখা যায় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতেছে তবে বুঝিতে হইবে দেশে

জনাধিক্য ঘটে নাই। মাথাপিছু আয় যখন কমিতে আরম্ভ করিবে তখন হইতেই জনাধিক্যের অবস্থা সুরু হইয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে।

শ্রমের যোগান : শ্রমের যোগান নির্ভর করে মোট জনসংখ্যার কর্মক্ষম ব্যক্তিগণের দক্ষতা ও কার্যের সময়ের উপর। শ্রমিকের দক্ষতা আবার (১) জাতিগত বৈশিষ্ট্য, (২) জলবায়ু, (৩) শ্রমিকের আয় ও জীবনযাত্রার মান, (৪) কার্যের সর্তাবলী, (৫) শিক্ষা, (৬) উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের উৎকর্ষ প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

প্রশ্নোত্তর

1. **What are, according to you, the signs of overpopulation in a country ?**

তোমার মতে, কোন দেশের জনাধিক্যের লক্ষণ কি কি ?

[ইংগিত : ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুসারে খাদ্যাভাবই জনাধিক্যের লক্ষণ। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে লক্ষণ হইল মাথাপিছু জাতীয় আয় কমিয়া যাওয়া।...৫৬-৫৮ এবং ৫৯-৬০ পৃষ্ঠা]

2. **Examine the connection between population and food supply.**

জনসংখ্যা ও খাদ্য যোগানের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। [৫৬-৫৯ পৃষ্ঠা]

3. **Analyse the factors that determine the supply of Labour in a country**

(C. U. 1948)

কোন দেশে যে যে বিষয় শ্রমের যোগান নির্ধারণ করিয়া থাকে তাহাদের ব্যাখ্যা কর। [৬১-৬৪ পৃষ্ঠা]

সপ্তম অধ্যায়

মূলধন

(Capital)

আমরা দেখিয়াছি যে অর্থবিদ্যায় উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামকেই মূলধন বলা হয়। ইহাও বলা হইয়াছে যে মূলধন অতীত শ্রমের ফল এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।* এইজন্য মূলধনকে 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' ('produced means of production') বলিয়াই বর্ণনা করা হয়। আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যায়—যে-সম্পদ সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত না হইয়া পুনরায় উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত হয় তাহাকেই মূলধন বলে—যেমন, যন্ত্রপাতি, গরু-লাঙল, বীজ-সার ইত্যাদি।

মূলধন—উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান

এখানে পুনরায় উল্লেখ করা যাইতে পারে যে একই দ্রব্য ব্যবহারের পার্থক্য অনুসারে মূলধন কিংবা ভোগ্যদ্রব্য হইতে পারে। যেমন, ডাক্তার যখন

---

* ৪৫ পৃষ্ঠা।

তাঁহার মোটরগাড়ী চড়িয়া রোগী দেখিবার জন্ত বাহির হন তখন উহা মূলধন; কিন্তু তিনি যখন ঐ গাড়ীতে করিয়া বেড়াইতে বাহির হন তখন উহা ভোগ্যদ্রব্য। কয়লা যখন কারখানায় ব্যবহৃত হয় তখন উহা মূলধন; কিন্তু বাড়ীতে রান্নার জন্ত যখন কয়লা ব্যবহার করা হয় তখন উহা ভোগ্যদ্রব্য।* মূলধন তিন প্রকারের হইতে পারে—(১) বাস্তব মূলধন, (২) আর্থিক মূলধন, এবং (৩) ঋণ মূলধন।

তবে ব্যবহারভেদে ভোগ্যদ্রব্যও মূলধন বলিয়া গণ্য হইতে পারে

তিন প্রকারের মূলধন

বাস্তব মূলধন (Concrete or Real Capital): কারখানার বাড়ী-ঘর, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, ব্যবসায়ীর মজুত মাল প্রভৃতি হইল বাস্তব মূলধন। ইহারা উৎপাদন বা ব্যবসায়ে নিবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহাদিগকে ব্যবসায়ীর মূলধনও (Trade Capital) বলা হয়।

সমাজের দিক হইতে উপরি-উক্ত দ্রব্যাদি ছাড়া রাস্তাঘাট, দোকানপাট, যানবাহন, বন্দর, পোতাশ্রয় প্রভৃতিকেও বাস্তব মূলধন বলিয়া গণ্য করা হয়, কারণ ইহারাও সমাজের উৎপাদনকার্যে সহায়তা করে।

আর্থিক মূলধন (Money Capital): টাকাকড়িকেই আর্থিক মূলধন বলা হয়। এই মূলধন ব্যক্তির দিক হইতে মূলধন মাত্র, সমাজের দিক হইতে নহে। টাকাকড়ি যদি সমাজের দিক হইতে মূলধন হইত তবে মাত্র নোট ছাপাইয়াই যে-কোন দেশ ধনী হইতে পারিত, উৎপাদনবৃদ্ধির কোন প্রয়োজনই হইত না। জিনিসপত্রের উৎপাদন না বাড়াইয়া শুধু টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়াইয়া গেলে মাত্র দামই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আর্থিক মূলধন বা টাকাকড়িকে প্রকৃত মূলধনে পরিণত করিতে হইবে। ইহা করিতে পারা যায় বলিয়াই ব্যবসায়ী টাকাকড়িকে মূলধন বলিয়া গণ্য করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যবসায়ীর ১০ হাজার টাকা থাকিলে সে ঐ টাকা দিয়া যে-কোন সময় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি কিনিতে পারে।

ঋণ মূলধন (Loan Capital): শেয়ার, বণ্ড, সরকারী ঋণপত্র (যেমন, সেভিংস সার্টিফিকেট) ইত্যাদিকে ব্যক্তির দিক হইতে মূলধন বলিয়া গণ্য করা যায়—কারণ, এগুলি হইতে তাহার আয় হয়। এগুলি বিক্রয় করিয়া সে প্রকৃত মূলধন-দ্রব্যাদিও ক্রয় করিতে পারে। সমাজের দিক হইতে এই সকল শেয়ার, বণ্ড প্রভৃতি কিন্তু মূলধন নহে—কারণ, এগুলি দ্বারা সমাজের কোন উৎপাদনকার্য চলে না।

সামাজিক ও ব্যক্তিগত মূলধনের মধ্যে পার্থক্য

অতএব, ব্যক্তির দিক হইতে যন্ত্রপাতি, টাকাকড়ি এবং সরকারী ঋণপত্র সকলই মূলধন বলিয়া গণ্য হইলেও, সমাজের দিক হইতে বাস্তব মূলধনই একমাত্র মূলধন।

---

* ১১ পৃষ্ঠা দেখ।

সম্পদ ও মূলধন (Wealth and Capital): এখন আমরা সামাজিক ও ব্যক্তিগত এই দুইটি দিক হইতে মূলধন ও সম্পদের মধ্যে পার্থক্য বিচার করিতে পারি। সমাজের দিক হইতে সকল মূলধনই সম্পদ, কিন্তু সকল সম্পদই মূলধন নয়। যখন কোন সম্পদ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন ঐ সম্পদ মূলধন নয়। যেমন, পূর্বের উদাহরণ অনুসারে বাড়ীতে রান্নার জন্য যখন কয়লা ব্যবহৃত হয়, তখন ঐ 'সম্পদ' ভোগ্যদ্রব্য, মূলধন নয়; কিন্তু কারখানায় যখন উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কয়লা ব্যবহার করা হয় তখন উহা মূলধন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোন সম্পদ মূলধন পর্যায়ে পড়িবে কি না তাহা নির্ভর করে কোন্ উদ্দেশ্যে ঐ সম্পদ ব্যবহৃত হইতেছে তাহার উপর। সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত হইলেও ঐ সম্পদকে মূলধন বলিয়া ধরা হয় না; পুনরায় অন্য দ্রব্যাদি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে তবেই ঐ সম্পদ মূলধন বলিয়া গণ্য হয়।

এখানে আরও বলা যাইতে পারে, ব্যক্তির দিক হইতে এরূপ সকল জিনিসই মূলধন যাহা দ্বারা কোন-না-কোন ভাবে তাহার আয় হয়। যেমন, টাকাকড়ি ধার দিয়া কোন ব্যক্তি আয় করিতে পারে। সুতরাং টাকাকড়ি তাহার নিকট সম্পদ এবং মূলধন উভয়ই; কিন্তু সমাজের দিক হইতে টাকাকড়ি সম্পদ কিংবা মূলধন কোনটাই নয়।*

মূলধন ও জমি (Capital and Land): মূলধন ও জমির মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না তাহার আলোচনাও করা যাইতে পারে। মূলধনের সহিত জমির অনেক সাদৃশ্য আছে। মূলধন যেমন সম্পদ জমিও তেমনি সম্পদ; মূলধন যেমন অন্য দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় জমিও তেমনি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু জমি ও মূলধনের মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, মানুষ নিজের পরিশ্রমের দ্বারা মূলধন সৃষ্টি করে। জমির বেলায় কিন্তু একথা খাটে না। জমি প্রকৃতির দান; মানুষের শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট নহে। ইহা ছাড়া জমির যোগানও অপরিবর্তনশীল। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না। অপরপক্ষে, মূলধনের পরিমাণ মানুষ নিজের চেষ্টায় বাড়াইয়া লইতে পারে। এই সকল পার্থক্যের জন্যই জমিকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু জমির মোট পরিমাণ বৃদ্ধি করা না গেলেও উহার উৎপাদিকাশক্তিকে সেচ-ব্যবস্থা, সার প্রয়োগ প্রভৃতির দ্বারা বাড়ানো যাইতে পারে। জমির এই বর্ধিত উৎপাদিকাশক্তিকে মূলধন এবং উহার আয়কে সুদ বা মূলধনের আয় হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে।

জমির সহিত মূলধনের পার্থক্য

জমিতে মূলধন নিবদ্ধ থাকিতে পারে

---

* ১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Capital) : দেখা গেল যে মূলধন—(ক) বাস্তব মূলধন, (খ) আর্থিক মূলধন, এবং (গ) ঋণ মূলধন এই তিন প্রকারের হইতে পারে। নিম্নলিখিত কয়েকভাবেও মূলধনের শ্রেণীবিভাগ করা হয় :

১। ব্যক্তিগত, সামগ্রিক এবং জাতীয় মূলধন

(১) ব্যক্তিগত, সামগ্রিক এবং জাতীয় মূলধন (Private, Collective and National Capital) : ব্যক্তিগত মালিকানায় যে-মূলধন থাকে এবং যাহা হইতে ব্যক্তি আয় ভোগ করে তাহাকে ব্যক্তিগত মূলধন বলে ; অপরদিকে সমাজের বা সাধারণের যে-মূলধন থাকে তাহাকে সামগ্রিক মূলধন বলা হয়। সমস্ত ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক মূলধন মিলিয়া হইল জাতীয় মূলধন।

২। স্থায়ী ও চলতি মূলধন

(২) স্থায়ী ও চলতি মূলধন (Fixed and Circulating Capital) : যে-মূলধন উৎপাদনকার্যে একবার ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হইয়া যায় না তাহাকে স্থায়ী মূলধন বলে—যেমন, কলকারখানার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। অপরদিকে কাঁচামাল জ্বালানি বীজ সার প্রভৃতির ন্যায় যে-মূলধনের কার্য একবার ব্যবহারেই শেষ হইয়া যায় তাহাকে চলতি মূলধন বলে। চলতি মূলধন পৌনঃপুনিক মূলধন (recurring capital) নামেও অভিহিত হয়, কারণ ইহা বারবার আবর্তন করিতে থাকে। যেমন, বীজ হইতে ধান্য উৎপাদন করা হইল ; এখন এই উৎপন্ন ধান্য হইতে কিছু অংশ আবার বীজ বা মূলধন হিসাবে রাখিয়া দিতে হইবে। উৎপাদন-কার্যে একবার মাত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া চলতি মূলধন একবারেই ফেরত পাওয়া যায় ; কিন্তু স্থায়ী মূলধন ফেরত পাওয়া যায় দীর্ঘকাল ধরিয়া। তাঁতী কাপড় বুনিবার জন্য যখন সুতা ক্রয় করে তখন সে আশা করে যে একবার কাপড় বিক্রীত হইলেই উহার দাম ফেরত পাইবে। কিন্তু যে-অর্থ ব্যয় করিয়া সে তাঁত বসায় তাহা ফেরত পাইবার আশা করে কাপড় কয়েকবার ধরিয়া উৎপন্ন ও বিক্রীত হইলে।

৩। নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ মূলধন

(৩) নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ মূলধন (Sunk or Specific and Floating or Non-Specific Capital) : নিবদ্ধ মূলধন হইল তাহাই যাহা বিশেষ এক-প্রকার উৎপাদনকার্যেই নিবদ্ধ থাকে—যাহাকে অন্য কোনপ্রকার উৎপাদন-কার্যে সহজে লাগানো যায় না। উদাহরণস্বরূপ, রেল-ইঞ্জিনের উল্লেখ করা যাইতে পারে ; ইহা মাত্র একপ্রকার উৎপাদনকার্যেই ব্যবহার্য। আবার ক্যামেরা দিয়া শুধু ছবি তোলাই যায়। কিন্তু কয়লা বা আর্থিক মূলধন বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনকার্যে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং ইহারা হইল অনিবদ্ধ মূলধনের উদাহরণ।

মূলধনের কার্যাবলী (Functions of Capital) : মূলধনের প্রাথমিক কার্য হইল শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করা। যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

মূলধন-দ্রব্যের সাহায্যে উৎপাদন করিলে শ্রমিক পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদির উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। দু'একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে। ধরা যাউক, ২০ মাইল দূরে ১০০ কুইণ্টাল দ্রব্য লইয়া যাইতে হইবে। একজন মোটরলরী-চালক লরী চালাইয়া ১ ঘণ্টার মধ্যে ঐ দ্রব্য লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। কিন্তু মোটরলরী ব্যবহার না করিয়া শুধু শ্রমিকের সাহায্যে এই কার্য করিতে গেলে বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হইবে এবং সময়ও অধিক লাগিবে। সুতরাং শ্রমের সহিত মূলধন—অর্থাৎ, মোটরলরী জুড়িয়া দেওয়ায় কাজ অতি দ্রুত ও স্বল্প পরিশ্রমে সম্পাদিত হইতেছে। আবার একজন লোক সেলাই-এর কলের দ্বারা যত সেলাই করিতে পারে খালি হাতে ততটা পারে না। সুতরাং দেশে মূলধন যত বৃদ্ধি পাইবে জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয়ও তত বাড়িয়া যাইবে। বর্তমানে ভারতে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও যে উৎপাদন কম তাহার অন্যতম কারণ হইল মূলধনের অপ্রাচুর্য।

কার্যাবলী:
১। শ্রমিকের দক্ষতা-বৃদ্ধি দ্বারা উৎপাদন-বৃদ্ধি করা

মোট উৎপাদন আর একটি কারণেও বৃদ্ধি পায়। ইহা হইল সূক্ষ্মতর শ্রমবিভাগ। শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন-পদ্ধতি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়। বিভিন্ন অংশের কাজের জন্য যতই যন্ত্রপাতি নিয়োগ করা হয় ততই উৎপাদনবৃদ্ধি এবং উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ, বাটার কারখানার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেখানে জুতা তৈয়ারির কাজ অনেকগুলি বিভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বিভাগের কাজের জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলে স্বল্প ব্যয়ে জুতার উৎপাদনও অধিক হয়। মূলধনের ব্যবহার যতই বাড়িতে থাকে, শ্রমবিভাগ বা বিশেষিকরণ (specialisation) ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হয়।

২। শ্রমবিভাগকে সূক্ষ্মতর করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা

মূলধন উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখিতে সাহায্য করে। কোন দ্রব্য উৎপাদিত হইয়া বাজারে বিক্রয় হইতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। ইতিমধ্যে শ্রমিকদের জীবনধারণের জন্য মজুরি না দেওয়া হইলে উৎপাদনকার্য অব্যাহতভাবে চলিতে পারে না। উৎপাদক উৎপাদনের সময় মূলধনের সাহায্যে শ্রমিকদের অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে এবং পরে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে উহা পূরণ করিয়া লয়।

৩। উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখা

পরিশেষে, উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহকেও মূলধনের অন্যতম কার্য বলিয়া নির্দেশ করা যায়। উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল এই মূলধনের সাহায্যেই ক্রয় করা হইয়া থাকে।

৪। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান সরবরাহ করা

মূলধনবৃদ্ধির উপায় (Factors governing Accumulation of Capital): আমরা দেখিয়াছি যে মূলধন প্রয়োগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি

পায়। যে-দেশে মূলধনের পরিমাণ অধিক সে-দেশের জাতীয় উৎপাদনও অধিক। আমাদের দেশ যে ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশের তুলনায় অনগ্রসর তাহার অন্যতম কারণ আমাদের মূলধনের সংগতি বিশেষ কম। কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, রাস্তাঘাট, সেচ-ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন-ব্যবস্থা, যানবাহন প্রভৃতি বাস্তব মূলধন গড়িয়া না তুলিতে পারিলে দেশের উৎপাদন বাড়িবে না। এই সকল বাস্তব মূলধন সৃজনকেই 'মূলধন-গঠন' (capital formation) বলা হয়।

মূলধন-গঠন কাহাকে বলে

এখন প্রশ্ন, মূলধন সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করিবার উপায় কি? প্রথমেই বলিতে হয় যে মূলধন সৃষ্টি নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর। মানুষ যখন ভবিষ্যতে অধিক ভোগের আশায় বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখে তখনই সঞ্চয় সম্ভব হয়। অতএব বলা যায়, কোন দেশ মূলধনবৃদ্ধি করিতে চাহিলে ঐ দেশের অধিবাসীদিগকে বর্তমান ভোগকে সংকুচিত করিতে হইবে। বিষয়টিকে একটি সহজ দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন একটি দ্বীপে একদল লোক মৎস্য শিকার করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। ইহারা দেখিল যে বেশী নৌকা তৈয়ারি করিতে না পারিলে অধিক পরিমাণে মাছ ধরা যাইতেছে না। সুতরাং ইহারা নৌকা তৈয়ারি করিবার সিদ্ধান্ত করিল। এখন তাহারা সকল সময় মৎস্য ধরিবার জন্য ব্যয় না করিয়া কিছুটা সময় নৌকা তৈয়ারিতে নিয়োগ করিল। অথবা একদল লোক নৌকা তৈয়ারি করিতে থাকিল, আর অপর দল মৎস্য শিকারে নিযুক্ত রহিল। নৌকা তৈয়ারি না হওয়া পর্যন্ত সকল লোক মৎস্য ধরার কার্যে সকল সময়ই নিযুক্ত থাকিতে পারিতেছে না; ফলে ঐ সময় অল্প মৎস্যের দ্বারা তাহাদের জীবিকানির্বাহ করিতে হইতেছে। কিন্তু যখন নৌকা তৈয়ারি হইয়া গেল তখন অনেক বেশী মৎস্য ধরা পড়িতে লাগিল; ফলে পূর্বের তুলনায় ভোগের পরিমাণ অধিক হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দ্বীপের লোক সাময়িকভাবে ভোগ কমাইয়াছিল বলিয়াই তাহারা মূলধন হিসাবে নৌকা তৈয়ারি করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মূলধনবৃদ্ধি নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর

সঞ্চয় বলিতে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকা বুঝায়

আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কোন কৃষক তাহার জমিতে উৎপন্ন সমস্ত শস্য খাইয়া ফেলিতে পারে অথবা সবটা না খাইয়া একাংশ জমাইয়া যন্ত্রপাতি, সার ইত্যাদি মূলধন ক্রয় করিবার জন্য ব্যয় করিতে পারে। দ্বিতীয় পন্থা যে গ্রহণ করিবে ভবিষ্যতে তাহার উৎপাদন অধিক হইবে।

সমগ্র দেশের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটিতে দেখা যায়। দেশের উৎপাদনের উপকরণের সমস্তটাই যদি বর্তমান ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে মূলধন-দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে না। বর্তমান

ভোগ হইতে কতকটা বিরত থাকিলেই উৎপাদনের উপকরণের একাংশকে মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করা যায়। বর্তমান সমাজে প্রায় সমস্ত কাজকারবারই টাকাকড়ি বা অর্থের মাধ্যমে চলে। কাজেই মূলধনবৃদ্ধির উপরি-উক্ত পদ্ধতিটি সহজে ধরা পড়ে না। তাহা না হইলেও মূলধন-গঠনের প্রণালী একই। লোকে যখন তাহাদের আয়ের একাংশ সঞ্চয় করে তখন তাহারা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় হইতে বিরত থাকে। ইহার ফলে উৎপাদনের যে-সকল উপাদান এই সকল ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করিত তাহাদের চাহিদা ও নিয়োগ কমিয়া যায়। অপরদিকে লোকে তাহাদের সঞ্চয় ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, সরকারী ঋণপত্র, ব্যবসায় প্রভৃতিতে বিনিয়োগ করে। ইহারা লোকের সঞ্চয় লইয়া মূলধন বাড়াইবার কাজে লাগায়। ফলে উৎপাদনের যে-সকল উপাদান পূর্বে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করিত তাহার একাংশ মূলধন-দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয়, এবং দেশের মূলধন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নিম্নলিখিত ছকটি হইতে বিষয়টি বুঝিতে পারা যাইবে:

ব্যক্তির মত দেশকেও সঞ্চয় দ্বারা মূলধনবৃদ্ধি করিতে হয়

সঞ্চয় বিনিয়োজিত হইয়া মূলধনবৃদ্ধি করে

মোট আয়
- ব্যয়ের পরিমাণ → ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন
- সঞ্চয়ের পরিমাণ → মূলধন-দ্রব্যের উৎপাদন (মূলধন-গঠন)
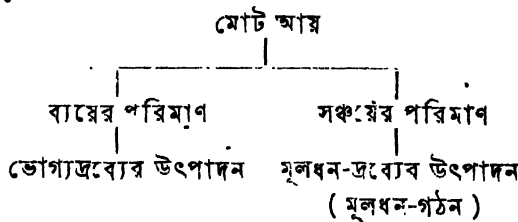
দেখা যাইতেছে, মূলধনবৃদ্ধি সঞ্চয় (savings) এবং ঐ সঞ্চয়ের বিনিয়োগের (investment) উপর নির্ভর করে।

সঞ্চয় নির্ধারক দুইটি বিষয়:
১। সঞ্চয়ের ইচ্ছা,
২। সঞ্চয়ের ক্ষমতা

সঞ্চয় আবার নির্ভর করে লোকের সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা (will to save) এবং সঞ্চয়ের ক্ষমতার (power to save) উপর।

(ক) সঞ্চয়ের ইচ্ছা (Will to Save): লোকে নানা কারণে বর্তমান ভোগ কমাইয়া সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হয়। ভবিষ্যৎ বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকা, পুত্রকন্যার শিক্ষা-দীক্ষা, বিবাহাদির ব্যয়নির্বাহ, নিজের হঠাৎ মৃত্যু হইলে পরিবারের ভরণপোষণ ইত্যাদির জন্য মানুষ দূরদৃষ্টিবশত সঞ্চয় করে। আবার বসতবাটি নির্মাণ, মোটরগাড়ী ক্রয় প্রভৃতি ভোগের ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্যেও মানুষ সঞ্চয় করিয়া থাকে। অর্থশালী হইয়া সমাজে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অথবা ব্যবসায়ে সফলতালাভের উদ্দেশ্যেও মানুষ সঞ্চয় করিতে মনোযোগী হয়। আবার কৃপণ ব্যক্তিরা স্বভাববশতই সঞ্চয় করিয়া চলে।

সঞ্চয়ের ইচ্ছা কি কি বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়:
১। ব্যক্তিগত দূরদৃষ্টি
২। সমাজে প্রতিপত্তি-লাভের ইচ্ছা

ব্যক্তি ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সঞ্চয়কার্য সম্পাদিত হয়। শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি নূতন যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ ইত্যাদির জন্য সঞ্চয় করিয়া থাকে। সঞ্চয়ের এই সকল প্রেরণা দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। দেশে শান্তিশৃংখলা বজায় এবং জীবন ও সম্পত্তির রক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে লোকে সঞ্চয় করিতে চাহে না। কারণ, ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চিত তখন সঞ্চয় করা নিরর্থক মনে হয়।

৩। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা

টাকাকড়ি বিনিয়োগ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকিলেও সাধারণের সঞ্চয়ের ইচ্ছা ব্যাহত হয়। এইজন্য দেশে ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, ডাকবিভাগের সেভিংস্ ব্যাংক প্রভৃতি যত গড়িয়া উঠে দেশের লোকের সঞ্চয়ও তত বাড়িয়া যায়।

৪। বিনিয়োগের সুব্যবস্থা
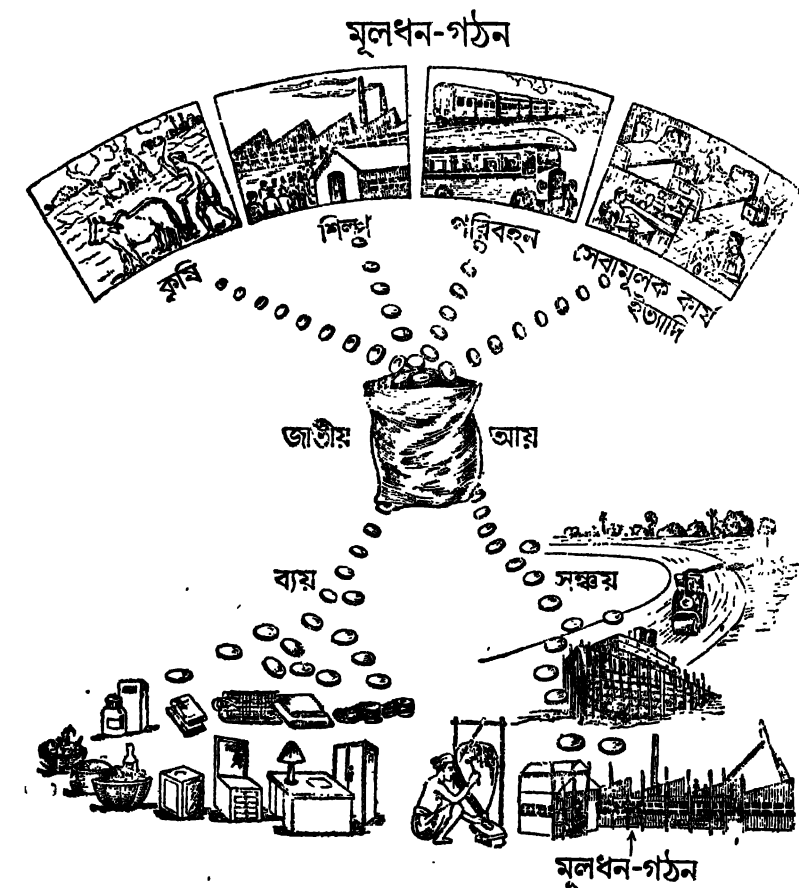
সঞ্চয় শিক্ষাবিস্তারের সহিত সম্পর্কিত। দেশে যতই শিক্ষার বিস্তার ঘটিবে লোকে ততই ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন হইবে; তাহাদের দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পাইবে; এবং ফলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে।

৫। শিক্ষাবিস্তার

পরিশেষে বলা হয় যে, সুদের হারের উপরও সঞ্চয় নির্ভর করে। সুদের হার অধিক হইলে লোকে অধিক আয়বৃদ্ধির আশায় অধিক সঞ্চয় করে।

৬। সুদের হার

(খ). সঞ্চয়ের ক্ষমতা (Power to Save): সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেই সঞ্চয় করা যায় না। সঞ্চয় করিবার জন্য লোকের আয়ের পরিমাণও যথেষ্ট হওয়া চাই। যে-দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় সামান্য এবং অন্নবস্ত্র ও আশ্রয় যোগানই কষ্টকর সেখানে লোকের সঞ্চয় করার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং আয় যত বাড়িবে লোকের সঞ্চয়ের ক্ষমতাও তত বাড়িবে।

সঞ্চয়ের ক্ষমতা আয় দ্বারা নির্ধারিত হয়
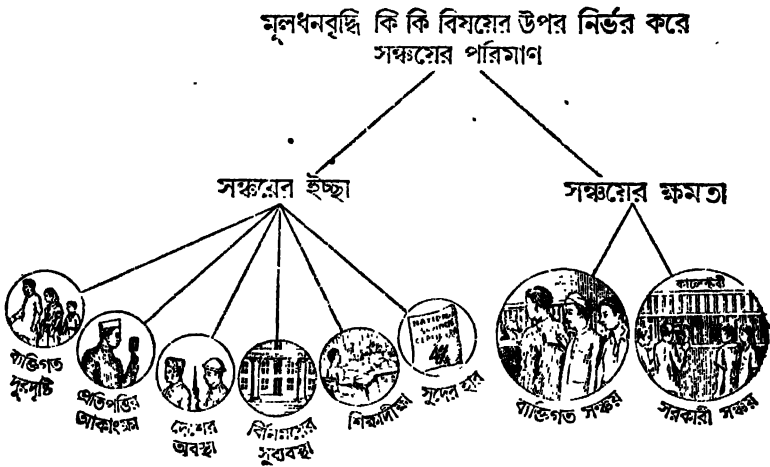
উপরি-উক্ত স্বেচ্ছামূলক ব্যক্তিগত সঞ্চয় (voluntary personal savings) ছাড়া বর্তমানে সরকারও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি করিয়া থাকে। যখন সরকারী রাজস্ব সাধারণ সরকারী ব্যয় হইতে অধিক হয়, তখন এই উদ্বৃত্তকে বাজেট-উদ্বৃত্ত (budget surplus) বলা হয়। ইহা আবশ্যিক সামাজিক সঞ্চয় (compulsory community savings) বলিয়াও অভিহিত হয়, কারণ সরকার সমাজকে এই সঞ্চয় করিতে বাধ্য করে। সরকার এই সঞ্চয়কে মূলধন-গঠনে নিয়োগ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত সরকার ঋণ করিয়া অথবা মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে মূলধন-গঠনে প্রবৃত্ত হইতে

সরকারী সঞ্চয়

পারে। এ-ক্ষেত্রেও সঞ্চয় আসে সমাজের নিকট হইতে। তবে ঋণের বেলায় সঞ্চয় হইল স্বেচ্ছামূলক; কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির বেলায় সঞ্চয় হইল অনিচ্ছামূলক (involuntary)। কারণ, মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায় এবং লোকের ভোগ হ্রাস পায়।

সংক্ষিপ্তসার

মূলধনকে 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই অর্থে জমি মূলধন নহে—কারণ, উহা উৎপাদিত উপাদান (produced means) নহে; ভোগ্যদ্রব্যও মূলধন নহে—কারণ, উহা উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হয় না। অবশ্য ব্যবহারভেদে ভোগ্যদ্রব্যও মূলধন বলিয়া গণ্য হইতে পারে—যেমন, কয়লা রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হইলে উহা ভোগ্যদ্রব্য কিন্তু কলকারখানায় ব্যবহৃত হইলে উহা মূলধন। এই কারণে মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলিয়া বর্ণনা করিতে অনেকে আপত্তি করেন। ইঁহাদের মতে, যাহা কিছু উপযোগ সৃষ্টি করে—অর্থাৎ, যাহা কিছু উৎপাদনশীল, সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে তাহাই মূলধন। এইরূপ মূলধনকে বাস্তব মূলধন বলা হয়। সমাজের দিক হইতে ঘরবাড়ী, যানবাহন, রাস্তাঘাট, কলকারখানা, পোতাশ্রয় প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর দিক হইতে বিচার করিলে তাহার কারখানাবাড়ী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদিকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

সমাজের দিক হইতে টাকাকড়ি মূলধন নহে; কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর দিক হইতে টাকাকড়ি মূলধন বলিয়া গণ্য। ইহাকে আর্থিক মূলধন বলা হয়।

আর্থিক মূলধন ছাড়াও ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ হইতে আর একপ্রকার মূলধনের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাকে ঋণ মূলধন বলে। বণ্ড, ঋণপত্র প্রভৃতি ইহাদের উদাহরণ।

সুতরাং, ব্যক্তিগত মূলধন তিন প্রকারের—(১) বাস্তব মূলধন, (২) আর্থিক মূলধন, এবং (৩) ঋণ মূলধন।

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ: অন্যান্যভাবেও মূলধনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এইরূপ অন্যতম শ্রেণীবিভাগ হইল (ক) ব্যক্তিগত, সামগ্রিক এবং জাতীয় মূলধনের মধ্যে। ব্যক্তি যে-মূলধনের মালিক তাহাকে ব্যক্তিগত মূলধন, সাধারণের মূলধনকে সামগ্রিক মূলধন এবং ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক মূলধনের সমষ্টিকে জাতীয় মূলধন বলা হয়।

(খ) মূলধন স্থায়ী ও চলতি—এই দুই প্রকারেরও হয়। যে মূলধন-দ্রব্য বার বার ব্যবহৃত হয় তাহাকে স্থায়ী মূলধন এবং যাহা একবার মাত্র ব্যবহৃত হয় তাহাকে চলতি মূলধন বলে।

(গ) নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ এইভাবেও মূলধনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যে-মূলধন একটিমাত্র কার্যে নিবদ্ধ থাকে তাহাকে নিবদ্ধ এবং যাহা বহুপ্রকার উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাহাকে অনিবদ্ধ মূলধন আখ্যা দেওয়া হয়।

মূলধনের কার্যাবলী: (১) মূলধন শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে; (২) ইহা শ্রমবিভাগকে সূক্ষ্মতর করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করে; (৩) ইহা উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখে; (৪) ইহা উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান সরবরাহ করে।

মূলধনবৃদ্ধির উপায়: মূলধনবৃদ্ধি সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে। সঞ্চয় হইতে মূলধন গঠিত হয়। সঞ্চয় বলিতে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকা বুঝায়। সঞ্চয়কে বিনিয়োগ করিয়া তবেই মূলধন সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং মূলধন-গঠন দুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়—(ক) সঞ্চয়, এবং (খ) বিনিয়োগ।

সঞ্চয় নির্ভর করে (ক) সঞ্চয়ের ইচ্ছা, এবং (খ) সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর। (ক) সঞ্চয়ের ইচ্ছা—১। ব্যক্তিগত দূরদৃষ্টি, ২। সমাজে প্রতিপত্তিলাভের ইচ্ছা, ৩। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা, ৪। বিনিয়োগের সুব্যবস্থা, ৫। শিক্ষা বিস্তার, এবং ৬। সুদের হার—এই কয়টি বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

(খ) সঞ্চয়ের ক্ষমতা আয় দ্বারা নির্ধারিত হয়।

ব্যক্তিগত সঞ্চয় ছাড়াও সরকারী সঞ্চয় আছে। সরকার নানাভাবে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া মূলধন-গঠন করিয়া থাকে।

প্রশ্নোত্তর

1. Define Capital and state the functions of Capital as a Factor of Production.

মূলধনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং উৎপাদনের উপাদান হিসাবে মূলধনের কার্যাবলী উল্লেখ কর।

[ইংগিত: মূলধন 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান'। ব্যক্তির দিক হইতে যাহা আয় সৃষ্টি করে তাহাই মূলধন ; সমাজের দিক হইতে যাহা উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হয় তাহাই মূলধন।...(৬৫-৬৬ এবং ৬৮-৬৯ পৃষ্ঠা)]

2. How would you define Capital? Distinguish between (*a*) Concrete or Real Capital, (*b*) Money Capital, and (*c*) Loan Capital.

কিভাবে মূলধনের সংজ্ঞা প্রদান করিবে? (ক) বাস্তব মূলধন, (খ) আর্থিক মূলধন, এবং (গ) ঋণ মূলধনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা]

3. Define Capital and explain the past played by Capital in production. (C. U. 1954 ; En. 1963)

মূলধনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং উৎপাদনকার্যে মূলধন কিভাবে সাহায্য করে তাহা ব্যাখ্যা কর।

[৬৫-৬৬ এবং ৬৮-৬৯ পৃষ্ঠা]

4. What is Capital? What are the factors upon which the accumulation of Capital depends? (P. U. 1961)

মূলধন কাহাকে বলে? কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর মূলধনবৃদ্ধি নির্ভর করে?

[ইংগিত: মূলধনবৃদ্ধি (ক) সঞ্চয়ের ইচ্ছা এবং (খ) সঞ্চয়ের ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত হয় বলিয়া যে যে বিষয় ইহাদের বৃদ্ধিসাধন করে তাহাই মূলধনবৃদ্ধির সহায়ক। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা, বিনিয়োগের সুব্যবস্থা, শিক্ষার প্রসার, জাতীয় আয় প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।...(৬৫-৬৬ এবং ৬৯-৭৪ পৃষ্ঠা)]

5. Distinguish between (*a*) Fixed and Circulating Capital, (*b*) Sunk and Floating Capital. (C. U. 1943, '54)

(ক) স্থায়ী ও চলতি মূলধন, (খ) নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ মূলধনের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [৬৮ পৃষ্ঠা]

অষ্টম অধ্যায়

ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ

(Forms of Business Organisation)

ব্যবসায় সংগঠন বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান: একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান, সমবায় এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগাধীন ব্যবসায়।

একমালিকী কারবার (Single-owner Firm): একজন মালিকের কারবারই ব্যবসায় সংগঠনের আদি রূপ এবং বর্তমানেও অধিকাংশ ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায় এই পর্যায়ভুক্ত। ইহাতে মালিক নিজের জায়গায় ব্যবসায় করে অথবা ব্যবসায়ের জন্য জায়গা ভাড়া লয়, শ্রমিক নিয়োগ করে, নিজেই মূলধন যোগান দেয় অথবা মূলধনের একাংশ

কিভাবে গঠিত হয়

ঋণ করিয়া সংগ্রহ করে এবং ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি নিজে বহন করে। এই কারণে লাভলোকসানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব মালিককে একাই বহন করিতে হয়।

সুবিধা

ব্যবসায়ের সকল দিকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও তত্ত্বাবধান এই প্রকার কারবারেই সম্ভব। কারবার সম্পূর্ণ নিজস্ব বলিয়া মালিক সর্বদা সতর্ক থাকে ; মাত্র রুটিন-মাফিক কার্য করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না।

কিন্তু একমালিকী কারবারের অনেক অসুবিধাও আছে। যাহার মূলধন যোগাইবার সামর্থ্য আছে তাহারই যে ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্যতা থাকিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। দ্বিতীয়ত, বর্তমান মালিকের হয়ত পরিচালনার যোগ্যতা আছে, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর নূতন মালিকেরও যে পরিচালনার যোগ্যতা থাকিবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। এই কারণে একমালিকী কারবার অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তৃতীয়ত, অধিক মূলধনের প্রয়োজন হইলে একজনের পক্ষে তাহা যোগান দেওয়া বা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এই কারণেই একমালিকী কারবার অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধির হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা স্থানীয় চাহিদাই মিটাইয়া থাকে।

অসুবিধা

অংশীদারী কারবার (Partnership Firm) : একাধিক ব্যক্তি লাভক্ষতির অংশীদার হইতে স্বীকৃত হইয়া ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে থাকিলে উহাকে অংশীদারী কারবার বলে। অবশ্য সকলকে যে সমান অংশীদার হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। অংশীদারদের মধ্যে কেহ হয়ত লাভের এক-চতুর্থাংশ পাইয়া থাকে, কেহ হয়ত অর্ধেক পাইয়া থাকে, ইত্যাদি। আমাদের দেশে ইহাদিগকে যথাক্রমে চার আনা অংশীদার, আট আনা অংশীদার প্রভৃতি বলিয়া এখনও অভিহিত করা হয়।

গঠন

অংশীদারী কারবারও ব্যবসায় সংগঠনের অতি পুরাতন রূপ এবং ইহা একজনের ব্যবসায়ের ত্রুটিগুলি হইতে বহু পরিমাণে মুক্ত। একজনের হয়ত মূলধন যোগাইবার সংগতি আছে, অপর একজনের ব্যবসায় পরিচালনার যোগ্যতা আছে। উভয়ে মিলিয়া কারবার করিলে উহা সফল হইবার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে পুরাতন মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠান নূতন অংশীদার গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, এক-মালিকী কারবার অপেক্ষা ইহা অধিক মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে, এবং ফলে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর পরিধির হইতে পারে। তৃতীয়ত, অডিটর, এটর্ণী প্রভৃতির ব্যবসায়ে অনেক সময় কিছু লোককে বাহিরে এবং কিছু লোককে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে কাজ করিতে হয় বলিয়া এইরূপ ব্যবসায় অংশীদারীর ভিত্তিতেই গঠিত হওয়া সুবিধাজনক।

সুবিধা—ইহা একজনের ব্যবসায়ের ত্রুটিগুলি হইতে মুক্ত

অংশীদারী কারবারেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, একজনের কুপরিচালনার ফল অপর সকলকে ভোগ করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, অংশীদারগণ মিলিয়া যে-মূলধন সরবরাহ করে তাহা অধিকাংশ সময়ই যথেষ্ট হয় না। এইজন্য যে-সকল ব্যবসায়ে বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় অংশীদারী কারবার তাহাদের অনুকূল নহে। তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ কারবার অসীম দায়ের (unlimited liability) ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। ইহার ফলে কারবার নষ্ট হইলে উহার যদি কোন দেনা থাকে তাহা একজনের নিকট হইতে আদায় করা যাইতে পারে। ইহা অতি বিপজ্জনক ব্যবস্থা। এইজন্য লোকে অনেক সময় অংশীদারী কারবারে যোগদান করিতে সাহসী হয় না। তাহাদের সর্বদা ভয় হয় যে কি-জানি কারবারের দেনার দায়ে কখন বাড়ীঘর ধরিয়া টান পড়িবে। নিষ্ক্রিয় অংশীদারগণের (sleeping partners)—অর্থাৎ, যাহারা মূলধন যোগান দিয়াই ক্ষান্ত থাকে তাহাদের পক্ষে এই ভয় সর্বাধিক। আজকাল অবশ্য অনেক সময় অংশীদারী কারবারের এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য ঘরোয়া যৌথ কোম্পানী (private limited company) গঠন করা হয়। ইহাতে অংশীদারগণের দায় নির্দিষ্ট থাকে। অর্থাৎ, যে যে-পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করে সে সেই পরিমাণ দায়ই বহন করে। চতুর্থত, অংশীদারদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মনোমালিন্যের ফলে কারবার মন্দের দিকে যাইতে পারে। পরিশেষে, মৃত্যু ইত্যাদি কারণে একজন অংশীদারের স্থান শূন্য হইলে তাহা সহসা পূরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ, মৃত অংশীদারের পুত্র তাহার পিতার মত যোগ্যতাসম্পন্ন নাও হইতে পারে।

ইহার কয়েকটি অসুবিধাও আছে

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান (Joint Stock Company): বর্তমানে ব্যবসায় সংগঠনের যে-রূপটি বিশেষ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে তাহা হইল যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান। ইহার মূলে আছে বৃহদায়তন ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য

বহুসংখ্যক ব্যক্তি মূলধন প্রদান করিয়া যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এই সকল মূলধন প্রদানকারীকে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার (shareholders) বলা হয়। অংশীদারগণ সকলেই কোম্পানীর মালিক। সুতরাং কোম্পানীর মুনাফা সকলেই ভোগ করে এবং ক্ষতি সকলেই বহন করে।

কিভাবে গঠিত হয়

অবশ্য সকল অংশীদারেরই লাভক্ষতির পরিমাণ সমান হয় না, কারণ প্রতিষ্ঠানে সকলের সমান অংশ থাকে না। প্রত্যেকে তাহার মালিকানার অনুপাতে মুনাফার অংশ পাইয়া থাকে এবং ঐ মালিকানার অনুপাতেই ক্ষতি বহন করে।

কাহার কতটা মালিকানা থাকিবে তাহা নির্ভর করে কে কি পরিমাণ মূলধন প্রদান করিয়াছে তাহার উপর। যাহাতে লোকে সাধ্যমত মূলধন প্রদান করিয়া ইচ্ছামত কোম্পানীর মালিক হইতে পারে, তাহার জন্য কোম্পানীর সমগ্র মূলধনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে (share) বিভক্ত করা হয়। যেমন, কোম্পানীর মোট মূলধন ১ লক্ষ টাকা হইলে ইহাকে ১০ হাজার অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এ-ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি অংশ বা 'শেয়ারে'র মূল্য হইবে ১০ টাকা। যাহার যত ইচ্ছা সে সেই পরিমাণ অংশই ক্রয় করিতে পারে। যে মোট অংশ বা 'শেয়ারে'র এক-শতাংশ ক্রয় করিল সে মোট বণ্টনযোগ্য লাভের একশত ভাগের এক ভাগ পাইবে।

পরিচালনার ভার থাকে পরিচালকমণ্ডলীর উপর

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের মালিক অসংখ্য বলিয়া সকলের পক্ষে উহা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। এইজন্য অংশীদারগণ মিলিয়া একটি পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors) গঠন করে। পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারিত হয় এবং উহারই তত্ত্বাবধানে দৈনন্দিন কার্য পরিচালিত হয়।

সসীম দায়ের নীতি এবং ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য

পূর্বে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণের দায় অসীম (unlimited) ছিল। ফলে কোম্পানীর সমগ্র দেনা একজনের নিকট হইতে আদায় করা হইত। যতদিন এই নীতি প্রচলিত ছিল ততদিন যৌথ মূলধনী ব্যবসায় বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই। কারণ, লোকে স্বাভাবিকভাবেই কোন প্রতিষ্ঠানের সামান্য অংশীদার হইয়া উহার সমগ্র দায় বহন করিতে চাহিত না। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সসীম দায়ের নীতি (principle of limited liability) প্রবর্তিত হইলে এই অসুবিধাটি দূর হয়। সসীম দায় বলিতে বুঝায় যে অংশীদারগণের দায় মাত্র তাহার অংশ বা শেয়ারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ, কোম্পানীর দেনার দায়ে অংশীদারকে তাহার ক্রীত শেয়ারের মূল্যের পরিমাণ অর্থই হারাইতে হইতে পারে; কোন ক্ষেত্রেই তাহার অধিক নহে। উদাহরণস্বরূপ, একজনের যদি একশত টাকার অংশ ক্রয় করা থাকে তবে কোম্পানী ফেল হইলে বড়জোর তাহার ঐ একশত টাকাই নষ্ট হইতে পারে; পাওনাদারগণ তাহার বাড়ীঘর ও অন্যান্য সম্পত্তি ধরিয়া টানাটানি করিতে পারে না।

সসীম দায় বলিতে কি বুঝায়

এইরূপ প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগ্রহের পন্থা: ১। শেয়ার বা অংশ বিক্রয়

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এ-ধারণা সহজেই করা যাইবে যে, অংশ বা শেয়ার বিক্রয়ই যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগ্রহের প্রধান পন্থা। ইহা ছাড়া এই সকল প্রতিষ্ঠান ডিবেঞ্চারও (debenture) বিক্রয় করে। ডিবেঞ্চার হইল এক রকমের তমসুক (bond) যাহার বিরুদ্ধে কোম্পানীর সম্পত্তি জামিন থাকে। অর্থাৎ, প্রয়োজন হইলে কোম্পানীর স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি

বেচিয়াও ডিবেঞ্চার-ক্রেতাগণের পাওনা শোধ করিতে হইবে। মুনাফার সহিত ডিবেঞ্চারের কোন সম্পর্ক নাই। মুনাফা হউক আর না-হউক ডিবেঞ্চারের উপর কোম্পানীকে নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করিতে হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, ডিবেঞ্চার-ক্রেতাগণ কোম্পানীর মালিক নয়, মহাজন মাত্র।

২। ডিবেঞ্চার বিক্রয়

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার তিন রকমের হইতে পারে—যথা, (১) সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার (preference shares), (২) সাধারণ শেয়ার (ordinary shares), এবং (৩) প্রতিষ্ঠাতৃগণের বিশেষ শেয়ার (founders' shares)।* সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার যাহারা ক্রয় করে কোম্পানীর লাভ হইলে তাহারা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাইয়া থাকে; লাভ না হইলে অবশ্য কিছুই পায় না। সর্বাগ্রগণ্য শেয়ারের দাবি ডিবেঞ্চারের পরই। প্রথমে ডিবেঞ্চারের উপর সুদ প্রদান করিতে হইবে। তারপর সর্বাগ্রগণ্য শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদান করিয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহাই সাধারণ অংশীদারদের (ordinary shareholders) মধ্যে প্রত্যেকের অংশ অনুসারে বন্টিত হইবে। কোম্পানী ফেল হইলেও অনুরূপ ব্যবস্থা। কোম্পানীর সম্পত্তি হইতে প্রথমেই ডিবেঞ্চারের দরুন পাওনা মিটাইতে হইবে। তারপর সর্বাগ্রগণ্য অংশের প্রাপ্য পূরণ হইয়া যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা সাধারণ অংশীদারগণ পাইবে। সর্বাগ্রগণ্য অংশ আবার সঞ্চয়মূলক (cumulative) হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন বৎসরে লভ্যাংশ প্রেরণ করিতে না পারিলে পর বৎসর যদি সম্ভব হয় তবে দুই বৎসরের দরুন একই সংগে লভ্যাংশ প্রদান করিতে হইবে।

বিভিন্ন রকমের অংশ

সাধারণ অংশের উপর লভ্যাংশ নির্দিষ্ট থাকে না। কোম্পানীর লাভ অনুসারে ইহার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাতৃগণের বিশেষ শেয়ার থাকিলে ইহার দাবি সকলের পরে। কোম্পানীর আয় হইতে প্রথমে ডিবেঞ্চারের সুদ ও সর্বাগ্রগণ্য শেয়ারের নির্দিষ্ট লভ্যাংশ মিটাইতে হইবে। তারপর সাধারণ শেয়ারের উপর লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে হইবে। ইহার পর যদি মুনাফায় কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহাই প্রতিষ্ঠাতৃগণের বিশেষ শেয়ারসমূহের মধ্যে বন্টিত হইবে।

সুবিধা-অসুবিধা ঃ যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের সপক্ষে প্রথমেই বলিতে হয় যে ইহা ব্যতীত শিল্পবাণিজ্য বর্তমানে উন্নত রূপ ধারণ করিতে পারিত না। শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির মূলে আছে বৃহদায়তন ব্যবসায়। যৌথ মূলধনী কারবারের ভিত্তিতেই বৃহদায়তনে ব্যবসায় গড়িয়া সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব করিয়াছে।

সুবিধা ঃ

* বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ যৌথ কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে 'প্রতিষ্ঠাতৃগণের বিশেষ শেয়ারে'র ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইতেছে।

কতকগুলি এরূপ ব্যবসাবাণিজ্য আছে যাহাতে প্রচুর মূলধন নিয়োগের প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, খনিজ তৈল উত্তোলন প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান না থাকিলে এগুলি রাষ্ট্রকেই পরিচালনা করিতে হইত। সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কতটা করিয়া উঠিতে পারিত সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উপরন্তু, ব্যাংক-ব্যবসায়, বীমা-ব্যবসায় প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠান যত বৃহদায়তন হয় উহার মর্যাদা এবং মুনাফাও তত বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রতিষ্ঠানও তত সফল হয়। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানই এই সকল ব্যবসায়ের আয়তনের প্রসার সম্ভব করিয়াছে। অপরদিকে আবার আয়তন প্রসারের জন্যই এই সকল প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তনে ব্যবসায়ের সকল সুযোগসুবিধা (advantages of large-scale production) ভোগ করিতে পারে।

১। ইহাতে প্রচুর মূলধন দ্বারা বৃহদায়তন ব্যবসায় সম্ভবপর হয়

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান লোকের বিনিয়োগ-অভ্যাস (investment habit) গড়িয়া তুলে। যাহাদের অর্থ আছে কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনা করিবার ইচ্ছা বা যোগ্যতা কোনটাই নাই তাহারা যৌথ মূলধনী কারবারের শেয়ার কিনিয়া ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করিতে পারে। সামান্য সঞ্চয়ও যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োগ করা যায়। দায় সীমাবদ্ধ (limited liability) বলিয়া এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে লোকের টাকা খাটাইতে আগ্রহ থাকে। কোম্পানী ফেল হইলে শুধু নিয়োজিত মূলধনটুকু নষ্ট হইতে পারে; অন্যান্য সম্পত্তি হারাইবার আশংকা নাই। ইহা ছাড়া শেয়ার বা অংশ হস্তান্তরযোগ্য। ইহার ফলে কোম্পানীর ক্ষতি না করিয়াও বিনিয়োগকারী (investor) টাকা ফেরত পাইতে পারে। শেয়ার-বাজার থাকার দরুন তাহাকে ক্রেতাও খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। একমালিকী বা অংশীদারী কারবারে কিন্তু ইহা সম্ভব হয় না। উহা হইতে টাকা উঠাইয়া লইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোম্পানী নষ্ট হয়। যাহাদের সঞ্চয় অধিক তাহাদের পক্ষেও যৌথ মূলধনী কারবার সুবিধাজনক। কারণ, ইহার ফলে তাহাদের একই ব্যবসায়ে সমগ্র সঞ্চয় বিনিয়োগ করিয়া সমগ্র ঝুঁকি একসংগে লইতে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিয়া তাহারা তাহাদের ঝুঁকিকে ছড়াইয়া দিতে পারে।

২। ইহা বিনিয়োগ অভ্যাস গড়িয়া তুলে

৩। দায় সীমাবদ্ধ বলিয়া সুবিধা

৪। শেয়ার বা অংশ হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া সুবিধা

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান বহুদিন বাঁচিয়া থাকে, একজন মালিকের ব্যবসায় বা অংশীদারী কারবারের মত একজনের মৃত্যু হইলেই প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যায় না। এই কারণে ইহা দূর ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করিতে পারে, ব্যবসায় সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিতে পারে। পরিচালনার ভার ব্যবসায় বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্পন্ন ক্ষুদ্র পরিচালকমণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত থাকে বলিয়া পরিচালনা ব্যাপারে উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়।

৫। স্থায়িত্ব আর একটি সুবিধা

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি বিশেষ অসুবিধা বা ত্রুটিও লক্ষ্য করা যায়। অংশীদারগণ সংখ্যায় অনেক বলিয়া কোম্পানীর কার্যপরিচালনার সহিত তাহাদের কোন যোগাযোগ দেখা যায় না। নিয়মিত লভ্যাংশ পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। ইহার ফলে কোম্পানীর ভাগ্যনিয়ন্তা পরিচালকগণ (directors) অংশীদারদের সন্তুষ্ট রাখিয়া নানা অসৎ উপায়ে নিজেদের স্বার্থসাধন করিবার সুযোগ পায়। আমাদের দেশে জমিদারী প্রথার আমলে নায়েবদের কুকীর্তির কথা যেমন সহরবাসী জমিদারগণের কর্ণে পৌঁছাইত না, তেমনি পরিচালকবৃন্দের অন্যায় ও অসদাচরণের কথাও অংশীদারেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জানিতে পারে না।

ত্রুটি:
১। অংশীদারদের সংগে পরিচালকমণ্ডলীর যোগাযোগের অভাব

অনেক সময় আবার পরিচালনার ভার বেতনভুক্ ম্যানেজারের হস্তে অর্পণ করা হয়। ইহার ফলে অংশীদারগণ ও পরিচালকগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও দূর হইয়া পড়ে। বেতনভুক্ ম্যানেজারের মধ্যে উদ্যোগ ও উৎসাহ বড় একটা দেখা যায় না। সাধারণত সে রুটিনমাফিক কাজ করিয়াই চলে। সে হয়ত বুঝিতেছে যে, একটি বিশেষ শাখা বন্ধ করা বা একটি নূতন যন্ত্র স্থাপন করা প্রয়োজন। নিজে মালিক হইলে সে অবিলম্বেই ইহা করিত, কিন্তু কোম্পানীর পরিচালকগণকে ইহা বুঝানো কঠিন বলিয়া সে এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়ই থাকে। ফলে গতানুগতিক পদ্ধতিতে যৌথ মূলধনী কারবার চলিতে থাকে। সুতরাং যে-সকল ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান তাহাদের উপযোগী নয়।

২। গতানুগতিক পদ্ধতিতে কার্যপরিচালনা

শেয়ার বা অংশের বিক্রয়যোগ্যতার যেমন সুবিধা আছে তেমনি অসুবিধাও আছে। শেয়ার বিক্রয়যোগ্য বলিয়া লোকে শেয়ার বেচাকেনার কার্য—অর্থাৎ, ফটকাবাজারের কারবারে টাকা খাটাইতে উৎসাহী হয়। ইহার ফলে দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের দিকে সঞ্চয় প্রবাহিত হয় না। উপরন্তু দেখা যায় যে, লোকে ফটকাবাজারে লোকসান খাইয়া ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময় আবার সঞ্চয়কারীদের ঠকাইবার জন্য ভুয়া কোম্পানী গড়িয়া উঠে। ইহাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া লোকের বিনিয়োগ-ইচ্ছা অন্তর্হিত হয়।

৩। শেয়ার হস্তান্তরযোগ্যতার জন্য অসুবিধাও দেখা দেয়

প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ, অপচয়, প্রতিষ্ঠান অতি বৃহদায়তন হওয়ার ফলে একচেটিয়া (monopoly) কারবারের উদ্ভব প্রভৃতি হইল যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ত্রুটি।

। অন্যান্য ত্রুটি

তবুও বলা যায়, ব্যবসায় সংগঠনের এই রূপের অসুবিধা অপেক্ষা সুবিধাই অধিক। এইজন্যই ইহা প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সমবায় (Cooperation): একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে ব্যবসায় সংগঠনের ধনতান্ত্রিক রূপ (capitalistic form) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। যে-কোন উপায়েই হউক সর্বাধিক মুনাফা লাভ (profit maximisation) করাই হইল ব্যবসায় সংগঠনের এই সকল রূপের আসল উদ্দেশ্য। ইহাদের ফলে সমাজজীবন নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিজ্ঞাপন, প্রচার-কার্য প্রভৃতির জন্য প্রভূত অর্থের অপচয় হয়, শ্রমিক নিপীড়িত হয়, সাধারণে অতিরিক্ত দাম দিতে বাধ্য হয়, ধনীদের পছন্দ ও রুচিমত জিনিসপত্র তৈয়ারি হয় এবং দরিদ্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন অবহেলিত হইতে থাকে, ইত্যাদি। একশ্রেণীর লেখকের মতে, দেশের অর্থনৈতিক জীবনের এই সকল ত্রুটি দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল সমবায়ের (cooperation) ভিত্তিতে ব্যবসাবাণিজ্য সংগঠন করা। সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত ব্যবসায়কে সমবায় সমিতি (Cooperative Society) বলা হয়।

সমবায় ধনতান্ত্রিক ব্যবসায় সংগঠনের ত্রুটিগুলি দূর করিতে চেষ্টা করে

সমবায় সমিতির নানা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল এইরূপ: কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যখন কোন অর্থনৈতিক স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে সাম্যের ভিত্তিতে এবং স্বেচ্ছায় পরস্পরের সহিত মিলিত হয় তখন তাহারা সমবায় সমিতি গঠন করিয়াছে বলা হয়। আর একটি সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে যে, সমবায় সমিতি গঠন করিয়া দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসমুদয় ধনীদের ন্যায় অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা ভোগ করিতে পারে। ফলে, তাহারা নিরবলম্ব হইয়াও নিজেদের বিকশিত করিতে সমর্থ হয়।

সমবায় সমিতির সংজ্ঞা

এই সংজ্ঞা দুইটি বিশ্লেষণ করিলে সমবায়ের কয়েকটি নীতি বা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, স্মরণ রাখিতে হইবে যে সমবায় আন্দোলনের মূলে রহিয়াছে দারিদ্র্যের পীড়ন। আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত জন-সাধারণই সমবায় সমিতিতে সংঘবদ্ধ হইয়া অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে চায়। দরিদ্রের বিশেষ কোন মূলধন থাকিতে পারে না। মূলধন তাহাদের সংগঠনের ভিত্তিও হইতে পারে না। অতএব, সমবায় সমিতির সদস্যগণ মূলধন-মালিক হিসাবে নয়, সাধারণ মানুষ হিসাবেই সম্মিলিত হয়।

সমবায়ের নীতি:
১। সমবায় দরিদ্র ব্যক্তিদের সংগঠন

দ্বিতীয়ত, সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক হইল সাম্যের সম্পর্ক। এখানে মালিক-শ্রমিকে কোন ভেদ নাই, ম্যানেজার ও সাধারণ কর্মচারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। একই স্বার্থের ভিত্তিতে সদস্যগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হয় বলিয়া প্রত্যেকেই একাধারে শ্রমিক ও মালিক, একাধারে পরিচালক ও কর্মচারী।

২। সভ্যদের মধ্যে সম্পর্ক হইল সাম্যের সম্পর্ক

তৃতীয়ত, সমবায় সমিতিতে লোকে স্বেচ্ছায় যোগদান করে এবং ইচ্ছামত উহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে পারে। প্রত্যেকে সকলের জন্য এবং সকলে প্রত্যেকের জন্য কার্য করিবে ইহাই সমবায়ের নীতি। সদস্যপদ স্বেচ্ছামূলক না হইলে এই নীতি কার্যকর হয় না। জোর করিয়া লোককে সকলের জন্য কাজ করানো যায় না।

৩। ইহাতে লোকে স্বেচ্ছায় যোগদান করে

পরিশেষে, সমবায় সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য হইল সদস্যদের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রসার করা। সুতরাং সদস্যগণ ছাড়া অন্য কাহারও স্বার্থের প্রতি এবং সদস্যগণের বেলাতেও অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনপ্রকার স্বার্থের প্রতি সমিতি দৃষ্টি দেয় না।

৪। ইহার উদ্দেশ্য সদস্যগণের অর্থনৈতিক স্বার্থসাধন করা

দেখা যাইতেছে, সমবায় মানুষকে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে অবস্থার উন্নতিসাধনের পথ নির্দেশ করে। সুতরাং যাহারা দরিদ্র, যাহাদের সম্বল অতি সামান্য, যাহারা যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহ করিয়া যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না তাহাদের পক্ষে সমবায় সংগঠন বিশেষ উপযোগী।

যে যে ক্ষেত্রে সমবায় বিশেষ উপযোগী :

ভারতের ন্যায় দেশে কৃষির ক্ষেত্রে ইহাকে অপরিহার্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, এরূপ দেশে কৃষকই সর্বাপেক্ষা নিঃসহায় ও নিঃসম্বল। তাহার জোতের (holding) পরিমাণ এত কম যে কৃষিকার্য তাহার পক্ষে মোটেই লাভজনক হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজার দূরে অবস্থিত হওয়ায় সে উৎপন্ন ফসলের উপযুক্ত দাম পায় না; ফড়িয়া, ব্যাপারী প্রভৃতির নিকট উহা স্বল্প দামে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ফলে তাহার উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না বলিয়া তাহাকে প্রায় গ্রামীণ মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয়। মহাজনও তাহার দুর্বলতার সুযোগ লইতে ছাড়ে না। অত্যধিক সুদে কর্জ দিয়া তাহাকে শোষণ করিতে থাকে এবং অবশেষে হয়ত তাহাকে বাস্তহীন করিয়া ছাড়িয়া দেয়। এই অবস্থায় কৃষির উন্নয়নের পন্থা হিসাবে সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

১। কৃষি

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পেও সমবায়-ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর হইতে পারে, কারণ এইরূপ শিল্পে অধিক মূলধন বা বিশেষ পরিচালনা দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহের ক্ষেত্রেও সমবায় সংগঠন বিশেষ উপযোগী। নিত্যব্যবহার্য ভোগ্যদ্রব্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্রয় করা হইলে দামে সুবিধা হয় এবং ভোগ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ে সমিতির যে-লাভ হয় তাহাও সভ্যগণের মধ্যে বণ্টিত হয়। অবশ্য সমবায়িক কার্যকলাপের মধ্যে সুবিধাজনক সর্তে ঋণদান

২। ক্ষুদ্র শিল্প
৩। ভোগ্যপণ্য ক্রয়
৪। মধ্যবিত্তদের ঋণ-ব্যবস্থা

করাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মাত্র কৃষকদের নহে, মধ্যবিত্তদেরও স্বল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা সমবায়ের মাধ্যমে করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই ভারতে সমবায় আন্দোলন সুরু করা হইয়াছিল।

বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি (Different Types of Co-operative Societies): জার্মেনী সমবায় আন্দোলনের জন্মভূমি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম ঐ দেশে দুই ধরনের সমবায় সমিতি প্রবর্তন করা হয়—যথা, (ক) গ্রামীণ (rural), এবং (খ) পৌর (urban)। গ্রামীণ সমিতিগুলি কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দান করেন রাইফিজেন (Raiffeisen) নামক একজন সমাজ-সংস্কারক। রাইফিজেন দেখিয়াছিলেন যে গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের দুঃখদৈন্যের মূলে রহিয়াছে সামান্য সুদে সহজলভ্য ঋণের অভাব এবং শোষণকারী মহাজনদের নিকট চিরস্থায়ীভাবে ঋণগ্রস্ততা। এই অবস্থার অবসানকল্পে তিনি যে-প্রকার সমিতি প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাকে 'রাইফিজেন ধরনের সমিতি' (Raiffeisen Type of Societies) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ভারতের ন্যায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই গ্রামাঞ্চলের সমিতিগুলি এই রাইফিজেন ধরনের সমিতির অনুকরণে গঠিত। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল: (১) সমিতির কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকার ফলে সমিতি মাত্র পরিচিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়; (২) যাহাতে দরিদ্র কৃষক ও স্বল্পবিত্ত গ্রামীণ কারিগর সহজেই সমিতির সদস্যপদ পাইতে পারে তাহার জন্য শেয়ারের মূল্য অতি অল্প রাখা হয়; (৩) মুনাফালাভই যাহাতে সমিতির লক্ষ্য হইয়া না পড়ে তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়; (৪) সদস্যদের দায় বা দায়িত্ব অসীম (unlimited) হয়; (৫) মাত্র উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে (productive purposes) বা বিশেষ বিশেষ কারণে ঋণদান করা হয়—যথা, নূতন জমি ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, পুরাতন জমির উন্নয়ন, গৃহনির্মাণ, চিকিৎসা ইত্যাদি; (৬) সমিতির সভ্যগণ বিনা পারিশ্রমিকে কার্য করে।

১। গ্রামীণ ও পৌর সমিতি

গ্রামীণ সমিতিকে রাইফিজেন ধরনের সমিতি বলা হয়

ইহার বৈশিষ্ট্য

জার্মেনীর নগরাঞ্চলে দরিদ্র কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে সমবায় নীতি প্রবর্তন করেন সমাজসেবী স্বলজ-ডেলিতস্ (Schultze-Delitsch)। সুতরাং এই ধরনের সমিতি 'স্বলজ-ডেলিতস্ ধরনের সমিতি' বলিয়া পরিচিত। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই পৌর সমবায় সমিতিগুলি এই স্বলজ-ডেলিতস্ ধরনের। এই প্রকার সমিতিতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়: (১) সমিতি অপরিচিত ব্যক্তিদের লইয়াও গঠিত হয় এবং ইহার কার্যক্ষেত্র নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে না; (২) শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে

পৌর সমিতি স্বলজ-ডেলিতস্ ধরনের বলিয়া অভিহিত

মূলধন সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়; (৩) সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ (limited) থাকে; (৪) সদস্য কোন্ উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ করিতেছে তাহার বিচার বিশেষ করা হয় না; (৫) বেতনভুক্ কর্মচারীদের দ্বারাই সমিতির কার্য পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

ইহার বৈশিষ্ট্য

রাইফিজেন এবং সুলজ-ডেলিত্‌স্ উভয় ধরনের সমবায় সমিতিই 'প্রধানত' ঋণদান সমিতি (credit society)।* কিন্তু ঋণদান ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমবায় সংগঠনের কার্যকারিতা রহিয়াছে। যথা, কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন, যন্ত্রপাতি বীজ সার ভোগ্যপণ্য ইত্যাদি সরবরাহ, বীমাকার্য, বিক্রয়-ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি কার্য সমবায় সমিতি গঠন করিয়া অতি সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদন করিতে পারা যায়।

২। ঋণদান ও অন্যান্য প্রকার সমিতি

আমাদের দেশে এই সকল উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার সমিতি আছে। কৃষির জন্য আছে সমবায়িক কৃষি-সমিতি। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত একত্রিত করিয়া, সেচকার্যের সুব্যবস্থা করিয়া আধুনিক পদ্ধতিতে বৃহদায়তন কৃষিকার্য সম্পাদনে নিযুক্ত আছে। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে তন্তুবায় সমবায় সমিতি বিশেষ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। চর্মশিল্প, তৈল উৎপাদন, মৎস্য শিকার প্রভৃতিতে সমবায় সমিতি প্রসারলাভ করিতেছে। নগরাঞ্চলে ভোগ্যপণ্য সরবরাহের জন্য কিছু কিছু সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির সংখ্যা হইল ঋণদান সমিতির পরই। গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে সমবায় সামান্য প্রসারলাভ করিলেও এই দিকে বর্তমানে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। পরিশেষে, বীমা ব্যবসায়ের জন্যও কয়েকটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ভারতের সমবায় সমিতি

উপরি-উক্ত সকল প্রকার সমবায় সমিতি মাত্র এক একটি উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয়। যথা, হয় তাহারা ঋণদান করে, না-হয় ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করে, অথবা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, ইত্যাদি। এ-ধরনের সমিতিকে একউদ্দেশ্যসাধক (single-purpose) সমিতি বলা হয়। কিন্তু সমবায় সমিতি বহুউদ্দেশ্যসাধকও (multi-purpose) হইতে পারে। অর্থাৎ, সমিতি একই সংগে ঋণদান, বিক্রয়-ব্যবস্থা, পণ্য সরবরাহ, উৎপাদনবৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে। ভারতে উত্তরপ্রদেশ বিহার মহারাষ্ট্র পশ্চিমবংগ রাজস্থান এবং মহীশূরে এই ধরনের বহুউদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতি অনেক আছে।

৩। একউদ্দেশ্যসাধক এবং বহুউদ্দেশ্যসাধক সমিতি

সমবায়ের সুবিধা-অসুবিধা: ব্যবসায় সংগঠনের রূপ হিসাবে সমবায়ের সুবিধার কিছু কিছু আলোচনা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে—যথা, ইহার মাধ্যমে

* ঋণদান ছাড়াও ইহারা অন্যান্য কার্য করিতে পারে; তবে সাধারণত ইহারা ঋণদানেই ইহাদের কার্যকে সীমাবদ্ধ রাখে।

দরিদ্র ব্যক্তিগণ তাহাদের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারে, প্রচারকার্য ইত্যাদির জন্য অপচয়মূলক ব্যয় হয় না, অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সকলে সমান মর্যাদা পায়, ইত্যাদি। ইহা ছাড়াও বলা যায় যে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার মত ইহাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উৎসাহের বিনাশ ঘটে না। ইহা যেমন ব্যক্তিগত স্বার্থকে বজায় রাখে, তেমনি আবার জনসাধারণের স্বার্থের সহিত উহার সমন্বয়সাধনও করে। ফলে সম্ভব হয় উন্নততর জীবনযাত্রা।

সুবিধা: ইহা ধনতান্ত্রিক ব্যবসায় সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনা উভয়েরই ত্রুটি হইতে মুক্ত

কিন্তু ব্যবসায় সংগঠনের রূপ হিসাবে সমবায়ের কার্যকারিতা বিশেষ সীমাবদ্ধ। দেখা যায়, ইহা মাত্র কৃষি ও ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সফল হইয়াছে। যেখানে বহু পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন হয় সেখানে—যথা, বৃহদায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রে—সমবায় এখনও বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই।

ত্রুটি: ১। ইহার কার্যকারিতা বিশেষ সীমাবদ্ধ

দ্বিতীয়ত, সমবায় সংগঠন ব্যাপারে ধরিয়া লওয়া হয় যে সকলেই ব্যবসায় পরিচালনা করিবার উপযুক্ত। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা: সকলেরই ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনায় যোগ্যতা থাকে না। বহু সমবায় সমিতি যোগ্য পরিচালকের অভাবেই ধ্বংস হইয়াছে।

২। ইহা ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত

তৃতীয়ত, সমিতির সদস্যগণ যদি সমবায়ের উচ্চ আদর্শ ও নীতির কথা স্মরণ রাখিয়া—'প্রত্যেকে সকলের জন্য এবং সকলে প্রত্যেকের জন্য' কার্য করে তবেই ইহা সফল হইতে পারে। অনেক সময়েই ইহা ঘটে না; ফলে সমবায় সমিতিও সফলতা অর্জন করিতে পারে না।

৩। সমবায়ের নীতি সকলে মানিয়া চলিতে পারে না

রাষ্ট্রীয় পরিচালনা (State Management): রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রসারের ফলে শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে রেলপথ, ডাক-তার, বিমান, বিদ্যুৎ সরবরাহ, জলসেচের খাল, মোটরবাস চালানো প্রভৃতি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে এবং রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ইহার উপর রাষ্ট্র কলকারখানার মালিক হইয়াও উহাদের পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে পারে। আমাদের দেশে চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন তৈয়ারির কারখানা, সিন্ধ্রির সার তৈয়ারির কারখানা, বিশাখাপত্তনমের জাহাজ নির্মাণের কারখানা, রুরকেল্লা, ভিলাই ও দুর্গাপুরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলির মালিক হইল রাষ্ট্র, এবং ইহাদের পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করিয়াছে রাষ্ট্র।

দিন দিন রাষ্ট্রীয় পরিচালনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে

রাষ্ট্রীয় পরিচালনা জনস্বার্থের অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হয়। দেশের ব্যবসাবাণিজ্য হইতে মুনাফা দেশের সকল লোক ভোগ করিবে ইহাই ত

অর্থনৈতিক আদর্শ। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত পরিচালনার অপচয়, অনগ্রসরতা, বেকার-সমস্যা প্রভৃতি যে-সকল ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে তাহা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব। ব্যক্তিগত মালিকের লক্ষ্য মুনাফা সর্বাধিক করা; রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য দেশের সর্বাংগীণ কল্যাণসাধন। এই কারণে রাষ্ট্র মুনাফা হ্রাস করিয়াও বহু লোককে নিয়োগ করিতে পারে, আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নূতন শিল্পের পত্তন করিতে এবং অনিষ্টকারক দ্রব্যের উৎপাদন কমাইয়া দিতে পারে। প্রতিযোগিতা থাকে না বলিয়া রাষ্ট্রের পক্ষে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য চালাইবারও প্রয়োজন হয় না। ফলে এই অর্থ উৎপাদনশীল কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় পরিচালনার সপক্ষে যুক্তি

রাষ্ট্রীয় পরিচালনা অবশ্য সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নয়। পরিচালকগণের পক্ষে উত্তম ও উৎসাহের অভাব, এই প্রকার সংগঠনের প্রধান ত্রুটি। মুনাফার সম্ভাবনা নাই বলিয়া এবং অভ্যাসগত কারণে রাষ্ট্রীয় পরিচালকগণ রুটিন-মাফিক কার্য করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। এইজন্যই আবার তাহাদের মধ্যে উৎকোচগ্রহণ, স্বজনপ্রীতি ও অন্যান্য দুর্নীতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে। পরিচালকগণ ভুলও করিতে পারে। তবুও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার প্রতি আকর্ষণ মোটেই কমে নাই; বরং দিন দিন ইহা বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। সুরুতেই বলা হইয়াছে যে, ইহার মূলে আছে সমাজতান্ত্রিক ধারণার প্রসার।

রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ত্রুটি

ত্রুটি সত্ত্বেও ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি

সংক্ষিপ্তসার

ব্যবসায় সংগঠনের রূপের মধ্যে একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় পরিচালনা এবং সমবায়ই প্রধান।

একমালিকী কারবার: ইহাতে একজন মালিকই মূলধন প্রদান করে, সে-ই পরিচালনা করে এবং মুনাফা ভোগ করে। ইহার কতকগুলি সুবিধা আছে; কিন্তু ইহা সংকীর্ণ পরিধির হয় এবং স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া থাকে।

অংশীদারী কারবার: কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিলে ইহাকে অংশীদারী কারবার বলে। একজনের ব্যবসায়ের অসুবিধাগুলি অংশীদারী কারবারে দেখা যায় না। তবুও ব্যবসায় সংগঠনের এই রূপ ত্রুটিবিহীন নহে। অসীম দায় (unlimited liability) ইহার প্রধান ত্রুটি।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান: বর্তমানে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানই বিশেষ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। বহু ব্যক্তি মূলধন প্রদান করিয়া এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন করে এবং একটি পরিচালকমণ্ডলীর হাতে ইহার পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে। সসীম দায় বা দায়িত্ব ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান (১) শেয়ার, এবং (২) ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করে। শেয়ার সাধারণত দুই রকমের হয়—যথা, অগ্রগণ্য শেয়ার ও সাধারণ শেয়ার। অগ্রগণ্য শেয়ার আবার সঞ্চয়-মূলক হইতে পারে। বিভিন্ন শেয়ারের উপর বিভিন্নভাবে লভ্যাংশ বণ্টিত হয়। ডিবেঞ্চারের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করা হয়।

সুবিধা : ১। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, ২। ইহা বিনিয়োগ-অভ্যাস গড়িয়া তুলে, ৩। দায় সীমাবদ্ধ হওয়ার জন্য লোকে বিনিয়োগ করিতে ভয় পায় না, ৪। শেয়ার আবার হস্তান্তরযোগ্য, ৫। এইরূপ প্রতিষ্ঠান সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয়।

অসুবিধা : ১। অংশীদারের সংগে পরিচালকমণ্ডলীর যোগাযোগ থাকে না, ২। ব্যবসায় গতানুগতিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, ৩। শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য হওয়ায় অসুবিধা দেখা যায়, ৪। একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হইতে পারে।

সমবায় : ধনতান্ত্রিক ব্যবসায় সংগঠনের ত্রুটিগুলি দূর করাই ইহার উদ্দেশ্য। সমবায়ের নিম্নলিখিত বৈশিষ্টাগুলি দেখা যায় : ১। সমবায় দরিদ্র ব্যক্তিদের সংগঠন, ২। সভ্যদের মধ্যে সম্পর্ক সাম্যের সম্পর্ক, ৩। ইহাতে লোকে স্বেচ্ছায় যোগদান করে, এবং ৪। ইহা সদস্যগণের অর্থনৈতিক স্বার্থসাধন করে।

কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, ভোগ্যপণ্য ক্রয় এবং মধ্যবিত্তদের ঋণ-ব্যবস্থায় সমবায় বিশেষ উপযোগী।

বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি : সমবায় সমিতিগুলিকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) গ্রামীণ, এবং (২) পৌর। গ্রামীণ সমিতিগুলিকে রাইফিজেন ধরনের এবং পৌর সমিতিগুলিকে সুলজ-ডেলিতস্‌ ধরনের বলিয়া অভিহিত করা হয়। মূলত ভারতের সমবায় সমিতিগুলিও এই রাইফিজেন এবং সুলজ-ডেলিতস্‌ ধরনের।

সমবায় সমিতির আর একটি শ্রেণীবিভাগ হইল ঋণদান ও অ-ঋণদান সমিতির মধ্যে। আবার বহু-উদ্দেশ্যসাধক সমবায় সমিতিও দেখা যায়। ভারতে ঋণদান সমিতি ছাড়াও সমবায়িক কৃষি সমিতি, তন্তুবায় সমিতি, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমিতি, গৃহনির্মাণ সমিতি, বীমা সমিতি এবং বহুউদ্দেশ্যসাধক সমিতি আছে।

সমবায়ের সুবিধা-অসুবিধা : ইহা ধনতান্ত্রিক ব্যবসায় সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ত্রুটি হইতে মুক্ত। কিন্তু সমবায়ের কার্যকারিতা বিশেষ সীমাবদ্ধ—ইহা বৃহদায়তন ব্যবসায়ের উপযোগী নহে। উপরন্তু, সমবায়ের সফলতা কতকগুলি নীতি পালনের উপর নির্ভর করে বলিয়া ইহা অনেক স্থলে ব্যর্থ হইয়াছে দেখা যায়।

রাষ্ট্রীয় পরিচালনা : বর্তমানে সমাজতান্ত্রিকতার ধারণার ফলে দিন দিন রাষ্ট্রীয় পরিচালনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, তবে ইহার কয়েকটি ত্রুটিও দেখা যায়।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the importance of Joint Stock form of business organisation and mention some of its defects. (B. U. 1961)

ব্যবসায় সংগঠনের অন্যতম রূপ হিসাবে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর, এবং উহার অসুবিধাগুলির উল্লেখ কর। [৭৭ এবং ৭৯-৮১ পৃষ্ঠা]

2. Describe the main features of a Joint Stock Company. Indicate the strength and weakness of such companies. (C. U. 1957, '60 ; P. U. 1963)

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। ইহার সুবিধা এবং অসুবিধা উল্লেখ কর।
[৭৭-৭৮ এবং ৭৯-৮১ পৃষ্ঠা]

3. Write a note on the advantages and disadvantages of the Joint Stock Company. (En. 1964) [৭৯-৮১ পৃষ্ঠা]

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ও অসুবিধার উপর একটি টীকা রচনা কর। [৭৯-৮১ পৃষ্ঠা]

4. Show how a Joint Stock Company raises its Capital. Indicate the advantages that it enjoys from limited liability and transferability of shares. (C. U. 1952)

কিভাবে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান মূলধন সংগ্রহ করে তাহা দেখাও। এইরূপ প্রতিষ্ঠান সীমাবদ্ধ দায় এবং শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতা হইতে যে-সুবিধা ভোগ করে তাহার বিবরণ দাও।

[ইংগিত : দায় সীমাবদ্ধ হওয়ার জন্য লোকে টাকা খাটাইতে ভয় পায় না। শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য

হওয়ায় যে-কোন সময় টাকা ফেরত পাওয়া যাইতে পারে। ইহাও বিনিয়োগ-অভ্যাস গড়িয়া তুলে।... (৭৮-৮০ পৃষ্ঠা)]

5. Define Cooperation. Describe the various types of Cooperative Societies, giving examples.

সমবায়ের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। উদাহরণসহ বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতির বিবরণ দাও।

[৮২ এবং ৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা)

নবম অধ্যায়

বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

(Large and Small-scale Industries)

বর্তমান যুগ একদিকে যেমন যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার যুগ, অন্যদিকে তেমনি বৃহদায়তন শিল্পের যুগ। বস্তুত, সকল ক্ষেত্রে শিল্পবাণিজ্য যদি ক্ষুদ্রায়তনেই পরিচালনা করা হইত তবে ব্যবসায় সংগঠনের রূপ হিসাবে একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার এবং সমবায়ের অস্তিত্বই লক্ষ্য করা যাইত—যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার উদ্ভব ঘটিত না।

বর্তমান যুগ বৃহদায়তন শিল্পের যুগ

বৃহদায়তন শিল্প উদ্ভবের মূলে আছে তিনটি কারণ—(ক) শ্রমবিভাগ, (খ) যন্ত্রপাতির ব্যবহার, এবং (গ) বিক্রয়-বাজারের প্রসার।

ইহার মূলে আছে ১। শ্রমবিভাগ, ২। যন্ত্রপাতির ব্যবহার, এবং ৩। বিক্রয়-বাজারের প্রসার

শ্রমবিভাগ (Division of Labour): শ্রমবিভাগ প্রথমে সুরু হয় পেশা বা কর্মবিভাগ হিসাবে। আদিমতম যুগে কর্মবিভাগ বলিয়া কিছু ছিল না। ভ্রাম্যমাণ মানবগোষ্ঠীর সকলে মিলিয়া পশুপক্ষী শিকার ও ফলমূল আহরণ করিয়া জীবনধারণ করিত। তাহার পর কৃষিকার্য সুরু ও গ্রাম-ব্যবস্থার উদ্ভব হইলে ধীরে ধীরে কর্মবিভাগ দেখা দিল। কতক লোক মাত্র কৃষিকার্যেই নিযুক্ত রহিল, আবার কতক লোক সংগে সংগে অন্যান্য পণ্যও উৎপাদন করিতে লাগিল। এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ ক্রমে কৃষিকার্য ছাড়িয়া তাহাদের বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনেই সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করিল—যেমন, যে-ব্যক্তি লাঙল তৈয়ারি করিত, সে শুধু লাঙল তৈয়ারিতেই নিযুক্ত রহিল। এইভাবে যে পেশাগত বিভিন্নতা বা কর্মবিভাগ সুরু হইল সমাজের ক্রমবিকাশের সংগে সংগে তাহা অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতে লাগিল। ফলে একদিন গড়িয়া উঠিল অসংখ্য পেশার ভিত্তিতে বর্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থা।

শ্রমবিভাগের সূত্রপাত ও প্রসার

বর্তমান দিনে কেহই তাহার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য স্বয়ং উৎপাদন করে না। ইহার পরিবর্তে সাধারণত একটিমাত্র পেশা অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জনে নিযুক্ত থাকে, এবং অর্জিত অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক মাত্র শিক্ষকতার কার্যেই নিযুক্ত থাকেন এবং ইহার বিনিময়ে যে-অর্থ পান তাহা দিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করেন।

বর্তমান শ্রমবিভাগ ও বিনিময় ব্যবস্থা

কিন্তু বিভিন্ন পেশায় উৎপাদনকার্যের বিভাগই শ্রমবিভাগের শেষ কথা নয়। শ্রমবিভাগ আরও অগ্রসর হইয়াছে। বর্তমানে প্রত্যেকটি পেশাও আবার বিভিন্ন অংশ বা প্রক্রিয়ায় (process) বিভক্ত। পূর্বে চিকিৎসককে—যেমন, কবিরাজ বা হকিমকে রোগনির্ণয়, ঔষধপত্র তৈয়ারি, ঔষধপত্র প্রদান সকল কার্যই স্বয়ং সম্পাদন করিতে হইত। বর্তমানে চিকিৎসক রোগনির্ণয় করিয়া ব্যবস্থাপত্র (prescription) লিখিয়া দিয়াই ক্ষান্ত। ঔষধ তৈয়ারি ও ঔষধ প্রদানের ভার হইল অন্যান্য শ্রেণীর লোকের উপর।* জুতা তৈয়ারির উদাহরণও লওয়া যাইতে পারে। পূর্বে জুতা তৈয়ারির জন্য চর্মকারকে চর্ম সংগ্রহ করিতে হইত। এখন চর্ম সংগ্রহ করে একদল লোক, চর্ম পরিষ্কার ও শোধন করে দ্বিতীয় একদল লোক এবং প্রকৃত জুতা তৈয়ারি করে আর একদল লোক। আবার বাটা কোম্পানীর মত জুতার কারখানায় মাত্র জুতা তৈয়ারির কার্যই শতাধিক ক্ষুদ্রতর প্রক্রিয়ায় বিভক্ত। কেহ শুধু গোড়ালি লাগায়, কেহ বা শুধু ফিতে পরায়, কেহ বা মাত্র চারিটি করিয়া পেরেক বসায়, ইত্যাদি। অর্থবিদ্যার জনক অ্যাডাম স্মিথ দেখিয়াছিলেন যে আলপিন তৈয়ারির কার্য ১৮টি প্রক্রিয়ায় বিভক্ত। এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান থাকিলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, শুধু শতাধিক নহে সহস্রাধিক প্রক্রিয়ায় বিভক্ত উৎপাদনকার্যও আছে।

বর্তমান শ্রমবিভাগ—প্রত্যেক পেশা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভক্ত

উদাহরণ

শ্রমবিভাগের কতকগুলি সুবিধা সহজেই অনুধাবন করা যায়। প্রথমত, শ্রমবিভাগের ফলেই শিল্পবাণিজ্যের এবং জীবনযাত্রার মানের বর্তমান উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। অবশ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমবিভাগ ছাড়া যন্ত্রপাতির আবিষ্কারও বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে। তবুও বলা যায়, শ্রমবিভাগ ব্যতিরেকে ইহা কোন উপকারেই আসিত না। উদাহরণ দিয়া একজন অর্থবিদ্যাবিদ বলিয়াছেন যে ইঞ্জিন-নির্মাতা, ইঞ্জিন-চালক, গার্ড, সিগন্যালার প্রভৃতির মধ্যে যদি শ্রমবিভাগ না থাকিত তবে বাষ্পীয় ইঞ্জিন দ্বারা কখনও রেলগাড়ি চালানো সম্ভব হইত না।

শ্রমবিভাগের সুবিধা

* অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য চিকিৎসক এখনও নিজে ঔষধ দিয়া থাকেন; কবিরাজ বা হকিম নিজে ঔষধপত্র তৈয়ারিও করিয়া থাকেন। তবে গতি হইল চিকিৎসার কার্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভক্ত করার দিকে।

আবার ইঞ্জিন নির্মাণের কার্যও যদি মাত্র একজনকে করিতে হইত তবে কখনই ইঞ্জিন নির্মিত হইত না।

দ্বিতীয়ত, শ্রমবিভাগ যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সহায়তা করিয়াছে। বিজ্ঞানীর পক্ষে গবেষণায় নিযুক্ত থাকা সম্ভব হইয়াছে বলিয়াই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিতে পারিয়াছে।

তৃতীয়ত, শ্রমবিভাগ শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অ্যাডাম স্মিথই প্রথম দেখাইয়াছিলেন যে কোন লোকই সকল কার্যের জন্য সমান উপযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং যে যে-কাজের উপযুক্ত তাহাতে নিযুক্ত থাকিলেই সে দক্ষতা দেখাইতে পারে।

চতুর্থত, একই কার্যে মনোনিবেশ করার জন্য সে পারদর্শিতাও লাভ করে।

পঞ্চমত, শ্রমিককে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিতে হয় না বলিয়া সময়ও বাঁচে।

ষষ্ঠত, শ্রমবিভাগ যত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও তত বাড়িতে থাকে।

পরিশেষে, এই সকল সুবিধার সমন্বয়ের ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় এবং শ্রমিককে অধিক মজুরি প্রদান করা সম্ভব হয়।

শ্রমবিভাগের অসুবিধা

অবশ্য শ্রমবিভাগের অসুবিধাও আছে। প্রথমত, অতি সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিক যন্ত্রবৎ হইয়া পড়ে; তাহার অন্য কার্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। দৈনিক সহস্র সহস্র জুতার গোড়ালি লাগানো যাহার কাজ তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ জুতা নির্মাণ করা আর সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, বৈচিত্র্যবিহীন একই ধরনের কাজ শ্রমিকের মনের উপর আঘাত করে বলিয়া তাহাকে নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়।

তৃতীয়ত, শ্রমিক যে-দ্রব্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে তাহার চাহিদা কমিয়া গেলে শ্রমিকের পক্ষে বেকার হইয়া থাকিবার আশংকা থাকে। কারণ, অন্য কাজে তাহার দক্ষতা থাকে না বলিয়া অন্য কাজে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হয় না।

পরিশেষে, শ্রমবিভাগের জন্য অসংখ্য শ্রমিক অসংখ্য রকমের কাজ করে বলিয়া পরিচালকগণের পক্ষে তাহাদের সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এই সকল অসুবিধার জন্য শ্রমবিভাগ সীমাহীনভাবে সম্প্রসারিত হইতে পারে না।

যন্ত্রপাতির ব্যবহার শ্রমবিভাগের সহিত জড়িত

যন্ত্রপাতির ব্যবহার (Use of Machinery): শ্রমবিভাগের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত আছে যন্ত্রপাতির ব্যবহার। শ্রমবিভাগ যত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও তত বাড়িতেছে। অপরদিকে আবার নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কারও শ্রমবিভাগকে সূক্ষ্মতর করিয়া তুলিয়াছে। উৎপাদনকার্যে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে যে-সকল সুবিধা হয় তাহাদিগকে

প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (ক) শক্তি (power), এবং (খ) সূক্ষ্মতা (precision)। যন্ত্রপাতির জন্য উৎপাদনকার্যে মানুষের শক্তি নানাভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে।

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুবিধা

জলস্রোত ও কয়লা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, অণু হইতে আণবিক শক্তির সৃষ্টি প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ নদী সমুদ্র পর্বত প্রভৃতি সকল প্রাকৃতিক বাধাকে জয় করিয়াছে। যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে মানুষের পেশীর উপর চাপও কম পড়িতেছে। তাজমহল নির্মাণে মানুষের পেশীর দ্বারা যত বড় পাথর তুলিতে হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বড় বড় পাথর আজ যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই তোলা যায়। দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দ্বারা

সূক্ষ্ম, নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ একই প্রকার জিনিসপত্রও তৈয়ারি করা সম্ভব হইতেছে। পরিশেষে, যন্ত্রপাতির দ্বারা অনেক অবাঞ্ছনীয় কাজও করা যায়।

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অসুবিধা

যন্ত্রপাতির ব্যবহারের অবশ্য অসুবিধাও আছে। যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে করিতে শ্রমিকও যান্ত্রিক হইয়া উঠে। তাহার পেশীর উপর চাপ কমিলেও মনের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় শ্রমিক ইহা সহ্য করিতে পারে না। যন্ত্রপাতি আবার প্রথম প্রথম শ্রমিককে কর্মচ্যুত করিয়া বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি করে। অবশ্য পরে ঐ নূতন যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামতের কারখানা গড়িয়া উঠিলে কর্মচ্যুত শ্রমিকের অধিকাংশ পুনর্নিযুক্ত হয়। আরও বলা যায় যে কদর্য কারখানা-জীবন, বৈচিত্র্যবিহীন পরিশ্রম ইত্যাদি যেমন শ্রমবিভাগের ফল তেমনি যন্ত্রপাতি ব্যবহারেরও ফল।

শিল্পের একদেশতা (Localisation of Industries): শ্রমবিভাগ দুই প্রকারের হয়—(ক) ব্যক্তিগত শ্রমবিভাগ বা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শ্রমবিভাগ (individual division of labour), এবং (খ) আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ বা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শ্রমবিভাগ (territorial division of labour)। আঞ্চলিক শ্রমবিভাগকে 'শিল্পের একদেশতা' বলিয়া অভিহিত করা হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, একটি শিল্প যদি দেশের এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হয় তাহাকে শিল্পের একদেশতা বলে। পশ্চিমবংগের পাটকল শিল্প, বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কল শিল্প প্রভৃতি এই একদেশতার উদাহরণ। ভারতের পাটকলের অধিকাংশ পশ্চিমবংগেই অবস্থিত; কাপড়ের কলের বেশীর ভাগ বোম্বাই ও আমেদাবাদে অবস্থিত।

একদেশতা কাহাকে বলে

একদেশতার প্রধান কারণ হইল ব্যয়সংক্ষেপের (economies) জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ। এই ব্যয়সংক্ষেপের জন্য তাহারা সুবিধাজনক স্থানে গিয়া ভিড় করে; ফলে শিল্পটি ঐ স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। নানা কারণে কলিকাতার আশেপাশে হুগলী নদীর ধারে পাটকল স্থাপন করা সুবিধাজনক বিবেচিত হইয়াছিল বলিয়াই পশ্চিমবংগের এই অঞ্চলে পাটকল শিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

একদেশতার কারণ

যে যে কারণে শিল্পের একদেশতা ঘটে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান:

(১) **কাঁচামালের সান্নিধ্য (Nearness to Raw Materials):** যে-অঞ্চলে কাঁচামাল পাওয়া যায় তাহার নিকটবর্তী স্থানেই শিল্পটি গড়িয়া উঠিবার প্রবণতা দেখা যায়। বাংলাদেশে পাট পাওয়া যায় বলিয়াই কলিকাতার নিকট পাটকল শিল্পের একদেশতা ঘটিয়াছে; ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ভাল তুলা

উৎপন্ন হয় বলিয়াই বোম্বাই ও আমেদাবাদে কাপড়ের কলগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

(২) জলবায়ু (Climate): জলবায়ুও আর একটি কারণ। ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের মূলে আছে ঐ অঞ্চলের আর্দ্র জলবায়ু।

(৩) শক্তির সান্নিধ্য (Nearness to Power): শক্তিসম্পদের সুযোগ লাভ করিবার জন্যও শিল্পের একদেশতা ঘটে। লৌহ শিল্প কয়লাখনির নিকটেই গড়িয়া উঠে।

(৪) বিক্রয়বাজারের সান্নিধ্য (Nearness to Market): প্রাচীনকালে রাজদরবারের নিকটবর্তী স্থানেই বিভিন্ন শিল্পকে কেন্দ্রীভূত হইতে দেখা যাইত। অন্যান্য সুবিধা না থাকিলেও একমাত্র বিক্রয়বাজারের সান্নিধ্যই শিল্পের একদেশতার কারণ ছিল। ঢাকাই মসলিন, মুর্শিদাবাদের সিল্ক ও বাসনপত্র শিল্পের একদেশতার কারণ ছিল ইহাই। বর্তমানেও দেখা যায় যে বিক্রয়বাজারের সুবিধা লাভ করিবার জন্য অনেক শিল্প মহানগরীর নিকট কেন্দ্রীভূত হইতেছে।

(৫) অন্যান্য কারণ (Other Reasons): অনেক সময় বন্দর, রেলপথ ইত্যাদির সুবিধা লাভ করিবার জন্যও শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়। মোটকথা, শিল্পের একদেশতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইল বহন-ব্যয় (transport cost) জনিত সুবিধা।* যে-স্থানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে কাঁচামাল ইত্যাদি লইয়া আসা ও নির্মিত দ্রব্য বিক্রয়বাজারে প্রেরণ করা ব্যাপারে সর্বাধিক সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে, শিল্পপতিগণ অধিকাংশ সময় সেই স্থানেই শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহান্বিত হয়। ফলে উদ্ভব হয় একদেশতার।

একদেশতার ফলে শিল্পের নানা সুবিধা হয়। প্রথমত, অনেক দক্ষ শ্রমিক ঐ স্থানে আসিয়া কর্মপ্রার্থী হয় বলিয়া শ্রমিকসংগ্রহ করা সহজ হয়। দ্বিতীয়ত, অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান একসংগে গড়িয়া উঠে বলিয়া যানবাহন ইত্যাদির সুবিধা পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, নানা সহায়ক শিল্প গড়িয়া উঠে। ইহাতে উপজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের সুবিধা হয়। চতুর্থত, শিল্পের একদেশতা ঘটিলে ঐ স্থানে যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানাও গড়িয়া উঠে। পরিশেষে, ঐ স্থানে শিল্পের সুনাম ছড়াইয়া পড়ে। যেমন, মুর্শিদাবাদের সিল্কের শাড়ী ক্রয় করিবার সময় লোকে কোন্ কারখানায় বা কোন্ তাঁতীর তৈয়ারি তাহা খোঁজ করে না।

একদেশতার সুবিধা

একদেশতার কিন্তু একটি বিশেষ বিপদ আছে। কেন্দ্রীভূত শিল্প যে-দ্রব্য উৎপাদন করে তাহার চাহিদা যদি বিশেষ কমিয়া যায় তবে ঐ অঞ্চলে ব্যাপক বেকার-সমস্যা দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দেশবিদেশে পাটজাত

* "The location of manufacturing industries may be influenced by many factors but often the dominant influence is transport costs." Benham

দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ হ্রাস পাইলে পশ্চিমবংগের পাটকলগুলির অধিকাংশ বন্ধ হইয়া পাটকল-শ্রমিকদের মধ্যে অনেক বেকারের সৃষ্টি করিবে।

একদেশতার বিপদ

বৃহদায়তন শিল্প (Large-scale Industry): শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সহিত বিক্রয়বাজারের প্রসার জড়িত হইয়া বৃহদায়তন শিল্প-ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। যন্ত্রপাতি ও শ্রমিককে যদি পূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে হয় তবে বৃহদায়তনে উৎপাদন করিতেই হইবে। বৃহদায়তনে উৎপাদন করিতে করিতে আরও শ্রমবিভাগ এবং যন্ত্রপাতি নিয়োগের সুবিধা উপস্থিত হয়। ফলে শিল্প বৃহত্তর আকার ধারণ করে। কিন্তু বিক্রয়বাজার যদি সংকীর্ণ হয় তবে বৃহদায়তনে উৎপাদন করা বোকামি, কারণ উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রীত হইবে না। এই কারণে বিক্রয়বাজার যতদিন গ্রামের বাজারের মত বিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভব হয় নাই। সুতরাং শ্রমবিভাগ, যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং বিক্রয়বাজারের প্রসার—এই তিনটি বিষয়ই শিল্পকে বৃহদায়তনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। এ-বিষয়ে অবশ্য পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভবের তিনটি কারণ

বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধা: শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে-সকল সুবিধা হয় তাহা সকলই বৃহদায়তন শিল্প ভোগ করিতে পারে। ইহা ছাড়া, বিক্রয় ব্যাপারে এবং অর্থসংগ্রহেও কতকগুলি সুবিধা হয়।

তিন প্রকারের সুবিধা

(ক) **উৎপাদন ব্যাপারে সুবিধা:** উৎপাদন ব্যাপারে বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

ক। উৎপাদন ব্যাপারে সুবিধা

(১) সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগের জন্য যে-ব্যক্তি যে-কার্যের উপযুক্ত তাহাকে তাহাতেই নিযুক্ত রাখিয়া তাহাদের দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। অতিমাত্রায় বিশেষজ্ঞ কর্মীদেরও (specialised experts) নিয়োগ করা যাইতে পারে।

১। পূর্ণ নিয়োগ

(২) শিল্পের মোট উৎপাদন-ব্যয়কে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়—যথা, ধার্য ব্যয় (fixed cost) এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় (variable cost)। কারখানার জন্য যে-জমি লওয়া হইয়াছে তাহার খাজনা, কারখানাগৃহ, অপরিহার্য যন্ত্রপাতি, ম্যানেজার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মাহিনা ইত্যাদি এই ধার্য ব্যয়ের মধ্যে পড়ে। অপরদিকে কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি প্রভৃতি হইল পরিবর্তনশীল ব্যয়। ব্যবসায়ের আয়তনবৃদ্ধির সমানুপাতে ধার্য ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটে না বলিয়া দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় পূর্বাপেক্ষা কম হয়।

২। ধার্য ব্যয় হ্রাস

(৩) একসংগে বহু পরিমাণে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি কেনা হয় বলিয়া দামের দিক দিয়া সুবিধা পাওয়া যায় এবং একসংগে অনেক মাল লইয়া আসিলে পরিবহণ-ব্যয়ও কম পড়ে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে মালপত্র কেনা ও পরিবহণ ব্যাপারে পাইকারী দরের যে সুবিধা পায় তাহা ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয় না।

৩। মাল কেনার সুবিধা

৪। যন্ত্রপাতি দ্বারা ব্যয়সংক্ষেপ

(৪) নূতন নূতন আধুনিক যন্ত্রপাতি বসাইয়া ক্রমাগত ব্যয়সংক্ষেপের ব্যবস্থা করা যায়।

(৫) উপজাত দ্রব্য (by-products) হইতে বিক্রয়যোগ্য পণ্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইক্ষু হইতে চিনি উৎপাদনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ছোট ছোট কারখানায় চিনি উৎপাদনের সময় অনেকটা রস নষ্ট হয়। বড় বড় কারখানায় এই রস হইতে জ্বালানির জন্য একরকম স্পিরিট তৈয়ারি করা হয়।

৫। উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার

৬। গবেষণা

(৬) বৃহদায়তন শিল্প উৎপাদনের উন্নতিকল্পে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বহু অর্থ-ব্যয়ও করিতে পারে।

(খ) বিক্রয় ব্যাপারে সুবিধা : বিক্রয় ব্যাপারেও বৃহদায়তন শিল্পের অনুরূপ কয়েকটি সুবিধা দেখা যায়। ইহা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হইতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে মাল বহন করিয়া বাজারে দিতে পারে; অনেক দ্রব্য একসংগে বিক্রয় হয়
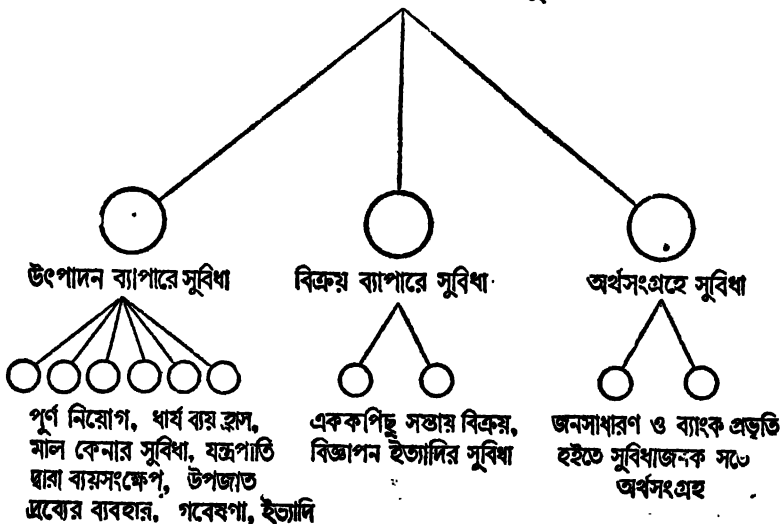
বলিয়া এককপিছু কিছু সুবিধা দিলেও মোট লাভ অধিক হইয়া থাকে। ইহা ছাড়াও, বৃহৎ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন, ক্যানভাসার নিয়োগ প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারকার্য চালাইতে পারে। ইহার উৎপন্ন দ্রব্যসমূহও পরস্পরের পক্ষে প্রচার করিতে থাকে—যেমন, বাটার জুতা বাটার মোজার বিজ্ঞাপনের কাজ করে।

খ। বিক্রয় ব্যাপারে সুবিধা

(গ) অর্থসংগ্রহে সুবিধা: বৃহদায়তন শিল্পের পক্ষে সুবিধাজনক সর্তে অর্থসংগ্রহ করা সম্ভব। ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, মহাজন প্রভৃতি যত স্বল্প সুদে এবং সহজ জামিনে বড় ব্যবসায়ীদের ঋণ দেয় ছোট ছোট ব্যবসায়ীকে তাহা দেয় না।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ (External and Internal Economies): বৃহদায়তনে উৎপাদনের উপরি-বর্ণিত সুবিধাসমূহকে সংক্ষেপে 'আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ' (economies of scale) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মার্শাল ইহাদিগকে বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ (external economies) এবং আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ (internal economies)—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ:

বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপের উদ্ভব হয় প্রধানত একদেশতার জন্য।* কোন শিল্প (industry) বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের (firm) আয়তন সম্প্রসারণের ফলে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে-সকল সুবিধা ভোগ করিতে সমর্থ হয় তাহাই বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া অভিহিত। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, শিল্পের আয়তন সম্প্রসারণের ফলে এই ব্যয়সংক্ষেপ কোন বিশেষ শিল্প-প্রতিষ্ঠান এককভাবে ভোগ করে না, সংগে সংগে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও উহা ভোগ করিতে সমর্থ হয়। যেমন, পশ্চিমবংগে হুগলী নদীর দুই তীরে যে অসংখ্য পাটকল-শ্রমিক আসিয়া হাজির হয় তাহার সুবিধা কোন পাটকল এককভাবে ভোগ করে না, সকল পাটকলই ঐ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। আবার কোন বিশেষ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তনবৃদ্ধি ব্যতিরেকেও উহা অপরের আয়তনবৃদ্ধির দরুন ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা ভোগ করিতে পারে। জামসেদপুরে টাটার কারখানা সম্প্রসারণের দরুন নূতন কোন রেললাইন পাতা হইলে ঐখানে যে টিন-পাত শিল্প (tin-plate industry) আছে তাহারও পরিবহণজনিত কিছু ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিবে।

ক। বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ

আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা শিল্প-প্রতিষ্ঠান কিন্তু এককভাবে ভোগ করে। ইহা দেখা দেয় কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়তনবৃদ্ধির ফলে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তনবৃদ্ধি ঘটিলে উহা অপেক্ষাকৃত সস্তা দামে কাঁচামাল কিনিতে পারে,

খ। আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ

* "External economies are those that...arise from the localisation of industries."

অপেক্ষাকৃত কম সুদে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে, নূতন নূতন যন্ত্রপাতি বসাইতে পারে, উপজাত দ্রব্য হইতে নূতন বিক্রয়যোগ্য পণ্য উৎপাদন করিতে পারে, দক্ষ ম্যানেজার ও কর্মী নিয়োগ করিতে পারে, ইত্যাদি।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Small-scale Industry): বৃহদায়তন উৎপাদনের উপরি-উক্ত সুবিধা সত্ত্বেও দেখা যায় যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-ব্যবস্থা এখনও টিকিয়া আছে। শুধু টিকিয়া আছে বলিলে অবশ্য ভুল হইবে, অনেক ক্ষেত্রে নিজ প্রাধান্যও বজায় রাখিয়াছে। ইহার কারণ হইল বৃহদায়তনে উৎপাদনের যেরূপ সুবিধা আছে সেইরূপ কতকগুলি অসুবিধা বা সীমাও আছে। এই অসুবিধাগুলিই ক্ষুদ্র শিল্পের সুবিধা হিসাবে দেখা দেয়।

প্রথমত, কতক প্রকারের জিনিসপত্র বহুল অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণে উৎপাদন করিলেই অধিক সফলতা লাভ করা যায়। যে-সকল দ্রব্যের চাহিদা ব্যক্তিগত রুচি-পছন্দ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল তাহাদিগকে বৃহদায়তন শিল্পে বহুল পরিমাণে উৎপাদন করা যায় না। এইজন্য দেখা যায় যে বাজারে 'রেডিমেড' পোশাকের প্রাচুর্য সত্ত্বেও দর্জির দোকানের সংখ্যা কমে নাই। অনেক দ্রব্য নির্মাণে আবার ব্যক্তিগত নিপুণতার প্রয়োজন হয়। ইহাদিগকেও বহুল পরিমাণে উৎপাদন করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, কাশ্মীরী শালের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং বৃহদায়তনে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার ব্যক্তিগত চাহিদার দ্বারা সীমাবদ্ধ। বাজার আবার ভৌগোলিক কারণেও সীমাবদ্ধ হয়। কাঁচা দুধ, মাছ, তরিতরকারি প্রভৃতি অধিকাংশ মাত্র স্থানীয় বাজারেই বিক্রয় করা চলে। এইজন্য এই সকল দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অতি বৃহদায়তন হইতে পারে না। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান টিকিয়া থাকে। এই দিকে লক্ষ্য করিয়া অ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছিলেন যে বাজারের আয়তনই শ্রমবিভাগ বা বৃহদায়তনে উৎপাদনের সীমা নির্দেশ করে।*

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সুবিধা: ১। সকল দ্রব্য বৃহদায়তনে উৎপাদন করা যায় না

দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে মালিক সকলের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারে। ইহার ফলে কাঁচামাল সরবরাহকারী ঠকাইতে পারে না, শ্রমিক ঠিকমত কাজ করে, খরিদ্দারের যত্ন লওয়া সম্ভব হয়, ইত্যাদি।

২। ক্ষুদ্র শিল্পে মালিকের দৃষ্টি সর্বত্র থাকে

তৃতীয়ত, পরস্পরের নিকট থাকিয়া কাজ করার ফলে ক্ষুদ্র শিল্পে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কও গড়িয়া উঠে।

৩। মালিক-শ্রমিকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক

চতুর্থত, পরিচালনার দিক দিয়াও ক্ষুদ্র শিল্পের কয়েকটি সুবিধা রহিয়াছে। বৃহদায়তন শিল্পের পরিচালনা-ব্যবস্থা অতি জটিল। ইহা রুটিন-পদ্ধতিতেই চলে;

* Division of labour is limited by the extent of the market.

ফলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময় অযথা বিলম্ব হয়, নানারূপ অপচয় ঘটে এবং ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের এই অসুবিধা নাই। ইহাতে মালিক বা পরিচালক দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহা কার্যকর করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে।

৪। পরিচালনার সুবিধা

পঞ্চমত, ব্যবসায়ের আয়তন একটা সীমা ছাড়াইয়া গেলে তাহা পরিচালনা করা দুষ্কর হইয়া পড়িতে পারে, কারণ লোকের পরিচালনা ক্ষমতার একটা সীমা আছে। এইরূপ ঘটিলে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাতের অভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু হইতে পারে।* পরিচালক প্রয়োজনমত মূলধন সংগ্রহ করিতে না পারিলে অথবা প্রয়োজনমত শ্রমিক নিয়োগ করিতে না পারিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে পারে। অনেক সময় এই মূলধন সংগ্রহ করার অসুবিধার জন্যই ব্যবসায়ের আয়তনকে সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়।

ক্ষুদ্র শিল্পে কিন্তু এই অসুবিধা নাই। অল্প লইয়া কারবার করে বলিয়া ইহার পক্ষে উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে কাম্য অনুপাত নির্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সুতরাং ইহা ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়াকে এড়াইয়া চলিতে পারে।

৫। ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদন হ্রাসের বিধির ভয় নাই

পরিশেষে, বৃহদায়তনে উৎপাদন সর্বদা বাজারে চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হয়। নচেৎ, উৎপন্ন দ্রব্য অবিক্রীত থাকার ফলে শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। ক্ষুদ্র শিল্পের পক্ষে এ-সমস্যা কিন্তু অতটা গুরুত্বপূর্ণ নহে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সামান্য পরিমাণে উৎপাদন করে; সুতরাং চাহিদার সামান্য হ্রাসবৃদ্ধিতে তাহার বিশেষ কিছু যায় আসে না। কোন বৎসরে পূজার সময়ে জুতার চাহিদা পূর্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ কমিয়া গেলে বাটা কোম্পানীর যতটা ক্ষতি হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জুতা নির্মাতার ততটা ক্ষতি হয় না।

৬। বাজারের সামান্য পরিবর্তনেও উহার কিছু যায় আসে না

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের এই সকল সুবিধা বা বৃহদায়তন শিল্পের এই সকল অসুবিধার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইংলণ্ড প্রভৃতি অতি শিল্পোন্নত দেশেও ক্ষুদ্র শিল্প বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিয়া আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষুদ্রায়তন। জাপানে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান হইল শতকরা ৮০ ভাগ। ভারতের ক্ষেত্রে ইহা শতকরা ৯৫-৯৮ ভাগের মত হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে বৃহদায়তন শিল্পোন্নয়নের সবিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৬০-৬১ সালে ঐ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি ১৩০০ কোটি টাকার মত দ্রব্য উৎপাদন

এই সকল সুবিধার জন্যই ক্ষুদ্র শিল্প স্থানচ্যুত হয় নাই

ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র শিল্প

* ৫৪ পৃষ্ঠা দেখ। সেখানে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে জমি শ্রম মূলধন ও সুংগঠন—উৎপাদনের এই চারিটি উপাদানের মধ্যে অনুপাত অকাম্য হইলেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়া সুরু হয়।

এবং ৩৬ লক্ষ লোক নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, অপরদিকে ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য ২০০ কোটি টাকার মত কম হইলেও উহাদের নিয়োগের পরিমাণ ছিল প্রায় ২ কোটি লোক।

ক্ষুদ্র শিল্পকে কুটির শিল্প হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। ক্ষুদ্র শিল্পে মালিক ভাড়াটিয়া শ্রমিকের সাহায্যে উৎপাদন করে, কিন্তু কুটির শিল্পে পরিবারের লোকেরাই প্রধানত শ্রমের যোগান দেয়।

সংক্ষিপ্তসার

বৃহদায়তন শিল্প : বর্তমান যুগ বৃহদায়তন শিল্পের যুগ। ইহার মূলে আছে তিনটি কারণ—১। শ্রমবিভাগ, ২। যন্ত্রপাতির ব্যবহার, এবং ৩। বিক্রয়বাজারের প্রসার।

শ্রমবিভাগের সূত্রপাত হয় অতি সরলভাবে; কিন্তু বর্তমানে ইহা জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। কিন্তু সুবিধাই অধিক।

যন্ত্রপাতির ব্যবহার শ্রমবিভাগের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে (১) শক্তি ও (২) সূক্ষ্মতার দিক দিয়া সুবিধা দেখা যায়। ইহার অবশ্য কয়েকটি অসুবিধাও আছে। যন্ত্রপাতি শ্রমিককে যন্ত্রে পরিণত করে, সাময়িকভাবে বেকার-সমস্যারও সৃষ্টি করে, ইত্যাদি।

বিক্রয়বাজারের প্রসার না ঘটিলে শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার সত্ত্বেও বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভব ঘটিত না।

শিল্পের একদেশতা : কোন শিল্প দেশের একস্থানে কেন্দ্রীভূত হইলে উহাকে 'একদেশতা' বলা হয়। একদেশতার মূলে আছে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয়সংক্ষেপের প্রচেষ্টা। এই ব্যয়সংক্ষেপ কাঁচামাল সংগ্রহ, শ্রমিক সংগ্রহ, বাজারে নির্মিত দ্রব্য প্রেরণ প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়া হইতে পারে। মোটকথা, যে-স্থানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে পরিবহণজনিত সুবিধা ভোগ করা যায়, শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে সেই স্থানেই ভিড় করিতে দেখা যায়, ফলে উদ্ভব হয় একদেশতার। একদেশতার যেরূপ সুবিধা আছে সেইরূপ অসুবিধা বা বিপদও আছে।

বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা : বৃহদায়তন শিল্প তিন প্রকার সুবিধা ভোগ করে—(ক) উৎপাদন ব্যাপারে সুবিধা, (খ) বিক্রয় ব্যাপারে সুবিধা, এবং (গ) অর্থসংগ্রহে সুবিধা।

উৎপাদন ব্যাপারে সুবিধা নিম্নলিখিত প্রকারের : ১। সকলকে পূর্ণভাবে নিয়োগ করা যাইতে পারে; ২। খার্য ব্যয় হ্রাস পায়; ৩। মাল কেনার সুবিধা হয়; ৪। যন্ত্রপাতি দ্বারা ব্যয়সংক্ষেপ করা যায়; ৫। উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার করা যায়; এবং ৬। গবেষণার জন্য ব্যয় করা সম্ভব হয়।

বিক্রয় ব্যাপারে সুবিধা : ১। স্বল্প ব্যয়ে বহু মাল বহন করিয়া লওয়া যায়; ২। প্রচারকার্যের জন্য ব্যয় করা সম্ভব হয়, এবং ৩। ইহার উৎপন্ন দ্রব্যও পরস্পরের পক্ষে প্রচার করিতে থাকে।

অর্থসংগ্রহে সুবিধা : বৃহদায়তন শিল্প সহজে অর্থসংগ্রহ করিতে পারে।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ : বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধাসমূহ 'আয়তনজনিত ব্যয়সংক্ষেপ' বলিয়া অভিহিত। ইহাদিগকে 'বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ' এবং 'আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ'—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। কোন শিল্প বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তন সম্প্রসারিত হইলে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে-সকল সুবিধা ভোগ করে তাহাই বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া অভিহিত; অপরদিকে কারখানার বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়তনবৃদ্ধির ফলে ঐ শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে-সকল সুবিধা এককভাবে ভোগ করে তাহাই আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংক্ষেপ বলিয়া বর্ণিত।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প : বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা সত্ত্বেও দেখা যায় যে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প টিকিয়া আছে। ইহার কারণ হইল, ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদনেরও কয়েকটি সুবিধা আছে যাহা বৃহদায়তনে উৎপাদনের সীমা নির্দেশ করে : ১। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে মালিক সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারে; ২। খরিদ্দারের প্রতি যত্ন

লইতে পারে; ৩। কতকগুলি দ্রব্য বৃহদায়তনে উৎপাদন করা যায় না; ৪। মালিক-শ্রমিকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক দৃঢ় হয়; ৫। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের মূলধন সংগ্রহের সমস্যা বিশেষ নাই; এবং ৬। বিক্রয়বাজারের তেজী-মন্দা অবস্থা দ্বারা বৃহদায়তন শিল্প অপেক্ষা কম প্রভাবান্বিত হয়।

এই সকলের ফলে দেখা যায় যে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান শুধু টিকিয়া থাকে নাই, অনেক ক্ষেত্রে নিজের প্রাধান্যও বজায় রাখিয়াছে। শুধু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে নহে, শিল্পোন্নত দেশসমূহেও বহু ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান আছে।

প্রশ্নোত্তর

1. **Discuss briefly the economies that generally result from production on a large scale. (C. U. 1958)**

বৃহদায়তনে উৎপাদন হইতে যে-সকল সুবিধার (ব্যয়সংক্ষেপের) উদ্ভব হয় তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। [৯৫-৯৭ পৃষ্ঠা]

2. **Explain briefly the advantages of Large-scale Production. (En. 1963)**

বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার সুবিধা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [৯৫-৯৭ পৃষ্ঠা]

3. **Describe the advantages and limitations of Large-scale Industries. (C. U. 1952)**

বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা ও সীমা বর্ণনা কর।

[ইংগিত: বৃহদায়তন শিল্পের সীমা বলিতে অসুবিধা বুঝায়। এই অসুবিধাগুলির জন্যই ক্ষুদ্র শিল্প-ব্যবস্থা টিকিয়া আছে।...(৯৫-৯৭ এবং ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা)]

4. **What are the benefits of large-scale production? Are these benefits equally available in every branch of production? (B. U. 1961)**

বৃহদায়তন উৎপাদন হইতে কি কি সুবিধা পাওয়া যায়? এই সুবিধাগুলি কি প্রত্যেক উৎপাদন-ক্ষেত্রেই ভোগ করা যায়?

[ইংগিত: যে-সকল দ্রব্য বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্র আয়তনেই উৎপাদন করা প্রয়োজন, যে-সকল দ্রব্যের বাজার নিয়ত পরিবর্তনশীল সেখানে বৃহদায়তনের সুবিধা বিশেষ ভোগ করা যায় না...এবং ৯৫-৯৭, ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা]

5. **In spite of advantages enjoyed by Large-scale Industries Small-scale ndustries are found to exist side by side. How would you explain this?**

বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা সত্ত্বেও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অস্তিত্ব পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। কিভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিবে? [৯৮-১০০ পৃষ্ঠা]

6. **Describe the advantages and disadvantages of Division of Labour. Discuss the statement that 'Division of Labour is limited by extent of the market'. (C. U. 1959)**

শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর। 'শ্রমবিভাগের সীমা বাজারের আয়তন দ্বারা নির্দিষ্ট'—উক্তিটির আলোচনা কর।

[ইংগিত: শ্রমবিভাগের ফলে বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভব হয়। কিন্তু শিল্প যতটা বৃহদায়তন হওয়া সম্ভব শ্রমবিভাগ ততটা সম্প্রসারিত হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ বলিয়া শিল্প বিশেষ বৃহদায়তন হইতে পারে না; ফলে শ্রমবিভাগও বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না।...(৯০-৯১ এবং ৯৮ পৃষ্ঠা)]

7. **Explain briefly the advantages and limitations of Division of Labour. (En. 1964)**

শ্রমবিভাগের সুবিধা ও সীমা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[ইংগিত: শ্রমবিভাগের যেমন কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে, আবার তেমনি কতকগুলি অসুবিধাও আছে। এই অসুবিধাগুলির জন্যই শ্রমবিভাগ অনির্দিষ্টভাবে সম্প্রসারিত হইতে পারে না। শ্রমিক উহাতে

আপত্তি করিয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, শ্রমবিভাগের অবশ্যম্ভাবী ফল হইল বৃহদায়তন শিল্প। বৃহদায়তন শিল্প নানাভাবে সীমাবদ্ধ বলিয়া শ্রমবিভাগও সীমানির্দিষ্ট হয়। যেমন, কতকগুলি দ্রব্য বৃহদায়তনে উৎপাদন করা অথবা ব্যাপক বাজারে বিক্রয় করা যায় না বলিয়া শ্রমবিভাগও বিশেষ সম্প্রসারিত হইতে পারে না।......এবং ৯০-৯১ এবং ৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা]

8. **Explain and illustrate the advantages of Division of Labour.**
(P. U. 1964)

উদাহরণসহ শ্রমবিভাগের সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা কর। [৯০-৯১ পৃষ্ঠা]

9. **Account for Localisation of Industries. What are its advantages and dangers ?** (C. U. 1961, '63)

শিল্পের একদেশতার কারণ ব্যাখ্যা কর। ইহার সুবিধা-অসুবিধা কি কি ? [৯৩-৯৫ পৃষ্ঠা]

দশম অধ্যায়

টাকাকড়ি ও ব্যাংক-ব্যবস্থা

(Money and Banking)

অর্থবিদ্যা মানুষের জীবনযাত্রার টাকাকড়ির ভূমিকা লইয়া আলোচনা করে। কারণ, টাকাকড়ির মাধ্যমেই বর্তমানে বিনিময়কার্য সম্পাদিত হয়, এবং টাকাকড়ির মাপকাঠিতেই লোকের অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিমাপ করা হয়।* কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে চিরকালই এইরূপ ছিল না। প্রথমে মানুষকে স্বয়ং ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া অভাব মিটাইতে হইত; এবং পরে অভাব বৃদ্ধি পাইলে এবং শ্রমবিভাগ দেখা দিলে সে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় (barter) করিত। দ্রব্য-বিনিময়ে নানারূপ অসুবিধা অনুভূত হওয়ায় টাকাকড়ির উদ্ভব হয়।

প্রথমত, দ্রব্য-বিনিময় ব্যাপারে বিনিময়কারী ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে অভাবের সংগতির (coincidence of wants) প্রয়োজন ছিল। যে-ব্যক্তির ধান্যের পরিবর্তে বস্ত্র সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন ছিল তাহাকে এরূপ এক বস্ত্র-উৎপাদনকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত যাহার ধান্যের অভাব আছে। ইহা না হইলে প্রত্যক্ষ বিনিময় সম্পাদিত হইত না। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় জিনিসপত্র ইচ্ছামত বিভক্ত করা যাইত না বলিয়া অসুবিধা দেখা দিত। একটি গরুর মূল্য ২০ কুইণ্টাল গম হইলে যাহার মাত্র ২ কুইণ্টাল গমের প্রয়োজন ছিল তাহাকে ২০ কুইণ্টাল গমই লইতে হইত। কারণ, গরুটিকে ত আর ১০ ভাগে ভাগ

দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধার জন্য টাকাকড়ির উদ্ভব হয়

---

* ৪ পৃষ্ঠা দেখ।

করিয়া মাত্র ১ ভাগ গম-বিক্রেতাকে দেওয়া যাইত না। তৃতীয়ত, বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য-নির্ধারণ করাও কঠিন ছিল। ১ কুইণ্টাল গমের বিনিময়ে ১.৫ কুইণ্টাল ধান্য, ২ কুইণ্টাল তৈলের বিনিময়ে ৫ খানি বস্ত্র, ১৫ খানি বস্ত্রের বিনিময়ে ১ কুইণ্টাল ধান্য পাওয়া গেলে ১ কুইণ্টাল তৈলের বিনিময়ে কতটা গম পাওয়া যাইবে তাহা নির্ণয় করা বিশেষ কঠিন হইয়া দাঁড়াইত।

টাকাকড়ির প্রচলন হইলে এই সকল অসুবিধা দূর হইয়া যায়। যে-লোক ধান্যের বিনিময়ে বস্ত্র সংগ্রহ করিতে চায় তাহাকে আর ধান্যের অভাব আছে এইরূপ বস্ত্র-উৎপাদনকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না, গরু-বিক্রেতাকে বাধ্য হইয়া ২০ কুইণ্টাল গম লইতে হয় না এবং ১ কুইণ্টাল তৈলের বিনিময়ে কি পরিমাণ গম পাওয়া যাইবে তাহার হিসাবের জন্য বিরাট অংক কষিতে হয় না।

টাকাকড়ি হইল বিনিময়ের সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম। সকলেই টাকাকড়ির মাধ্যমে দ্রব্যাদি বিনিময় করে। একখানি ১০ টাকার নোটের বিনিময়ে ঐ পরিমাণ মূল্যের সকল জিনিসই পাওয়া যাইবে। এই নোটকে কাগজী মুদ্রা (paper money) বলা হয়। কাগজী মুদ্রা ছাড়াও ধাতব মুদ্রা আছে—যথা, পুরাতন টাকা আধুলি সিকি এবং ১, ২, ৫, ১০, ২৫, ৫০ নয়া পয়সা প্রভৃতি।* এই কাগজী ও ধাতব মুদ্রার প্রচলন হইয়াছে বহু পরে। প্রথম প্রথম কোন বিশেষ দ্রব্যকেই টাকা-কড়ি বা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হইত। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে গরু, ছাগল, চামড়া, শস্য, কড়ি এমনকি ক্রীতদাসও বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সকল গরু ছাগল বা ক্রীতদাস একই রকমের নহে বলিয়া মূল্য-নির্ধারণের অসুবিধা দূরীভূত হয় নাই। ফলে মানুষকে ধাতব মুদ্রার দিকে ঝুঁকিতে হইয়াছে। ধাতুর মধ্যেও মানুষ তাম্র ব্রোঞ্জ স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু একসংগে বহু সোনা ও রূপার টাকা বহন করিয়া লইয়া যাওয়া অসুবিধাজনক। প্রথমত, এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কাগজী মুদ্রার প্রচলন হয়। বর্তমানে কাগজী মুদ্রাই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্যলাভ করিয়াছে এবং টাকাকড়ির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক হিসাবে ধাতব মুদ্রা প্রচলিত রহিয়াছে।

টাকাকড়ি বিনিময়ের মাধ্যম

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকার বিনিময়ের মাধ্যম

বর্তমানের মুদ্রা-ব্যবস্থা

টাকাকড়ির কার্যাবলী (Functions of Money): উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে টাকাকড়ির কার্যাবলী সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা করা যাইবে। টাকাকড়ি শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য করে না; ইহা মূল্যেরও পরিমাপ করে। বর্তমানে মূল্য (value) টাকাকড়ির অংকেই প্রকাশ

* কিছুদিন পরে পুরাতন আধুলি সিকি প্রভৃতির প্রচলন থাকিবে না এবং 'নয়া পয়সা' পয়সা নামে অভিহিত হইবে।

করা হয়। এইভাবে প্রকাশিত মূল্যকে দাম বলে।* আবার টাকাকড়ির অংকেই সঞ্চয় করা হয় এবং দেনাপাওনা মিটানো হয়। সুতরাং দেখা যায়, টাকাকড়ির কার্যাবলী প্রধানত চারিটি: (ক) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য, (খ) মূল্য পরিমাপের কার্য, (গ) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য, এবং (ঘ) দেনাপাওনা মিটানোর মান হিসাবে কার্য।

চারিটি প্রধান কার্য

(ক) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য (Function as a Medium of Exchange): ইহাই টাকাকড়ির প্রাথমিক কার্য এবং টাকাকড়ির প্রচলন হয় এই কার্য সম্পাদনের জন্যই। বর্তমানে লোকে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় না করিয়া টাকাকড়ির মাধ্যমেই করে।

(খ) মূল্যের পরিমাপ হিসাবে কার্য (Function as a Measure of Value): বর্তমানে আমরা দ্রব্যাদির বিনিময়-মূল্য নির্ধারণ করি না, টাকাকড়ির অংকে উহাদের 'দাম' নির্ধারণ করি। যখন বলি যে ১ কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম ২ টাকা, তখন ঐ পরিমাণ সরিষার তৈলের মূল্য পরিমাপের জন্য 'টাকাকড়ি' ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে টাকা (Rupee) মূল্য পরিমাপের একক। অন্যান্য দেশেরও এইরূপ নিজ নিজ একক আছে—যেমন, ইংলণ্ডের পাউণ্ড, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার, সোবিয়েত ইউনিয়নের রুবল, পাকিস্তানের পাকিস্তানী টাকা, ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক বিনিময়ের সুবিধার জন্য বিভিন্ন দেশের টাকাকড়ির 'এককে'র মধ্যে বিনিময়-হার নির্দিষ্ট থাকে। যেমন, ভারতের একটি টাকার বিনিময়ে ইংলণ্ডের ১ শিলিং ৬ পেনি পাওয়া যায়।

মূল্য পরিমাপের একক

(গ) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য (Function as a Store of Value): লোকের আয় একসংগে ব্যয়িত হয় না। যে ব্যক্তি মাস-মাহিনা পায় সে সারামাস ধরিয়া ধীরে ধীরে ব্যয় করে; যে কৃষক মাত্র একপ্রকার শস্য উৎপাদন করে তাহাকে উহার বিনিময়ে সারাবৎসর ব্যয়নির্বাহের উদ্দেশ্যে চালাইতে হয়। পূর্বে এইরূপ বর্তমান আয় হইতে ভবিষ্যৎ জিনিসপত্র মজুত রাখা হইত; বর্তমানে টাকাকড়িই মজুত রাখা হয়। আবার লোকে ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, পুত্রকন্যার শিক্ষা ইত্যাদির জন্য সঞ্চয়ও করে। বর্তমানে ইহাও টাকাকড়ির আকারে করা হয়। জিনিসপত্র মজুত রাখা বা স্বর্ণ-রৌপ্য ভূগর্ভে লুকাইয়া রাখা অপেক্ষা টাকাকড়ির আকারে সঞ্চয় করা অনেক সুবিধা-জনক ও নিরাপদ। টাকাকড়ি নষ্ট হয় না, মাটির তলায় লুকাইয়া রাখারও প্রয়োজন হয় না। ব্যাংকে, পোষ্ট অফিসে বা সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া উহা জমা রাখা যাইতে পারে। ব্যাংক ও সরকার জমা টাকাকড়িকে উৎপাদনশীল

বর্তমানে জিনিসপত্রের পরিবর্তে টাকাকড়ি সঞ্চয় করা হয়

এইরূপ সঞ্চয়ের উপযোগিতা

* ২২ পৃষ্ঠা দেখ।

কার্যে নিয়োগ করে। এইভাবে সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য সম্পাদনের দ্বারা টাকাকড়ি অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

(ঘ) দেনাপাওনার মান হিসাবে কার্য (Function as a Standard of Deferred Payment): বর্তমান সমাজে দেনাপাওনা মিটানোর কার্য সর্বদাই চলিয়া থাকে। পূর্বে জিনিসপত্র ঋণ করা হইত এবং ঐ জিনিসপত্রেই ঋণ পরিশোধ করা হইত। এই ব্যবস্থার অসুবিধা হইল যে জিনিসপত্র সকল সময় একই প্রকারের হয় না। একটি ছাগল ধার লইয়া পরে ছাগল ফেরত দিতে গেলে মহাজন ভালভাবে দেখিয়া লইবে যে ছাগলটি কিরূপ। মনঃপূত না হইলে সে অন্য একটি ছাগল লইয়া আসিতে বলিবে; কিন্তু খাতকের হয়ত আর ছাগল নাই। টাকাকড়ির মাধ্যমে দেনাপাওনা মিটাইলে এইরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি ১০০ টাকা ধার লইয়াছে সে ১০০ টাকাই শোধ দিবে; কিছু সুদ দেওয়ার কথা থাকিলে কিছু সুদও দিবে।

টাকাকড়ির মাধ্যমে দেনাপাওনা মিটানোর সুবিধা

সঞ্চয়ের ভাণ্ডার ও দেনাপাওনার মান হিসাবে কার্য করিবার জন্য টাকাকড়ির মূল্য স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ, যাহারা সঞ্চয় করে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ১০ হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছে, টাকাকড়ির মূল্য অর্ধেক হইয়া গেলে তাহার সঞ্চয়ের মূল্য ৫ হাজার টাকা হইয়া যাইবে; অথবা যে ব্যক্তি ১০০ টাকা ধার দিয়াছে সে ফেরত পাইবার সময়ে প্রকৃতপক্ষে অর্ধেক ফেরত পাইবে। সুতরাং, টাকাকড়ির মূল্য বিশেষ পরিবর্তনশীল হইলে চলিবে না। কিন্তু দেখা যায় যে আধুনিক সমাজে টাকাকড়ির মূল্য প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। এ-পরিবর্তন যতটা কম হয় তাহা দেখাই সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্য। এ-সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা হইতেছে।

টাকাকড়ির মূল্যের স্থায়িত্ব প্রয়োজন

টাকাকড়ির আরও একটি উল্লেখযোগ্য কার্য আছে। টাকাকড়িই বর্তমানে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখিয়াছে। সংগঠক টাকাকড়ি দিয়াই কাঁচামাল ক্রয় করে, শ্রমিককে মজুরি প্রদান করে, জমির মালিকের খাজনা মিটায় এবং মূলধন সরবরাহকারীকে সুদ দেয়। টাকাকড়ি না থাকিলে ইহাদের সকলের জন্যই তাহাকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করিতে হইত; ফলে সে উৎপাদনকার্যে মনোনিবেশ করিবার অবকাশই পাইত না।

টাকাকড়ির আর একটি কার্য—উৎপাদন-ব্যবস্থা চালু রাখা

টাকাকড়ি কি? (What is Money?): এখন প্রশ্ন করা যায়, টাকাকড়ি কি? ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে যাহাই টাকাকড়ির কার্য

সম্পাদন করে তাহাই টাকাকড়ি (money is what money does)।

যাহাই টাকাকড়ির কার্য সম্পাদন করে তাহাই টাকাকড়ি

সুতরাং, যে-কোন বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপ, সঞ্চয়ের ভাণ্ডার এবং লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে কার্য করিবে, তাহাকেই টাকাকড়ি বলিয়া অভিহিত করা যায়। কাগজী মুদ্রায় যদি এই সকল কার্য চলে তবে কাগজী মুদ্রাই টাকাকড়ি।

এই সকল কার্য সম্পাদন করিবার জন্য যে-বস্তু টাকাকড়ি হিসাবে প্রচলিত আছে তাহাকে সর্বজনগ্রাহ্য করিতে হইবে। অর্থাৎ, বিনিময় ও দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে সকলে ঐ বস্তুকে লইতে স্বীকার করিবে। বর্তমানে যে-প্রকার টাকাকড়ি সকলকেই লইতে হইবে তাহা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ আইন-নির্দিষ্ট টাকাকড়িকে বিহিত মুদ্রা (legal tender money) বলে। বর্তমানে আমাদের দেশে নয়া পয়সার মুদ্রা এবং পুরাতন সিকি আধুলি প্রভৃতি উভয়ই বিহিত মুদ্রা। কিন্তু কিছুদিন পরে পুরাতন সিকি আধুলি বিনিময় ও লেনদেনের কার্যে চলিবে না—কারণ, উহারা আর বিহিত মুদ্রা থাকিবে না।

টাকাকড়ি হইতে হইলে বস্তুকে সর্বজন-গ্রাহ্য হইতে হইবে

অতএব, টাকাকড়ির সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায়: বিনিময় ও দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে যে-বস্তু সর্বজনগ্রাহ্য তাহাই টাকাকড়ি। সঞ্চয় ও হিসাবনিকাশ ইহার অংকেই করা হয়।

সংজ্ঞা: সর্বজনগ্রাহ্য বিনিময়ের মাধ্যমই টাকাকড়ি

বিভিন্ন প্রকারের টাকাকড়ি (Kinds of Money): টাকাকড়ির মাধ্যমে হিসাবনিকাশ এবং বিনিময়কার্য সম্পাদন করা হয়। সুতরাং প্রথমত, টাকাকড়ি দুই প্রকারের হইতে পারে: (১) হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি (money of account), এবং (২) আসল টাকাকড়ি (actual money)। হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি আসলে বর্তমান নাও থাকিতে পারে। ভারতে সেদিন পর্যন্ত পাই পয়সার অংকে হিসাব করা হইত; কিন্তু পাই পয়সার প্রচলন বহুদিন পূর্বেই উঠিয়া গিয়াছিল। সুতরাং আসল টাকাকড়ি হইল তাহাই যাহা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত থাকে।

১। হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি এবং আসল টাকাকড়ি

আসল টাকাকড়ি আবার কাগজী (paper money) এবং ধাতব (metallic money) এই দুই প্রকারের হয়। কাগজী টাকাকড়ি সরকার বা ব্যাংক প্রচলন করিয়া থাকে। সরকার কর্তৃক পরিচালিত হইলে উহাকে কারেন্সী নোট এবং ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত হইলে উহাকে ব্যাংক-নোট বলা হয়। সরকার যে কারেন্সী নোট প্রচলন করে তাহা দুই প্রকারের হয়—(১) পরিবর্তনীয় (convertible), এবং (২) অপরিবর্তনীয় (inconvertible)। দাবি করা হইলে পরিবর্তনীয় কাগজী

২। কাগজী ও ধাতব টাকাকড়ি

মুদ্রার পরিবর্তে সরকার স্বর্ণ অথবা রৌপ্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকে, কিন্তু অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ব্যাংক-নোট সকল সময়েই পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা। আমাদের দেশে সরকার যে ১ টাকার নোট প্রচলন করে উহা অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা; এবং অন্য সমস্ত নোট যাহা রিজার্ভ ব্যাংক প্রচলন করে তাহা পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা।

৩। কাগজী নোট দুই প্রকারের—পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয়

ধাতব মুদ্রা প্রধানত দুই প্রকারের—(১) প্রামাণিক মুদ্রা (Standard Coin), এবং (২) নিদর্শক মুদ্রা (Token Coin)। প্রামাণিক মুদ্রাই দেশের প্রধান মুদ্রা। সাধারণত ইহা স্বর্ণে বা রৌপ্যে নির্মিত হয় এবং ইহার ধাতুমূল্য লিখিত মূল্যের (face value) সমান হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা (Sovereign) ছিল এই ধরনের প্রামাণিক মুদ্রা। ইহাকে গলাইয়া ফেলিলে ২০ শিলিং মূল্যের স্বর্ণ পাওয়া যাইত।

৪। ধাতব মুদ্রা দুই প্রকারের—প্রামাণিক ও নিদর্শক

নিদর্শক মুদ্রা বলিতে নিকৃষ্টতর ধাতুনির্মিত মুদ্রাসমূদয়কেই বুঝায়। উহারা মূল্যের নিদর্শক (token of value) মাত্র। অর্থাৎ, উহাদের লিখিত মূল্য ও ধাতব মূল্য সমান হয় না। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত নিকেলের টাকা, পুরাতন আধুলি, সিকি, নয়া পয়সার মুদ্রা সকলই নিদর্শক মুদ্রা। উহাদের গলাইয়া বিক্রয় করিলে ঐ পরিমাণ মূল্য পাওয়া যায় না।

মুদ্রার আর একটি শ্রেণীবিভাগ হইল সসীম বিহিত মুদ্রা (limited legal tender) এবং অসীম বিহিত মুদ্রার (unlimited legal tender) মধ্যে। কতক প্রকারের মুদ্রা বিনিময় বা দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক দিলে লোকে লইতে অস্বীকার করিতে পারে। ইহাদিগকে সসীম বিহিত মুদ্রা বলে। অপরদিকে অসীম বিহিত মুদ্রা হইল তাহাই যাহা বিনিময় ও দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে যে-কোন পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। ভারতে সিকি আধুলি নয়া পয়সার মুদ্রা প্রভৃতি সসীম বিহিত মুদ্রা। ইহাদিগকে ১ টাকার বেশী দিলে লোকে লইতে অস্বীকার করিতে পারে। কিন্তু ১ টাকার মুদ্রা বা নোট অসীম বিহিত মুদ্রা। লোকে ইহাদিগকে যে-কোন পরিমাণে লইতে বাধ্য।

৫। সসীম ও অসীম বিহিত মুদ্রা

মুদ্রামান (Monetary Standards): কাগজী ও ধাতব উভয় প্রকার মুদ্রার প্রচলনই বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে করা হয়। মুদ্রা প্রচলনের এই পদ্ধতিকেই মুদ্রামান বলে। মুদ্রামান প্রধানত দুই প্রকারের হয়—(১) ধাতব মুদ্রামান (Metallic Standard), এবং (২) কাগজী মুদ্রামান (Paper Standard)।

ধাতব মুদ্রামান ও কাগজী মুদ্রামান

ধাতব মুদ্রামানের অধীনে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য মুদ্রা অথবা উভয় ধাতু নির্মিত মুদ্রাই প্রামাণিক ও অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকে। কেবলমাত্র

স্বর্ণমুদ্রা এইরূপ প্রচলিত থাকিলে উহাকে একধাতু স্বর্ণমান (Monometallic Gold Standard), মাত্র রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত থাকিলে উহাকে একধাতু রৌপ্যমান (Monometallic Silver Standard) এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় মুদ্রাই প্রচলিত থাকিলে উহাকে দ্বিধাতুমান (Bimetallic) বলিয়া অভিহিত করা হয়। দ্বিধাতুমানের অধীনে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে বিনিময়ের হার আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং উভয়ই অসীম বিহিত মুদ্রা বলিয়া ঘোষিত হয়। যাহাতে বাজারে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে মূল্যের পার্থক্য দেখা না দেয় তাহার জন্য অবাধ মুদ্রাংকনের ব্যবস্থা থাকে। অর্থাৎ, যে-কেহ স্বর্ণ বা রৌপ্য লইয়া গিয়া টাঁকশাল হইতে উহার বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা পাইতে পারে।* ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এইরূপ দ্বিধাতুমান-ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। পরে ১৮৩৫ সাল হইতে একধাতু রৌপ্যমান-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

একধাতু স্বর্ণমান, একধাতু রৌপ্যমান ও দ্বিধাতুমান

কাগজী মুদ্রামানের অধীনে অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রাকেই অসীম বিহিত মুদ্রা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কাগজী মুদ্রা প্রচলিত থাকিলেই কাগজী মুদ্রামানের উদ্ভব হয় না—কারণ, ঐ কাগজী মুদ্রা সম্পূর্ণ পরিবর্তনীয় মুদ্রা বা প্রতিনিধিত্বমূলক মুদ্রা (representative money) হইতে পারে। প্রতিনিধিত্বমূলক মুদ্রা বলিতে সেই মুদ্রাকেই বুঝায় যাহা প্রামাণিক মুদ্রার প্রতিনিধিত্ব করে। জনসাধারণ দাবি করিবামাত্র কাগজের নোটের পরিবর্তে ঐ প্রামাণিক ধাতুমুদ্রা বা ঐ ধাতু প্রদান করিতে হইবে। এই কারণে প্রতিনিধিত্বমূলক মুদ্রার বিরুদ্ধে শতকরা ১০০ ভাগই ধাতু জমা রাখা হয়। বিগত তৃতীয় দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণ-দাবিপত্র (Gold Certificate) ছিল এইরূপ প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী মুদ্রা।

কাগজী মুদ্রামানের প্রকৃতি

বিভিন্ন প্রকারের স্বর্ণমান (Varieties of Gold Standard) : উপরে যে স্বর্ণমানের বর্ণনা দেওয়া হইল তাহাকে স্বর্ণমুদ্রামান (Gold Currency or Gold Circulation Standard) বলে। ইহাতে স্বর্ণমুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত থাকে। কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা একেবারে প্রচলিত না করিয়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত স্বর্ণ-দাবিপত্র বা কাগজী নোটের দ্বারাও স্বর্ণমান বজায় রাখা যায়। সুতরাং স্বর্ণমান বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে।

* ধরা যাউক, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে বিনিময়-মূল্য ১ : ১৬ ঠিক করিয়া দেওয়া হইল। অর্থাৎ, একটি ১ তোলা ওজনের স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে অনুরূপ ওজনের ১৬টি রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যাইবে। কিন্তু বাজারে যদি ১ তোলা স্বর্ণের বদলে ১৭ তোলা রৌপ্য পাওয়া যায় তবে লোকে স্বর্ণমুদ্রা গলাইয়া রৌপ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিবে। এইজন্য টাঁকশাল হইতে নির্দিষ্ট হারে মুদ্রা প্রদানের ব্যবস্থা থাকে। টাঁকশাল হইতে যদি একটি ১ তোলা স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে ১৬ তোলা রৌপ্য পাওয়া যায় তবে বাজারে কেহই ১ তোলা স্বর্ণের পরিবর্তে ১৭ তোলা রৌপ্য দিবে না।

ক। স্বর্ণমুদ্রামান: স্বর্ণমুদ্রামানই স্বর্ণমানের শ্রেষ্ঠ রূপ। ইহার পর স্বর্ণ-পিণ্ডমান (Gold Bullion Standard), স্বর্ণবিনিময়মান (Gold Exchange Standard), এবং স্বর্ণসমতামান (Gold Parity Standard) প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

চারি প্রকারের স্বর্ণমান

খ। স্বর্ণপিণ্ডমান: ইহার অধীনে কাগজী নোট বা কোন নিকৃষ্ট ধাতুর মুদ্রা অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকে। ইহাকে ইচ্ছামত স্বর্ণ বা স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্তিত করা যায় না। কিন্তু টাঁকশাল-কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ জনসাধারণকে ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকে। ফলে টাকাকড়ির এককের মূল্য স্বর্ণমূল্য হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না। ভারতে ১৯২৭-৩১ সাল এই কয় বৎসর স্বর্ণপিণ্ডমান প্রবর্তিত ছিল।

গ। স্বর্ণবিনিময়মান: ইহাতেও কাগজী বা নিকৃষ্ট ধাতুর মুদ্রাই অসীম বিহিত মুদ্রা বলিয়া ঘোষিত হয়। দেশের অভ্যন্তরে বিনিময়কার্যের জন্য ইহাকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা যায় না। টাঁকশাল-কর্তৃপক্ষও স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে না। কিন্তু বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ঐ মুদ্রাকে নির্দিষ্ট হারে এমন এক মুদ্রায় বিনিময় করা যায় যাহা স্বর্ণমানের উপর স্থাপিত। ব্যাখ্যা-স্বরূপ ভারতে ১৮৯৮ সাল হইতে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত স্বর্ণবিনিময়মানের উল্লেখ করা যায়।* এই সময় আভ্যন্তরীণ লেনদেনের জন্য ভারতে প্রচলিত টাকার (Rupee) পরিবর্তে স্বর্ণ পাওয়া যাইত না; কিন্তু বৈদেশিক দেনা-পাওনা মিটানোর জন্য উহার বিনিময়ে ১ টাকা=১ শিলিং ৪ পেন্স—এই হারে ব্রিটিশ মুদ্রা ষ্টার্লিং পাওয়া যাইত। ষ্টার্লিং স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই ষ্টার্লিং-এর মাধ্যমে মূল্য প্রদানের অর্থই ছিল স্বর্ণের মাধ্যমে মূল্য প্রদান করা। যথা, ভারতীয় টাকা=ষ্টার্লিং=স্বর্ণ। এইভাবে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমে স্বর্ণ প্রদান করিতে হয় বলিয়া ইহাকে স্বর্ণবিনিময়মান বলে।

ঘ। স্বর্ণসমতামান: বর্তমানে ভারতের ন্যায় অনেক দেশই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্য। আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের সদস্যপদভুক্ত হইলে দেশকে উহার মুদ্রার স্বর্ণমূল্য (gold value) ঘোষণা করিতে ও বজায় রাখিতে হয়। সকল দেশেরই মুদ্রামূল্য স্বর্ণের সহিত সম্পর্কিত থাকে বলিয়া এই সকল বিভিন্ন মুদ্রার পারস্পরিক মূল্যের সমতা দেখা যায়। এইজন্য ইহাকে স্বর্ণসমতামান বলা হয়। ভারতের টাকার স্বর্ণমূল্য যতটা, মার্কিন মুদ্রার (ডলার) ২১ সেণ্টের স্বর্ণমূল্য ততটাই। সুতরাং ভারতীয় টাকা ও মার্কিন ডলারের মধ্যে বিনিময় হার হইল ১ টাকা=২১ সেণ্ট।

অনুরূপভাবে, ভারতীয় টাকা ও ষ্টার্লিং-এর মধ্যে বিনিময় হার হইল ১ টাকা =১ শি. ৬ পে.। স্বর্ণসমতামানের উপর স্থাপিত মুদ্রাকে পরিচালিত মুদ্রা (Managed Money) বলা হয়।

পরিচালিত মুদ্রা

* অনেকের মতে, ভারতে স্বর্ণবিনিময়ের সময় ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ধরা যায়।

স্বর্ণমান সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহার হিসাবে বলা যায় যে, স্বর্ণের মাপকাঠিতে মূল্য পরিমাপ এবং শেষ পর্যন্ত স্বর্ণের দ্বারা মূল্য পরিশোধ করা হয় বলিয়াই বিশেষ মুদ্রাকে স্বর্ণমান আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু স্বর্ণবিনিময়মান ও স্বর্ণসমতামানে আভ্যন্তরীণ দেনাপাওনা মিটানোর কার্য কখনই স্বর্ণের মাধ্যমে করা হয় না ; স্বর্ণপিণ্ডমানে ইহা কতকটা করা হয় এবং স্বর্ণমুদ্রামানে ইহা পুরাপুরিই করা হয়। এইজন্য বলা হয় যে স্বর্ণমানের পরিমাণভেদ আছে (there are degrees of gold standard)।

উপসংহার

স্বর্ণমানের পরিমাণভেদ

কাগজী মুদ্রার সুবিধা-অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Paper Money) : বর্তমানে যে কাগজী মুদ্রা ধাতব মুদ্রার উপর প্রাধান্যলাভ করিয়াছে তাহার মূলে আছে কাগজী মুদ্রার বিশেষ কয়েকটি সুবিধা।

প্রথমত, কাগজী মুদ্রা সহজ বহনযোগ্য। বহু টাকার নোট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যত সুবিধাজনক বহু টাকার মুদ্রা লইয়া যাওয়া তত সুবিধাজনক নহে। ধাতব মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া লইতে অনেক সময় নষ্ট হয় ; কাগজী মুদ্রার পরীক্ষার কার্য অতি শীঘ্রই সমাপ্ত হয়।

সুবিধা :
১। সহজ বহনযোগ্যতা

দ্বিতীয়ত, কাগজী নোট মুদ্রণের ব্যয়ও কম। সোনারূপা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া মুদ্রা প্রচলন করিতে যে বিরাট ব্যয় হয় কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে তাহা বাঁচিয়া যায়। ধাতব মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে হস্তান্তরের ফলে অনেক সোনারূপা ক্ষয় হয়। ইহাকে জাতীয় ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কাগজের নোটের বেলায় এই ক্ষতি হয় না।

২। ব্যয়সংক্ষেপ

তৃতীয়ত, কাগজী মুদ্রাকে সহজেই বদলানো যায়। নোট পুরাতন হইয়া গেলে তাহাকে নষ্ট করিয়া তাহার পরিবর্তে আর একখানি নোট সহজেই ছাপিয়া লওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু ধাতব মুদ্রা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাহাকে বদলানো অপেক্ষাকৃত কঠিন।

৩। পরিবর্তনশীলতা

চতুর্থত, কাগজী মুদ্রার যোগান অতি দ্রুত বৃদ্ধি করা যায়। সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থায় ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। জাতীয় আয়বৃদ্ধির দরুন দেশে যতই ক্রয়বিক্রয় ও লেনদেনের কার্য সম্প্রসারিত হইবে টাকাকড়ির চাহিদা ততই বৃদ্ধি পাইবে। সোনা-রূপার টাকার যোগান সোনারূপার উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ইহা সকল সময় প্রয়োজনমত বাড়ানো যায় না। কিন্তু প্রয়োজনমত কাগজের নোট ছাপিয়া দিলেই হইল। অবশ্য নোট মুদ্রণের বিরুদ্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বর্ণ বা রৌপ্য জমা রাখিতে হয় ; তবে সাধারণত নোটের মূল্যের একটি অংশমাত্র এই-ভাবে জমা রাখা হয়। ফলে যত জমা হয় তাহার অনেক অধিক নোট ছাপাইয়া

৪। সম্প্রসারণশীলতা

দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকাকড়ি সরবরাহ করা চলে। বর্তমানে ভারতে যে-কোন পরিমাণ নোট ছাপার জন্য ১১৫ কোটি টাকার অধিক স্বর্ণ মজুত রাখিবার প্রয়োজন হয় না।*

এই যে যত খুশি তত নোট ছাপা চলে ইহাই কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি। ইহার জন্য সরকার রাজস্বসংগ্রহে মনোযোগ না দিয়া নোট ছাপানোতেই আগ্রহশীল হইতে পারে। ক্রমাগত নোট ছাপাইয়া গেলে ইহার বিরুদ্ধে জমার পরিমাণ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকিবে এবং একদিন কাগজী মুদ্রা 'আর পরিবর্তনীয় নয়' বলিয়া ঘোষিত হইবে। তখন উহার মূল্য দ্রুত পড়িয়া যাইবে এবং মর্যাদা নষ্ট হইবে। এই অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতির (inflation) চরম অবস্থা বলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মেনীতে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হাংগেরী, গ্রীস এবং চীন দেশে এইরূপ ঘটিয়াছিল। কাগজী নোটের দাম এত পড়িয়া গিয়াছিল যে লোকে শেষ পর্যন্ত উহা লইতেই অস্বীকার করিয়াছিল।

অসুবিধা :
১। সম্প্রসারণশীলতার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে

দ্বিতীয়ত, কাগজী নোট বিদেশীরা গ্রহণ করিতে চায় না। বর্তমানে অবশ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কাগজী মুদ্রার বিনিময়-হার স্থির করিয়া দেওয়া আছে। কিন্তু ক্রমাগত নোট ছাপাইয়া গেলে এই বিনিময়-হার বজায় রাখিতে পারা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে সকল বিদেশীই কাগজী নোট গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে।

২। কাগজী নোট বিদেশীরা গ্রহণ করে না

তৃতীয়ত, অসাবধানবশত কাগজী মুদ্রা নষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়। এক তাড়া নোট কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে পারে।

৩। ইহা একেবারে নষ্ট হইতে পারে

টাকাকড়ির সৃজন এবং ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি (Creation of Money and Bank Money): ধাতব মুদ্রার যুগে রাজ-দরবারের তত্ত্বাবধানে টাকাকড়ি সৃজন বা মুদ্রা নির্মাণ করা হইত। তারপর কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে বিভিন্ন ব্যাংক পূর্ণ পরিবর্তনীয় কাগজী নোট ছাপাইতে থাকে। বর্তমানে নোট প্রচলন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (Central Bank) একচেটিয়া অধিকার। আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এবং সরকারের নির্দেশানুসারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই কার্য সম্পাদন করে। রিজার্ভ ব্যাংক আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সুতরাং এখানে নোট প্রচলনের ভার রিজার্ভ ব্যাংকের উপর ন্যস্ত। নোট ছাড়া ধাতব মুদ্রার প্রচলন করে সরকার। আমাদের দেশে সরকার অবশ্য ১ টাকার নোটও ছাপাইয়া থাকে।

বর্তমানে নোট প্রচলন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একচেটিয়া অধিকার

* এই উদ্দেশ্যে স্বর্ণের দাম হিসাব করা হয় আন্তর্জাতিক মূল্যে (at international price) বা তোলা প্রতি ৬২.৫০ টাকা হিসাবে।

অতএব দেখা যাইতেছে, টাকাকড়ি সৃষ্টির মালিক হইল সরকার। সরকারের নির্দেশমত কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট প্রচলন এবং টাঁকশাল মুদ্রা নির্মাণ করিয়া চলে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে টাকাকড়ির যোগানবৃদ্ধি একমাত্র সরকারেরই ক্ষমতা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ-ধারণা ভুল। শুধু সরকার নহে, দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থাও টাকাকড়ির যোগান দিয়া থাকে। অন্তভাবে বলা যায়, সরকারের ন্যায় ব্যাংকগুলিও টাকাকড়ি সৃষ্টি করে। ব্যাংকের যোগান দেওয়া এইরূপ টাকাকড়িকে ব্যাংকের টাকাকড়ি বা ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি (bank money) বলা হয়।

ব্যাংক-ব্যবস্থাও টাকাকড়ি সৃষ্টি করে

ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি ব্যাংকের আমানত (bank deposits) ছাড়া আর কিছুই নয়। লোকে আমানতের বিরুদ্ধে চেক কাটিয়া লেনদেনকার্য সম্পাদন করে। সুতরাং চেকও বিনিময়ের মাধ্যম। কিন্তু চেক সকলে লইতে রাজী হয় না বলিয়া—অর্থাৎ, ইহা সর্বজনগ্রাহ্য নহে বলিয়া অনেক অর্থবিদ্যাবিদ ইহাকে টাকাকড়ি হিসাবে গণ্য করিতে চাহেন না। ইঁহাদের মতে, চেক নহে—ব্যাংকের আমানতই টাকাকড়ি। আমানতের দরুনই চেকের দাম; আমানত আছে বলিয়াই চেকের মাধ্যমে বিনিময়কার্য (যাহা টাকাকড়ির প্রাথমিক কার্য) সম্পাদন করা যায়।

আমানতই ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি

এখন প্রশ্ন, ব্যাংক আমানত বা তাহার টাকাকড়ি সৃষ্টি করে কিরূপে? এই বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্বে ব্যাংক কাহাকে বলে এবং ব্যাংকের কার্যাবলী কি কি ?—তাহা জানা প্রয়োজন।

ব্যাংক (Banks): ব্যাংক-ব্যবসায়ের উদ্ভব হয় তিনটি প্রধান ব্যবসায় হইতে—যথা, বণিকদের ব্যবসায় বা বাণিজ্য (trade), মহাজনদের ব্যবসায় (money lending) এবং স্বর্ণকারদের ব্যবসায়। বর্তমান ব্যাংক-ব্যবসায়ীর পূর্বপুরুষ বলিয়া এই তিনজনেরই নামোল্লেখ করিতে হয়। তবে ব্যাংক-ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয় বণিকদের ব্যবসায় হইতে।

ব্যাংক-ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশ

প্রথম প্রথম ব্যবসাবাণিজ্য ধাতব মুদ্রার মাধ্যমেই পরিচালিত হইত। ধাতব মুদ্রা সহজ বহনযোগ্য হইলেও লুণ্ঠিত হইবার ভয় ছিল। এই কারণে প্রাচীনকালে বণিকরা আসল টাকাকড়ি বহন না করিয়া টাকাকড়ির মালিকানার নির্দেশক লিখিত পত্র বহন করিত। যে-নগরে বণিকের বাসস্থান ছিল সেখানকার কোন প্রখ্যাত ব্যক্তি বণিকের নিকট হইতে টাকা জমা রাখিয়া এইরূপ লিখিত পত্র প্রদান করিত। অনেক সময় আবার বণিক নিজ নামেই ঐ পত্র বাহির করিত। যাহা হউক, ঐ প্রখ্যাত ব্যক্তি বা বণিকের উপর লোকের বিশ্বাস থাকায় তাহারা নগদ টাকার পরিবর্তে ঐরূপ লিখিত পত্র লইতে আপত্তি করিত না। প্রয়োজনমত তাহারা পত্র-প্রচলনকারীর নিকট উপস্থিত হইয়া নগদ টাকাও গ্রহণ

১। বণিকদের ব্যবসায়

করিতে পারিত; অথবা দেনা মিটাইতে ঐ পত্র কাহাকেও সমর্পণ করিতে পারিত। এইভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যে নগদ টাকার পরিবর্তে ঋণপত্রের ব্যবহার সুরু হইল। এই ঋণপত্রই পরে বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ বা হুণ্ডিতে পরিণত হয়।

ব্যাংক-ব্যবসায়ীর বংশের ইতিহাসে পরবর্তী পূর্বপুরুষ হইল মহাজন বা ঋণ-ব্যবসায়ী। ঋণের ব্যবসায় অতি প্রাচীন। ইহার উদ্ভব হয় টাকাকড়ির প্রচলনের সংগে সংগেই। অতীতে ঋণ-ব্যবসায়ীকে লোকে শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখিলেও তাহার যে উপযোগিতা আছে তাহা তাহারা অস্বীকার করিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম মহাজন নিজের সঞ্চিত অর্থই ব্যবসায়ে খাটাইত। এইভাবে সে ঋণের ব্যবসায়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিলে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাহীন সঞ্চিত অর্থের মালিকরা তাহাদের সঞ্চয় খাটাইবার জন্য উহা মহাজনদের হস্তে সমর্পণ করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম মহাজন কিছু কমিশন লইয়া এই টাকা খাটাইবার ব্যবস্থা করিত; ক্রমেই সে ইহা তাহার নিজের টাকাকড়ির সহিত মিশাইয়া ফেলিয়া খাটাইতে লাগিল এবং যে তাহার নিকট টাকা খাটাইবার জন্য জমা রাখিয়াছিল তাহাকে নির্দিষ্ট সুদ দিতে লাগিল। এইভাবে আমানতগ্রহণ ও ঋণপ্রদানের কার্য সুরু হইল এবং ব্যাংক-ব্যবসায় পূর্ণতর রূপ ধারণ করিল।

২। মহাজনদের ব্যবসায়

টাকাকড়ির সৃজন (creation of money) হইল ব্যাংক-ব্যবসায়ের পরবর্তী অধ্যায়। এই কার্য সুরু করে ইংরাজ স্বর্ণকারগণ। প্রাচীন ইংলণ্ডে ধনী বণিকরা স্বর্ণকারদের নিকট স্বর্ণ গচ্ছিত রাখিয়া রসিদ লইত এবং গচ্ছিত স্বর্ণ ফেরত লইবার সময় এই রসিদ প্রত্যর্পণ করিত। পরে এই রসিদ প্রত্যেকবারেই স্বর্ণকারের নিকট ফেরত না আসিয়া টাকাকড়ির মত দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে হস্তান্তরিত হইতে লাগিল। ইহাতে প্রত্যেকবারেই গচ্ছিত স্বর্ণ উঠাইয়া দেনা মিটানো এবং পাওনাদারের পক্ষে ঐ স্বর্ণ আবার গচ্ছিত রাখার অসুবিধা দূর হইল। এইরূপ হস্তান্তরযোগ্য স্বর্ণ আমানতের রসিদই পরবর্তী যুগে ব্যাংক-নোটে পরিণত হয়।

৩। স্বর্ণকারদের ব্যবসায়

আরও কিছুদিন পরে দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে সকল সময় আমানত-রসিদও ব্যবহারের প্রয়োজন হইত না। গচ্ছিতকারী তাহার গচ্ছিত স্বর্ণ হইতে কিছু পরিমাণ তাহার পাওনাদারকে প্রদানের জন্য লিখিত নির্দেশ স্বর্ণকারকে দিতে পারিত। এইরূপ লিখিত নির্দেশ চেক ছাড়া আর কিছুই নয়। চেকের উদ্ভব হওয়ায় স্বর্ণকার পুরাপুরি ব্যাংক-ব্যবসায়ীতেই পরিণত হইল।

ব্যাংক-ব্যবসায় করিতে করিতে স্বর্ণকারগণ দেখিল যে তাহাদের নিকট যত পরিমাণ স্বর্ণ গচ্ছিত থাকে তাহারা তাহার অধিক আমানত-রসিদ

(deposit receipts) বাজারে ছাড়িতে পারে, কারণ লোকে যাহা জমা রাখে তাহার অতি সামান্য অংশই সাধারণত উঠাইয়া লয়। সুতরাং তাহারা হয় অধিক আমানত-রসিদ ছাপাইয়া লোককে ধার দিতে লাগিল, অথবা গচ্ছিতকারীর হিসাবে অধিক আমানত দেখাইয়া ঐ স্ফীত আমানতের উপর চেক কাটিতে অনুমতি প্রদান করিল। যে-পন্থাই অবলম্বন করা হউক না কেন, ইহার ফলে ব্যাংক-ব্যবসায়ে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সূচিত হইল। অর্থাৎ, ব্যাংক-ব্যবস্থা (the banking system) টাকাকড়ি সৃজনের কার্য সুরু করিল* এবং ব্যাংক-ব্যবসায় বর্তমান রূপ ধারণ করিল।

ব্যাংক-ব্যবসায়ের পূর্ণ রূপ গ্রহণ

বর্তমানে ব্যাংক-ব্যবসায়ী মোটামুটিভাবে তিন ধরনের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রথমত, সে হুণ্ডি বাট্টা করা ইত্যাদির মাধ্যমে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য পরিচালনায় অর্থ-সরবরাহ করে। এই কার্য উত্তরাধিকারসূত্রে বণিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। দ্বিতীয়ত, ঋণ-ব্যবসায়ীর মত সে সঞ্চয়সংগ্রহ ও ঋণপ্রদান করে। তৃতীয়ত, সে স্বর্ণকারদের মত নগদ টাকা ছাড়াও চেকের মাধ্যমে দেনাপাওনা মিটানোর সুব্যবস্থা করিয়া দেয় এবং এই ব্যবস্থা হইতে সে টাকাকড়ি সৃজনও করিয়া থাকে।

ব্যাংক-ব্যবসায়ের সংজ্ঞা ও ব্যাংকের কার্যাবলী (Definition of Banking and Functions of Banks): ব্যাংক-ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশের উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই ব্যাংকের কার্যাবলী সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইবে। অবশ্য এ-সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন; কিন্তু তাহার পূর্বেই আবার ব্যাংকের একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

প্রধানত ব্যাংক ঋণের কারবারী। ইহা আমানতগ্রহণ ও শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণগ্রহণ করে এবং এই ঋণগৃহীত অর্থ হইতে আবার ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে ঋণপ্রদান করে। এইজন্য একজন আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ ব্যাংকের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন: ব্যাংক অর্থ-সরবরাহ ব্যাপারে অন্যতম মধ্যস্থ; ইহা ঋণ

অর্থবিদ্যার দিক হইতে ব্যাংকের সংজ্ঞা

---

* বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। স্বর্ণকারগণ যখন অভিজ্ঞতার ফলে দেখিল যে লোকে তাহাদের গচ্ছিত স্বর্ণের শতকরা দশভাগের অধিক উঠাইয়া লয় না তখন যে-স্বর্ণকারের নিকট ১ হাজার টাকার স্বর্ণ আছে সে উহার দশগুণ বা মোট ১০ হাজার টাকার আমানত-রসিদ মুদ্রণ করিয়া বাজারে ছাড়িতে লাগিল। কেহ ১ হাজার টাকার ঋণগ্রহণ করিতে আসিলে তাহাকে ১ হাজার টাকার স্বর্ণ না দিয়া ঐ অংকের একটি আমানত-রসিদ প্রদান করিল, অথবা তাহার আমানতের ঘরে ঐ পরিমাণ স্বর্ণ বেশী করিয়া জমা দেখাইল। উভয় ক্ষেত্রেই মোট টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়িয়া গেল।

আদানপ্রদানের কারবারী।* বিশ্বাসই ঋণের ভিত্তি বলিয়া ব্যাংকের কারবারকে 'বিশ্বাসের কারবার'ও (business of dealing in credit) বলা হয়। বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া লোকে ব্যাংকে টাকাকড়ি জমা রাখে, বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই আবার ব্যাংক টাকাকড়ি ঋণ হিসাবে প্রদান করে।

এইভাবে যে-কোন ঋণের কারবারীকেই অর্থবিদ্যাবিদের দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাংক-ব্যবসায়ী বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়। কিন্তু অধিকাংশ সভ্য দেশেই কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান ব্যাংক এবং কোন্ কোন্ ঋণ-ব্যবসায়ী ব্যাংক-ব্যবসায়ী (banker) বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া থাকে। ১৯৪৯ সালের ভারতীয় ব্যাংকিং কোম্পানী আইন (Banking Companies Act, 1949) দ্বারা এইরূপ ব্যাংক-ব্যবসায় ও ব্যাংক-ব্যবসায়ীর সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে। এই সংজ্ঞা অনুসারে ব্যাংক-ব্যবসায় বলিতে বুঝায় ঋণ-প্রদান ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের নিকট হইতে আমানতগ্রহণ এবং চাহিবামাত্র অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে চেক, ড্রাফট্ প্রভৃতি ঋণপত্রের মাধ্যমে নির্দেশ প্রাপ্তিমাত্র আমানত প্রত্যর্পণ। উপরন্তু, ব্যাংক-ব্যবসায়ী হিসাবে পরিগণিত হইবার জন্য প্রত্যেক ব্যাংক-ব্যবসায়ীকে রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং কার্যক্ষেত্রে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank) দ্বারা অনুমোদিত না হইলে আইনের দৃষ্টিতে কোন ঋণের কারবার 'ব্যাংক' বলিয়া গণ্য হয় না।

ব্যাংকের আইনগত সংজ্ঞা

ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা (Utility of Banking): বর্তমান অর্থনৈতিক জগতে ব্যাংক-ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়সংগ্রহ করিয়া এবং সেই সঞ্চয় শিল্পবাণিজ্যে নিয়োগ করিয়া ব্যাংক উৎপাদন-ব্যবস্থাকে চালু রাখে। ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাংকের নিকট হইতে চলতি মূলধন সংগ্রহ করে। ব্যাংকে টাকা জমা রাখা নিরাপদ; ইহাতে কিছু কিছু সুদও পাওয়া যায়। এইজন্য লোকে সঞ্চয়েও আগ্রহশীল হয়। সুতরাং ব্যাংক-ব্যবস্থা শুধু সঞ্চয়সংগ্রহ করে না, সঞ্চয়বৃদ্ধিও করে। অতএব, মূলধন-গঠনে (capital formation) দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ-সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

ব্যাংক দেশের সঞ্চয়-সংগ্রহ করিয়া বিনিয়োগ করে

ব্যাংকগুলি শুধু আমানতের মাধ্যমেই সঞ্চয়সংগ্রহ করে না; অনেক ক্ষেত্রে তাহারা শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করিয়া থাকে। এই সূত্রে বহু পরিমাণে স্থায়ী মূলধন সংগৃহীত হয়।

ব্যাংক শেয়ার প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে

* "A bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts." Cairncross

ব্যাংক-ব্যবস্থা ঋণ সৃজন করিয়া প্রয়োজনমত টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইহার ফলে শিল্পবাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয়। যদি ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনমত টাকাকড়ি সরবরাহ করা না যাইত, তবে সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থা (developing economy) পদে পদে ব্যাহত হইত।

টাকাকড়ি সৃজন করিয়া উহার যোগান বৃদ্ধি করে

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও অনেকাংশে ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। লোকে দূরে বসিয়া যখন কেনাবেচা করে তখন ব্যাংকের মাধ্যমেই টাকার লেনদেন হয়। অনেক সময় আবার ধারে কেনাবেচা চলে। ক্রেতা তখন নির্দিষ্ট সময়ের পর মূল্য পরিশোধের জন্য এক অংগীকারপত্র প্রদান করে। ইহাকে হুণ্ডি (Bill of Exchange) বলা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই টাকার প্রয়োজন হইলে বিক্রেতা ঐ হুণ্ডি ব্যাংক হইতে কিছু ডিস্কাউণ্ট বাদ দিয়া ভাঙাইয়া লইতে পারে। এইভাবে ধারে বিক্রয় করিয়াও ব্যবসায়ী ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে পারে।* বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়বিক্রয়ও ব্যাংকের মাধ্যমে হয়।

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে চলে

পরিশেষে, ব্যাংকগুলি অনেক সময় ব্যবসায়ীদের উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা এবং এজেন্ট হিসাবে কার্য করে। ইহাতেও ব্যবসাবাণিজ্য বিশেষ উপকৃত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষার প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজকল্যাণে নিরত থাকে।

ব্যাংক অন্যান্যভাবেও ব্যবসাবাণিজ্যকে সাহায্য করে

ব্যাংকের কার্যাবলী (Functions of Banks) :

ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা হইতেই ব্যাংকের নিম্নলিখিত কার্যাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়।

(ক) সঞ্চয়সংগ্রহ (Collection of Savings) : সঞ্চয়সংগ্রহই ব্যাংকের প্রাথমিক কার্য। ব্যাংক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখে এবং ইহার দরুন সুদ প্রদান করে। আমানত প্রধানত দুই ধরনের—(ক) চলতি আমানত (demand deposit), এবং (খ) মেয়াদী আমানত (time deposit)। চলতি আমানত হইতে আমানতকারী ইচ্ছামত চেক কাটিয়া টাকা তুলিতে পারে; কিন্তু মেয়াদী আমানত হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা উঠানো যায় না। মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে তবেই আমানত ফেরত পাওয়া যায়। তবে মেয়াদী আমানত জামিন রাখিয়া

ব্যাংক আমানত দ্বারা দেশের সঞ্চয়-সংগ্রহ করে

---

* ধরা যাউক, কলিকাতার এক ব্যবসায়ী ক বোম্বাই-এর এক ব্যবসায়ী খ-এর ৩ মাস পরে মূল্য পরিশোধের সর্তে ১ হাজার টাকার মাল বিক্রয় করিয়া প্রতিশ্রুতিপত্র বা হুণ্ডি লিখিয়া লইল। এখন ক-এর যদি ঠিক ১ মাস পরেই টাকার প্রয়োজন হয় তবে ক ঐ প্রতিশ্রুতিপত্র বা হুণ্ডি ২ মাসের ডিস্কাউণ্ট বাদ দিয়া কোন ব্যাংক হইতে ভাঙাইয়া লইতে পারিবে। ২ মাস পরে ব্যাংক খ-এর নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইবে।

টাকা ধার লওয়া যাইতে পারে। ব্যাংক মেয়াদী আমানত বহুদিন ধরিয়া খাটাইতে পারে বলিয়া উহার সুদ চলতি আমানতের উপর সুদ অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবেই অধিক হয়। আমাদের দেশে আরও একপ্রকার আমানত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে জমা আমানত (savings deposit) বলে। ইহা হইতে সপ্তাহে একবার কি দুইবার নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত টাকা চেক কাটিয়া তোলা যায় এবং ইহার সুদ মেয়াদী আমানত অপেক্ষা কম কিন্তু চলতি আমানত অপেক্ষা বেশী হয়।

(খ) ঋণ ও বিনিয়োগ (Loans and Investments): সংগৃহীত সঞ্চয় হইতে ব্যক্তি ও ব্যবসাবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া ব্যাংকের দ্বিতীয় কার্য। নানাভাবে ব্যাংক এই কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রথমত, উহা সরাসরি ঋণপ্রদান করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, হুণ্ডি ডিস্কাউন্ট করিতে পারে। হুণ্ডি ভাঙানোও একপ্রকার ঋণপ্রদান কার্য। তৃতীয়ত, উহা শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, ডিবেঞ্চার অথবা সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া অর্থ বিনিয়োগ (invest) করিতে পারে।

(গ) টাকাকড়ির সৃজন (Creation of Money): টাকাকড়ি সৃজন করা ব্যাংকগুলির অন্যতম প্রধান কার্য। ব্যাংক-ব্যবস্থা এই কার্য সম্পাদন করে আমানত সৃষ্টির দ্বারা। পূর্বে অনেক ব্যাংকই নোট ছাপাইয়া টাকাকড়ির সৃষ্টি করিতে পারিত। বর্তমানে এ-ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়া অন্য কোন ব্যাংকের নাই।

(ঘ) অন্যান্য কার্য (Other Functions): ব্যাংক অন্যান্য কার্যও সম্পাদন করে। ইহা মুদ্রা-বিনিময় (money-changing) করে; স্বর্ণ রৌপ্য টাকাকড়ি স্থানান্তরে প্রেরণ করে; স্বর্ণ রৌপ্য ক্রয়বিক্রয় করে; শেয়ার, ডিবেঞ্চার ক্রয়বিক্রয়ে সহায়তা করে। উপরন্তু, ব্যাংক মক্কেলের এজেন্ট বা ট্রাষ্টী হিসাবে বাড়ীভাড়া আদায় করে; উহা ডিভিডেণ্ড আদায়, চিঠিপত্র প্রদান, হিসাবপত্র রাখা প্রভৃতি কার্যও করিয়া থাকে। পূর্বের স্বর্ণকারদের মত এখনও ব্যাংকগুলি মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করে।

টাকাকড়ির সৃজন ও ব্যাংক-ব্যবস্থা (Creation of Money and the Banking System):

এখন ব্যাংক-ব্যবস্থা কিভাবে টাকাকড়ি সৃজন করিয়া থাকে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে।

ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করিয়া টাকাকড়ি যোগান দেয়।

ব্যাংক টাকাকড়ি সৃজন করে আমানত সৃষ্টির দ্বারা। আমানতের উদ্ভব দুই প্রকারে হয়: (ক) যখন কোন ব্যক্তি নগদ টাকা লইয়া ব্যাংকে জমা দেয় তখন তাহার নামে ঐ টাকা আমানত পড়ে। যেমন, আমি যদি ১ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিই তবে ঐ টাকা আমার নামে আমানত হইবে। (খ) এইভাবে আমানতের দরুন টাকাকড়ি না পাইয়াও ব্যাংক আমানতের সৃষ্টি করিতে

পারে। এই প্রকার আমানত সৃষ্টিকেই টাকাকড়ির সৃজন (creation of money) বলা হয়।

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাংক কিভাবে টাকাকড়ি বা আমানত সৃষ্টি করে তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; ধরা যাউক, দেশে একটিমাত্র ব্যাংক আছে এবং ব্যাংকটির নাম শতাব্দী ব্যাংক। শতাব্দী ব্যাংকে ১ হাজার টাকা আমানত হইল। অভিজ্ঞতা হইতে ব্যাংক ইহা জানে যে আমানতকারী ঐ ১ হাজার টাকার অধিকাংশটাই চেক কাটিয়া খরচ করিবে এবং সামান্য কিছু নগদ লইতে পারে। আবার আমানতকারীর নিকট হইতে যাহারা চেক পাইবে তাহারাও যে সমস্তটা নগদে লইবে না, তাহাদেরও যে অনেকে ব্যাংকে চেক জমা দিবে এবং ইহার ফলে আমানত আবার ব্যাংকের নিকট ফিরিয়া আসিবে—ইহাও শতাব্দী ব্যাংকের জানা আছে। সুতরাং ১ হাজার টাকা যে আমানত হইয়াছে তাহার একাংশ নগদ টাকায় রাখিলেই ব্যাংকের চলিবে। এই একাংশ যদি শতকরা ১০ ভাগ বা মোট ১০০ টাকা হয়, তবে বাকী ৯০০ টাকা শতাব্দী ব্যাংক ঋণপ্রদান করিতে পারে।

একটিমাত্র ব্যাংক কিভাবে ইহা করে তাহার দৃষ্টান্ত

কিন্তু ব্যাংক যখন ঋণপ্রদান করে তখন সাধারণত ঋণগ্রহীতাকে নগদ টাকা দেয় না, তাহার হিসাবে ঐ পরিমাণ টাকা আমানত দেখায় মাত্র। আমাদের উদাহরণে শতাব্দী ব্যাংক যদি একমাত্র ক-কেই ৯০০ টাকা ঋণ দেয় তবে উহা তখনই ক-এর হাতে নগদ ৯০০ টাকা দিবে না, ক-এর হিসাবে ৯০০ টাকা আমানত দেখাইবে মাত্র। ক ঐ আমানত হইতে ইচ্ছামত চেক কাটিয়া খরচ করিতে পারিবে। সুতরাং এই ৯০০ টাকা হইল ঋণ আমানত। ইহার জন্য ক কোন টাকা জমা দেয় নাই; ক-কে ঋণপ্রদান করিয়াই ব্যাংক এই আমানতের সৃষ্টি করিয়াছে। এইজন্য ইংরাজীতে বলা হয় যে, প্রত্যেকটি ঋণ একটি করিয়া আমানতের সৃষ্টি করিয়া থাকে (every loan creates a deposit)। আমানতই ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি বলিয়া আমানত সৃষ্টির অর্থই টাকাকড়ির সৃজন। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে ৯০০-এর মত টাকাকড়ি (money) সৃষ্ট হইল।

এখানেই কিন্তু বিষয়টির শেষ হয় না। যে ৯০০ টাকা ব্যাংক ঋণপ্রদান করিল তাহারও মাত্র একাংশ ক এবং ক যাহাদের নামে চেক কাটিবে তাহারা নগদ টাকায় তুলিয়া লইবে; বাকী টাকা শতাব্দী ব্যাংকেই চেকের মারফতে ফিরিয়া আসিবে—অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, এ-ক্ষেত্রেও শতকরা ১০ ভাগ নগদ টাকা—অর্থাৎ, মোট ৯০ টাকা প্রয়োজন হইবে। সুতরাং (৯০০ − ৯০) টাকা = ৮১০ টাকা শতাব্দী ব্যাংক আবার ঋণপ্রদান করিতে পারে।

এ-পর্যন্ত হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, ব্যাংকে মাত্র ১০০০ টাকা জমা পড়িয়াছে। কিন্তু আমানত হইয়াছে (১০০০+৯০০+৮১০) টাকা=২৭১০ টাকা। সুতরাং শতাব্দী ব্যাংক (২৭১০−১০০০) টাকা=১৭১০ টাকা (আমানত) সৃষ্টি করিয়াছে। এইভাবে ব্যাংক তাহার প্রাপ্ত আমানতের ১০ গুণের মত টাকাকড়ি সৃষ্টি করিতে পারে।

ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, শতাব্দী ব্যাংকই দেশের একমাত্র ব্যাংক। সুতরাং লোকে যখন চেক পাইয়া জমা দিবে তখন শতাব্দী ব্যাংকেই জমা দিবে। কিন্তু দেশে একটিমাত্র ব্যাংক থাকে না। ফলে লোকে যখন চেক কাটে তখন ঐ চেক অন্য ব্যাংকে জমা পড়ে বলিয়া টাকাকড়ি এক ব্যাংক হইতে অন্য ব্যাংকে স্থানান্তরিত হয়। ইহাতে বিশেষ কোন ব্যাংকের টাকাকড়ি সৃজনের ক্ষমতা কমিয়া যাইতে পারে; কিন্তু একসংগে সকল ব্যাংকের—অর্থাৎ, দেশের ব্যাংক-ব্যবস্থার অবস্থার কোন তারতম্য হয় না। টাকাকড়ি 'শতাব্দী ব্যাংক' হইতে 'জাতীয় ব্যাংকে' স্থানান্তরিত হইলে 'শতাব্দী ব্যাংকে'র আমানত বা ঋণ-সৃজনের ক্ষমতা কমে, কিন্তু 'জাতীয় ব্যাংকে'র ক্ষমতা বাড়ে। ফলে সামগ্রিকভাবে ব্যাংক-ব্যবস্থার ক্ষমতা পূর্বের মতই থাকিয়া যায়।

সকল ব্যাংক কিভাবে ইহা করে

অনুরূপভাবে, ব্যাংক যখন কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সরকারী ঋণপত্র, শেয়ার প্রভৃতি ক্রয় করে তখন তাহাকে নগদ টাকা না দিয়া তাহার নামে আমানত দেখাইতে পারে। ঋণপত্র-বিক্রেতা প্রয়োজনমত ঐ আমানত হইতে টাকা তুলিয়া লইবার অধিকারী হয়। এই আমানত হইতেও চেকের দ্বারা টাকা উঠানো হয় এবং ঐ সকল চেকেরও অধিকাংশ আবার ব্যাংকগুলিতে জমা পড়ে।

এইভাবে সরকার-সৃষ্ট টাকাকড়ি ব্যতিরেকেও মোট টাকাকড়ির যোগান বাড়িতে এবং বিনিময়কার্য সম্পাদিত হইতে পারে।

অবশ্য ব্যাংকগুলির পক্ষে এই পদ্ধতিতে টাকাকড়ি সৃজনের পথে কতকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। প্রথমত, আমরা দেখিয়াছি যে ব্যাংকগুলি যে ঋণপ্রদান করে ঋণগ্রহীতা তাহার একাংশ তখনই বা কিছু পরে নগদ টাকার লইতে পারে বলিয়া ব্যাংকগুলিকে কিছু নগদ টাকা বা মোট আমানতের শতকরা ১০ ভাগ রাখিয়া দিতে হয়। কিন্তু নগদ টাকার যোগান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকে বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে-পরিমাণ টাকা বাজারে ছাড়িবে তাহাই কতকটা অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ বা টাকাকড়ি সৃজনের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দিবে।

ঋণদান-পদ্ধতিতে টাকাকড়ি সৃজনের কতকগুলি প্রতিবন্ধক

দ্বিতীয়ত, দেশের লোকে যদি বিনিময়কার্যে চেক অপেক্ষা নগদ টাকা ব্যবহার করিতে অধিক অভ্যস্ত হয় তবে ব্যাংক বিশেষ টাকাকড়ি সৃজন করিতে পারিবে না। আমাদের দেশে অনেক লোকই ব্যাংক-প্রদত্ত ঋণ

অনতিবিলম্বেই নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিয়া লয়। ফলে ব্যাংকের নগদ টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়। ১ হাজার নগদ টাকা তুলিয়া লইলে ব্যাংকের টাকাকড়ি সৃজনের ক্ষমতা মোটামুটি ১০ হাজার (১ হাজার টাকার ১০ গুণ) টাকার মত কমিয়া যায়। সুতরাং ব্যাংক-ব্যবস্থা কি পরিমাণ টাকাকড়ি সৃজন করিতে পারে তাহা নির্ভর করে ঐ দেশের লোকে নগদ টাকা কি পরিমাণ ব্যবহার করে তাহার উপর।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক দেশেই রীতি (convention) বা আইন অনুসারে ব্যাংকগুলিকে গৃহীত আমানতের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়। সুতরাং যখনই কোন আমানত সৃষ্টি করা যাইবে তখনই উহার দরুন কিছু টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা দিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই জমার অনুপাতের হ্রাসবৃদ্ধি করিতেও সমর্থ। ইহার ফলে ব্যাংকগুলি ঋণপ্রদানের মাধ্যমে যথেচ্ছ পরিমাণে টাকাকড়ি সৃজন করিতে পারে না। আমাদের দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে (Commercial Banks) উহাদের গৃহীত চলতি ও মেয়াদী আমানতের (Demand and Time Deposits)* শতকরা ৩ ভাগ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট জমা রাখিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাংক যদি দেখে যে, ব্যাংকগুলি অত্যধিক ঋণপ্রদান করিতেছে তবে ঐ জমার অনুপাত ৫ গুণ বা শতকরা ১৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারে। তখন স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংকের টাকাকড়ি সৃজনের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

অনেকের মতে, ব্যাংকের টাকাকড়ি সৃজনের ক্ষমতা নাই। ব্যাংক যে-ঋণপ্রদান করে তাহা শুধু হাতে করে না, সম্পত্তির জামিনের বিরুদ্ধেই করে। সুতরাং সম্পদই টাকাকড়িতে রূপান্তরিত হয়, শূন্য হইতে টাকাকড়ি সৃষ্টি হয় না। এই যুক্তি সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লওয়া যায় না। কারণ দেখা যায়, ব্যাংক অনেক সময় ব্যক্তিগত সুনাম ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ঋণ প্রদান করে। উপরন্তু, যে-কোন উন্নত দেশে যে-কোন সময় ব্যাংক-ব্যবস্থা কর্তৃক গৃহীত আমানতের হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে উহা নগদ টাকাকড়ির পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অধিক। কোন এক বিশেষ দিনে ইংলণ্ডে মোট ব্যাংক-আমানতের পরিমাণ ছিল ৩০০ কোটি পাউণ্ড, কিন্তু নগদ টাকাকড়ির পরিমাণ কখনই ৯০ কোটি পাউণ্ড ছাড়াইয়া যায় নাই। ব্যাংক-ব্যবস্থা যদি টাকাকড়ি বা আমানত সৃজন করিতে না পারে তবে ৯০ কোটি পাউণ্ড নগদ টাকাকড়ি হইতে ৩০০ কোটি পাউণ্ড আমানত আসিল কোথা হইতে? অতএব এই বলিয়া উপসংহার করা যায় যে, বিনিময়ের মাধ্যম বা টাকাকড়ি সৃজন করিবার ক্ষমতা ব্যাংক-ব্যবস্থার আছে।

বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক (Types of Banks): ব্যাংকের কার্যাবলীর আলোচনা হইতে এ-ধারণা করা অবশ্যই ভুল হইবে যে সকল কার্যই

* 'Demand Deposit' কে চলতি ভাষায় সাধারণত 'Current Account' বলা হয়।

প্রত্যেক ব্যাংক সম্পাদন করিয়া থাকে। শিল্পজগতে বর্তমানে যেরূপ শ্রমবিভাগ দেখা যায়, ব্যাংক-ব্যবস্থাতেও সেইরূপ বিশেষীকৃত কার্য (specialised functions) পরিদৃষ্ট হয়। অন্যভাবে বলিতে গেলে, কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানই যেরূপ সকল প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করে না, তেমনি কোন ব্যাংকই ব্যাংকের সকল কার্য সম্পাদন করে না। ফলে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে

এই বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের মধ্যে (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক, (খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক, (গ) বিনিময় ব্যাংক, (ঘ) শিল্প ব্যাংক, (ঙ) জমিবন্ধকী ব্যাংক, এবং (চ) সমবায় ব্যাংকই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank): বর্তমানে প্রত্যেক সভ্য দেশেই একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম রিজার্ভ ব্যাংক (Reserve Bank of India)। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংক-সমাজের সমাজপতি। দেশের অভ্যন্তরে সকল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ, দেশের কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থা পরিচালনা, দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে টাকাকড়ির মূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা করা এবং নানাভাবে উন্নয়ন কার্যে সহায়তা করা ইহার দায়িত্ব।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী :
১। নোট প্রচলন

প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাগজী মুদ্রা প্রচলনের একমাত্র অধিকারী। আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী ও সরকারী তত্ত্বাবধানে ইহা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়ত, মুদ্রার ন্যায় ঋণের পরিমাণের উপরও টাকাকড়ির যোগান নির্ভর করে বলিয়া দেশের ঋণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ভারও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ন্যস্ত। কি পরিমাণ টাকাকড়ির যোগান দেওয়া হইবে তাহা নির্ধারণ করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক মোট মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সচেষ্ট থাকে। টাকাকড়ির যোগান হ্রাস করিবার প্রয়োজন হইলে উহা নোট ছাপা কমাইয়া দেয় এবং অন্যান্য ব্যাংককে ঋণদান হ্রাস করিতে নির্দেশ দেয় বা বাধ্য করে; অপরদিকে টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধি করা স্থির হইলে নোট ছাপা বাড়াইয়া দেয় এবং ব্যাংকগুলিকে ঋণদানে উৎসাহিত করে। এইভাবে টাকা-কড়ির যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রামূল্যের স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা করে।

২। ঋণ-নিয়ন্ত্রণ

টাকাকড়ির যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্য সমস্ত ব্যাংকের ব্যাংক। এই সমস্ত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট একটি করিয়া হিসাব এবং তাহাদের গৃহীত আমানতের কিছু অংশ জমা রাখিতে হয়। ইহার পরিবর্তে তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে কিছু সুবিধাও পাইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাহাদের স্বল্পকালীন ঋণদান করে। প্রথম

৩। ইহা অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক

শ্রেণীর হুণ্ডি (first class bills of exchange) পুনর্বাট্টা (rediscount) করে ইত্যাদি।*

চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক। ইহা সরকারের টাকাকড়ি জমা রাখে, প্রয়োজন হইলে সরকারকে স্বল্পমেয়াদী ঋণপ্রদান করে এবং সরকারী ঋণ (Public Debt) পরিচালনা করে।

৪। ইহা সরকারের ব্যাংক

পঞ্চমত, অন্যান্য দেশের মুদ্রার সহিত নির্দিষ্ট বিনিময় হার বজায় রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্য। এই উদ্দেশ্যে ইহাকে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ ক্রয়বিক্রয় করিতে হয়।

৫। ইহা মুদ্রার বিনিময় হার বজায় রাখে

পরিশেষে, দেশের শিল্পবাণিজ্য যাহাতে সুপরিচালিত হয়, ব্যাংক ফেল পড়িয়া লোকের আমানত যাহাতে নষ্ট না হয়, ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখাও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্তব্য। মোটকথা, ব্যাংক-ব্যবস্থা দেশের শিল্পবাণিজ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে; তাহার ভালমন্দ সবকিছুর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দায়ী।

৬। অন্যান্য কার্য

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ঋণ-নিয়ন্ত্রণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। বলা হইয়াছে যে, টাকাকড়ির যোগান মুদ্রার ন্যায় ঋণের উপরও নির্ভর করে। ইহাও দেখা গিয়াছে, ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে টাকাকড়ির সৃজন করিয়া উহার যোগান বৃদ্ধি করিতে পারে। ব্যাংকসমূহের এই ক্ষমতা যাহাতে সাধারণ স্বার্থের পরিপন্থী না হয় তাহার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি দেখে যে, অন্যান্য ব্যাংক অতিরিক্ত ঋণদান করিতেছে বা যে-সময় ঋণদানের মাধ্যমে টাকাকড়ির পরিমাণবৃদ্ধি করা প্রয়োজন সে-সময় ঋণদানে বিরত থাকিতেছে তখন উহা নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিতে পারে:

কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা ও ঋণ-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রণ করে

ঋণ-নিয়ন্ত্রণের পন্থাসমূহ

(ক) নৈতিক প্রণোদন (Moral Suasion): ইহা দ্বারা বুঝায় ব্যাংকগুলির বিচারবুদ্ধির নিকট আবেদন করা—তাহাদের বলা হয় যে, তাহারা দেশের স্বার্থ-বিরুদ্ধ কার্য করিতেছে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে সংযত হওয়া কর্তব্য।

(খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হারের পরিবর্তন (Changes in the Bank Rate): নৈতিক প্রণোদনে বিশেষ ফল না হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য যে-সকল পন্থা অনুসরণ করে, সুদের হারের পরিবর্তন তাহার অন্যতম।

---

* পুনর্বাট্টা বলিতে বুঝায় একবার ভাঙানো হুণ্ডিকে পুনরায় ভাঙানো। ১১৬ পৃষ্ঠার উদাহরণে 'ক' কোন ব্যাংকের নিকট হইতে হুণ্ডি ডিস্কাউন্ট করিয়া নির্দিষ্ট মেয়াদের ২ মাস পূর্বে টাকা লইল। ঐ ব্যাংকের যদি আবার ২ মাসের পূর্বেই টাকার প্রয়োজন হয় তবে উহা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ভাঙাইয়া লইতে পারিবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বৃদ্ধি করিলে অন্যান্য ব্যাংকও উহা বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইবে। কারণ, প্রয়োজনমত তাহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতেই ঋণ লইতে হয়। সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে লোকে কম ঋণ গ্রহণ করিবে। ফলে শেষ পর্যন্ত মোট ঋণের পরিমাণ কমিয়া যাইবে।

সুদের হারের পরিবর্তন কিভাবে কার্য করে

(গ) খোলা বাজারে কারবার (Open Market Operations) : খোলা বাজারে কারবারের অর্থ হইল জনসাধারণের নিকট সরকারী ঋণপত্র ক্রয়বিক্রয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন জনসাধারণের নিকট সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করে তখন ক্রেতা আমানত হইতে টাকাকড়ি তুলিয়া লইয়া উহার মূল্য প্রদান করে। ফলে ব্যাংকসমূহের আমানতের পরিমাণ হ্রাস পায় বলিয়া ঋণদানের ক্ষমতাও কমিয়া যায়। অপরদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণপত্র ক্রয় করিলে ঐ টাকা ব্যাংকে আমানত পড়ে এবং ব্যাংকগুলির ঋণদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

খোলা বাজারে কারবারের অর্থ

(ঘ) জমার অনুপাতে পরিবর্তন (Variation in the Reserve Ratio) : অন্যান্য ব্যাংকের আমানতের যে-অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক ক্ষেত্রে তাহার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে। নূতন আইন অনুসারে আমাদের দেশের রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট তপশীলী ব্যাংকগুলি (Scheduled Banks) তাহাদের মোট চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগ আইনত জমা রাখিতে বাধ্য। রিজার্ভ ব্যাংক এই জমার অনুপাতকে ৫ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারে। অর্থাৎ, ব্যাংকগুলিকে তাহাদের চলতি ও মেয়াদী আমানতের শতকরা ১৫ ভাগ পর্যন্ত জমা দিবার নির্দেশ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট অধিক টাকা জমা দিতে হইলে ব্যাংকগুলির ঋণদানের ক্ষমতা কমিয়া যায়; আবার জমার পরিমাণ কম হইলে ঋণদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

এই পদ্ধতির কার্যকারিতা

(ঙ) ঋণ-বরাদ্দ নীতি (Rationing of Credit) : পরিশেষে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ-বরাদ্দ করিবার ক্ষমতাও থাকিতে পারে। এইরূপ হইলে ইহা নির্দেশ দিতে পারে যে, কোন্ ব্যাংক কত পরিমাণ ঋণপ্রদান করিতে পারিবে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Banks) : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আলোচনা প্রসংগে যে-সকল 'অন্যান্য ব্যাংকে'র কথা বারবার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদিগকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। জনসাধারণের নিকট হইতে আমানতের মাধ্যমে সঞ্চয়সংগ্রহ, এইরূপে সংগৃহীত অর্থ হইতে ব্যক্তি ও শিল্প-বাণিজ্যকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ঋণদান করা, হুণ্ডি ক্রয়বিক্রয় দ্বারা আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করা, মক্কেলের পক্ষে এজেন্ট ও ট্রাষ্টীর কার্য করা, মূল্যবান জিনিস ও দলিলপত্র গচ্ছিত রাখা, ইত্যাদিই বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংককে যৌথ পুঁজি ব্যাংকও (Joint Stock Bank) বলা হয়। এরূপ বর্ণনার কারণ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। ইংলণ্ডে প্রথমে একমাত্র 'ব্যাংক অফ্ ইংলণ্ড'ই বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্য পরিচালনা করিত এবং উহা যৌথ পুঁজির ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় হইতে সকল বাণিজ্যিক ব্যাংককেই যৌথ পুঁজি ব্যাংক বলিয়া অভিহিত করা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করে না, কারণ যে-আমানতের মাধ্যমে উহা অর্থ-সংগ্রহ করে তাহা স্বল্পমেয়াদী হয়। এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংক জমিবন্ধকী ব্যবসায় হইতে বিরত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আবার বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়কার্য, শিল্পবাণিজ্যের শেয়ার-ডিবেঞ্চার বিক্রয়কার্য, ইত্যাদি বিশেষীকৃত কার্য (specialised functions) বলিয়া ইহাও সম্পাদন করে না।

বাণিজ্যিক ব্যাংক [illegible] পুঁজি ব্যাংক নামেও পরিচিত

ইহা দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করে না

বিনিময় ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক ও জমিবন্ধকী ব্যাংক (Exchange Banks, Industrial Banks and Land Mortgage Banks): যে-সকল ব্যাংক প্রধানত বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়কার্য করিয়া থাকে তাহাদিগকে বিনিময় ব্যাংক (Exchange Banks), যে-সকল ব্যাংক প্রধানত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান বা উহাদের শেয়ার-ডিবেঞ্চারে অর্থ বিনিয়োগ করে তাহাদিগকে শিল্প ব্যাংক (Industrial Banks) এবং যে-সকল ব্যাংক জমিবন্ধকী কার্য করে তাহাদিগকে জমিবন্ধকী ব্যাংক (Land Mortgage Banks) বলা হয়।

বিশেষ কার্যের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য মুনাফা লাভ করা। কিন্তু অনেক সময় মুনাফার উদ্দেশ্য ছাড়াও ব্যাংক গড়িয়া উঠে। এই সকল ব্যাংক সমবায় ব্যাংক (Cooperative Bank) নামে অভিহিত। পারস্পরিক সহায়তায় স্বল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করা এইরূপ ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

সমবায় ব্যাংক

সংক্ষিপ্তসার

প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধার জন্য টাকাকড়ির উদ্ভব হয়। টাকাকড়ি বর্তমান বিনিময়ের সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষ দেখিয়াছে যে উর্ধ্ব মূল্যের টাকাকড়ির জন্য কাগজ এবং স্বল্প মূল্যের টাকাকড়ির জন্য ধাতব মুদ্রাই শ্রেষ্ঠ।

টাকাকড়ির কার্যাবলী: টাকাকড়ির কার্যাবলী প্রধানত চারিটি—(ক) বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কার্য, (খ) মূল্যের পরিমাপ হিসাবে কার্য, (গ) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কার্য, (ঘ) দেনাপাওনার মান হিসাবে কার্য। সঞ্চয়ের ভাণ্ডার ও দেনাপাওনার মান হিসাবে কার্য করিবার জন্য টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব প্রয়োজন।

টাকাকড়ি উৎপাদন-ব্যবস্থাকেও চালু রাখে।

টাকাকড়ি কি ?: বিনিময় ও দেনাপাওনা মিটানোর কার্যে যে-বস্তু সর্বজনগ্রাহ্য তাহাই টাকাকড়ি। সঞ্চয় ও হিসাবনিকাশ ইহার অংকেই প্রকাশ করা হয়।

বিভিন্ন প্রকারের টাকাকড়ি: প্রথমত, টাকাকড়ি দুই প্রকারের হয়—(ক) হিসাবনিকাশে ব্যবহার্য টাকাকড়ি, এবং (খ) আসল টাকাকড়ি।

আসল টাকাকড়ি দুই প্রকারের: (১) কাগজী টাকাকড়ি, এবং (২) ধাতব টাকাকড়ি। কাগজী টাকাকড়ি বা নোট দুই প্রকারের—(১) পরিবর্তনীয় ও (২) অপরিবর্তনীয়। ধাতব মুদ্রাও দুই প্রকারের—(১) প্রামাণিক ও (২) নিদর্শক।

মুদ্রার আর একটি শ্রেণীবিভাগ হইল (ক) সসীম বিহিত মুদ্রা ও (খ) অসীম বিহিত মুদ্রার মধ্যে।

উপরি-উক্ত সকল টাকাকড়িই সরকার-সৃষ্ট। ইহা ছাড়াও ব্যাংকের টাকাকড়ি বা ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি আছে।

মুদ্রামান: মুদ্রামান মোটামুটি দুই প্রকারের—(ক) ধাতব মুদ্রামান, (খ) কাগজী মুদ্রামান। ধাতব মুদ্রামানের অধীনে ১। একধাতু স্বর্ণমান, ২। একধাতু রৌপ্যমান, এবং ৩। দ্বিধাতুমানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

স্বর্ণমান আবার চারি প্রকারের হয়—১। স্বর্ণমুদ্রামান, ২। স্বর্ণপিণ্ডমান, ৩। স্বর্ণবিনিময়মান, ৪। স্বর্ণসমতামান। এইজন্য বলা যায় যে স্বর্ণমানের পরিমাণভেদ আছে।

কাগজী মুদ্রার সুবিধা-অসুবিধা: কাগজী মুদ্রার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়—১। ইহা সহজ বহনযোগ্য, ২। ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপ হয়, ৩। ইহা পরিবর্তনশীল, এবং ৪। ইহা সম্প্রসারণশীল। ইহার অসুবিধাগুলি হইল—১। ইহার সম্প্রসারণের জন্য মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে; ২। ইহা বিদেশীরা গ্রহণ করে না; এবং ৩। ইহা একেবারে নষ্ট হইতে পারে।

টাকাকড়ির সৃজন ও ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি: বর্তমানে একমাত্র সরকারই টাকাকড়ি সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া অনেক সময় মনে করা হয়। কিন্তু ইহা ভুল। সরকারের ন্যায় ব্যাংকগুলিও টাকাকড়ি সৃজন করে। এইরূপ টাকাকড়িকে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি বলা হয়। ব্যাংকের আমানতই ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি।

ব্যাংক: ব্যাংক-ব্যবসায়ের উদ্ভব হয় তিনটি প্রধান ব্যবসায় হইতে: (ক) বণিকদের ব্যবসায়, (খ) মহাজনদের ব্যবসায়, এবং (গ) স্বর্ণকারদের ব্যবসায়। ব্যাংক-ব্যবসায়কে ঋণের ব্যবসায় বলা হয়। বিশ্বাসই এই কারবারের ভিত্তি; ব্যাংক আমানতের মাধ্যমে অর্থ-সংগ্রহ করিয়া ঐ অর্থ ব্যক্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে ঋণ দেয়।

ব্যাংক-ব্যবস্থার উপযোগিতা: ব্যাংক দেশের সঞ্চয়সংগ্রহ করিয়া শিল্পবাণিজ্যে নিয়োগ করে; শেয়ার প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে; টাকাকড়ির সৃষ্টি করিয়া উহার যোগান বৃদ্ধি করে; আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে চলে; এবং অন্যান্যভাবেও ইহা দেশের শিল্পবাণিজ্যে সহায়তা করে।

ব্যাংকের কার্যাবলী: বলা যায়, ব্যাংকের কার্যাবলী চারি প্রকারের—১। সঞ্চয়সংগ্রহ, ২। ঋণ ও বিনিয়োগ, ৩। টাকাকড়ির সৃজন, এবং ৪। অন্যান্য কায। ব্যাংক সঞ্চয়সংগ্রহ করে বিভিন্ন প্রকার আমানতের মাধ্যমে।

টাকাকড়ির সৃজন: ব্যাংক টাকাকড়ি সৃজন করে আমানত সৃষ্টি করিয়া; আমানত সৃষ্টি বলিতে বুঝায় আমানতের দরুন টাকা না পাইয়াও আমানত বা জমার সৃষ্টি। ঋণপ্রদানের মাধ্যমেই ব্যাংক এইরূপ আমানত সৃষ্ট করে। মোটামুটি দেশের ব্যাংক-ব্যবসায় নগদ টাকায় যে-পরিমাণ আমানত গ্রহণ করে তাহার ১০ গুণ পর্যন্ত টাকাকড়ি সৃজন করিতে পারে। এইরূপ টাকাকড়ি সৃজন ব্যাংকগুলি কতটা করিতে পারিবে তাহা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা, দেশে নগদ টাকাকড়ির পরিমাণ, দেশের লোকের নগদ টাকাকড়ি ব্যবহারের অভ্যাস, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি, ইত্যাদি

বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক : বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের মধ্যে (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক, (খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক, (গ) বিনিময় ব্যাংক, (ঘ) শিল্প ব্যাংক, (ঙ) জমিবন্ধকী ব্যাংক, এবং (চ) সমবায় ব্যাংকই প্রধান।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক : কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংক সমাজের সমাজপতি। ইহার কার্যাবলীর মধ্যে ১। নোট প্রচলন, ২। ঋণ-নিয়ন্ত্রণ, ৩। টাকাকড়ির পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি করা, ৪। অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসাবে কার্য করা, ৫। সরকারের ব্যাংক হিসাবে কার্য করা, এবং ৬। মুদ্রার বিনিময় হার বজায় রাখা—এই কয়টিই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অর্থ-ব্যবস্থার ভালমন্দের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেকাংশে দায়ী।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ঋণ-নিয়ন্ত্রণ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রিত করে। ঋণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য ইহা পাঁচটি পন্থা অবলম্বন করিতে পারে—১। নৈতিক প্রণোদন, ২। সুদের হারে পরিবর্তন, ৩। খোলা বাজারে কারবার, ৪। জমার অনুপাতে পরিবর্তন, এবং ৫। ঋণ-বরাদ্দ।

বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতের মাধ্যমে সঞ্চয়সংগ্রহ করিয়া ব্যক্তি ও শিল্পবাণিজ্যকে স্বল্পমেয়াদী ঋণদান করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক যৌথ মূলধনী ব্যাংক নামেও পরিচিত।

বাণিজ্যিক ব্যাংক ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের জন্য বিনিময় ব্যাংক, শিল্পবাণিজ্যকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের জন্য শিল্প ব্যাংক। জমিবন্ধকী কার্যের জন্য জমিবন্ধকী ব্যাংক এবং পারস্পরিক সহায়তায় ঋণপ্রদানের জন্য সমবায় ব্যাংকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the advantages of using money instead of exchanging goods by barter? Why are gold and silver generally chosen as money? (B. U. 1961)

দ্রব্য-বিনিময়ের পরিবর্তে টাকাকড়ি ব্যবহার করিলে কি কি সুবিধা হয়? সাধারণত স্বর্ণ ও রৌপ্যকেই টাকাকড়ি হিসাবে ব্যবহার করা হয় কেন? [১০২-১০৩ পৃষ্ঠা]

2. Describe the functions of Money. How is production facilitated by the use of Money?

টাকাকড়ির কার্যাবলী বর্ণনা কর। টাকাকড়ির ব্যবহারের ফলে উৎপাদনকার্য কিভাবে সুপরিচালিত হয়? [১০৩-১০৫ পৃষ্ঠা]

3. Describe the merits and demerits of Paper Money. (C. U. 1948, '49)

কাগজী মুদ্রার সুবিধা-অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর। [১১০-১১১ পৃষ্ঠা]

4. What are the functions of Banks? Do banks create Money?

ব্যাংকের কার্যাবলী কি কি? ব্যাংকগুলি কি টাকাকড়ি সৃজন করিতে পারে? [১১৬-১২০ পৃষ্ঠা]

5. What is the Central Bank? What are its functions?
(C. U. 1949, '50, '51, '57, '62 ; P. U. 1961, '64)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাহাকে বলে? ইহার কার্যাবলী কি কি? [১২১-১২২ পৃষ্ঠা]

6. Explain briefly the advantages of Paper Money. (En. 1963)

কাগজী মুদ্রা-ব্যবস্থার সুবিধা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [১১০-১১১ পৃষ্ঠা]

একাদশ অধ্যায়

টাকাকড়ির মূল্য

(Value of Money)

টাকাকড়ির মূল্য ও মূল্যস্তর (Value of Money and Price Level) : আমরা দেখিয়াছি, সঞ্চয়ের ভাণ্ডার এবং দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশের কার্য করিবার জন্য টাকাকড়ির মূল্য স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। ইহাও আলোচনা করা হইয়াছে যে টাকাকড়ি বা মুদ্রামূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা করা সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্য। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে, টাকাকড়ির মূল্য বলিতে কি বুঝায় ?

অর্থবিদ্যায় 'মূল্য' শব্দটি বিনিময়-মূল্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং টাকাকড়ির মূল্য বলিতেও উহার বিনিময়-মূল্য বুঝায়।* অর্থাৎ, এক একক টাকাকড়ির বিনিময়ে যে-পরিমাণ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহাই টাকাকড়ির মূল্য। ইহাকে টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি (purchasing power) বলা হয়।

টাকাকড়ির মূল্য বলিতে এক একক টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি বুঝায়

ভারতে টাকাকড়ির একক হইল 'টাকা' (Rupee)। সুতরাং এক টাকার যে-পরিমাণ ক্রয়শক্তি—অর্থাৎ, এক টাকায় যতখানি জিনিসপত্র কিনিতে পারা যায় তাহাই এ-দেশে টাকাকড়ির মূল্য। অনুরূপভাবে, ইংলণ্ডে এক পাউণ্ডের বিনিময়ে যতখানি জিনিসপত্র কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাই ঐ দেশে টাকাকড়ির মূল্য।

টাকাকড়ির মূল্য মূল্যস্তরের (Price Level) বিপরীত। মূল্যস্তর বলিতে বুঝায় বিভিন্ন জিনিসের গড়পড়তা দাম। এই গড়পড়তা দাম যদি বাড়িয়া যায় তবে টাকাকড়ির মূল্য কমিয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে; অপরদিকে গড়পড়তা দাম বা মূল্যস্তর যদি হ্রাস পায় তবে টাকাকড়ির মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে ধরিতে হইবে। আমাদের দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের তুলনায় জিনিসপত্রের গড়পড়তা দাম বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং টাকাকড়ির মূল্যও বহুগুণ কমিয়া গিয়াছে। সাধারণ কথাবার্তায় লোকে যে প্রায়ই বলে 'টাকার আর দাম নাই' তাহা এই জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধি বা টাকার মূল্যহ্রাসের উল্লেখ মাত্র।

টাকাকড়ির মূল্য মূল্যস্তরের বিপরীত

মূল্যস্তর পরিবর্তনের কারণ (Reasons for Changes in the Price Level) : মূল্যস্তরের পরিবর্তন প্রধানত দুইটি কারণে ঘটে—(ক) টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তন, (খ) জিনিসপত্রের যোগানে পরিবর্তন। জিনিসপত্রের

* অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবহার-মূল্য আছে; কিন্তু এক বিনিময় ছাড়া টাকাকড়ির কোন উপযোগিতা নাই। অতএব, টাকাকড়ির মূল্য বলিতে এই বিনিময়-মূল্য ছাড়া আর কিছু কল্পনা করা যায় না।

যোগান যদি পূর্বের মতই থাকে, কিন্তু টাকাকড়ির যোগান যদি বাড়িয়া যায় তবে জিনিসপত্রের গড়পড়তা দাম বা মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে। অপরদিকে টাকাকড়ির যোগান অপরিবর্তিত থাকিয়া জিনিসপত্রের যোগান বাড়িয়া গেলে গড়পড়তা দাম বা মূল্যস্তর হ্রাস পাইবে। আবার যদি এরূপ হয় যে টাকাকড়ির যোগান বাড়িল এবং সংগে সংগে জিনিসপত্রেরও যোগান কমিয়া গেল তবে মূল্যস্তর বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমাদের দেশে ইহাই ঘটিয়াছিল। একদিকে ক্রমাগত নোট ছাপানোর দরুন টাকাকড়ির যোগান বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল; অপরদিকে আমদানি কমিয়া যাওয়া, কলকারখানা প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনে নিযুক্ত হওয়া ইত্যাদি কারণে সাধারণের জন্য ভোগ্যদ্রব্যের যোগান অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছিল। ফলে মূল্যস্তর চারি গুণের মত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

টাকাকড়ি ও জিনিসপত্রের যোগান পরিবর্তিত হইলেই মূল্যস্তর পরিবর্তিত হয়

টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব (Quantity Theory of Money): দেখা গেল যে মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটে (ক) টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তন, এবং (খ) জিনিসপত্রের যোগানে পরিবর্তন—উভয়ের জন্যই। প্রাচীন লেখকগণ কিন্তু মনে করিতেন যে শুধু টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তনের জন্যই মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটে, জিনিসপত্রের যোগানে পরিবর্তনের জন্য নহে। আবার তাঁহারা এই বুঝিয়াছিলেন যে টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তন ঘটে শুধু টাকাকড়ির পরিমাণের পরিবর্তনের জন্যই, অন্য কোন কারণে নহে। ইহার ফলে যে-তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে তাহাকে অর্থের পরিমাণতত্ত্ব (Quantity Theory of Money) বলা হয়। তত্ত্বটিকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যাইতে পারে: টাকাকড়ির পরিমাণ যে-দিকে এবং যতটা পরিবর্তিত হইবে মূল্যস্তরও সেই দিকে এবং ততটা পরিবর্তিত হইবে। টাকাকড়ির পরিমাণ হঠাৎ যদি দ্বিগুণ হয় তবে মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হইবে; টাকাকড়ির পরিমাণ যদি অর্ধেক হইয়া যায় মূল্যস্তরও অর্ধেক হইয়া যাইবে।

টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে টাকাকড়ির মূল্য (Value of Money) মূল্যস্তরের (Price Level) ঠিক বিপরীত। সুতরাং মূল্যস্তর যতটা বৃদ্ধি পায় টাকাকড়ির মূল্যও ততটা কমে; এবং অপরদিকে মূল্যস্তর যতটা কমে টাকাকড়ির মূল্য বা ক্রয়শক্তি ততটা বৃদ্ধি পায়।

বিখ্যাত মার্কিন অর্থবিদ্যাবিদ ফিসার (Fisher) টাকাকড়ির এই পরিমাণতত্ত্বকে প্রথমে নিম্নলিখিত সমীকরণের রূপে প্রকাশ করেন:

ফিসারের সমীকরণ

$$PT = MV$$

$$\text{অথবা } P = \frac{MV}{T}$$

সমীকরণটিতে PT হইল টাকাকড়ির চাহিদার এবং MV টাকাকড়ির যোগানের দিক। টাকাকড়ির চাহিদা সৃষ্ট হয় বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র হইতে। ইহার পরিমাণ T হইলে এবং গড়পড়তা জিনিসপত্রের মূল্য বা মূল্যস্তর P হইলে মোট PT পরিমাণ টাকাকড়ির চাহিদা হইবে। অপরদিকে M হইল নগদ বা সরকার-সৃষ্ট টাকাকড়ির পরিমাণ যাহা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একটি টাকা দ্বারা অনেকবার বিনিময়কার্য সম্পাদন করা চলে। আমি যে টাকাটি রামের নিকট হইতে জিনিস বেচিয়া পাইলাম তাহা আবার শ্যামকে জিনিস কিনিবার জন্য দিতে পারি। সুতরাং ঐ টাকাটি দুইটি টাকার কার্য—অর্থাৎ, দুইবার বিনিময় সম্পাদনের কার্য করিতে পারে; অন্য একটি মুদ্রা আবার তিনবার বা চারিবার বিনিময় সম্পাদন করিতে পারে। এইভাবে দেশে যত সরকার-সৃষ্ট মুদ্রা আছে তাহাদের বিনিময় সম্পাদনের একটি গড় নির্ণয় করা যায়। এই গড়কেই V বা টাকাকড়ির প্রচলনগতি (velocity of circulation) বলা হয়। টাকাকড়ির পরিমাণকে টাকাকড়ির প্রচলনগতি দিয়া গুণ করিলে মোট টাকাকড়ির যোগানের পরিমাণ পাওয়া যাইবে। টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বে ইহাকে MV আকারে প্রকাশ করা হয়।

সমীকরণটির ব্যাখ্যা

এখানে PT=MV হইলে, MVকে T দিয়া ভাগ করিলেই P কত তাহা জানা যাইবে। কোন কারণে হঠাৎ যদি M বা মোট টাকাকড়ির পরিমাণ দ্বিগুণ হয় তবে P বা মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হইবে—অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য কমিয়া অর্ধেক হইবে। অপরদিকে কোন কারণে টাকাকড়ির পরিমাণ যদি অর্ধেক হয় তবে মূল্যস্তরও অর্ধেক হইবে—অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য দ্বিগুণ হইবে।*

---

* একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝানো যাইতে পারে। ধরা যাউক, কোন এক দেশে মাত্র ১০০০টি ধাতব মুদ্রা (M) প্রচলিত আছে; এবং মোট জিনিসপত্রের সংখ্যা ৬০০০। ৬০০০ সংখ্যক জিনিসপত্রের মধ্যে ৪০০০টি বাজারে বিক্রয়ের জন্য আনীত হয় (T)। বাকী ২০০০ যাহারা উৎপাদন করে তাহারা নিজেরাই ভোগ করে। অতএব, ৪০০০টি সংখ্যক জিনিসপত্রের ক্রয়বিক্রয় ১০০০টি মুদ্রার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। প্রত্যেকটি মুদ্রা গড়ে ৮ বার করিয়া হস্তান্তরিত হইলে—অর্থাৎ, মুদ্রার প্রচলনগতি ৮ হইলে পাটীগাণিতিক মূল্যে সমীকরণটি এইরূপ দাঁড়াইবে:

$$P = \frac{M(১০০০) \times V(৮)}{T(৪০০০)}$$

অথবা $P = \frac{৮০০০}{৪০০০}$

অথবা P=২। অর্থাৎ, জিনিসপত্রের গড়মূল্য বা মূল্যস্তর হইল ২ টাকা।

এখন ধরা যাউক, হঠাৎ কোন কারণে ঐ দেশে মোট মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ হইল। ফলে Pও দ্বিগুণ হইবে—যথা,

$$P = \frac{M(২০০০) \times V(৮)}{T(৪০০০)}$$

অথবা P=৪।

অধ্যাপক ফিসারের উপরি-উক্ত পরিমাণতত্ত্বে শুধু সরকার-সৃষ্ট বা নগদ টাকাকড়ির কথা ধরা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি ইত্যাদির মাধ্যমেও ক্রয়বিক্রয় চলে। এই কারণে ফিসার পরে টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বটির নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তন-সাধন করেন :

পরিবর্তিত সমীকরণ

$$PT = MV + M'V'$$

এখন M′ বলিতে ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি এবং V′ বলিতে উহার প্রচলন-গতি বুঝাইতেছে। সরকার-সৃষ্ট বা নগদ টাকাকড়িকে উহার প্রচলনগতি দিয়া গুণ করিলে মোট টাকাকড়ির যোগানের একাংশ পাওয়া যাইবে; এবং ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়িকে উহার প্রচলনগতি দিয়া গুণ করিলে টাকাকড়ির যোগানের অপরাংশ পাওয়া যাইবে। ইহার ফলে অবশ্য সমীকরণটির প্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। ইহা এই প্রকার রূপ ধারণ করিবে মাত্র :

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

এখন P বা মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটিবে শুধু M-এর পরিবর্তনের জন্য নহে, M′-এর পরিবর্তনের জন্যও বটে। অন্যভাবে বলা যায়, দেশে নগদ ও ব্যাংক-সৃষ্ট টাকাকড়ি—উভয়ের পরিমাণ যতটা বাড়িবে মূল্যস্তরও ততটা বাড়িবে; এবং এই দুই প্রকার টাকাকড়ির পরিমাণ যতটা হ্রাস পাইবে মূল্যস্তরও ততটা হ্রাস পাইবে।

সমালোচনা : টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব এই অনুমানের উপর নির্ভরশীল যে টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তিত হইলেও বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র (T) এবং টাকাকড়ির প্রচলনগতির (V এবং V′) কোন পরিবর্তন ঘটে না। এই অনুমান ঠিক নহে। অধিকাংশ সময় টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তনের সংগে সংগে উৎপাদনের পরিমাণেও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে দেখা যায়। দাম বাড়িলে মুনাফা বেশী হয় বলিয়া উৎপাদকগণ অধিক উৎপাদনে আগ্রহান্বিত হয়; অপরদিকে দাম কমিলে তাহারা উৎপাদনের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। অবশ্য যদি উৎপাদনবৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকে—অর্থাৎ, উৎপাদনের সকল উপকরণই যদি পূর্ণভাবে নিয়োজিত হইয়া থাকে, তবে আর উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিবে না। ফলে টাকাকড়ির পরিমাণ যতটা বৃদ্ধি পাইবে মূল্যস্তরও ততটা বাড়িবে। অতএব, মাত্র পূর্ণনিয়োগের অবস্থাতেই টাকাকড়ির পরিমাণবৃদ্ধির ফলে সমপরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি ঘটে।

তত্ত্বটি ভ্রান্ত অনুমানের উপর নির্ভরশীল

আবার টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে উহার প্রচলনগতিরও পরিবর্তন ঘটিতে পারে। যেমন, টাকাকড়ির পরিমাণ একদিকে বৃদ্ধি পাইল কিন্তু অপরদিকে উহার প্রচলনগতি কমিয়া গেল। এরূপ অবস্থাতেও টাকাকড়ির পরিমাণে যতটা বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটিবে মূল্যস্তরে সেই পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস দেখা যাইবে না।

সকল ক্ষেত্রে মূল্যস্তরের পরিবর্তন টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তনের সমানুপাতিক হয় না

মোটকথা, অন্যান্য জিনিসের ন্যায় টাকাকড়িরও মূল্য নির্ভর করে উহার চাহিদা ও যোগান—উভয়ের উপর। এই চাহিদা ও যোগান নানা বিষয়—যথা, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ, দেশের লোকে কি-পরিমাণ টাকাকড়ি ব্যবহার করে এবং কি-পরিমাণ প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময় (barter) করে—ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি ভালর দিকে যাইতে থাকে তবে টাকাকড়ির পরিমাণবৃদ্ধি ব্যতিরেকেও মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে। ইহা ঘটিবে টাকাকড়ির প্রচলনগতি বাড়িয়া। অপরদিকে দেশে কাজকারবারে যদি মন্দার সূচনা হয় তবে টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়াইলেও মূল্যস্তরে বৃদ্ধি না ঘটিতে পারে। কারণ, সংগে সংগে টাকাকড়ির প্রচলনগতি কমিয়া যাইতে পারে।

একমাত্র টাকাকড়ির পরিমাণই উহার মূল্য-নির্ধারক নহে

অতএব, একমাত্র টাকাকড়ির পরিমাণই টাকাকড়ির মূল্য-নির্ধারণ করে এরূপ ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব আংশিক ও ত্রুটিপূর্ণ।

সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনের পরিমাপ (Measurement of Changes in the General Price Level) : মূল্যস্তর বা জিনিসপত্রের গড়পড়তা দাম নানা প্রকারের হইতে পারে—যথা, বিলাস-দ্রব্যের মূল্যস্তর, শ্রমিকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যস্তর, ইত্যাদি। চালডাল, গম-আটা, তৈল, লবণ, মসলাপাতি, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা, কাঁচামাল, উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি—সকল জিনিসের গড়পড়তা দামকে 'সাধারণ মূল্যস্তর' বলা যাইতে পারে। এই সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনই দেশের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেইজন্য বিভিন্ন সময়ে ইহার পরিবর্তনের পরিমাপ করা হয়; এবং সাধারণ মূল্যস্তরবৃদ্ধি বা টাকাকড়ির মূল্যহ্রাসের ফলে দরিদ্র চাকরিয়ারা যাহাতে দুর্দশায় পতিত না হয় তাহার জন্য মাগ্‌গি ভাতার ব্যবস্থা করা হয়, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়, ইত্যাদি। মূল্যস্তর কমিয়া আসিলে—অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে মাগ্‌গি ভাতা আবার কমাইয়া দেওয়া হয়, শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করা হয়।

সাধারণ মূল্যস্তর বলিতে কি বুঝায়

সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনের গুরুত্ব

কিন্তু এক সময়ের তুলনায় অন্য এক সময়ে মূল্যস্তর বাড়িল কি কমিল এবং কতটা পরিমাণ বাড়িল বা কমিল তাহা বুঝা যায় কিরূপে? ইহা বুঝিবার উপায় হইল সংশ্লিষ্ট দুই বা ততোধিক সময়ের মূল্যস্তর পাশাপাশি সাজাইয়া পরীক্ষা করা। এই পদ্ধতিকে সূচক-সংখ্যা পদ্ধতি (Device of Index Numbers) বলা হয়। সূচকসংখ্যা প্রণয়ন করিয়া দ্রব্যমূল্য বা উহার বিপরীত টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়।

মূল্যস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করা যায় সূচকসংখ্যার দ্বারা

এই প্রসংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য (absolute value) পরিমাপ করিবার কোন উপায়ই নাই; যাহা করা যায় তাহা হইল উহার আপেক্ষিক মূল্য (relative value)—অর্থাৎ, অন্য এক সময়ের তুলনায় উহার পরিবর্তন নির্ধারণ করা। টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে এক একক টাকাকড়ির বিনিময়ে যত প্রকার দ্রব্য ও সেবা যে-পরিমাণ পাওয়া যায় তাহাদের সকলেরই একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতে এক টাকার মূল্য হইল ২ কিলোগ্রাম চাল, ৩ কিলোগ্রাম গম, ½ কিলোগ্রাম ডাল, ১ খানি সূক্ষ্ম শাড়ির এক-দশমাংশ, ১ খানি মোটা ধুতির এক-চতুর্থাংশ, কলেজের ছাত্র-বেতনের এক-ষষ্ঠাংশ, ডাক্তারের ফী'র এক-পঞ্চমাংশ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে যে-তালিকা প্রস্তুত হইবে প্রকৃতপক্ষে তাহা সীমাহীন হইবে। সুতরাং ইহা সম্ভব নয়।

টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য পরিমাপ করা যায় না, মাত্র আপেক্ষিক মূল্যই করা যায়

টাকাকড়ির অনাপেক্ষিক মূল্য বলিতে কি বুঝায়

সরল সূচকসংখ্যা প্রণয়ন (Construction of Simple Index Number): সূচকসংখ্যায় বিভিন্ন সময়ের মূল্যস্তর পাশাপাশি সাজাইয়া গড়পড়তা দাম বা উহার বিপরীত টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন হিসাব করা হয়। সুতরাং সূচকসংখ্যা হইল বিশেষ পদ্ধতিতে সাজানো কতকগুলি মূল্যস্তরের সংখ্যা (a series of price level)।

সূচকসংখ্যা কাহাকে বলে

মূল্যস্তর বিভিন্ন প্রকারের হয় বলিয়া সূচকসংখ্যাও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা যাইতে পারে—যথা, সাধারণ মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয়, শ্রমিকদের জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয়, বিলাস-দ্রব্যের দামের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয়, ইত্যাদি। উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে সূচকসংখ্যা প্রণয়ন নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে করা হইয়া থাকে।

বিভিন্ন প্রকার সূচকসংখ্যা

সূচকসংখ্যা প্রণয়নের বিভিন্ন স্তর

(ক) ভিত্তি বৎসর নির্বাচন (Selection of the Base Year): প্রথমেই ভিত্তি বৎসর নির্বাচন করিতে হইবে—অর্থাৎ, যে বৎসরের তুলনায় অন্যান্য বৎসরের দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাপ করা হইবে তাহাকে প্রথমে বাছিয়া লইতে হইবে।

(খ) দ্রব্যাদির নির্বাচন (Selection of Commodities): দ্বিতীয়ত, সূচকসংখ্যার উদ্দেশ্য অনুসারে দ্রব্যাদি নির্বাচন করিতে হইবে। যদি শ্রমিক-শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য সূচক-সংখ্যা প্রণয়ন করা হয়, তবে শ্রমিকরা যে-যে দ্রব্য ও সেবা সচরাচর ভোগ করিয়া থাকে তাহাদিগকে তালিকাভুক্ত করিতে হইবে। যদি এরূপ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের পরিবর্তে সাধারণ মূল্যস্তরের

দ্রব্যাদির নির্বাচন কিভাবে করিতে হইবে

হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয় করিবার জন্য সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করিতে হয় তবে যত বেশী সংখ্যক দ্রব্য ও সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় ততই ভাল।

(গ) দাম সংগ্রহ (Collection of Prices): দ্রব্যাদি নির্বাচনের পর সংশ্লিষ্ট সকল বৎসরে উহাদের দাম সংগ্রহ করা প্রয়োজন। খুচরা দাম (retail prices) সংগ্রহ করিতে পারিলেই ভাল হয়। ইহা সম্ভব না হইলে পাইকারী দামও (wholesale prices) চলিতে পারে।

(ঘ) ভিত্তি বৎসরে প্রত্যেক দ্রব্যের গড় দাম ১০০ করিয়া ধরিয়া তুলনার বৎসরে উহা শতকরা কত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা দেখানো প্রয়োজন।

(ঙ) এইবার সংশ্লিষ্ট বৎসরসমূহের দামের গড় লইয়া উহাদের মধ্যে তুলনা করিলেই মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি বুঝা যাইবে। ভিত্তি বৎসরে প্রত্যেক দ্রব্যের দাম ১০০ করিয়া ধরা হয় বলিয়া ঐ বৎসরের গড় ১০০ হইতে বাধ্য। তুলনার বৎসরের গড় ১০০ অপেক্ষা যতটা অধিক বা কম হইবে মূল্যস্তর ততটা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।

বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য একটি সূচকসংখ্যা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

মনে করা যাউক, ১৯৫৮ সালের তুলনায় ১৯৬৪ সালের প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের মূল্যস্তরের পরিবর্তন নির্ধারণ করা প্রয়োজন।* দেশে চাউল গম তৈল ঘৃত ও মৎস্য এই পাঁচ প্রকারের খাদ্যদ্রব্য প্রধানত ব্যবহৃত হইলে সূচকসংখ্যাটি নিম্নের ছকটির মত হইবে।

দ্রব্য	ভিত্তি বৎসরে (১৯৫৮ সাল) দাম	ভিত্তি বৎসরের গড়	১৯৬৪ সালের দাম	১৯৬৪ সালের গড় (১৯৫৮ সালের তুলনায় শতকরা কত ভাগ বৃদ্ধি)
	প্রতি কুইন্টাল টা. ন.প.		প্রতি কুইন্টাল টা. ন.প.	
১। চাউল	৫০.০০	১০০	৬০.০০	১২০
২। গম	৬০.০০	১০০	৭৫.০০	১২৫
৩। তৈল	২০০.০০	১০০	২৪০.০০	১২০
৪। ঘৃত	১০০০.০০	১০০	১২০০.০০	১২০
৫। মৎস্য	৩০০.০০	১০০	৪৫০.০০	১৫০
		৫০০÷৫ =১০০		৬৩৫÷৫ =১২৭

এই কাল্পনিক সূচকসংখ্যা অনুসারে ১৯৫৮ সালের তুলনায় ১৯৬৪ সালে প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের দাম গড়পড়তা শতকরা ২৭ ভাগ বাড়িয়াছে।

* আমাদের দেশে ১৯৫৮ সাল হইতে মেট্রিক ওজন-পদ্ধতি আংশিকভাবে প্রবর্তিত হয়; দশমিক মুদ্রা-ব্যবস্থা তাহার পূর্বেই চালু হইয়াছিল।

এইভাবে খাদ্যদ্রব্যের সূচকসংখ্যার পরিবর্তে সাধারণ সূচকসংখ্যা (General Index Number) প্রণয়ন করিয়া যদি দেখা যায় যে, সকল জিনিসপত্রের গড়পড়তা দাম শতকরা ঐ ২৭ ভাগ বাড়িয়াছে তবে টাকাকড়ির মূল্য ১৯৫৮ সালের তুলনায় শতকরা ২৭ ভাগ কমিয়াছে বুঝিতে হইবে।

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation): মুদ্রাস্ফীতি বা ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ ইনফ্লেশন (inflation) বর্তমানে একটি বিশেষ সুপরিচিত শব্দ হইলেও ইহার প্রকৃত অর্থ লইয়া বেশ কিছুটা মতবিরোধ রহিয়াছে। ফলে মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন সংজ্ঞাও প্রচলিত হইয়াছে। যাহা হউক, মোটামুটিভাবে বলা যায় যে সাধারণ মূল্যস্তর যখন ক্রমাগত বাড়িতে থাকে—অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য যখন অবিচ্ছিন্নভাবে কমিতে থাকে তখন যে-অবস্থার উদ্ভব হয় তাহাকেই মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া অভিহিত করা যায়। মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইবার কারণ হইল জিনিসপত্রের যোগানের তুলনায় লোকের ক্রয়শক্তির (purchasing power) বৃদ্ধি। অন্যভাবে বলিতে গেলে, জিনিসপত্রের যতটা যোগান দেওয়া সম্ভব হয় লোকে তাহার তুলনায় অধিক ব্যয় করিতে সমর্থ হয় বলিয়াই মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা

বৈশিষ্ট্য

অনেকের মতে অবশ্য মূল্যস্তর অবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পাইলেই উহাকে 'প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি' বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। মূল্যস্তর বৃদ্ধির দরুন মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বলিয়া শিল্পপতিরাও উৎপাদনবৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয়। ইহাতে উৎপাদনের যে সকল উপকরণ অলস অবস্থায় পড়িয়াছিল তাহারা নিয়োজিত হয়। বেকার শ্রমিক কাজ পায়, জমি মূলধন-দ্রব্য প্রভৃতির যে যে অংশ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল তাহাদিগকে কাজে লাগানো হয়, ইত্যাদি। ফলে মূল্যস্তরবৃদ্ধির সংগে সংগে উৎপাদনবৃদ্ধিও ঘটিতে থাকে। এইভাবে যতক্ষণ উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে ততক্ষণ মূল্যস্তরবৃদ্ধিকে 'আংশিক মুদ্রাস্ফীতি' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

আংশিক মুদ্রাস্ফীতি

কিন্তু আংশিক মুদ্রাস্ফীতি বেশীদিন চলিতে পারে না। একসময় উৎপাদনের সকল অলস উপকরণই নিয়োজিত হইয়া দেশে আসে পূর্ণনিয়োগের অবস্থা (condition of full employment)। তখন আর উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব হয় না এবং শিল্পপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দরুন মজুরি সুদ প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানের মূল্যসমূহও (factor prices) ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী হয়। এই অবস্থায় লোকের ব্যয় যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় সেই পরিমাণই মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে—অর্থাৎ, মূল্যবৃদ্ধি পুরাদমে চলিতে থাকে। আধুনিক লেখকগণ এইরূপ অবস্থাকেই 'প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি' (true inflation) আখ্যা দিয়া থাকেন। সুতরাং প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি বলিতে বুঝায় উৎপাদনবৃদ্ধির সম্ভাবনারহিত অবিচ্ছিন্ন মূল্যবৃদ্ধি।

প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি

মুদ্রাসংকোচ (Deflation) : মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থা হইল মুদ্রাসংকোচ। এই অবস্থায় মোট আয়-ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া যায় বলিয়া মোট টাকাকড়ির পরিমাণ এবং ফলে, মূল্যস্তরও কমিয়া যাইতে থাকে। এই অবস্থাকেই মুদ্রাসংকোচের অবস্থা বলা হয়।

দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলাফল (Effects of Changes in Prices) : জিনিসপত্রের দাম বা উহার বিপরীত মুদ্রামূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির ফল সমাজের সকল শ্রেণীর উপর সমান নহে। এই কারণেই সরকারকে মুদ্রামূল্যে যথা-সম্ভব স্থায়িত্ব রক্ষা করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। বস্তুত, টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষা বা দামের হ্রাসবৃদ্ধি নিবারণ সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্য বলিয়া পরিগণিত।

দাম বৃদ্ধি পাইলে কিছু লোকের লাভ হয়। খাতক (debtor), শিল্পপতি, মালমজুতকারী প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। খাতক সকল সময়ই পূর্বের চুক্তি অনুসারে ঋণ পরিশোধ করে ; অথচ দাম বৃদ্ধি পাইলে ঐ টাকায় পূর্বাপেক্ষা কম জিনিসপত্র পাওয়া যায়। সুতরাং খাতক লাভবান এবং পাওনাদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিল্পপতিদের লাভ হয় প্রধানত দুইটি কারণে। প্রথমত, তাহারা যখন কাঁচা-মাল ক্রয় করে তখন উহার দাম কম থাকে, কিন্তু যখন তৈয়ারি জিনিস বিক্রয় করে তখন কাঁচামালের দাম বাড়িয়া যায়। তৈয়ারি জিনিস বিক্রয় করিবার সময় সেই সময়কার বর্ধিত দামেই কাঁচামালের হিসাব করে। উদাহরণস্বরূপ, শীতবস্ত্র-উৎপাদক ৮ টাকা পাউণ্ড দামে পশম কিনিল ; কিন্তু তৈয়ারি আলোয়ান বাজারে বিক্রয় করিতে গিয়া দেখিল যে পশমের দাম বাড়িয়া ১০ টাকা পাউণ্ড হইয়াছে। সে এই ১০ টাকা দাম হিসাব করিয়াই আলোয়ানের দাম ঠিক করিবে। দ্বিতীয়ত, তৈয়ারি জিনিসের দাম যে-হারে বৃদ্ধি পায়, মজুরি সুদ ইত্যাদি সে-হারে বৃদ্ধি পায় না। যাহারা মালমজুতের ব্যবসায় করে তাহাদেরও লাভ হয়। কিন্তু যাহারা মাস-মাহিনা অথবা দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরিতে কার্য করে তাহাদের বেতন ও মজুরি দামবৃদ্ধির অনুপাতে বাড়ে না বলিয়া দামবৃদ্ধির ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেনসনভোগী প্রভৃতির ন্যায় যাহাদের আয় একেবারে ধরাবাঁধা তাহাদের আরও ক্ষতি হয়। শ্রমজীবীরা কিন্তু একদিক দিয়া লাভ করে, কারণ তাহাদের নিয়োগের পরিমাণ বাড়ে। ভারতের ন্যায় দেশে কৃষকের দুই দিক দিয়া লাভ হয়। প্রথমত, ঋণগ্রস্ত কৃষকের ঋণের ভার কমিয়া যায় ; দ্বিতীয়ত, কৃষিজ উৎপন্নের দাম বাড়িলেও খাজনা বাড়ে না। পরিশেষে, বর্ধিত দামের ফলে সঞ্চয়ের মূল্য কমিয়া যায়। ইহাতেও অনেকের ক্ষতি হয়।

দামবৃদ্ধির ফলে কিছু লোকের লাভ এবং কিছু লোকের ক্ষতি হয়

দাম হ্রাস পাইলে সকল দিক দিয়াই ঠিক ইহার বিপরীত ঘটে। প্রথমত, পাওনাদার লাভবান ও খাতক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ খাতককে একই

পরিমাণ টাকা ফেরত দিতে হয়, কিন্তু ঐ টাকায় পূর্বাপেক্ষা বেশী জিনিসপত্র পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, শিল্পপতিদের মুনাফা কমে, কারণ জিনিসপত্রের দাম যে-পরিমাণ কমে উৎপাদন-ব্যয় সে-তুলনায় হ্রাস পায় না। দামহ্রাসের দরুন মালমজুতকারীরও লোকসান হয়। যাহারা বেতন ও মজুরি পায় ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের আর্থিক অবস্থা অবশ্য সচ্ছল হইয়া উঠে, কিন্তু নিয়োগের পরিমাণ কমে। সুতরাং শ্রেণী হিসাবে তাহাদের ক্ষতিই হয়। কৃষকেরও ক্ষতি হয়। খাজনা, সুদ প্রভৃতির হার একই থাকে অথচ দ্রব্যের দাম কমার জন্য তাহার আয় কমিয়া যায়। পেনসনভোগীর ন্যায় লোকের আয় নির্দিষ্ট থাকিলেও অবস্থা পূর্বাপেক্ষা সচ্ছল হইয়া উঠে। নির্দিষ্ট আয়ের বিনিময়ে তাহারা পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে। পূর্বে যাহারা সঞ্চয় করিয়াছে তাহাদেরও অনুরূপ সুবিধা হয়।

দাম হ্রাস পাইলে বিপরীত শ্রেণীর লাভক্ষতি হয়

সংক্ষিপ্তসার

টাকাকড়ির মূল্য ও মূল্যস্তর: টাকাকড়ির মূল্য বলিতে এক একক টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি বুঝায়। টাকাকড়ির মূল্য মূল্যস্তরের ঠিক বিপরীত। মূল্যস্তর বলিতে বুঝায় বিভিন্ন জিনিসের গড়পড়তা দাম। এই গড়পড়তা দাম যদি বাড়িয়া যায় তবে টাকাকড়ির মূল্য কমিয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে; অপরদিকে গড়পড়তা দাম বা মূল্যস্তর যদি হ্রাস পায় তবে টাকাকড়ির মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে।

মূল্যস্তর পরিবর্তনের কারণ: দুইটি কারণে মূল্যস্তর পরিবর্তিত হয় (ক) টাকাকড়ির চাহিদায় বা বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন, এবং (খ) টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তন।

টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব: প্রাচীন লেখকগণ মনে করিতেন যে একমাত্র টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তনের ফলেই মূল্যস্তর বা উহার বিপরীত টাকাকড়ির মূল্য পরিবর্তিত হয়। তাঁহাদের আরও ধারণা ছিল যে টাকাকড়ির যোগানে পরিবর্তনের একমাত্র কারণ হইল টাকাকড়ির পরিমাণে পরিবর্তন। এই ধারণার ফলেই টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে। সংক্ষেপে তত্ত্বটি অনুসারে, টাকাকড়ির পরিমাণ যতটা বাড়িবে বা কমিবে, মূল্যস্তরও সেই পরিমাণ বাড়িবে বা কমিবে। টাকাকড়ির পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হইবে, টাকাকড়ির পরিমাণ অর্ধেক হইলে মূল্যস্তরও অর্ধেক হইবে।

টাকাকড়ির পরিমাণতত্ত্ব ভ্রান্ত অনুমানের উপর নির্ভরশীল। ইহা একটি আংশিক ও ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্ব।

সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তনের পরিমাপ: নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা এবং কাঁচামাল, উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি সকল জিনিসের গড়পড়তা দামকে সাধারণ মূল্যস্তর বলা হয়। মূল্যস্তরের পরিবর্তন বুঝা যায় সূচকসংখ্যা প্রণয়নের দ্বারা। সূচকসংখ্যা টাকাকড়ির আপেক্ষিক মূল্য—অর্থাৎ, অন্য এক সময়ের তুলনায় টাকাকড়ির মূল্য নির্দেশ করে।

সরল সূচকসংখ্যা প্রণয়ন: সূচকসংখ্যা হইল বিশেষ পদ্ধতিতে সাজানো কতকগুলি মূল্যস্তর। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ইহা প্রণয়ন করা যাইতে পারে। প্রণয়ন করিবার বিভিন্ন স্তর হইল নিম্নলিখিতরূপ: (ক) প্রথমে ভিত্তি বৎসর নির্বাচন করিতে হইবে; (খ) তারপর উদ্দেশ্য অনুসারে দ্রব্যাদি নির্বাচন করিতে হইবে; (গ) তৃতীয় স্থলে দাম সংগ্রহ করিতে হইবে; (ঘ) চতুর্থত, ভিত্তি বৎসরের তুলনায় গড় দাম শতকরা কত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা দেখিতে হইবে; এবং (ঙ) পরিশেষে, সংশ্লিষ্ট বৎসরসমূহের দামের গড় লইয়া তুলনা করিতে হইবে।

মুদ্রাস্ফীতি: মূল্যবৃদ্ধি মাত্রই মুদ্রাস্ফীতির নির্দেশক নহে; আবার মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলেই লোকের দুঃখদুর্দশা বাড়ে না। মূল্যবৃদ্ধি হইতে হইতে যদি পূর্ণনিয়োগের অবস্থা আসার পরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে তবেই

মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। সংজ্ঞা দিয়া বলিতে গেলে, মুদ্রাস্ফীতি হইল ভোগ্যদ্রব্যাদির সরবরাহ অপেক্ষা সাধারণের ক্রয়শক্তির বৃদ্ধি।

দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলাফল: দামবৃদ্ধির ফলে কিছু লোকের লাভ এবং কিছু লোকের ক্ষতি হয়। যাহাদের লাভ হয় তাহাদের মধ্যে দেনাদার, শিল্পপতি, কৃষক, ব্যবসায়ী প্রভৃতিই প্রধান। যাহাদের ক্ষতি হয় তাহাদের মধ্যে পাওনাদার, শ্রমিক, বাঁধা মাহিনার চাকরিয়া প্রভৃতি আছে। নিয়োগবৃদ্ধি হয় বলিয়া দলগতভাবে শ্রমিকরা অবশ্য লাভবান হয়। দাম হ্রাস পাইলে ঠিক ইহার বিপরীত ঘটে।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by the term 'Value of Money'? How can you measure changes in the Value of Money? (C. U. 1951)

টাকাকড়ির মূল্য বলিতে কি বুঝায়? কিভাবে টাকাকড়ির মূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করিবে?

[১২৭ এবং ১৩১-১৩৪ পৃষ্ঠা]

2. What are Index Numbers? Why and how are they constructed?

সূচকসংখ্যা কাহাকে বলে? কেন এবং কিভাবে তাহাদের প্রণয়ন করা হয়? [১৩১-১৩৪ পৃষ্ঠা]

3. Construct a Simple Index Number showing change in the prices of food stuff.

খাদ্যদ্রব্যের মূল্যে পরিবর্তন দেখাইয়া একটি সরল সূচকসংখ্যা প্রণয়ন কর। [১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠা]

4. Explain carefully the relationship between changes in the quantity of money and changes in the general price level. (C. U. 1953, '60)

টাকাকড়ির পরিমাণে পরিবর্তন এবং সাধারণ মূল্যস্তরে পরিবর্তনের মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা সঠিকভাবে বর্ণনা কর। [১২৮-১৩১ পৃষ্ঠা]

5. What exactly do you mean by 'Inflation of Currency'? Examine the effects of Inflation upon the following classes of people in a country: businessmen, wage-earners, pensioners and salaried people. (C. U 1951, '61)

মুদ্রাস্ফীতি বলিতে ঠিক কি বুঝ? কোন দেশের নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণী লোকের উপর মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল পরীক্ষা কর: ব্যবসায়িগণ, দিনমজুরগণ, পেনসন্‌ভোগিগণ এবং বেতনভোগিগণ।

[১৩৪-১৩৬ পৃষ্ঠা]

6. Indicate the effects of a rise in the level of prices upon (a) wage-earners, (b) businessmen, and (c) persons with fixed incomes. (P. U. 1963)

(১) শ্রমিক, (২) ব্যবসায়ী, এবং (৩) বাঁধা আয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণের উপর মূল্যস্তর বৃদ্ধির কি ফল হয়, তাহা দেখাও। [১৩৫-১৩৬ পৃষ্ঠা]

7. Discuss the functions of Money. What will be the effect of a change in the quantity of money on the general price level? (En. 1964)

টাকাকড়ির কার্যাবলী ব্যাখ্যা কর। মূল্যস্তরের উপর টাকাকড়ির পরিমাণ পরিবর্তনের কি ফল হইতে পারে তাহা দেখাও।

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের ইংগিত: 'উৎপাদনের উপকরণসমূহ পূর্ণভাবে নিয়োজিত হইয়া থাকিলে —অর্থাৎ, পূর্ণনিয়োগের সময় টাকাকড়ির পরিমাণ যতটা বৃদ্ধি পাইবে মূল্যস্তরও ততটা বৃদ্ধি পাইবে। অন্য সময় কিন্তু টাকাকড়ির পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধিতে মূল্যস্তরের সমপরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি নাও ঘটিতে পারে, কারণ সংগে সংগে দ্রব্যাদির উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইতে পারে।......১০৩-১০৫, ১২৭-১২৮ এবং ১৩০-১৩১ পৃষ্ঠা]

দ্বাদশ অধ্যায়

বাজার

(Markets)

বর্তমানে অর্থ-ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হইল বাজার। বাজারের মাধ্যমেই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় চলে এবং চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে দাম নির্ধারিত হয়। সুদূর অতীতেই বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ যখন পণ্যোৎপাদন (commodity production) এবং বিনিময়ের পথে পদসঞ্চার করে তখন হইতেই বাজার প্রবর্তনের পথ প্রস্তুত করা হয়। তারপর ক্রমশ ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারিত হইলে উৎপাদন-পদ্ধতি উন্নতিলাভ করে এবং শিল্পের বিস্তার হয়। সংগে সংগে বাজারও প্রসারিত হয়।

বাজার বলিতে কি বুঝায় ? (What is a Market ?) : যে-কোন নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় চলিলে তাহাকেই সাধারণ ভাষায় বাজার বলা হয়। এই অর্থে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে যে-সকল ক্রয়বিক্রয়ের জায়গা আছে তাহারা বাজার বলিয়া অভিহিত। যেমন, নূতন বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট বাজার, বড়বাজার প্রভৃতি। আবার গ্রামাঞ্চলে যে-সকল নির্দিষ্ট জায়গায় হাট বসে বা বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় চলে তাহাদেরও বাজার বলা হয়। কিন্তু অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট জায়গাকে বুঝায় না ; কোন দ্রব্য বা উৎপাদনের উপাদানসমূহের ক্রেতাবিক্রেতাগণের মধ্যে লেনদেনের যে-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহাকেই অর্থবিদ্যায় বাজার বলিয়া অভিহিত করা হয়।

অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে নির্দিষ্ট জায়গা বুঝায় না

নির্দিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতারা নানা স্থানে ছড়াইয়া থাকিতে পারে—এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থান করিতে পারে, এবং তাহাদের মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা কোন নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত নাও হইতে পারে। টেলিফোন টেলিগ্রাম চিঠিপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে ক্রেতাবিক্রেতাদের লেনদেন সম্পাদিত হইতে পারে।

বাজার বলিতে বুঝায় ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক

সুতরাং যদি কোন অঞ্চলে বিশেষ দ্রব্যের ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে আদান-প্রদানের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ফলে, উহাদের প্রদত্ত বিভিন্ন দাম একে অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তবে ঐ অঞ্চল সংকীর্ণ হউক বা বিস্তৃত হউক উহাকে বাজার বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে বাজারের উপাদানের ইংগিত পাওয়া যায়। প্রথমত, বাজারের জন্য বিশেষ দ্রব্য থাকা চাই। বস্তুত, অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে পৃথক পৃথক জিনিসের জন্য পৃথক পৃথক বাজার বুঝায়। যেমন, গমের বাজার, পাটের বাজার, তুলার বাজার প্রভৃতি। এই সকল পণ্য (commodities) ব্যতীত অন্যান্য ধরনের বাজারও আছে—যেমন, বিদেশী মুদ্রার বাজার, শেয়ার-বাজার, শ্রমের বাজার। দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতাবিক্রেতা থাকা চাই। যে-কোন দ্রব্যের দাম (price) থাকিলেই উহার বাজার থাকিবে। তৃতীয়ত, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

বাজারের উপাদান

১। পৃথক পৃথক দ্রব্য

২। দাম

৩। ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক

বাজারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Markets) : বিভিন্নভাবে বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে: পরিধি অনুযায়ী বাজার স্থানীয় (Local), জাতীয় (National) ও আন্তর্জাতিক (International) হইতে পারে। দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকিলে তাহাকে স্থানীয় বাজার বলে—যেমন, তরিতরকারি, ইট প্রভৃতির ক্রয়বিক্রয় সাধারণত দেশের নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে; সুতরাং উহাদের বাজারকে স্থানীয় বাজার বলা হয়। অনেক জিনিস আছে যাহাদের ক্রয়বিক্রয় সমগ্র দেশ জুড়িয়া চলে অথচ ইহাদের চালান বিদেশে যায় না—দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই সকল দ্রব্যের বাজার জাতীয় বাজার। বর্তমান জগতে পরিবহণ ও সংসরণ, ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রসারের ফলে আবার অনেক দ্রব্যের বাজার দেশের সীমাকেও অতিক্রম করিয়াছে; ফলে উহাদের বাজার এখন জগদ্ব্যাপী—যেমন, পাট, তুলা, স্বর্ণ প্রভৃতির বাজার আন্তর্জাতিক।

১। পরিধি অনুসারে বাজারের শ্রেণীবিভাগ

ক। স্থানীয় বাজার

খ। জাতীয় বাজার

গ। আন্তর্জাতিক বাজার

দ্বিতীয়ত, সময়ের তারতম্য অনুসারে বাজারের প্রকারভেদ করা যায়। মার্শাল (Marshall) সময়ের দিক হইতে চারি প্রকারের বাজারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—যথা, অত্যল্পকালীন বাজার (very short-period market), স্বল্পকালীন বাজার (short-period market), দীর্ঘকালীন বাজার (long-period market), এবং অতি দীর্ঘকালীন বাজার (secular-period or very long-period market)। এই চারি প্রকারের বাজারের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে হইল এইরূপ :

২। সময়ের তারতম্য অনুসারে বাজারের শ্রেণীবিভাগ

অত্যল্পকালীন বাজার : এক দিনের বা কয়েক দিনের বাজারকে মার্শাল অত্যল্পকালীন বাজারের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। এইরূপ বাজারের মেয়াদ বা

ক। অত্যল্পকালীন বাজার

সময় এতই স্বল্প যে যোগানের (supply) হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয় না; অর্থাৎ যোগান মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে। এই অবস্থায় দামের উপর চাহিদার প্রভাব অধিক পড়িবে। চাহিদা অধিক হইলে দাম বৃদ্ধি পাইবার প্রবণতা দেখা দিবে, আর চাহিদা হ্রাস পাইলে দামহ্রাসের ঝোঁক দেখা দিবে। উদাহরণস্বরূপ, এক বিশেষ দিনে

দৃষ্টান্ত

বাজারে মৎস্য যোগানের কথা ধরা যাউক। ঐ দিনের দামের তারতম্য অনুসারে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। মৎস্য যোগানের পরিমাণ এইভাবে নির্দিষ্ট থাকায় চাহিদা অধিক হইলে মৎস্যের দাম বৃদ্ধি পাইবে, চাহিদা কম থাকিলে মৎস্যের দাম হ্রাস পাইবে। দাম অত্যল্প হইলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত মৎস্যই বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে, কারণ মৎস্য অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী পচনশীল দ্রব্য। তবে সকল দ্রব্যই মৎস্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নয়। আবার বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনেক ক্ষণস্থায়ী দ্রব্যই কিছু সময়ের জন্য ধরিয়া রাখা সম্ভব হয়। এই অবস্থায় অত্যন্ত স্বল্পকালীন বাজারেও কোন দ্রব্যের চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে যোগানেরও কতকটা পরিবর্তন করা সম্ভব হয়।

স্বল্পকালীন বাজার : স্বল্পকালীন বাজারে দ্রব্যের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করিবার মত সময় হাতে থাকে। তবে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের দ্বারা যতটা পরিমাণ পরিবর্তন সম্ভব যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি ততটা

খ। স্বল্পকালীন বাজার

পরিমাণই হইবে। অর্থাৎ, স্বল্পকালীন বাজারের সময় এত যথেষ্ট নয় যে উহার মধ্যে উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পের পক্ষে বিশেষীকৃত বা স্থায়ী সাজসরঞ্জামের বা মূলধনের (specialised or fixed equipment or capital) পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। সুতরাং স্বল্পকালীন বাজারে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত যোগান মাত্র আংশিকভাবে তাল রাখিয়া চলিতে পারে।

দীর্ঘকালীন বাজার : দীর্ঘকালীন বাজারে চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী সমধিক পরিমাণে যোগানের পরিবর্তনসাধনের যথেষ্ট সময় থাকে। চাহিদা

গ। দীর্ঘকালীন বাজার

বৃদ্ধি পাইলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলি স্থায়ী মূলধন, কুশলী শ্রমিক বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহা ব্যতীত নূতন নূতন কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়া সংশ্লিষ্ট 'শিল্পে'র* কলেবর বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। অপরপক্ষে চাহিদা হ্রাস পাইলে দীর্ঘকালীন বাজারে শিল্পে অবস্থিত কারখানাগুলির উৎপাদন কমানো যায়।

* এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে 'শিল্প' (   ) বলিতে একই শ্রেণীভুক্ত সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের (Firm) সমষ্টিকে বুঝায়।

দীর্ঘকালীন বাজারে সময় অধিক হওয়ায় এইভাবে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত সম্পূর্ণভাবে তাল রাখিয়া চলিতে পারে।

অতি দীর্ঘকালীন বাজার: মার্শাল দীর্ঘকালীন বাজার ব্যতীত অতি-দীর্ঘকালীন বাজারের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ বাজারের সময় এতই দীর্ঘ যে সাধারণ দীর্ঘকালীন বাজারে যে-সকল পরিবর্তন সম্ভব হয় তাহা ছাড়াও আরও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। যেমন, এক যুগ হইতে অন্য যুগের মধ্যে মানুষের জ্ঞান, জনসংখ্যার আয়তন, মূলধন সরবরাহের অবস্থা, মানুষের রুচি, অভ্যাস প্রভৃতি সকলই পরিবর্তিত হইতে পারে। এই সমস্তের প্রভাবের ফলে দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে।

ঘ। অতি দীর্ঘকালীন বাজার

বাজারের পরিধি (Extent of a Market): সকল দ্রব্যের বাজারের আয়তন বা পরিধি একপ্রকারের নয়। ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন কোন দ্রব্যের বাজার জগদ্ব্যাপী আবার কোন কোন দ্রব্যের বাজার অত্যন্ত সংকীর্ণ ও স্থানীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। যদিও বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের প্রসার এবং পরিবহণ ও আদানপ্রদানের সুযোগসুবিধার উন্নতির ফলে বহু দ্রব্যের বাজারই সম্প্রসারিত হইতেছে, তবুও কোন দ্রব্যের বাজারের আয়তন বিস্তৃত হইতে হইলে কতকগুলি সর্ত পূরিত হওয়া প্রয়োজন। সর্তগুলির বর্ণনা মোটামুটি এইভাবে করা যায়:

ব্যাপক পরিধির বাজারের জন্য দ্রব্যের যে যে বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন:

(১) স্থায়িত্ব (Durability): ক্ষণস্থায়ী বা পচনশীল দ্রব্যের বাজার স্বাভাবিকভাবেই সংকীর্ণ হয়। ক্ষণস্থায়ী হইলে স্থানান্তরে প্রেরণে অসুবিধা হয় এবং প্রেরণের সময়ের মধ্যে দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং দ্রব্যাদি যত দীর্ঘস্থায়ী হইবে অন্য কোন বাধা না থাকিলে উহাদের বাজার তত সম্প্রসারিত হইবে।

(২) সহজে স্থানান্তরে প্রেরণের সুবিধা (Portability): সুপরিসর বাজারের জন্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটি সহজেই স্থানান্তরে প্রেরণযোগ্য হওয়া চাই। আয়তনের তুলনায় দাম যত অধিক হইবে দ্রব্যের প্রেরণযোগ্যতা তত বেশী সহজ হইবে। ইটের কথা যদি ধরা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ইটের আয়তন বা ওজনের তুলনায় উহার দাম অতি সামান্য। ফলে উহাকে স্বল্প খরচে স্বল্প সময়ের মধ্যে স্থানান্তরে প্রেরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং উহার বাজার সংকীর্ণ হইতে বাধ্য। অপরপক্ষে সোনার মত মূল্যবান ধাতুর বাজার বিস্তৃত হয়, কারণ আয়তনের তুলনায় উহার দাম অধিক।

(৩) সহজে চেনার যোগ্যতা (Cognizability): যে-সকল দ্রব্যের গুণাগুণ সহজেই বুঝিয়া লওয়া যায় তাহাদের বাজারও বিস্তৃত হয়। এইজন্য মূল্যবান ধাতু, সরকারী ঋণপত্র বা কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতির বাজার ব্যাপক হয়।

(৪) ব্যাপক চাহিদা (Wide Demand): অন্যান্য সুযোগসুবিধা যতই থাকুক না কেন, কোন দ্রব্যের বাজার সুপরিসর হইতে হইলে ঐ দ্রব্যটির স্থায়ী ও ব্যাপক চাহিদা থাকা চাই। উদাহরণস্বরূপ, সোনারূপা প্রভৃতির চাহিদা জগদ্ব্যাপী বলিয়া উহাদের বাজারও সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত।

বাজার ও প্রতিযোগিতা (Market and Competition): বাজারের দুইটি পক্ষ আছে—ক্রেতা ও বিক্রেতা। ক্রেতাবিক্রেতাদের চাহিদা ও যোগানের প্রভাবের ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সংখ্যা ও প্রতিযোগিতার তারতম্য থাকিতে পারে। এই তারতম্যের জন্যই বাজারে বিভিন্ন পরিবেশ বা অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাজারের বিভিন্ন পরিবেশ বা অবস্থা সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা লইয়া চলা প্রয়োজন; কারণ উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্যার রূপ বাজারের অবস্থার (conditions of market) দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের কথা উল্লেখ করা যায়। বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকিলে দাম-নির্ধারণে এক ধরনের শক্তি কার্য করিবে; আবার বাজারে যদি একচেটিয়া ব্যবসায় চালু থাকে তাহা হইলে দাম-নির্ধারণের সূত্র ভিন্ন আকার ধারণ করিবে।

বাজারের বিভিন্ন অবস্থা বা পরিবেশ

বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে ধারণার প্রয়োজনীয়তা

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা (Perfect Competition): অর্থবিদ্যাবিদগণ যখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করেন তখন তাঁহারা নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন: (১) বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা (a large number of buyers and sellers), (২) পূর্ণাংগ বাজার (perfect market), এবং (৩) সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ-সুযোগ (free entry) এবং শিল্পগুলির মধ্যে উৎপাদনের উপাদান-সমূহের সম্পূর্ণ গতিশীলতা (perfect mobility of productive resources)।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সর্ত:

বহুসংখ্যক ক্রেতাবিক্রেতার অবস্থিতি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার প্রথম সর্ত। এখন প্রশ্ন হইল, 'বহুসংখ্যক' বলিতে কি বুঝায় এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উহার তাৎপর্যই বা কি? কত সংখ্যা হইলে বহুসংখ্যক হইবে সে-সম্বন্ধে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। তবে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের জন্য ক্রেতাবিক্রেতাদের সংখ্যা এত বেশী হওয়া প্রয়োজন যে, যেন কোন ক্রেতা ও বিক্রেতা এককভাবে লেনদেন বা দ্রব্যমূল্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে। প্রত্যেক বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের যোগান মোট যোগানের তুলনায় এত সামান্য যে একজন বিক্রেতা বা একটি প্রতিষ্ঠানের যোগানের পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। ধরা যাউক, বাজারে ধান্যের মোট যোগানের

১। বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতার অবস্থিতি

পরিমাণ ২০০ লক্ষ কুইণ্টাল এবং কোন একজন কৃষকের সর্বাধিক উৎপাদন-ক্ষমতা হইল ২০০ কুইণ্টাল। এই অবস্থায় ঐ কৃষক বাজারে ২০০ কুইণ্টাল বিক্রয় করিল বা না করিল তাহার দ্বারা বাজারে ধান্যের দাম পরিবর্তিত হইবে না।

২। পূর্ণাংগ বাজার

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সর্ত হইল পূর্ণাংগ বাজার। পূর্ণাংগ বাজারের জন্য তিনটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়: প্রথমত, ক্রয়বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্য সমজাতীয় (homogeneous) হইবে। দ্বিতীয়ত, ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হইবে। অর্থাৎ, বাজারের বিভিন্ন অংশে ক্রয়বিক্রয় কিভাবে চলিতেছে সে-সম্পর্কে ক্রেতাবিক্রেতারা সম্যকভাবে অবহিত থাকিবে। তৃতীয়ত, ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে ক্রেতাবিক্রেতারা কোন পৃথকাচরণ করিবে না। অর্থাৎ নির্দিষ্ট দামে ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে অবাধ লেনদেন চলিবে এবং কাহারও প্রতি বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্ব করা হইবে না।

৩। শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশ সুযোগ এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের গতিশীলতা

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার তৃতীয় সর্ত হইল সংশ্লিষ্ট শিল্পে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশের সুযোগ এবং শিল্পগুলির মধ্যে উৎপাদনের উপাদানসমূহের সম্পূর্ণ গতিশীলতা। নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশের সুযোগ থাকে বলিয়া প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বহু হয়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের সম্পূর্ণ গতিশীলতার জন্যই বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদনের একই উপাদানের—যেমন, শ্রমের দাম সমান হয়।

একচেটিয়া কারবারে যোগানের ভার থাকে একের হস্তে

একচেটিয়া কারবার (Monopoly): পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হইল একচেটিয়া কারবার। একচেটিয়া বাজারে মাত্র একজন বিক্রেতা বা একটি প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের যোগান দিয়া থাকে। কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ করপোরেশন একচেটিয়া কারবারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ...র্থাৎ,

একচেটিয়া কারবার যদি নিখুঁত (pure or absolute) হয় ...যোগ্য রূপ হইল একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের কোনপ্রকার পরিবর্ত-দ্রব ...এম রূপ।
product) থাকিবে না এবং স্বাভাবিকভাবেই তাহাকে সে...
সম্মুখীন হইতে হইবে না। এইরূপ নিখুঁত একচেটিয়া ক...
কারবারী দ্রব্যের দাম চড়া রাখিলেও ক্রেতাগণ ...es ? What are the conditions
করিবে না, অন্য দ্রব্যবিক্রেতার দিকে ঝুঁকি... (C. U. 1940)

সুতরাং বিক্রয় ব্যাপারে প্রতিযোগিতা থাকে না

কিন্তু একেবারে পরিবর্ত-দ্রব্য ... -আয়তন কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়?
প্রতিযোগিতা ... নযোগ্যতা, চাহিদার ব্যাপকতা প্রভৃতির দ্বারা নির্ধারিত
...র্য্য হইলে, উহার চাহিদা ব্যাপক হইলে বাজারের আয়তন
কেন ...১৪১-১৪২ পৃষ্ঠা)]
একই Competition ? What are its conditions ?
এইজন্য সাধারণতা কাহাকে বলে? ইহার সর্ত কি কি? [১৪২-১৪৩ পৃষ্ঠা]

যেখানে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের সরবরাহকারী হইল একজন এবং বাজারে ঐ দ্রব্যের 'ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্যের অভাব' (absence of close substitutes) দেখা যায়। ঘনিষ্ঠ পরিবর্তের অভাব বলিতে বুঝায় যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত-দ্রব্য এতই দূরবর্তী (remote) বা এতই অপ্রচুর যে একচেটিয়া কারবারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিযোগিতার কথা বিশেষ চিন্তা না করিয়াই আপন মূল্যনীতি নির্ধারণ করিতে পারে। সুতরাং, একচেটিয়া কারবারে প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না।

বাস্তব জগতে নিখুঁত একচেটিয়া কারবার ও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা উভয়ই বিরল

বাস্তব জগতে নিখুঁত একচেটিয়া কারবার যেমন দেখা যায় না, তেমনি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সন্ধানও কদাচিৎ পাওয়া যায়। এই দুই-এর মধ্যবর্তী অবস্থাই বাজারে সচরাচর দেখা যায়। অর্থাৎ, বেশীর ভাগ শিল্পের বেলায় প্রতিযোগিতা হইল অপূর্ণাংগ (imperfect competition)। প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হয় প্রধানত দুইটি কারণে: প্রথমত, বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা স্বল্প হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিক্রয় দ্রব্য সমজাতীয় না হইতে পারে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, যখন দ্রব্য সমজাতীয় হয় এবং ক্রেতা বহুসংখ্যক হয় তখন প্রতিযোগিতা হয় নিখুঁত বা পূর্ণাংগ। এই দুইটির যে-কোনটির অভাবে প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হইতে পারে।

কেন প্রতিযোগিতা অপূর্ণাংগ হয়

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার একটি রূপ হইল 'একচেটিয়া প্রতিযোগিতা' (Monopolistic Competition)। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা পৃথকীকৃত (differentiated) কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (close substitute products) লইয়া প্রতিযোগিতা করে। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতার সংখ্যা বহু হইলেও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মত বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্যাদি সমজাতীয় হয় না। কিন্তু একেবারে সমজাতীয় না হইলেও বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্যাদি সদৃশ ও ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য হয়, ক্ষেত্রে উহার তাৎপর্যের মত দূরবর্তী পরিবর্ত-দ্রব্য (remote substitute

একচেটিয়া প্রতি-
যোগিতা অপূর্ণাংগ
সমূ‌ -বিক্রেতার
বহুসং

এখন প্রশ্ন হইল,

কোন চটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা ট্রেডমার্ক, সুন্দর প্যাকেট বাজারের চেষ্টা করে এবং অনুরূপ দ্রব্য হইতে যে তাহার দ্রব্য প্রয়োজন যে, রে।

১। বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতার অবস্থিতি

লেনদেন বা দ্রব্যমূল্যের উপর বিশেষ প্রভ টি রূপ হইল অলিগোপলি (Oligopoly) বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের যোগান মোট লা বিক্রেতাবিশিষ্ট কারবার। যখন একজন বিক্রেতা বা একটি প্রতিষ্ঠানের যোগানের বহুসংখ্যক বিক্রেতার স্থলে বাজারে দ্রব্যমূল্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না। একটি ধ করে তখন তাহাকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। ধরা যাউক, বাজারে ধান্যের যে অলিগোপলির

একটি বিশেষ সংস্করণ হইল দ্বি-বিক্রেতাবিশিষ্ট কারবার বা ডুয়োপলি (Duopoly)। ডুয়োপলিতে দুইজন বিক্রেতা বা দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে।

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান অর্থ-ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হইল বাজার। বাজারের মাধ্যমেই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

বাজার বলিতে কি বুঝায়? অর্থবিজ্ঞার বাজার বলিতে হাটবাজার বসার জায়গা বুঝায় না, বুঝায় ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক। অর্থনৈতিক বাজারের উপাদান হইল তিনটি—১। পৃথক পৃথক দ্রব্য, ২। প্রত্যেক দ্রব্যের পৃথক দাম, এবং ৩। ক্রেতাবিক্রেতাদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক।

বাজারের শ্রেণীবিভাগ: নানাভাবে অর্থনৈতিক বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। (ক) পরিধি অনুসারে বাজার—১। স্থানীয়, ২। জাতীয়, এবং ৩। আন্তর্জাতিক—এই তিন প্রকারের হয়। (খ) সময়ের তারতম্য অনুসারে বাজার আবার—১। অত্যল্পকালীন, ২। স্বল্পকালীন, ৩। দীর্ঘকালীন, এবং ৪। অতি দীর্ঘকালীন—এই চারি রকমের হইতে পারে।

বাজারের পরিধি: ব্যাপক পরিধির বাজারের জন্য দ্রব্যের নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা প্রয়োজন—১। উহা স্থায়ী হইবে, ২। উহাকে সহজ বহনযোগ্য হইতে হইবে, ৩। উহাকে সহজে চেনা যাইবে, এবং ৪। উহার ব্যাপক চাহিদা থাকিবে।

বাজার ও প্রতিযোগিতা: ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা ও প্রতিযোগিতার তারতম্য অনুসারে বাজারে বিভিন্ন অবস্থার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপ অন্যতম অবস্থা হইল পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার জন্য নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির কল্পনা করা হইয়াছে—১। বহুসংখ্যক ক্রেতাবিক্রেতার অবস্থিতি, ২। পূর্ণাংগ বাজার, এবং ৩। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশের সুযোগ ও উৎপাদনের উপাদানসমূহের গতিশীলতা। ইহাদের ফলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাজার-দাম সর্বত্র একই হয়।

একচেটিয়া কারবার: একচেটিয়া বাজারে যোগানের ভার থাকে একজন মাত্র ব্যক্তি বা একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের হস্তে। সুতরাং বিক্রয় ব্যাপারে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না। বাস্তব জগতে নিখুঁত একচেটিয়া কারবার বা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা উভয়ই বিরল। এই দুই-এর মধ্যবর্তী অবস্থা—অর্থাৎ, অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা নানা রকমের হইতে পারে। ইহার মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য রূপ হইল অলিগোপলি ও ডুয়োপলি। একচেটিয়া কারবার অবশ্য অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতারই চরম রূপ।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by 'Market' in Economics? What are the conditions that govern the extent of a market? **(C. U. 1940)**

অর্থবিজ্ঞার বাজার বলিতে কি বুঝায়? বাজারের আয়তন কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়?

[ইংগিত: বাজারের আয়তন দ্রব্যের স্থায়িত্ব, বহনযোগ্যতা, চাহিদার ব্যাপকতা প্রভৃতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। দ্রব্য পচনশীল না হইলে, সহজ বহনযোগ্য হইলে, উহার চাহিদা ব্যাপক হইলে বাজারের আয়তন ব্যাপক হইবে।...(১৩৮-১৩৯ এবং ১৪১-১৪২ পৃষ্ঠা)]

2. What is Perfect Competition? What are its conditions?

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে? ইহার সর্ত কি কি? [১৪২-১৪৩ পৃষ্ঠা]

3. **Write notes on :**

(*a*) **Local, National and International Markets.**

(*b*) **Very Short-period Market, Short-period Market, Long-period Market and Very Long-period Market.**

টীকা রচনা কর : (ক) স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার।

(খ) অত্যল্পকালীন, স্বল্পকালীন, দীর্ঘকালীন এবং অতি দীর্ঘকালীন বাজার।

[১৩৯-১৪১ পৃষ্ঠা]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দাম-নির্ধারণের গোড়ার কথা

(Introduction to Price Determination)

অভাবমোচনের সমস্যাই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু। অভাবের পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে। উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা বিনিময়ের মাধ্যমে ভোগীর নিকট গিয়া পৌঁছায়। বিনিময়কার্য সম্পাদিত হয় বাজারে। সুতরাং বাজারে বিনিময় হইল উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সেতু।

বিনিময় উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সেতু

বাজারে বিনিময়কার্য সম্পাদন বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রথম প্রথম প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময়ই করা হইত। সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় কয়েকটি সর্তের উপর নির্ভরশীল। অন্যতম সর্ত হইল, বিনিময়কারী ব্যক্তিগণের প্রত্যেককেই মনে করিতে হইবে যে বিনিময় দ্বারা তাহার লাভ হইবে। ধরা যাউক, এক ব্যক্তি চাউলের পরিবর্তে সরিষার তৈল চায় এবং অপর এক ব্যক্তি সরিষার তৈলের পরিবর্তে চাউল চায়। অতএব, উভয়েরই অপরের দ্রব্য পাইবার জন্য আকাংক্ষা রহিয়াছে। কিন্তু কতটা চাউলের পরিবর্তে কতটা সরিষার তৈল বিনিময় করা যাইতে পারে সে-সম্বন্ধে উভয়ে একমত না হইলে বিনিময় সংঘটিত হইবে না। যাহার চাউল আছে সে যদি মনে করে চাউল বিনিময় করিয়া তাহার যে 'ক্ষতি' হইবে সরিষার তৈল হইতে তাহা অপেক্ষা বেশী 'লাভ' পাওয়া যাইবে, এবং অনুরূপভাবে সরিষার তৈলের মালিক যদি মনে করে যে সরিষার তৈলের বিনিময়ে চাউল পাওয়ায় তাহার লাভ বাড়িবে তবেই চাউল ও সরিষার তৈলের মধ্যে বিনিময় সংঘটিত হইবে। এই যে 'লাভক্ষতি'র উল্লেখ করা হইল অর্থবিদ্যার উহাকে 'উপযোগ' বলে। সুতরাং বিনিময় দ্বারা উভয় পক্ষেরই উপযোগ বর্ধিত হয়। উভয় পক্ষের উপযোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিলে বিনিময় সম্পাদিত হইবে না।

সরাসরি দ্রব্য বিনিময় ও ইহার সর্ত

বিনিময়কারী উভয় পক্ষের উপযোগ বর্ধিত হইলে তবেই বিনিময় সম্পাদিত হয়

বর্তমানে পরোক্ষ বা টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময়ের ব্যাপারেও ঐ একই সর্ত কার্য করে। টাকাকড়ির বিনিময়ে দ্রব্যসংগ্রহ করিলে এক দিক দিয়া উপযোগ বাড়ে, অন্য দিক দিয়া টাকাকড়ি কমিয়া যাওয়ার জন্য উপযোগ বা অভাবমোচনের ক্ষমতা কমে। বিক্রেতার পক্ষে দ্রব্যের বিনিময়ে টাকাকড়ি পাওয়ার জন্য উপযোগ বাড়ে, কিন্তু দ্রব্য হস্তান্তরিত হওয়ায় উপযোগ কমে।

টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময় সম্পর্কে ঐ একই কথা প্রযোজ্য

সুতরাং ক্রেতাবিক্রেতা উভয়েই যদি মনে করে তাহাদের উপযোগ বাড়িবে তবেই টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময় সম্পাদিত হইতে পারে। এইজন্য দেখা যায় যে 'দামে না পোষানোর দরুন' অনেকে বাজারে জিনিস কিনিতে গিয়াও ফিরিয়া আসিয়াছে, অথবা খরিদ্দার থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতা বিক্রয় করে নাই।

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের যখনই 'দামে পোষায়' তখন টাকা ও জিনিসের উপযোগ বা আকাংক্ষা পরস্পরের সমান হয়।* এই দামকে অর্থবিদ্যায় 'বাজার-দাম' (Market Price) বলা হয়। এই দামেই বাজারে জিনিসপত্র বেচাকেনা হয়। এ-সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

মূল্য ও দাম (Value and Price) : মূল্য ও দামের পার্থক্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।** মূল্যকে টাকাকড়ির অংকে প্রকাশ করিলে উহাকে দাম বলা হয়। বিভিন্ন দ্রব্যের দাম জানিতে পারিলে আমরা উহাদের পারস্পরিক মূল্য নির্ধারণ করিয়া লইতে পারি। ধরা যাউক, এক কিলোগ্রাম চাউলের দাম ৫০ নয়া পয়সা এবং এক কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম ২ টাকা; এ-ক্ষেত্রে উভয়ের বিনিময়-মূল্য হইবে ১ কিলোগ্রাম চাউল=২৫০ গ্রাম সরিষার তৈল। চাউলের দাম বাড়িয়া যদি প্রতি কিলোগ্রাম ২ টাকা এবং সরিষার তৈলের দাম বাড়িয়া যদি প্রতি কিলোগ্রাম ৮ টাকা হয় তবে এখনও ১ কিলোগ্রাম চাউলের পরিবর্তে ২৫০ গ্রাম সরিষার তৈল পাওয়া যাইবে। কিন্তু সাধারণত এরূপ ঘটে না—সকল জিনিসের দাম সমপরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য পরিবর্তিত হইতে পারে। এই পারস্পরিক মূল্য কতটা পরিবর্তিত হইয়াছে, বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য কি ?—এই সকল বিষয় অনুধাবনের সহজ উপায় হইল দাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। দাম সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রথমেই আছে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা দেখা।

মূল্যের পরিবর্তে দাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান হয় কেন

দাম-নির্ধারণ (Price Determination) : সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, বাজারে দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা

---

* এই উপযোগকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

** ২২ পৃষ্ঠা।

নির্ধারিত হয়। সুতরাং দাম বা মূল্যের দুইটি দিক আছে—(ক) চাহিদার দিক, এবং (খ) যোগানের দিক। চাহিদার সৃষ্টি করে ক্রেতারা এবং যোগান দেয় উৎপাদকগণ। চাহিদা ও যোগান যেখানে পরস্পরের সমান হয় সেখানেই দাম নির্ধারিত হয়।

দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগান দ্বারা

প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণের অনেকে মনে করিতেন যে দাম বা মূল্য শুধু যোগানের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ হইতে কয়েকটি মূল্যতত্ত্বেরও (Theories of Value) ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—যথা, শ্রমতত্ত্ব, উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব, পুনরুৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব ইত্যাদি।

প্রাচীন লেখকগণ মনে করিতেন যে দাম শুধু যোগান দ্বারাই নির্ধারিত হয়

মূল্যের শ্রমতত্ত্ব (Labour Theory of Value): এই তত্ত্ব অনুসারে দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে-পরিমাণ শ্রম ব্যয়িত হইয়াছে তাহাই উহার মূল্য। একটি দ্রব্য তৈয়ারি করিতে যদি ১০ দিনের এবং অপর একটি তৈয়ারি করিতে যদি ৫ দিনের পরিশ্রম লাগিয়া থাকে তবে প্রথম দ্রব্যটির মূল্য দ্বিতীয় দ্রব্যটির মূল্যের দ্বিগুণ হইবে।

সংক্ষেপে শ্রমতত্ত্ব

নানা দিক দিয়া মূল্যের শ্রমতত্ত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে। শ্রম বিভিন্ন ধরনের হয় বলিয়া কতটা শ্রম নিয়োগ করিতে হইয়াছে তাহা মূল্যের মাপকাঠি হইতে পারে না। দ্বিতীয়ত, শ্রমই যদি মূল্য নির্ধারক হইত তবে জিনিসপত্রের দাম সকল সময়েই অপরিবর্তিত থাকিত। কিন্তু দেখা যায় যে উৎপন্ন দ্রব্যাদির দাম অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হইয়াছে। তৃতীয়ত, শ্রমই উৎপাদনের একমাত্র উপাদান নহে; প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন এবং সংগঠন-নৈপুণ্যও উৎপাদনকার্যে সহায়তা করিয়া থাকে। পরিশেষে, শ্রম সম্পূর্ণ বিফল হইতে পারে। তখন মূল্য নির্ধারিত হইবে কিরূপে? এ-প্রশ্নের উত্তরও শ্রমতত্ত্বে পাওয়া যায় না।

সমালোচনা

মূল্যের উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব (Cost of Production Theory of Value): মূল্যের ব্যাখ্যা হিসাবে শ্রমতত্ত্ব ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইলে উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব প্রচার করা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে দ্রব্যের মূল্য উহার উৎপাদন-ব্যয়—অর্থাৎ, শ্রম কাঁচামাল মূলধন প্রভৃতি সকলের দরুন ব্যয়েরই সমান হয়। এইভাবে শ্রমতত্ত্বের একটি ত্রুটি দূর করা হইলেও চাহিদার দিকে দৃষ্টিপাত না করার জন্য ইহাতে ত্রুটি থাকিয়া যায়। সুতরাং এই তত্ত্বও বর্জিত হইয়াছে।

এই তত্ত্বও বর্জিত হইয়াছে

পুনরুৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব (Cost of Reproduction Theory): এই তত্ত্বের সমর্থকগণ বলেন, আদিতে দ্রব্য নির্মাণ করিতে যে-ব্যয় হইয়াছিল তাহার দ্বারা উহার মূল্য নির্ধারিত হয় না, মূল্য নির্ধারিত হয় উহার

পুনরুৎপাদন-ব্যয় দ্বারা—অর্থাৎ, ভবিষ্যতে উহা পুনরায় উৎপাদন করিতে কি ব্যয় হইবে তাহার দ্বারা। এই তত্ত্বও মূল্যের ব্যাখ্যা করে না। কোন দ্রব্য পুনরায় উৎপাদন করিতে বহু ব্যয় হইতে পারে, কিন্তু উহার যদি কোন চাহিদা না থাকে তবে বাজারে উহার কোন দামই পাওয়া যাইবে না।

এই তত্ত্বও গ্রহণযোগ্য নহে

মূল্য-নির্ধারণের উপরি-উক্ত তত্ত্বগুলিকে আংশিক (partial) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ইহারা মাত্র যোগানের দিক হইতে মূল্য-নির্ধারণের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে। মূল্য বা দাম নির্ধারণের পূর্ণ ব্যাখ্যা পাইতে হইলে আমাদিগকে শুধু যোগান নহে, চাহিদার দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মার্শালকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, কাঁচির দ্বারা কোন কিছু কাটা হইলে যেমন উপরের এবং নীচের দুইটি ফলাই ব্যবহৃত হয়, তেমনি দাম বা মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগান উভয়ই ক্রিয়া করে। অথবা, ক্রিকেট খেলায় 'ন্যাটা' ব্যাটস্‌ম্যান যেমন শুধু বাম হাতেই ব্যাট করে না, তাহার ডান হাতটিও যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি দাম চাহিদা ও যোগান উভয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়, শুধু চাহিদা বা শুধু যোগান দ্বারা নহে।

দাম শুধু যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় না

এখন চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিবার পূর্বে অভাব সম্বন্ধে পুনরায় দু'চার কথা বলা প্রয়োজন।

অভাব (Wants): অভাব হইতেই যে অর্থবিদ্যার আলোচনা সুরু তাহা আমরা দেখিয়াছি।* অভাব আছে বলিয়াই মানুষকে অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সংক্রান্ত কাজকর্মে সারাদিন ব্যস্ত থাকিতে হয়। মানুষের এই অভাবের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

অভাবের বৈশিষ্ট্য

প্রথমত, সাধারণভাবে অভাবের কোন সীমা নাই (wants in general are unlimited)। একটি অভাব পরিতৃপ্ত হইলে আর একটি নূতন অভাব আসিয়া দেখা দেয়। যে-ব্যক্তির দুই বেলা দুই মুঠা ভাত জুটে না সে মনে করে অন্নকষ্ট দূর হইলেই তাহার সকল অভাব মিটিবে। যখন অন্নকষ্ট দূর হয়, তখন সে অভাব-বোধ করে পোশাকপরিচ্ছদের। সাধারণ পোশাকপরিচ্ছদের অভাব মিটিবার পর সে দামী পোশাকপরিচ্ছদের আকাংক্ষা করে। এইভাবে মানুষ সীমাহীন অভাবের পশ্চাতে প্রতিনিয়ত ছুটিয়াই চলে।

১। সাধারণভাবে অভাব অসীম

দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে অভাব অসীম হইলেও প্রতিটি অভাব কিন্তু সসীম (each want is limited)। একটি বিশেষ দ্রব্য যতই পাওয়া যায় উহার জন্য আকাংক্ষা ততই কমিয়া যায়। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যদি সরবৎ পান করিয়া চলে তবে প্রতিটি অতিরিক্ত গ্লাস সরবতের

২। প্রত্যেকটি অভাব কিন্তু সসীম

* ১ পৃষ্ঠা।

জন্য তাহার আকাংক্ষা ক্রমশ কমিয়া যাইবে এবং শেষে এমন এক সময় আসিবে যখন তাহার সরবৎ পানের কোন আগ্রহই থাকিবে না। যে-ব্যক্তির এক জোড়াও জুতা নাই সে প্রথম জোড়া জুতার জন্য যতটা আকাংক্ষা বোধ করিবে, দ্বিতীয় জোড়া জুতার জন্য ততটা আকাংক্ষা বোধ করিবে না। তাহার জুতা জোড়ার সংখ্যা যদি ক্রমশ বাড়িয়া চলে তবে এমন এক সময় আসিবে যখন তাহার নূতন এক জোড়া জুতার জন্য কোন আগ্রহই থাকিবে না। অর্থাৎ, তাহার জুতার জন্য যে-অভাববোধ তাহা সম্পূর্ণভাবে মিটিয়া যাইবে।

৩। কতকগুলি অভাব পরস্পরের প্রতিযোগী

তৃতীয়ত, কতকগুলি অভাব পরস্পরের প্রতিযোগী (a few wants are competitive)। গরম পানীয়ের অভাব চা বা কফি যে-কোন একটি হইতে, জামার অভাব পাঞ্জাবী বা সার্ট যে-কোন একটি হইতে, পরিবহণের অভাব বাস বা ট্রাম যে-কোন একটি হইতে মিটিতে পারে। সুতরাং চা কফির, পাঞ্জাবী সার্টের এবং বাস ট্রামের প্রতিযোগী।

৪। কতকগুলি অভাব পরস্পরের পরিপূরক

চতুর্থত, কতকগুলি অভাব পরস্পরের পরিপূরক (a few wants are complementary)। চা-এর অভাব দুধ ও চিনির অভাব সৃষ্টি করে; মোটরগাড়ী চড়ার অভাব মিটানোর জন্য মোটরগাড়ী ও পেট্রল দুই-ই চাই, আলু বা পটলের তরকারি আলাদাভাবে রাঁধা গেলেও আলু পটলের তরকারি রাঁধিতে হইলে আলু ও পটল উভয়ই প্রয়োজন।

অভাবের শ্রেণীবিভাগ :
১। প্রয়োজনীয়,
২। আরামপ্রদ এবং
৩। বিলাস-দ্রব্য

এইভাবে বৈশিষ্ট্য আলোচনা ছাড়াও মানুষের অভাবকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—যথা, প্রয়োজনীয় অভাব (necessaries), আরামপ্রদ দ্রব্যাদি (comforts), এবং বিলাস-দ্রব্যাদি (luxuries)। প্রয়োজনীয় অভাব বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে—যথা, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অভাব, দক্ষতার জন্য অভাব, রীতিগত প্রয়োজনীয় অভাব ইত্যাদি। যে-অভাবগুলি না মিটিলে জীবনধারণই সম্ভব নহে তাহাদিগকে জীবনধারণের জন্য অভাব (necessaries for life) বলে। উদাহরণস্বরূপ, ন্যূনতম খাদ্যবস্ত্র ও বাসস্থানের উল্লেখ করা যায়। দক্ষতার জন্য অভাব (necessaries for efficiency) হইল সেইগুলি যেগুলি না মিটিলে দক্ষতা বজায় রাখা যায় না। শহরে যে-ডাক্তারের পসার আছে তাঁহার পক্ষে একখানি মোটরগাড়ী রাখা প্রয়োজন, সাইকেলে চাপিয়া রোগী দেখিতে গেলে তাঁহার দক্ষতা বজায় থাকে না।

প্রয়োজনীয় অভাবের প্রকারভেদ

রীতিগত প্রয়োজনীয় অভাব (conventional necessaries) বলিতে সেগুলিকে বুঝায় যেগুলি ব্যক্তির পক্ষে মর্যাদা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয়; পাড়ায় যদি সকলেরই একটি করিয়া রেডিও-সেট থাকে

তবে আমাকেও একটি রেডিও-সেট রাখিতে হয়, অফিসে সমপদস্থ লোকে সকলেই যদি স্যুট পরিয়া আসে তবে আমাকেও স্যুট পরিতে হয়, ইত্যাদি।

বিলাস-দ্রব্য সেগুলিকেই বলে যেগুলির অভাব মানুষ আড়ম্বর প্রদর্শনের জন্য বোধ করে। দামী দামী জামাকাপড় অলংকার গাড়ীবাড়ী আসবাবপত্র প্রভৃতি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নহে, দক্ষতা বজায় রাখার জন্যও আবশ্যক নহে। তবুও মানুষ এগুলির আকাংক্ষা করে শুধু আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার জন্য।

প্রয়োজনীয় অভাব ও বিলাস-দ্রব্যের অভাবের মধ্যস্থল অধিকার করিয়া থাকে আরামপ্রদ দ্রব্যগুলি। এগুলি হইতে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না, আড়ম্বর প্রদর্শনও সম্ভব হয় না। এগুলি হইতে কিছুটা আরাম, কিছুটা সুখ ভোগ করা যায়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে একই জিনিস ব্যক্তিভেদে প্রয়োজনীয়, আরামপ্রদ ও বিলাস-দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যে-ডাক্তারের পসার ভাল তাঁহার পক্ষে একখানি মোটরগাড়ী বিশেষ প্রয়োজনীয়, একজন উচ্চ মাহিনার চাকরিয়ার পক্ষে একখানি গাড়ী হইলে বেশ ভাল হয়, কিন্তু সাধারণ চাকরিয়া বা ছোট ব্যবসায়ীর নিকট মোটরগাড়ী বিলাস-দ্রব্য বলিয়াই গণ্য।

একই দ্রব্য বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার অভাব মিটাইতে পারে

চাহিদা (Demand): অভাববোধ বা আকাংক্ষা হইতেই চাহিদার উদ্ভব হয়। কিন্তু অর্থবিদ্যায় শুধু আকাংক্ষা বা পাইবার ইচ্ছাকেই চাহিদা বলিয়া গণ্য করা হয় না। আমি একখানি মোটরগাড়ীর আকাংক্ষা করিতে পারি; কিন্তু আমার মোটরগাড়ী ক্রয়ের ক্ষমতা বা ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকিতে পারে। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে বলা যায় না যে আমার মোটরগাড়ীর চাহিদা রহিয়াছে। অতএব, চাহিদা আকাংক্ষা ছাড়াও অন্য দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে (১) ক্রয়ের ক্ষমতা, এবং (২) ক্রয়ের ইচ্ছা।

চাহিদার বৈশিষ্ট্য

ক্রয়ের ক্ষমতা বা ইচ্ছা আবার দামের উপর নির্ভরশীল। কোন দ্রব্যের দাম বেশী হইলে উহা লোকের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে যাইতে পারে অথবা ক্রয়ের ইচ্ছা অন্তর্হিত হইতে পারে। এইজন্য চাহিদা বলিতে কোন বিশেষ দামেই চাহিদার পরিমাণ বুঝায়। বস্তুত, দাম-নিরপেক্ষ চাহিদা বলিতে কিছু নাই। 'বাজারে মাছের চাহিদা কত?'—এইরূপ প্রশ্ন অর্থহীন। মাছের চাহিদা বিভিন্ন দামে বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। ২ টাকা কিলোগ্রাম হইলে হয়ত লোকে ১০ কুইণ্টাল কিনিতে ইচ্ছুক হইবে, ৩ টাকা কিলোগ্রাম হইলে ৫ কুইণ্টাল কিনিতে ইচ্ছুক হইবে এবং ১ টাকা কিলোগ্রাম হইলে ৪০ কুইণ্টাল কিনিতে ইচ্ছুক হইবে, ইত্যাদি। সুতরাং বিশেষ দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য লোকে

অর্থবিদ্যায় চাহিদা বলিতে বিশেষ দামেই চাহিদা বুঝায়

কিনিতে ইচ্ছুক থাকে তাহাই ঐ জিনিসের চাহিদা। বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদার জন্য বিভিন্ন দাম থাকে। এই সকল দামকে চাহিদা-দাম (Demand Price) বলা হয়। চাহিদা-দাম একজনের হইতে পারে, আবার সকলেরও হইতে পারে। একজন ২ টাকা কিলোগ্রাম দামে ১ কিলোগ্রাম মাছ কিনিতে প্রস্তুত, সকলে ঐ দামে ১০ কুইণ্টাল মাছ কিনিতে ইচ্ছুক। অতএব, ২ টাকা চাহিদা-দামে ১ কিলোগ্রাম ও ১০ কুইণ্টাল হইল যথাক্রমে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক চাহিদা। দাম-নির্ধারণ ব্যাপারে এই সামগ্রিক চাহিদা-দামই গুরুত্বপূর্ণ।

চাহিদা-দাম

উপযোগ ও চাহিদা (Utility and Demand): ব্যক্তিগতই হউক আর সামগ্রিকই হউক চাহিদা-দাম সকল সময় ব্যক্তির নিকট দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। প্রান্তিক উপযোগ (marginal utility) বলিতে বুঝায় ক্রীত জিনিসের শেষ একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগ; আর সকল একক হইতে যে-উপযোগ পাওয়া যায় তাহাকে মোট উপযোগ (total utility) বলে।

চাহিদা-দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়

ইহা একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা যে ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ যতই বাড়িতে থাকে ঐ দ্রব্যের জন্য আকাংক্ষা ততই কমিয়া যায়। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির নিকট প্রথম এক গ্লাস সরবতের জন্য যেরূপ আকাংক্ষা থাকে, দ্বিতীয় গ্লাস সরবতের জন্য সেরূপ ইচ্ছা থাকে না। তৃতীয় গ্লাস সরবতের জন্য তাহার আকাংক্ষা আরও কমিয়া যায়। আকাংক্ষা কি পরিমাণ কমিতেছে তাহা বুঝা যায় লোকে কি দাম দিতে প্রস্তুত তাহা হইতে।

তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যদি প্রথম গ্লাস সরবতের জন্য ৫০ নয়া পয়সা, দ্বিতীয় গ্লাসের জন্য ২৫ নয়া পয়সা এবং তৃতীয় গ্লাসের জন্য ১২ নয়া পয়সা দিতে প্রস্তুত থাকে তবে তাহার নিকট সরবতের উপযোগ ৫০ নয়া পয়সা হইতে কমিয়া ২৫ নয়া পয়সা এবং ২৫ নয়া পয়সা হইতে কমিয়া ১২ নয়া পয়সায় পরিণত হইতেছে। এখন যদি প্রতি গ্লাস সরবতের দাম ২৫ নয়া পয়সা করিয়াই হয় তবে ঐ ব্যক্তি দুই গ্লাস সরবৎ পান করিবে। এই দ্বিতীয় গ্লাস সরবতের যে-উপযোগ—অর্থাৎ, ২৫ নয়া পয়সা তাহাই হইল তাহার প্রান্তিক উপযোগ। ইহা বাজার-দামের সমান। এ-ক্ষেত্রে তাহার মোট উপযোগ হইতেছে ৫০ + ২৫ = ৭৫ নয়া পয়সা। ইহার সহিত বাজার-দামের কোন সম্পর্ক নাই। সরবতের দাম প্রতি গ্লাস ১২ নয়া পয়সা হইলে সে তিন গ্লাস পান করিত; ফলে তখনও দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হইত। এইভাবে প্রান্তিক উপযোগ দামের সমান না হওয়া পর্যন্ত লোকে জিনিস ক্রয় করিয়া চলে বলিয়াই দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়।

প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগ

উদ্বৃত্ত-তৃপ্তি (Consumers' Surplus) : জিনিসের দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হয় বলিয়া ভোগী (consumer) অধিকাংশ সময় একটা উদ্বৃত্ত-তৃপ্তি উপভোগ করে। ইহাকে উদ্বৃত্ত-তৃপ্তি বা ভোগোদ্বৃত্ত (consumers' surplus) বলা হয়। আমাদের উদাহরণে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি ২ গ্লাস সরবৎ পান করিতেছে বলিয়া সে ৫০+২৫=৭৫ নয়া পয়সার মত (মোট) তৃপ্তি বা উপযোগ অনুভব করিতেছে ; কিন্তু প্রতি গ্লাস সরবতের দাম ২৫ নয়া পয়সা বলিয়া মোট দাম দিতেছে ৫০ নয়া পয়সা। সুতরাং সে ৭৫−৫০=২৫ নয়া পয়সার মত অতিরিক্ত তৃপ্তিলাভ করিতেছে। দুই গ্লাসের পরিবর্তে ঐ ব্যক্তি যদি ৩ গ্লাস সরবৎ পান করিত তবে সে ৫০+২৫+১২=৮৭ নয়া পয়সার মত তৃপ্তিলাভ করিত; কিন্তু প্রতি গ্লাস সরবতের দাম ১২ নয়া পয়সা বলিয়া ৩৬ (অথবা ৩৭) নয়া পয়সা মোট দাম দিত। ফলে তাহার ৮৭−৩৬ (অথবা, ৩৭)=৫১ (অথবা, ৫০) নয়া পয়সার উদ্বৃত্ত-তৃপ্তি লাভ হইত।

এইভাবে মোট উপযোগ হইতে মোট দামকে বাদ দিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাই উদ্বৃত্ত-তৃপ্তি বা ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ। এই প্রসংগে অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে এরূপ পরিমাপ করা সকল সময় সম্ভব হয় না, কারণ লোকে কোন্ পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করিয়া কতটা তৃপ্তি পাইল তাহা সকল ক্ষেত্রে নির্ধারণ করা যায় না।

চাহিদার সূত্র (Law of Demand) : উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে দাম যত কম হইবে লোকে জিনিস তত বেশী কিনিবে, পক্ষান্তরে দাম যত বেশী হইবে লোকে জিনিস তত কম কিনিবে। চাহিদা ও দামের মধ্যে এই যে সম্পর্ক ইহাকে চাহিদার সূত্র (Law of Demand) বলা হয়।

চাহিদা-সূচী

চাহিদার সূত্র হইতে কোন্ কোন্ দামে কি কি পরিমাণ চাহিদা হইবে তাহার তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহাকে চাহিদা-সূচী (Demand Schedule) বলা হয়। নিম্নে একটি কাল্পনিক চাহিদা-সূচী দেওয়া হইল :

প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	সরিষার তৈলের চাহিদার পরিমাণ
৩ টাকা	৫ কুইণ্টাল
২.৫০ „	৭ „
২ „	১০ „
১.৫০ „	১৫ „
১ „	২৫ „

দেখা যাইতেছে যে দাম যত কমিতেছে চাহিদার পরিমাণ ততই বাড়িতেছে। চাহিদার সূত্র অনুসারেই এই রকম হয়।

নিম্নের রেখাচিত্রটির সাহায্যে চাহিদার সূত্রের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে :
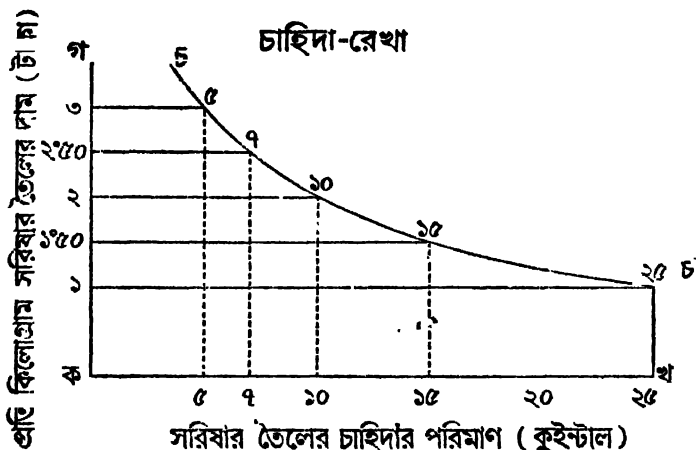
ক গ অক্ষে সরিষার তৈলের দাম এবং ক খ অক্ষে চাহিদার পরিমাণ ধরা হইল। দাম যখন ৩ টাকা তখন ৫ কুইণ্টাল চাহিদা হয়। দাম কমিয়া ২·৫০ টাকা, ২·৫০ টাকা হইতে ২ টাকা, ২ টাকা হইতে ১·৫০ টাকা এবং ১·৫০ টাকা হইতে ১ টাকায় আসিলে চাহিদাও যথাক্রমে বাড়িয়া ৭, ১০, ১৫ এবং ২৫ কুইণ্টালে দাঁড়াইবে। বিভিন্ন দামে সরিষার তৈলের চাহিদার পরিমাণ নির্দেশক উপরের ৫, ৭, ১০, ১৫ এবং ২৫ যোগ করিলে যে-রেখাটি (চ চ´) পাওয়া যায় তাহাকে চাহিদা-রেখা (Demand Curve) বলে। ইহার গতি নিম্নমুখী। ইহার দ্বারা বুঝানো হয় যে দাম কমিলেই চাহিদা বাড়ে।

চাহিদা-রেখা

চাহিদার নিয়মের পশ্চাতে যে যে শক্তি কাষ করে :

এখন প্রশ্ন, চাহিদার এই সূত্রের মূলে কি কি কারণ আছে—অর্থাৎ, দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদা কমে কেন?

প্রথমত, প্রত্যেক ব্যক্তি যত অধিক পরিমাণে কোন দ্রব্য পাইতে থাকে উহার জন্য তাহার আকাংক্ষা ততই কমিয়া যায়। অর্থাৎ, তাহার নিকট ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইতে থাকে। অপরদিকে দাম দিতে হইলে ত্যাগস্বীকার করিতে হয়—অর্থাৎ, টাকা-কড়ির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় লোকে অসুবিধা বোধ করে। সুতরাং লোক ততটাই ত্যাগস্বীকার করিতে, ততটাই অসুবিধা ভোগ করিতে রাজী থাকে যতটা পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ সে কোন দ্রব্য হইতে ভোগ করিতে পারে। সুতরাং দাম কমিলে লোকে বেশী পরিমাণ জিনিস ক্রয় করিবে, আর দাম বেশী হইলে কম জিনিসপত্র ক্রয় করিবে।

১। প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস

দ্বিতীয়ত, কোন জিনিসের দাম কমিলে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, কারণ সে পূর্বের তুলনায় কম ব্যয় করিয়া জিনিসটির সেই

পরিমাণই ক্রয় করিতে পারে। যেমন, ধরা যাউক কোন ব্যক্তি ২ টাকা কিলোগ্রাম দামে ১ কিলোগ্রাম মাছ ক্রয় করিত। মাছের দাম কমিয়া ১ টাকা কিলোগ্রাম হইলে সে পূর্বের মত ১ কিলোগ্রাম মাছ ক্রয় করিলেও তাহার হাতে ১টি টাকা থাকিয়া যাইবে। এই অতিরিক্ত টাকার একাংশ সে আরও মাছ কিনিতে ব্যয় করিতে পারে বলিয়া মাছের ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে কোন জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাইলে ক্রেতার আয় হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া ধরা হয় এবং ঐ জিনিসের ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যায়। ইহাকে আয়-প্রভাব (Income Effect) বলা হয়।

২। আয়-প্রভাব

তৃতীয়ত, কোন জিনিসের দাম হ্রাস পাইলে লোকে অপেক্ষাকৃত অধিক দামের অন্যান্য দ্রব্যের পরিবর্তে ঐ জিনিস অধিকমাত্রায় ক্রয় করিতে থাকে; আবার কোন জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাইলে ঐ দ্রব্যের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম দামের অন্য জিনিস অধিকমাত্রায় ক্রয় করে। যেমন, মাছের তুলনায় মাংসের দাম কমিলে অনেকে অধিক পরিমাণে মাংস ক্রয় করিবে, আবার মাংসের দাম বৃদ্ধি পাইলে অনেকে মাছের দিকে ঝুঁকিবে। সুতরাং কোন দ্রব্যের দাম কমিলে ও বাড়িলে উহার ক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে বাড়িবে ও কমিবে। ইহাকে পরিবর্ত-প্রভাব (Substitution Effect) বলা হয়।

৩। পরিবর্ত প্রভাব

আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাবকে মিলাইয়া দাম-প্রভাব (Price Effect) বলা হয়।

চতুর্থত, কোন জিনিসের দাম কমিলে অনেক নূতন ক্রেতা আসিয়া জুটিবে। অর্থাৎ, যাহারা পূর্বের দামে জিনিসটি ক্রয় করিতে পারিত না, তাহাদের মধ্যে অনেকে জিনিসটি ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। এইভাবে ক্রেতার সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। অপরপক্ষে দাম বাড়িলে ক্রেতার সংখ্যা হ্রাসের ফলে চাহিদার পরিমাণও কমিবে।

৪। ক্রেতার সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দামের পরিবর্তন ছাড়াও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। যেমন, লোকের আয়ের পরিবর্তন, রুচি-ফ্যাসানের পরিবর্তন, জনসংখ্যার পরিবর্তন প্রভৃতির ফলে চাহিদা পূর্বের তুলনায় কমবেশী হইতে পারে। কিন্তু আমরা যখন চাহিদার সূত্রের উল্লেখ করি তখন এইগুলি অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া ধরিয়া লইয়া শুধু দামের সংগে চাহিদার সম্পর্ক নির্ধারণ করি, এবং দেখিতে পাই যে দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে আর দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমে।

চাহিদার সূত্রের অনুমান

যোগান (Supply) : অর্থবিদ্যায় যোগান বলিতে নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতারা বাজারে যতটা মাল ছাড়িতে ইচ্ছুক তাহাকে বুঝায়। চাহিদার

মত যোগানের পরিমাণও দাম-পরিবর্তনের সংগে সংগে পরিবর্তিত হয়। তবে এই পরিবর্তন চাহিদার পরিবর্তনের ঠিক বিপরীত। দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে কিন্তু যোগান কমে। দাম বাড়িলে চাহিদা কমে কিন্তু যোগান বাড়ে। অর্থাৎ, দাম ও চাহিদার পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক বিপরীতমুখী (inverse), কিন্তু দাম ও যোগানের পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক প্রত্যক্ষ (direct)। দাম ও যোগানের মধ্যে এই প্রত্যক্ষ সম্পর্ককেই যোগানের সূত্র (Law of Supply) বলা হয়। যোগানের সূত্র হইতে যোগান-সূচী (Supply Schedule) প্রস্তুত করা যাইতে পারে। নিম্নে একটি যোগান-সূচী দেওয়া হইল :

দাম-পরিবর্তনের ফলে যোগানেরও পরিবর্তন হয়

যোগানের সূত্র

প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ
৩ টাকা	১৫ কুইণ্টাল
২·৫০ „	১৩ „
২ „	১০ „
১·৫০ „	৭ „
১ „	৪ „

সূত্রটি হইতে দেখা যাইবে যে দাম যত বাড়িতেছে যোগানের পরিমাণও তত বাড়িতেছে। এই দামকে যোগান-দাম (Supply Price) বলা হয়। যোগানের উপর দামের প্রভাব চাহিদার উপর দামের প্রভাবের ঠিক বিপরীত। এই কারণে যোগান-রেখা (Supply Curve) অংকন করা হইলে তাহার গতিও চাহিদা-রেখার বিপরীত-মুখী—অর্থাৎ, উর্ধ্বমুখী হইবে। নিম্নে রেখাচিত্রটির সাহায্যে যোগানের সূত্র ব্যাখ্যা করা হইল :

যোগান-দাম ও যোগান-রেখা
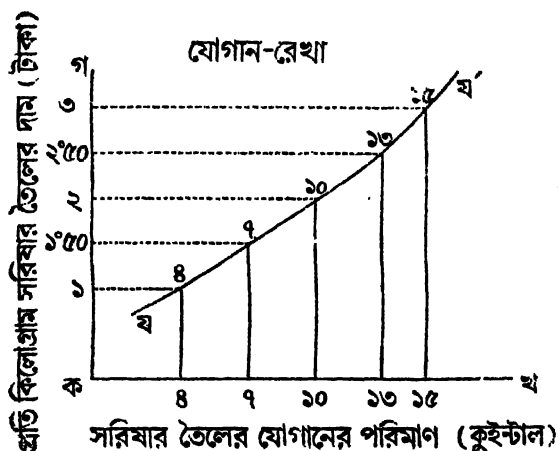
দাম যখন ১ টাকা তখন যোগান ৪ কুইন্টাল; দাম বাড়িয়া ১ টাকা হইতে ১·৫০ টাকা, ১·৫০ টাকা হইতে ২ টাকা, ২ টাকা হইতে ২·৫০ টাকা এবং ২·৫০ টাকা হইতে ৩ টাকা হইলে যোগানের পরিমাণও বাড়িয়া যথাক্রমে ৭, ১০, ১৩ এবং ১৫ কুইন্টাল হইবে। বিভিন্ন দামে সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ নির্দেশক উপরের দিকে ৪, ৭, ১০, ১৩ এবং ১৫ যোগ করিলে যে-রেখাটি (য য´) পাওয়া যায় তাহাই যোগান-রেখা। প্রতিবার দামবৃদ্ধির ফলে ইহা উপরের দিকে উঠিতেছে।

যোগানের পশ্চাতে কোন্ শক্তি কার্য করে

এখন প্রশ্ন হইল, বিভিন্ন দামে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য যোগান হয় কেন? অর্থাৎ, যোগানের পশ্চাতে কোন্ শক্তি কার্য করে? এই প্রশ্নের বিচারে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন যোগানের বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে একমাত্র কার্য করে উৎপাদন-ব্যয়

সংক্ষেপে বলা যায়, দীর্ঘকালীন বাজারে যোগান নির্ধারিত হয় উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা। যে-দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিলে উৎপাদন-ব্যয় (Cost of Production)* পোষায় উৎপাদকগণ সেই পরিমাণ দ্রব্যই যোগান দিয়া থাকে। আমাদের উদাহরণে ১ টাকা কিলোগ্রাম দামে ৪ কুইন্টাল, ১·৫০ টাকা কিলোগ্রাম দামে ৭ কুইন্টাল, ২ টাকা কিলোগ্রাম দামে ১০ কুইন্টাল, ইত্যাদি পরিমাণ সরিষার তৈল যোগান দিলে উৎপাদকের পোষায়—ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। দাম উহা অপেক্ষা কম হইলে উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান হইবে না বলিয়া উৎপাদনও কমিবে; ফলে যোগানও হ্রাস পাইবে।

স্বল্পকালীন ভিত্তিতে কার্য করে সংরক্ষণ-দাম

স্বল্পকালীন বাজারে কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ কমাইবার বিশেষ সুযোগ থাকে না। ফলে ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় যে মজুত মালের মধ্যে তাহারা কতটুকু পরিমাণ বাজারে ছাড়িবে। ইহা নির্ধারিত হয় সংরক্ষণ-দাম (Reservation Price) দ্বারা। সংরক্ষণ-দাম বলিতে সেই দামকেই বুঝায় যাহা না পাইলে বিক্রেতারা বাজারে মাল ছাড়িবে না। এই সংরক্ষণ-দাম নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা, মজুত মালের পরিমাণ ও প্রকৃতি, ভবিষ্যতে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা, বিক্রেতাদের নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি। মজুত মালের পরিমাণ যদি অধিক হয় এবং দ্রব্যটি যদি মাছ তরিতরকারির মত

সংরক্ষণ-দাম কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

পচনশীল হয় তবে বিক্রেতাদের যথাশীঘ্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিতে হইবে। ফলে উহার সংরক্ষণ-দামও কম হইবে। অপরপক্ষে দ্রব্যটি যদি পচনশীল না হয় এবং মজুত মালের পরিমাণ যদি অধিক না হয় তবে দাম কম হইলে বিক্রেতারা দ্রব্যটি

* স্বাভাবিক বা সাধারণ মুনাফা (normal profit) উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ধরিয়া রাখিবার প্রচেষ্টাই করিবে। এ-ক্ষেত্রে দ্রব্যটি ধরিয়া রাখিবার সময় তাহারা ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুমান করিবে। ভবিষ্যতে যদি চাহিদাবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে তবেই তাহারা মাল ধরিয়া রাখিবে, নচেৎ নয়। আবার বিক্রেতাদের নিকট নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা যদি খুব বেশী হয় তবে ভবিষ্যতে চাহিদাবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও তাহাদের পক্ষে স্বল্প দামে বিক্রয় করিবার চাপ অধিক হইবে। এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা সংরক্ষণ-দাম নির্ধারিত হয়।

সংরক্ষণ-দাম বিভিন্ন বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হইলেও উহার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। কারণ, ব্যবসায়ীরা নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির প্রভাব যথাসম্ভব কাটাইয়া উঠিয়া যতক্ষণ-পর্যন্ত-না দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মাল ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে।

স্বল্পকালীন ভিত্তিতেও যোগান উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়

অবশ্য স্বল্পকালীন চাহিদা যদি বিশেষ হ্রাস পায় এবং অদূর ভবিষ্যতে উহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকে তবে আর মাল ধরিয়া রাখে না—উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা স্বল্প বাজার-দামেই উহা বিক্রয় করিয়া দেয়। অতএব, বলা যায় যে স্বল্পকালীন ভিত্তিতে যোগান উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা বেশ কতকটা প্রভাবান্বিত হয়।

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে যোগান উৎপাদন-ব্যয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে যোগান উৎপাদন ব্যয় দ্বারা পুরাপুরিই প্রভাবান্বিত হয়—উৎপাদন-ব্যয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কারণ, বহুদিন ধরিয়া লোকসান দিয়া কেহই উৎপাদন করিতে চাহে না।

চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য (Equilibrium of Demand and Supply):

চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবার পূর্বে দেখা যাউক যে ইহাদের প্রভাবে কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক দাম নির্ধারিত হয়। চাহিদার সূত্র অনুসারে দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদা কমে; অপরদিকে যোগানের নিয়ম অনুসারে ঠিক বিপরীত ঘটে। দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণের এই বিপরীতমুখী গতি একস্থানে আসিয়া পরস্পরের সহিত সমান হইতে দেখা যায়। যে-দামে এইরূপ ঘটে তাহাকে ভারসাম্য দাম (Equilibrium Price) এবং ঐ দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয় তাহাকে ভারসাম্য পরিমাণ (Equilibrium Amount) বলা হয়।

চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে দাম ধার্য হয়

নিম্নে চাহিদা ও যোগান সূচী পাশাপাশি সাজাইয়া প্রতিযোগিতামূলক দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা ব্যাখ্যা করা হইল :

সরিষার তৈলের চাহিদার পরিমাণ	প্রতি কিলোগ্রাম সরিষার তৈলের দাম	সরিষার তৈলের যোগানের পরিমাণ
৫ কুইণ্টাল	৩ টাকা	১৫ কুইণ্টাল
৭ "	২·৫০ "	১৩ "
১০ "	২ "	১০ "
১৫ "	১·৫০ "	৭ "
২৫ "	১ "	৪ "

উপরি-উক্ত চাহিদার তালিকা হইতে দেখা যায় যে দামবৃদ্ধির সংগে সংগে চাহিদার পরিমাণ কমিতেছে কিন্তু যোগানের তালিকা অনুসারে দামবৃদ্ধির সংগে সংগে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। দাম যখন প্রতি কিলোগ্রাম ২ টাকা করিয়া তখন চাহিদা ও যোগান উভয়ই ১০ কুইণ্টাল। দাম আরও বৃদ্ধি পাইয়া ২ টাকা হইতে ২·৫০ টাকা হইলে যোগান ১৩ কুইণ্টাল হইবে কিন্তু চাহিদা ৭ কুইণ্টালে নামিয়া আসিবে। ফলে বাধ্য হইয়া বিক্রেতাদের দাম কমাইতে হইবে। অপরদিকে দাম কমিয়া ১·৫০ টাকা হইলে চাহিদা বাড়িয়া ১৫ কুইণ্টাল হইবে, কিন্তু যোগান কমিয়া ৭ কুইণ্টালে দাঁড়াইবে। ফলে চাহিদার প্রভাবে দাম আবার উর্ধ্বমুখী হইবে। এইভাবে পরস্পরের সহিত ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে চাহিদা ও যোগান ২ টাকা দামে পরস্পরের সহিত সমান হইবে। এই ২ টাকায় ক্রয়বিক্রয়ের অবস্থাই হইল ভারসাম্যের অবস্থা (Equilibrium Position) এবং এই ২ টাকা দামই ভারসাম্য-দাম (Equilibrium Price)। ভারসাম্য-দাম বলা হয় এই কারণে যে ঐ দামে চাহিদা ও যোগানের প্রভাবের মধ্যে সমতার সৃষ্টি হয়।

ভারসাম্য-দাম

বিষয়টিকে চাহিদা ও যোগান রেখার সাহায্যে বুঝাইবার জন্য নিম্নে রেখাচিত্রটি অংকন করা হইল:
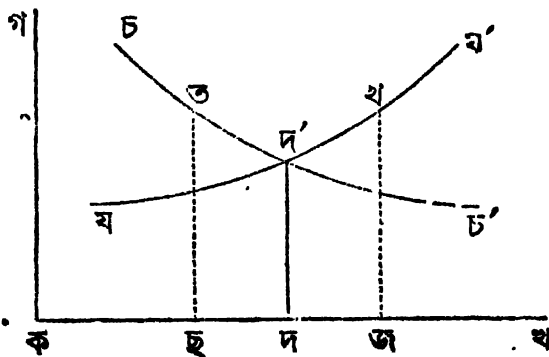
চ চ´ পূর্বোক্ত চাহিদা-রেখা ; উহার গতি নিম্নমুখী। য য´ যোগান-রেখা ; উহা ঊর্ধ্বগামী।* উহারা পরস্পরকে দ´ বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। দ দ´ (অস্থায়ী) ভারসাম্য-দাম পরিমাপ করে। অর্থাৎ, দ দ´ দামে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান (ক দ পরিমাণ) হইবে। দাম যদি বাড়িয়া ছ ত হয় তবে চাহিদা কমিয়া ক ছ-এ আসিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু যোগান হইবে ক জ পরিমাণ। যোগানের পরিমাণ চাহিদা অপেক্ষা অধিক হওয়ায় বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আবার দামকে দ দ´-তে লইয়া আসিবে।
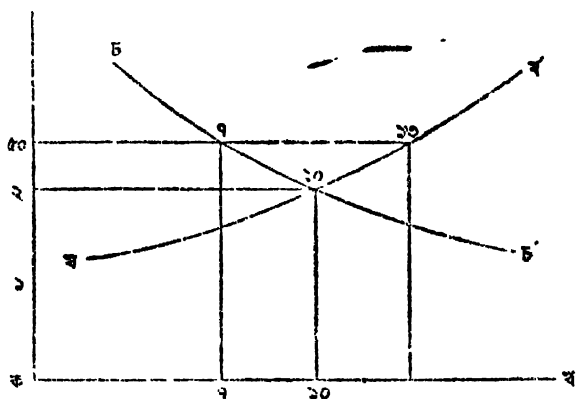
পাটীগাণিতিক হিসাব ধরিলে আমাদের উদাহরণে দ দ´ (দাম) হইল ২ টাকা এবং ক দ (চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ) হইল ১০ কুইন্টাল। দাম দ দ´ (২ টাকা) হইতে বাড়িয়া ছ ত (২·৫০ টাকা) হইলে চাহিদা ক দ (১০ কুইন্টাল) হইতে ক ছ-তে (৭ কুইন্টাল) কমিয়া আসিবে; কিন্তু যোগান ক দ (১০ কুইন্টাল) হইতে ক জ-তে (১৩ কুইন্টাল) বৃদ্ধি পাইবে।

দাম-নির্ধারণ ব্যাপারে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়াকে এইভাবে বিবৃত করা যায়:

দাম-নির্ধারণের ব্যাপারে চাহিদা ও যোগানের তিনটি নীতি

(১) কোন বিশেষ দামে চাহিদা যোগান অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ দাম বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু যোগান চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ দাম কমার দিকে ঝোঁক দেখা দিবে।

(২) দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে কিন্তু যোগান কমে; দাম বাড়িলে চাহিদা কমে কিন্তু যোগান বাড়ে।

(৩) এইভাবে দাম এমন একটা স্তরে আসিয়া দাঁড়ায় যেখানে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পরের সমান হয়।**

---

* ১৫৪ এবং ১৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

** Henderson: *Supply and Demand*

সংক্ষিপ্তসার

বিনিময় উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সেতু। পূর্বে লোকে সরাসরি দ্রব্য-বিনিময় করিত। দ্রব্য বিনিময় হউক আর টাকাকড়ির মাধ্যমে বিনিময়ই হউক, বিনিময়কারী উভয় পক্ষ লাভবান হইয়াছে মনে না করিলে বিনিময়কার্য সম্পাদিত হয় না। উভয় পক্ষ তখনই লাভবান হয় যখন উভয়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়। আধুনিক বিনিময়ের উদাহরণ দিয়া বলিতে গেলে, টাকাকড়ি ও দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সমান হইলে তবেই বিনিময়কার্য সম্পাদিত হইতে পারে। যে-দামে ইহা হয় তাহাকে বাজার-দাম বলে।

মূল্য ও দাম: মূল্যকে টাকাকড়ির অংকে প্রকাশ করা হইলে উহাকে দাম বলে। দামের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করিয়া আমরা মূল্যের পরিবর্তন সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি।

দাম-নির্ধারণ: দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগান দ্বারা। প্রাচীন লেখকগণ কিন্তু মনে করিতেন যে দাম শুধু যোগান দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এই দিক দিয়া কয়েকটি তত্ত্বও উদ্ভূত হইয়াছে—যথা, (ক) শ্রমতত্ত্ব, (খ) উৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব, (গ) পুনরুৎপাদন-ব্যয়তত্ত্ব, ইত্যাদি। এই সকল তত্ত্বের ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া মার্শাল ঘোষণা করেন যে, যেমন কাঁচি দিয়া কোন কিছু কাটিতে হইলে কাঁচির দুইটি ফলাই ব্যবহার করিতে হয় তেমনি দামও চাহিদা এবং যোগান উভয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়—একমাত্র চাহিদা বা একমাত্র যোগান দ্বারা নহে।

অভাব: অভাবের জন্যই মানুষ অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। মানুষের অভাবের চারিটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়: ১। সামগ্রিকভাবে অভাব অসীম, ২। প্রত্যেকটি অভাব কিন্তু সসীম, ৩। কতকগুলি অভাব পরস্পরের প্রতিযোগী, এবং ৪। কতকগুলি অভাব পরস্পরের পরিপূরক।

মানুষের অভাবকে মোটামুটিভাবে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: ১। প্রয়োজনীয়, ২। আরামপ্রদ, ৩। বিলাস-দ্রব্য। প্রয়োজনীয় অভাব তিন ধরনের হয়—(ক) জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয়, (খ) দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয়, এবং (গ) রীতিগত প্রয়োজনীয়।

চাহিদা: অর্থবিদ্যায় চাহিদা বলিতে বিশেষ দামেই চাহিদা বুঝায়। বস্তুত, দাম-নিরপেক্ষ চাহিদা বলিয়া কিছু নাই। চাহিদা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(ক) আকাংক্ষা, (খ) ক্রয়ের ক্ষমতা, এবং (গ) ক্রয়ের ইচ্ছা। বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদার জন্য বিভিন্ন দাম থাকে। ইহাকে চাহিদা-দাম বলে।

উপযোগ ও চাহিদা: উপযোগ ও চাহিদার মধ্যে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ।

ব্যক্তির নিকট চাহিদা দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। প্রান্তিক উপযোগ বলিতে বুঝায় ক্রীত জিনিসের শেষ একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগ। ভোগের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায় প্রান্তিক উপযোগ তত হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। এইভাবে হ্রাস পাইতে পাইতে উপযোগ যতক্ষণ-পর্যন্ত-না দামের সমান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি ক্রয় করিয়া চলে।

উদ্বৃত্ত তৃপ্তি: বিভিন্ন একক হইতে বিভিন্ন পরিমাণ উপযোগ পাওয়া যায়, কিন্তু দাম সকল এককের বেলায় একই থাকে বলিয়া ক্রেতা ও ভোগী কতকটা উদ্বৃত্ত-তৃপ্তি লাভ করে। ইহাকে ভোগোদ্বৃত্ত বলা হয়। মোট-উপযোগ হইতে মোট প্রদত্ত দাম বাদ দিয়া ইহার পরিমাপ করা হয়।

চাহিদার সূত্র: চাহিদার সূত্র অনুসারে দাম বাড়িলে চাহিদা কমিবে এবং দাম কমিলে চাহিদা বাড়িবে। চাহিদার সূত্র হইতে চাহিদা সূচী প্রণয়ন করা যায়—অর্থাৎ, দেখানো যায় যে কোন্ কোন্ দামে কি কি পরিমাণ চাহিদা হইবে। চাহিদার সূত্রের রেখাচিত্র অংকন করিলে তাহা হইতে চাহিদা-রেখা পাওয়া যায়। এই চাহিদা-রেখার গতি নিম্নমুখী। ইহা দ্বারা বুঝানো হয় যে দাম কমিলেই চাহিদা বাড়ে।

চাহিদার সূত্রের পশ্চাতে এই কয়টি নিয়ম কার্য করে: ১। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ, ২। আয়-প্রভাব, ৩। পরিবর্ত-প্রভাব, এবং ৪। ক্রেতার সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি। চাহিদার সূত্র কতকগুলি অনুমানের উপর নির্ভরশীল।

যোগান : নির্দিষ্ট দামে যে-পরিমাণ দ্রব্য বাজারে ছাড়া হয় অর্থবিদ্যায় তাহাকেই যোগান বলে। দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানও পরিবর্তিত হয়। চাহিদার সূত্রের মত যোগানের সূত্র, চাহিদা-দামের মত যোগান-দাম এবং চাহিদা-রেখার মত যোগান-রেখাও আছে।

স্বল্পকালীন যোগানের পশ্চাতে কার্য করে 'সংরক্ষণ দাম' এবং দীর্ঘকালীন যোগানের পশ্চাতে কার্য করে 'উৎপাদন-ব্যয়'। তবে স্বল্পকালীন ভিত্তিতেও যোগান উৎপাদন ব্যয় দ্বারা বেশ কতকটা প্রভাবান্বিত হয়, কারণ উৎপাদন-ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিক্রেতারা যোগান দিবে কি না তাহা মোটামুটি ঠিক করে।

চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য : প্রতিযোগিতামূলক দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে অবস্থায় চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয়া দাম নিরূপিত হয় তাহাকে 'ভারসাম্যের অবস্থা' এবং যে-দামে উহা নির্ধারিত হয় তাহাকে 'ভারসাম্য দাম' বলা হয়।

দাম-নির্ধারণ ব্যাপারে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়াকে তিনটি সরল নীতিতে বিবৃত করা যায় :

১। কোন বিশেষ দামে চাহিদা যোগান অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ দাম বাড়িতে থাকিবে; কিন্তু যোগান চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইলে ঐ দাম কমার দিকে ঝোঁক দেখা দিবে।

২। দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে কিন্তু যোগান কমে; দাম বাড়িলে ইহার বিপরীত ঘটে।

৩। এইভাবে দাম এমন একটা স্তরে আসিয়া দাঁড়ায় যেখানে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. State the Law of Demand. Explain why a rise in price tends to decrease demand and a fall in price to increase it. (C. U. 1950, '58)

চাহিদার সূত্র বিবৃত কর। কেন দাম বাড়িলে চাহিদা কমে এবং দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে তাহা ব্যাখ্যা কর।

[ইংগিত : চাহিদার সূত্রের পশ্চাতে যে যে শক্তি কার্য করে তাহা বর্ণনা কর।...১৫৩-১৫৫ পৃষ্ঠা]

2. State the Law of Supply. What are the forces that lie behind it?

যোগানের সূত্র বিবৃত কর। এই সূত্রের পশ্চাতে কোন্ কোন্ শক্তি কায করে? [১৫৫-১৫৮ পৃষ্ঠা]

3. Explain how price is determined in the market under conditions of competition. (P. U. 1961; B. U. 1961; C. U. 1962)

কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর। [১৫৮-১৬০ এবং ১৭৭ পৃষ্ঠার ২নং প্রশ্ন দেখ।]

4. Write a note on price determination under competition. (En. 1964)

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাম-নির্ধারণের উপর একটি টীকা রচনা কর। [পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর দেখ।]

চতুর্দশ অধ্যায়

চাহিদা ও যোগানের প্রকৃতি

(Nature of Demand and Supply)

দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। এখন দেখা প্রয়োজন যে চাহিদা ও যোগান কিভাবে নির্ধারিত হয়।

চাহিদা সম্পর্কে এই আলোচনার প্রথমেই আমাদের একটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। চাহিদা দুই প্রকার বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। প্রথমত, কোন জিনিসের দাম পরিবর্তিত হইলে উহার চাহিদার পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। দ্বিতীয়ত, লোকের আয়, রুচি প্রভৃতির পরিবর্তনের ফলেও চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। এখন চাহিদার পরিবর্তন (Changes in Demand) বলিতে এই দ্বিতীয় প্রকার পরিবর্তনকেই বুঝায়।* আর কোন দ্রব্যের চাহিদার উপর উহার দামের পরিবর্তনের প্রভাবকে বুঝাইবার জন্য 'চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা' (Elasticity of Demand) বা 'চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন' (Changes in the Quantity demanded) কথাটি ব্যবহৃত হয়।

চাহিদার দুই প্রকার পরিবর্তন

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand): দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমে—ইহাই চাহিদার নিয়ম। কিন্তু দাম বাড়াকমার ফলে সকল দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের সমান হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। দেখিতে পাওয়া যায়, দাম সামান্য কমিলে বিলাস-দ্রব্যের চাহিদা বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়, কিন্তু চাউল লবণ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বিশেষ কমিলেও উহাদের চাহিদা তেমন বৃদ্ধি পায় না। দাম-পরিবর্তন ও চাহিদার পরিমাণ পরিবর্তনের মধ্যে এই যে সম্বন্ধ ইহাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand) বলে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, দামের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন যে-পরিমাণ সাড়া দেয় তাহাই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা।**

দাম-পরিবর্তন ও চাহিদা-পরিবর্তনের মধ্যে সম্বন্ধকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে

দামের বেশ কিছুটা পরিবর্তন হইলে যে-সকল দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ সামান্য মাত্র পরিবর্তন ঘটে, তাহাদিগকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (Inelastic Demand) বলে। চাউল, লবণ, সাধারণ পোশাকপরিচ্ছদ ইত্যাদি ইহার উদাহরণ। অপরদিকে দামের

অস্থিতিস্থাপক চাহিদা

---

* ১৫৫ পৃষ্ঠা দেখ।

** **Elasticity of demand may be defined as the degree of response to changes in price.**

সামান্ত পরিবর্তন ঘটিলেই যে-সকল দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ পরিমাণে পরিবর্তিত হয় তাহাদিকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা (Elastic Demand) বলে। মোটরগাড়ী, রেডিও-সেট, ফাউণ্টেন পেন প্রভৃতি বিলাস-দ্রব্যের চাহিদা এই শ্রেণীভুক্ত।

স্থিতিস্থাপক চাহিদা

কোন চাহিদা স্থিতিস্থাপক কি অস্থিতিস্থাপক তাহা বুঝা যায় বিভিন্ন দামে ঐ দ্রব্যের উপর ব্যয়িত অর্থ হইতে। চা ও কফির উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক বিভিন্ন বাজার-দামে উহাদের উপর কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয় :

উদাহরণ

চা

প্রতি পাউণ্ডের দাম	চাহিদার পরিমাণ	মোট ব্যয়
৩ টাকা	১০০০ পাউণ্ড	৩০০০ টাকা
২ „	১২০০ „	২৪০০ „
১ „	১৫০০ „	১৫০০ „

কফি

প্রতি পাউণ্ডের দাম	চাহিদার পরিমাণ	মোট ব্যয়
৪ টাকা	১০০ পাউণ্ড	৪০০ টাকা
৩'৫০ „	২০০ „	৭০০ „
৩ „	৫০০ „	১৫০০ „

দেখা যাইতেছে, চা-এর দাম পাউণ্ড প্রতি ১ টাকা কমিলেও চাহিদা তেমন বৃদ্ধি পাইতেছে না এবং চা-এর উপর ব্যয়িত মোট টাকার পরিমাণ কমিতেছে। অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ইহাই লক্ষণ। কিন্তু কফির দাম পাউণ্ড প্রতি ৫০ নয়া পয়সা কমিয়া যাওয়ার ফলেই চাহিদা প্রায় দ্বিগুণ ও ততোধিক হইতেছে এবং কফির উপর ব্যয়িত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। স্থিতিস্থাপক চাহিদার ইহাই বিশেষত্ব।*

অস্থিতিস্থাপক চাহিদার লক্ষণ

স্থিতিস্থাপক চাহিদার লক্ষণ

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, যে দ্রব্য যত প্রয়োজনীয় অভাব দূর করে তাহার চাহিদা তত অস্থিতিস্থাপক। চাউল তৈল লবণ প্রভৃতি আমাদের জীবন-ধারণের পক্ষে অপরিহার্য। এই কারণে ইহাদের চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক। চা-ও আমাদের দেশে বর্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে পড়ে; সুতরাং ইহার চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

* চাহিদা স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক কিছুই না হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে 'একের সমান' (equal to unity or one) বলা হয়। ইহাতে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ পূর্বের মত থাকিয়া যায়। আমাদের উদাহরণে প্রতি পাউণ্ড চা-এর দাম ৩ টাকা হইতে ২ টাকায় কমার ফলে যদি চাহিদা বাড়িয়া ১৫০০ পাউণ্ড এবং ফলে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩০০০ টাকা হইত, তখন চা-এর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে একের সমান বলা হইত।

অপরপক্ষে স্বর্ণ রৌপ্য হীরক মোটরগাড়ী প্রভৃতি বিলাস-দ্রব্য আমাদের অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় অভাব মিটায়। ফলে ইহাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

দ্বিতীয়ত, যে-সকল দ্রব্য নানাভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। কয়লা রন্ধনকার্য, কলকারখানা, রেলইঞ্জিন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কয়লার দাম বৃদ্ধি পাইলে লোকে রন্ধনকার্যে জ্বালানী কাঠ ব্যবহার করিতে পারে, আবার দাম কমিলে যাহারা কাঠ ব্যবহার করিত তাহারা কয়লার চাহিদা বাড়াইতে পারে।

তৃতীয়ত, ভোগ স্থগিত রাখিতে সমর্থ হইলে ঐ ভোগ্যদ্রব্য বা উহার উৎপাদনের উপকরণগুলির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইবে। বাড়ীঘর নির্মাণের দ্রব্যাদির দাম যদি বাড়িয়া যায় তবে লোকে বাড়ীঘর নির্মাণ স্থগিত রাখে; পরে আবার মালমসলার দাম কমিলে নির্মাণকার্য সুরু করে।

পরিশেষে, যে-সকল দ্রব্যের পরিবর্ত (substitute) আছে তাহাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। যেমন, চা-এর দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে লোকে কফি পান সুরু করিতে পারে, বিদ্যুৎ সরবরাহের দাম বৃদ্ধি করিলে লোকে গ্যাসের বাতি জ্বালাইতে পারে, ইত্যাদি।

চাহিদার মূল্যানুগ এবং আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা (Price-Elasticity and Income Elasticity of Demand): দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে-পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে তাহাকে 'চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা' (Price-Elasticity of Demand) বলা হয়। দাম ছাড়া আরও অনেক কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল আয়ের পরিবর্তন। আয় বাড়িলে লোকে বেশী করিয়া জিনিসপত্র কিনিবে; এবং আয় কমিলে কেনার পরিমাণও কমাইয়া দিবে। আয় কম থাকার জন্য যে ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামে চাপিত, সপ্তাহে মাত্র দুই তিন দিন মাছ খাইত, জামাকাপড় নিজেই সাবান দিয়া কাচিয়া লইত—আয় বাড়িলে সে প্রথম শ্রেণীর ট্রামে চাপিবে, রোজই মাছ খাইবে এবং জামাকাপড় ধোপার বাড়ী দিবে। ফলে এই সমস্ত জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িবে। আয়ের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার এইরূপ পরিবর্তনকে 'চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা' (Income-Elasticity of Demand) বলা হয়।

চাহিদার পরিবর্তন কাহাকে বলে এবং কি কি কারণে ইহা ঘটিতে পারে

চাহিদার পরিবর্তন (Changes in Demand): দামের পরিবর্তন না ঘটিয়াও চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলে উহাকে চাহিদার পরিবর্তন (Change in Demand) বলা হয়। চাহিদার এই ধরনের হ্রাসবৃদ্ধি হইলে পূর্বের দামেই জিনিসপত্র কমবেশী বিক্রয় হয়। পূর্বোক্ত আয়ের পরিবর্তন ছাড়া নিম্নলিখিত কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়:

(১) লোকের রুচি, স্বভাব ও ফ্যাসানের পরিবর্তন : চা-পানের অভ্যাস বৃদ্ধি পাইলে চিনি ও দুগ্ধের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে; মোটরগাড়ীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইলে ঘোড়ার গাড়ীর চাহিদা কমিবে: মেয়েদের মধ্যে জরির জুতা পরার ফ্যাসান চালু হইলে জরির চাহিদা বাড়িবে; ইত্যাদি।

(২) জনসংখ্যার পরিবর্তন : জনসংখ্যার পরিবর্তনের ফলেও চাহিদা পরিবর্তিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে বহু লোকের আগমনের ফলে পশ্চিমবংগের বাড়ীঘর জমিজমার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে; আবার ঐ কারণেই পূর্ব-পাকিস্তানে ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে।

(৩) আয়ের বণ্টনে পরিবর্তন : জাতীয় আয়ের বণ্টন-পদ্ধতি পরিবর্তিত হইলেও চাহিদা পরিবর্তিত হইবে। ধনীর তুলনায় দরিদ্রের আয় বৃদ্ধি পাইলে দরিদ্রের ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়িবে এবং ধনীর ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কমিবে।

(৪) ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা : চাহিদা বাজারের তেজী-মন্দা অবস্থার দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়। তেজী বাজারের (boom market) সময় সকল জিনিসের চাহিদা বাড়ে আবার মন্দাবাজারের সময় সকল জিনিসের চাহিদা কমে।

(৫) পরস্পর-সম্পর্কিত দামের পরিবর্তন : কতকগুলি এরূপ দ্রব্য আছে যাহাদের দাম পরস্পর-সম্পর্কিত—যেমন, চা ও চিনি, মোটরগাড়ী ও পেট্রল, ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে একটির দাম বাড়িলে অপরটির চাহিদাও হ্রাস পাইতে পারে। যেমন, পেট্রলের দাম বৃদ্ধি পাইলে লোকে মোটরগাড়ী চড়া কমাইয়া দিতে পারে।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Supply) : স্থিতিস্থাপকতা চাহিদার ন্যায় যোগানের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, দাম ও যোগানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। দাম বাড়িলে যোগান বাড়ে এবং দাম কমিলে যোগান কমে।* যোগানের ক্ষেত্রেও স্থিতিস্থাপকতা দাম-পরিবর্তনে যোগান যে-পরিমাণ সাড়া দেয় তাহা পরিমাপ করে।

স্থিতিস্থাপকতা যোগানেরও বৈশিষ্ট্য

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা, দ্রব্যের স্থায়িত্ব, উৎপন্নের হার, সময়ের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি। যে-সকল দ্রব্য ক্ষণস্থায়ী বা পচনশীল স্বল্পকালীন বাজারে তাহাদের যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়। যেমন, শাকসব্জি দুধ ইত্যাদির স্বল্পকালীন যোগান অস্থিতিস্থাপক। দাম কম হইলেও এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। কারণ, তাহা না হইলে উহারা নষ্ট হইয়া যাইবে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে অবশ্য দাম উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা কম হইলে উৎপাদক কোন দ্রব্য যোগান দিবে না। সুতরাং দীর্ঘকালীন বাজারে অস্থায়ী ও

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে :

১। দ্রব্যের প্রকৃতি

* ১৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

পচনশীল দ্রব্যের যোগান স্থিতিস্থাপক এবং উহাদের দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়।

দ্বিতীয়ত, যে-ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদন করিতে গেলে উৎপাদন-ব্যয় পূর্বাপেক্ষা বেশীমাত্রায় বৃদ্ধি পায় সে-ক্ষেত্রে দাম সামান্য বাড়িলে যোগান তেমন বৃদ্ধি পায় না, কারণ উৎপাদক ঐ দামে খরচ পোষাইতে পারে না। অপরদিকে যে-ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদন-ব্যয় পূর্বাপেক্ষা কম হয় সেখানে যোগানের পরিমাণ বিশেষ বাড়িয়া যায়।

২। অতিরিক্ত উৎপাদন-ব্যয়

তৃতীয়ত, সময় স্বল্প হইলে যোগানের পরিমাণ পরিবর্তনের সুযোগ থাকে না। ফলে যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়। অপরদিকে সময় দীর্ঘ হইলে উৎপাদক যোগানের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে—যোগান স্থিতিস্থাপক হয়।

৩। সময়ের দৈর্ঘ্য

মোটামুটিভাবে বলা যায়, যোগান স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক হইবে তাহা নির্ভর করে (ক) সময়ের দৈর্ঘ্য, এবং (খ) অতিরিক্ত উৎপাদন-ব্যয়ের উপর। অতিরিক্ত উৎপাদন-ব্যয় আবার উৎপন্নের বিধির (Laws of Returns) উপর নির্ভরশীল।

অতিরিক্ত উৎপাদন-ব্যয় নির্ভর করে উৎপন্নের বিধির উপর

উৎপন্নের বিধি (Laws of Returns): উৎপন্নের বিধি সংখ্যায় তিনটি—(ক) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি, (খ) ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি, এবং (গ) সমহারে উৎপন্নের বিধি।

(ক) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Law of Diminishing Returns): ইহার সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অনুপাত কাম্য অবস্থা ছাড়াইয়া গেলে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে ঘটিতে থাকে; এবং ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় দেখা দেয়। এই কারণে ইহাকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিও (Law of Increasing Cost) বলা হয়।* নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধি সম্বন্ধে আরও সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইবে:

ইহাকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিও বলে

ধান্যের উৎপাদন	কুইন্টাল প্রতি উৎপাদন-ব্যয়
১০০ কুইন্টাল	১০ টাকা
২০০ "	১২ "
৩০০ "	১৫ "
৪০০ "	২০ "

* ৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিধিটি মাত্র কৃষি ও অনুরূপ কার্যের বেলাতেই ক্রিয়া করে না; উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই ইহার কার্যকারিতা দেখা যায়।

একসময় না একসময় ইহা উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই কার্য করে

উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে অনুপাত কাম্য অবস্থায় পৌছানোর পর যদি যে-কোন উপাদানকে অপরিবর্তিত রাখিয়া অপরগুলির পরিমাণ ক্রমশ বাড়াইয়া যাওয়া হয় তবে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ে উৎপাদন ঘটিতে থাকিবে। বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে জমি শ্রম ও মূলধন বাড়ানো সম্ভব হইলেও সংগঠক একই থাকে বলিয়া ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিকে ক্রিয়া করিতে দেখা যায়।

(খ) ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি (Law of Increasing Returns): উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে অনুপাত যতক্ষণ কাম্য অবস্থায় না পৌছায় ততক্ষণ উহাদের নিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া চলিলে ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন ঘটে।

ইহা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন ব্যয়ের বিধি নামেও পরিচিত

ফলে এককপিছু উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। এইজন্য এই সূত্রকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের বিধিও (Law of Decreasing Cost) বলা হয়। প্রধানত উৎপাদনের যে-সকল ক্ষেত্রে প্রকৃতির দানের প্রাধান্য নাই, সেখানেই এরূপ ঘটিতে দেখা যায়। তবে কৃষির বেলাতেও প্রথম প্রথম এই বিধি কার্য করিতে পারে। বিধিটিকে বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত উদাহরণ দেওয়া হইল:

সিমেন্টের উৎপাদন	টন প্রতি উৎপাদন-ব্যয়
১০০ টন	১০০ টাকা
২০০ "	৯০ "
৩০০ "	৮০ "
৪০০ "	৭০ "

বৃহদায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের আয়তন যতই বাড়িতে থাকে শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ততই সুবিধা পাওয়া যায়। অন্যান্যভাবেও

বৃহদায়তনে উৎপাদনের ফলে এরূপ ঘটিতে দেখা যায়

ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিতে থাকে। ফলে এককপ্রতি উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ কমিয়া আসে। অবশ্য অনির্দিষ্ট কাল ধরিয়া এরূপ চলিতে পারে না। উপাদানসমূহের মধ্যে কাম্য অনুপাতের অবস্থা অতিক্রম করিলেই ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় ক্রিয়া করিবে।

(গ) সমহারে উৎপন্নের বিধি (Law of Constant Returns): অনেক সময় সমহারে উৎপাদন হইতে দেখা যায়। সুতরাং এককপিছু উৎপাদন-ব্যয়ও অপরিবর্তিত থাকে। ইহারও একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে:

কাপড়ের উৎপাদন	মিটার প্রতি উৎপাদন-ব্যয়
১০০ মিটার	৫০ নয়া পয়সা
২০০ "	৫০ "
৩০০ "	৫০ "
৪০০ "	৫০ "

সমহারে উৎপন্নের বিধি ক্রমহ্রাসমান ও ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধির সমপ্রভাবের ফল। প্রকৃতির দানের অপ্রতুলতার জন্য ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের দিকে যতটা ঝোঁক দেখা যায় —শ্রমবিভাগ, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বৃহদায়তনে উৎপাদনের জন্য ঠিক ততটাই ব্যয়সংক্ষেপ ঘটে। ফলে উৎপাদন ও উৎপাদন-ব্যয়ের হার একই থাকে।

ক্রমহ্রাসমান ও ক্রমবর্ধমান বিধির ফল সমান হইলে সমহারে উৎপাদন ঘটে

দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন উৎপাদন-ব্যবস্থা বিভিন্ন উৎপন্নের বিধির অধীন বলিয়া উৎপাদন-ব্যয়ও বিভিন্ন হয়। কোন দ্রব্যের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের নিয়মাধীন হইলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধির সংগে সংগে যোগান-দামও বাড়িতে থাকিবে; উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের সূত্রাধীন হইলে যোগান যত বাড়িবে যোগান-দাম তত কমিবে; এবং সমহারে উৎপন্নের বিধি কার্য করিলে যোগান-দাম কমিবেও না, বাড়িবেও না—একই থাকিবে।

বিভিন্ন প্রকারের উৎপাদন ব্যয়ের জন্য যোগান-দাম বিভিন্ন হয়

পরিবর্তনশীল ও স্থির ব্যয় (Variable and Fixed Costs): বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্ উৎপন্নের বিধিটি কার্যকর হইবে তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে পরিবর্তনশীল ও স্থির ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্কের উপর।

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয়কে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) উৎপাদনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরিবর্তনশীল ব্যয় (direct or variable costs), এবং (খ) উপরিস্থ বা ধার্য (overhead or fixed) ব্যয়। উৎপাদন করিতে হইলে কাঁচামাল কিনিতে হইবে, শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করিতে হইবে, ইত্যাদি। এগুলিই উৎপাদনের প্রত্যক্ষ ব্যয়। উৎপাদন বন্ধ থাকিলে এই বাবদ কোন ব্যয় করিতে হইবে না। আবার উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে এই ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া চলিতে হইবে। সুতরাং প্রত্যক্ষ ব্যয় সম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল। ইহাকে প্রাথমিক ব্যয় (prime costs) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

পরিবর্তনশীল ব্যয়

উৎপাদন-ব্যয়ের বাকী অংশকেই স্থির বা ধার্য ব্যয় বলা হয়। এই ব্যয় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনক্ষমতা অবধি উৎপাদনের পরিমাণের সহিত সম্পর্কচ্যুত; উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে ইহার পরিমাণ পরিবর্তিত হয় না। জমির খাজনা বা বাড়ীর ভাড়া, মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স, দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদ, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি এই ধার্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। উৎপাদন হউক আর না-হউক প্রতিষ্ঠানকে এই ব্যয় বহন করিয়া যাইতে হইবে। এই স্থির বা ধার্য ব্যয়কে পরিপূরক ব্যয়ও (supplementary costs) বলা হয়।

ধার্য বা স্থির ব্যয়

উৎপাদন যখন শূন্য হইতে সুরু করিয়া ক্রমশ বাড়িতে থাকে তখন প্রথম প্রথম এককপিছু উৎপাদন-ব্যয় দ্রুত হ্রাস পায়, কারণ একই পরিমাণ ধার্য

ব্যয় অধিক এককের মধ্যে ছড়াইয়া যায়।* অবশ্য উৎপাদন-ব্যয়ের হ্রাসের পরিমাণ ক্রমশ কমিতে থাকে এবং এক সময় প্রায় সমহারে উৎপাদন হইতে দেখা যায়। তারপর উৎপাদন যখন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ক্ষমতা অতিক্রম করে তখন এককপিছু উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কারণ, ধার্য ব্যয়ের অধিক এককের মধ্যে ছড়াইয়া যাওয়ার যে-সুবিধা তাহা আর ভোগ করা যায় না এবং নানারূপ বিশৃংখলার ফলে যে-ব্যয়বাহুল্য (diseconomies) দেখা যায় তাহাই সকল এককের মধ্যে ছড়াইয়া গিয়া ব্যয়বৃদ্ধি ঘটায়।

উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক উৎপাদন-ব্যয়

অতএব, পরিবর্তনশীল ও ধার্য ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্কের জন্য উৎপাদন শূন্য হইতে বৃদ্ধি করা হইতে থাকিলে প্রথম প্রথম ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়, মধ্যে সমপরিমাণ উৎপাদন-ব্যয় এবং শেষে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় ঘটিতে দেখা যায়। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় ক্রমহ্রাসমান, না সম-পরিমাণ, না ক্রমবর্ধমান হইবে তাহা নির্ভর করে ঐ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের আয়তনের উপর।

প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় (Marginal and Average Cost of Production): কোন শিল্প বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির অধীন হইলে উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে উহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকে এবং ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধির অধীন হইলে উহার বিপরীত ঘটে। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় পরিবর্তনের সংগে সংগে গড় উৎপাদন-ব্যয়ও যে পরিবর্তিত হয় তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণটি হইতে বুঝা যাইবে:

মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)	মোট উৎপাদন ব্যয় (টাকা)	প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (টাকা)	গড় উৎপাদন-ব্যয় (টাকা)
১	১০	১০	১০
২	১৮	৮	৯
৩	২৭	৯	৯
৪	৩৮	১১	৯.৫

দেখা যাইতেছে যে, উৎপাদন যখন ৩ কুইন্টাল তখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড় উৎপাদন-ব্যয় উভয়ই ৯ টাকা হইতেছে। যে-পরিমাণ উৎপাদন হইলে প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় উভয়ই এরূপ সমান হয় তাহাকে কাম্য উৎপাদন (Optimum Production) এবং যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এরূপ ঘটে তাহাকে কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান (Optimum Firm) বলা হয়।

কাম্য উৎপাদন ও কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান

* প্রতিষ্ঠানের ধার্য ব্যয় যদি ৯০ টাকা হয় এবং ১ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে যদি ৪ টাকা [illegible] ব্যয় লাগে তবে ১ একক দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় হইল ৯৪ টাকা, ২ এককের ৯৮ টাকা, ৩ এককের ১০২ টাকা। ২ একক দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় যখন ৯৮ টাকা তখন এককপিছু উৎপাদন-ব্যয় হইল ৪৯ টাকা। অনুরূপভাবে ৩ একক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এককপিছু উৎপাদন-ব্যয় হইল ৩৪ টাকা।

সংক্ষিপ্তসার

দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। চাহিদা ও যোগান পরিবর্তিত হইলে দামও পরিবর্তিত হয়। চাহিদার পরিবর্তন ঘটে দুইটি কারণে—(ক) দামের পরিবর্তন, এবং (খ) অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তন। দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তনকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা: দাম-পরিবর্তন ও চাহিদা-পরিবর্তনের মধ্যে সম্বন্ধকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে। দামের বেশ কিছুটা পরিবর্তন ঘটিলেও যে-চাহিদা সামান্যমাত্র পরিবর্তিত হয় তাহাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা এবং দাম সামান্য পরিবর্তিত হইলেই যে চাহিদা বিশেষ পরিবর্তিত হয় তাহাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে না হ্রাস পাইতেছে—তাহার দ্বারাই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিচার করা হয়। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা, প্রয়োজনীয় নাকি অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, নানাভাবে না একককার্যে ব্যবহার্য দ্রব্য, ইত্যাদি।

চাহিদার মূল্যানুগ ও আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা: দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে চাহিদার যে-পরিবর্তন ঘটে তাহাকে চাহিদার মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা এবং আয়ের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে চাহিদার যে-পরিবর্তন ঘটে তাহাকে চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়।

চাহিদার পরিবর্তন: দাম-পরিবর্তন ব্যতিরেকেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। ইহাকে চাহিদার পরিবর্তন বলা হয়। ১। লোকের রুচি ও স্বভাবের পরিবর্তন, ২। জনসংখ্যার পরিবর্তন, ৩। আয়ের বণ্টনে পরিবর্তন, ৪। ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থার পরিবর্তন, এবং ৫। পরস্পর-সম্পর্কিত দামের পরিবর্তন—এই কয়টি কারণের জন্য চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা: স্থিতিস্থাপকতা চাহিদার ন্যায় যোগানেরও বৈশিষ্ট্য। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা প্রধানত নির্ভর করে (ক) সময়ের দৈর্ঘ্য, এবং (খ) অতিরিক্ত উৎপাদন-ব্যয়ের উপর। অতিরিক্ত উৎপাদন-ব্যয় আবার (ক) পরিবর্তনশীল ও স্থির ব্যয়ের মধ্যে সম্বন্ধ, এবং (খ) উৎপন্নের হার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

উৎপন্নের হার বা বিধি: উৎপন্নের হার বা বিধি তিন প্রকারের—১। ক্রমবর্ধমান, ২। ক্রমহ্রাসমান, এবং ৩। সমহার। ফলে উৎপাদন-ব্যয়ও তিন প্রকার: ১। ক্রমহ্রাসমান, ২। ক্রমবর্ধমান, এবং ৩। সমহার।

পরিবর্তনশীল ও স্থির ব্যয়: বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্ উৎপন্নের বিধিটি কার্যকর হইবে তাহা নির্ভর করে পরিবর্তনশীল ও স্থির বা ধার্য ব্যয়ের সম্পর্কের উপর। উৎপাদন যখন শূন্য হইতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন প্রথম প্রথম ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়, মধ্যে সমপরিমাণ উৎপাদন-ব্যয় এবং পরে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় ঘটিতে দেখা যায়। কারণ, প্রথম প্রথম ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি, মধ্যে সমহার উৎপন্নের বিধি এবং পরে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর হয়।

প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় এবং কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান: প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে গড় উৎপাদন-ব্যয়ও পরিবর্তিত হয়। যেখানে প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন-ব্যয় পরস্পরের সমান হয় সেই পরিমাণ উৎপাদনকেই কাম্য উৎপাদন এবং যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এরূপ ঘটে তাহাকে কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. What do you understand by Elasticity of Demand? Distinguish between Elastic and Inelastic Demand. What are the factors which influence such elasticity? **(En. 1961)**

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিতে কি বুঝ? স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে পার্থক্য দেখাও। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি কি বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়? [১৬৩-১৬৫ পৃষ্ঠা]

2. Distinguish between elastic and inelastic demand. Is the demand for the following elastic or inelastic ?

(a) Rice, (b) Diamonds, (c) Salt, and (d) Motor cars.
(P. U. 1961, '64 ; C. U. 1962)

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির চাহিদা স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক ?

(ক) চাউল, (খ) হীরক, (গ) লবণ, এবং (ঘ) মোটরগাড়ী। [১৬৩-১৬৫ পৃষ্ঠা]

3. State the Law of Demand. What are the factors which govern the demand for a commodity ? (En. 1964)

চাহিদার সূত্র বিবৃত কর। দ্রব্যবিশেষের চাহিদা কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয় ?

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের ইংগিত : দ্রব্যবিশেষের চাহিদা প্রথমত নির্ধারিত হয় দাম দ্বারা। দাম অধিক হইলে চাহিদা অল্প এবং দাম অল্প হইলে চাহিদাও অধিক হইবে। দ্বিতীয়ত, চাহিদা নির্ভর করে দ্রব্যের প্রকৃতির উপর। দ্রব্যটি যত প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইবে উহার চাহিদাও তত অধিক হইবে। তৃতীয়ত, পরিবর্ত-দ্রব্যের অস্তিত্বও দ্রব্যটির চাহিদা নির্ধারণ করিয়া থাকে। পরিবর্ত-দ্রব্য না থাকিলে দাম বৃদ্ধি পাইলেও চাহিদা বিশেষ হ্রাস পাইবে না। পরিশেষে, দ্রব্যটি যত বেশী কার্যে ব্যবহৃত হইবে উহার চাহিদাও তত অধিক হইবে। যেমন, কয়লা নানা কার্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া উহার চাহিদাও ব্যাপক......এবং ১৫৩-১৫৫, ১৬৩-১৬৫ পৃষ্ঠা দেখ।]

4. What do you mean by Elasticity of Supply ? Indicate the factors that influence Elasticity of Supply.

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলিতে কি বুঝ ? কি কি বিষয় যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণ করে দেখাও। [১৬৬-১৬৭ পৃষ্ঠা]

5. Distinguish between Fixed and Variable Costs. Show the relationship between them.

স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। উহাদের মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা দেখাও।
[১৬৯-১৭০ পৃষ্ঠা]

6. State and explain the Laws of Increasing and Diminishing Returns.

ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ব্যাখ্যা কর। [৪৯-৫২ এবং ১৬৭-১৬৮ পৃষ্ঠা]

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাজারের বিভিন্ন অবস্থায় দাম-নির্ধারণ

(Price Determination under Different Market Conditions)

পূর্ণাংগ এবং অপূর্ণাংগ বা একচেটিয়া বাজার

মোটামুটিভাবে অর্থনৈতিক বাজারকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(ক) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, এবং (খ) অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বা একচেটিয়া কারবারের বাজার। ইহা ছাড়াও বাজার যে সময়ের তারতম্য বা পরিধি অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত হইতে পারে তাহা আমরা দেখিয়াছি।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম-নির্ধারণ (Price Determination in Perfectly Competitive Market) : পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দুই প্রকার দাম নির্ধারিত হয়—(১) বাজার-দাম, এবং

(২) স্বাভাবিক দাম। সংক্ষেপে, বাজার-দাম হইল স্বল্পকালীন দাম এবং স্বাভাবিক দাম হইল দীর্ঘকালীন দাম। বাজার-দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমান নাও হইতে পারে; কিন্তু স্বাভাবিক দাম একদিকে প্রান্তিক উপযোগ অপরদিকে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। প্রথমে কিভাবে বাজার-দাম নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা করা যাউক।

বাজার-দাম ও স্বাভাবিক দাম

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রেতাবিক্রেতা অসংখ্য থাকে বলিয়া, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য একই মানের হয় বলিয়া, পৃথকভাবে ক্রেতাবিক্রেতাগণ মোট বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের সামান্য সামান্য অংশ ক্রয়বিক্রয় করে বলিয়া এবং প্রত্যেকেই অপরে কি-দামে ক্রয়বিক্রয় করিতেছে তাহা জানে বলিয়া বাজার-দাম এক হয়।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা

বাজার-দাম এই এক হওয়ার মূলে কার্য করে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত। চাহিদা ও যোগান কিভাবে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে সে-সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।* এখন সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে চাহিদা ও যোগান একসময় পরস্পরের সহিত সমান হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থা অবশ্য অস্থায়ী। এইজন্য ইহাকে অস্থায়ী ভারসাম্য (Temporary Equilibrium) এবং ঐ দামকে অস্থায়ী ভারসাম্য দাম (Temporary Equilibrium Price) বা বাজার-দাম (Market Price) বলা হয়।

বাজার-দাম হইল অস্থায়ী ভারসাম্য দাম

বাজার-দামের উপর প্রান্তিক উপযোগ ও উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব (Influence of Marginal Utility and Cost of Production on Market Price):

বাজার-দাম হইল স্বল্পকালীন ভারসাম্য-দাম। অর্থাৎ, স্বল্প সময়ের মধ্যে যে-দামে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয় তাহাকেই বাজার-দাম বলে। স্বল্প সময়ের মধ্যে যোগান মোটামুটি স্থির থাকে। সুতরাং উৎপাদন-ব্যয় বাজার-দামের উপর প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। মাছ, তরিতরকারি প্রভৃতি পচনশীল দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় যাহাই হউক না কেন, ক্রেতারা যে-দাম দিতে চাহিবে বিক্রেতাগণকে তাহাতেই উহা বিক্রয় করিতে হইবে। অন্যান্য দ্রব্যের বেলায় বিক্রেতাদের প্রত্যাশিত বা সংরক্ষণ দাম (Reservation Price) থাকে। এই সংরক্ষণ-দামের জন্য বাজার-দামের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়।**

বাজার-দামের উপর যোগানের কিছুটা প্রভাব দেখা যায়

কিন্তু ক্রেতার নিকট বাজার-দাম সর্বদাই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সমান

---

* ১৪৮-১৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

** ১৫৭-১৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

হয়। কোন দ্রব্য লোকে যত বেশী পরিমাণ কিনিতে থাকে ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি অনুসারে উহার প্রতি ক্রীত এককের উপযোগ ততই কমিতে থাকে। এইভাবে একসময় বাজার-দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পরের সমান হয়। যে-ব্যক্তি ২ টাকা কিলোগ্রাম দামের ২ কিলোগ্রাম সরিষার তৈল কিনিল, সে ২ কিলোগ্রামের কম বা বেশী কিনিল না কেন? অথবা, যে-ব্যক্তি ২৫ নয়া পয়সা দামের দুই গ্লাস সরবৎ পান করিল, সে এক বা তিন গ্লাস সরবৎ পান করিল না কেন? ইহার উত্তর হইল, প্রথম ব্যক্তির নিকট সরিষার তৈলের দ্বিতীয় কিলোগ্রামের উপযোগ ২ টাকার এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট দ্বিতীয় গ্লাস সরবতের উপযোগ ২৫ নয়া পয়সার সমান। স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রান্তিক উপযোগ বিভিন্ন ব্যক্তির বেলায় বিভিন্ন প্রকার হয়। একজন ২ টাকা দামে ৪ কিলোগ্রাম তৈলও কিনিতে পারে। তাহার নিকট ৪র্থ কিলোগ্রামের উপযোগ ২ টাকার সমান।* সুতরাং বাজার-দাম মোট বিক্রীত দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের সমান হয় মনে করিলে ভুল হইবে; উহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগের সমান হয় মাত্র।

অবশ্য চাহিদা বা উপযোগের প্রভাবই অধিক

কিভাবে স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হয়? (How is Normal Price Determined?): দীর্ঘকালীন বাজারে শেষ পর্যন্ত যে-দাম নির্ধারিত হওয়া সম্ভব তাহাকেই স্বাভাবিক দাম বলা হয়। স্বাভাবিক দাম বলিতে কোন বিশেষ দামকে বুঝায় না; দীর্ঘকাল ধরিয়া চাহিদা ও যোগানের প্রভাবের ফলে যে-দাম নির্ধারিত হওয়া স্বাভাবিক তাহাকেই বুঝায়। স্বাভাবিক দাম দীর্ঘকালীন গড় দামও নহে। চাহিদা ও যোগানের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিবে ইহা ধরিয়া লইয়াই দীর্ঘকালীন গড় দাম নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু স্বাভাবিক দাম-নির্ধারণের বেলায় চাহিদা ও যোগানের অবস্থার যে যে পরিবর্তন ঘটা সম্ভব তাহাদের বিষয়ও বিবেচনা করা হয়।

স্বাভাবিক দাম বলিতে কি বুঝায়

স্বাভাবিক দাম আবার অতি দীর্ঘকালীন দাম নাও হইতে পারে। কয়েকটি শিল্পের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যেই স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হওয়া সম্ভব; আবার কয়েকটির বেলায় বহুদিন সময় লাগিতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, মোটামুটি যে দীর্ঘকালীন সময়ের মধ্যে চাহিদার অবস্থার সহিত যোগানের অবস্থার সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয় সেই সময়কার দামই হইল স্বাভাবিক দাম।

স্বাভাবিক দাম সকল সময়েই উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। চাহিদার অবস্থা অনুসারে বাজার-দাম উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা কম বা বেশী হইতে পারে। দাম

* এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে উপযোগ পরিমাপ করা হইয়া থাকে লোকে কি দাম দিতে প্রস্তুত তাহার দ্বারা।...১৫২ পৃষ্ঠা দেখ।

উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা কম হইলে উৎপাদক বা বিক্রেতাগণকে লোকসান দিয়া বেচিতে হইবে ; এবং দাম বেশী হইলে তাহাদের মুনাফা 'স্বাভাবিক মুনাফা' অপেক্ষা অধিক হইবে। এই দুইটি অবস্থার কোনটিই বেশীদিন বর্তমান থাকিতে পারে না। কোন উৎপাদকই দীর্ঘকাল ক্ষতি স্বীকার করিয়া উৎপাদন করিবে না; এবং মুনাফা স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী হইতে থাকিলে সকলে অধিক পরিমাণ উৎপাদন করিবে, নূতন নূতন ব্যবসায়ী ঐ দ্রব্য উৎপাদন সুরু করিবে, ইত্যাদি। ফলে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সম্পূর্ণ সমান হইবে। এই দামকে 'স্বাভাবিক দাম' (Normal Price) এবং এই অবস্থাকে প্রকৃত ভারসাম্যের অবস্থা বলা হয়। এই দামে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সহিত সমান হইয়া সম্পূর্ণ স্থিতিশীল বা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ, তাহাদের বাড়াকমার দিকে কোনও ঝোঁক দেখা যায় না। সুতরাং স্বাভাবিক দামে প্রান্তিক উপযোগ ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় পরস্পরের সমান হয়।

স্বাভাবিক দাম প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়

এখন প্রশ্ন হইল, স্বাভাবিক দাম কোন্ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে? আধুনিক লেখকগণের মতে, ইহা তাহারই সমান হইবে যাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড় উৎপাদন-ব্যয় (average cost) পরস্পরের সহিত সমান। আমরা দেখিয়াছি যে এইরূপ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে কাম্য প্রতিষ্ঠান (Optimum Firm) বলিয়া অভিহিত করা হয়।*

দাম-নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব (Time Element in Price Determination): চাহিদা ও যোগানের প্রভাব দ্বারা দাম নির্ধারিত হয়। কিন্তু এই দুই প্রভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব সময়ের সংগে সংগে যে পরিবর্তিত হয়, বাজার-দাম ও স্বাভাবিক দামের পার্থক্য হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। সংক্ষেপে বলা যায়, সময় যতই স্বল্প হইবে চাহিদার প্রভাব হইবে তত অধিক এবং সময় যতই দীর্ঘ হইবে যোগানের প্রভাব হইবে তত বেশী।

সময় স্বল্প হইলে চাহিদা অধিক এবং সময় অধিক হইলে যোগান অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে

সময়ের দৈর্ঘ্য অনুসারে বাজার চারি প্রকারের হয় বলিয়া** মার্শাল চারি প্রকারের দামের উল্লেখ করিয়াছেন: (ক) অত্যল্পকালীন দাম বা বাজার-দাম (Very Short-period or Market Price), (খ) স্বল্পকালীন দাম (Short-period Price), (গ) দীর্ঘকালীন বা স্বাভাবিক দাম (Long-period or Normal Price), এবং (ঘ) অতি দীর্ঘকালীন দাম (Very Long-period or Secular Price)।

সময়ানুসারে বাজার-দামের প্রকারভেদ

---

* ১৭০ পৃষ্ঠা দেখ।

** ১৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

অত্যল্পকালীন বাজারে দাম অনিয়মিত ও ক্ষণস্থায়ী কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই সময়ে চাহিদার প্রভাব হয় সর্বাধিক। বিক্রেতারা অবশ্য মাল বিক্রয় না করিয়া কিছুদিন বসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু বেশীদিন তাহাদের পক্ষে এই অবস্থায় থাকা সম্ভব হয় না। সুতরাং মোটামুটি চাহিদার প্রভাব দ্বারাই দাম নির্ধারিত হয়। বলা হইয়াছে যে, এই দামকে বাজার-দাম বলা হয়। ইহাতে বিক্রেতার লাভও হইতে পারে আবার ক্ষতিও হইতে পারে।

অত্যল্পকালীন বাজার-দাম

বাজার-দাম অধিক হইলে যোগান বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু যোগান নির্ভর করে সাজসরঞ্জামের অবস্থা ও উৎপাদনের আয়তনের উপর। স্বল্প সময়ের মধ্যে ইহাদের পরিবর্তনসাধন করা সম্ভব নয়। বর্তমান সাজসরঞ্জাম ও উৎপাদনের আয়তনে অধিক উৎপাদন করিতে গেলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের (increasing cost) সূত্র ক্রিয়া করিতে পারে। সুতরাং উৎপাদকগণ সেই পর্যন্তই উৎপাদন করিবে যে-পর্যন্ত-না প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দামের সমান হয়। এই দামকে স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম (Short-period Normal Price) বলা যাইতে পারে।

স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম

দীর্ঘকালীন বাজারে সাজসরঞ্জাম—অর্থাৎ, উৎপাদনের উপাদানসমূহের পরিবর্তনসাধন করা সম্ভব। কোন বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা যদি যোগান অপেক্ষা বহুদিন ধরিয়া অধিক থাকে তবে উৎপাদকগণ অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিয়া, নূতন নূতন যন্ত্রপাতি বসাইয়া, উৎপাদনের আয়তন বৃহত্তর করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। ইহার ফলে যদি ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের (decreasing cost) সূত্র ক্রিয়া করে তবে দাম হ্রাস পাইবে; অপরদিকে যদি ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের সূত্র কার্যকর হয় তবে দাম বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদন-ব্যয় সমান থাকিলে দাম একই থাকিবে। দীর্ঘকালীন বাজারে এই দামকে দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম (Long-period Normal Price) বলা হয়।

দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম

অতি দীর্ঘকালীন বাজারে সাজসরঞ্জামেরও উৎপাদন-ব্যয় পরিবর্তিত হয়; দামের পরিবর্তন ব্যতিরেকেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। এই সকলের ফলে দাম বাজার-দাম বা স্বাভাবিক দাম হইতে বহুদূরে সরিয়া যাইতে পারে। এই অতি দীর্ঘকালীন দাম ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত।

অতি দীর্ঘকালীন দাম

উপসংহার: দাম-নির্ধারণ তত্ত্বের উপসংহার হিসাবে আর একটি কথা বলা যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে যে, দাম চাহিদা ও যোগানের অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। চাহিদার পশ্চাতে কার্য করে ক্রেতাদের উপযোগকে সর্বাধিক করিবার ইচ্ছা (desire to maximise utility) এ

যোগানের পশ্চাতে কার্য করে সংগঠকদের মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা (desire to maximise profit)। বিশেষ অবস্থায় যখন উভয়েরই প্রচেষ্টা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া তাহারা ক্রয়বিক্রয়ে অগ্রসর হয় তখনই ভারসাম্যের সৃষ্টি হইয়া দাম নির্ধারিত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দুই প্রকার দাম নির্ধারিত হয়—(ক) বাজার-দাম, এবং (খ) স্বাভাবিক দাম।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতাবিক্রেতা থাকে বলিয়া, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের মান একই হয় বলিয়া, ক্রেতাবিক্রেতাগণ মোট চাহিদা ও যোগানের সামান্য অংশ ক্রয়বিক্রয় করে বলিয়া এবং প্রত্যেকেই অপরে কি দামে ক্রয়বিক্রয় করিতেছে তাহা জানে বলিয়া বাজার-দাম একই হয়।

বাজার-দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে-অবস্থায় চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয়া বাজার দাম নিরূপিত হয় তাহাকে 'অস্থায়ী ভারসাম্য অবস্থা' বলা হয়। ফলে বাজার-দাম 'অস্থায়ী ভারসাম্য দাম' নামেও অভিহিত হয়।

বাজার-দামের উপর প্রান্তিক উপভোগ ও উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব: বাজার-দামের বেলায় যোগান অপেক্ষা চাহিদারই অধিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ইহা উৎপাদন-ব্যয়ের সমান নাও হইতে পারে; কিন্তু ইহা সকল ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রান্তিক উপভোগের সমান হয়।

কিভাবে স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হয়: যে মোটামুটি দীর্ঘকালীন সময়ে চাহিদার অবস্থার সহিত যোগানের অবস্থার সমন্বয়সাধন সম্ভব হয় সেই সময়কার দামই হইল স্বাভাবিক দাম। স্বাভাবিক দাম সকল সময়েই কাম্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়।

দাম-নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব: সময় যত স্বল্প হয় দামের উপর চাহিদার প্রভাব তত অধিক হইতে দেখা যায়; অনুরূপভাবে সময় যত দীর্ঘ হয় যোগানেরও তত অধিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সময়ের দৈর্ঘ্য অনুসারে চারি প্রকার বাজারের জন্য চারি প্রকার দামের কথা মার্শাল উল্লেখ করিয়াছেন—১। অত্যল্পকালীন দাম, ২। স্বল্পকালীন দাম, ৩। দীর্ঘকালীন বা স্বাভাবিক দাম, এবং ৪। অতি দীর্ঘকালীন দাম। অত্যল্পকালীন দামকে বাজার-দাম বলা হয়। ইহা প্রধানত চাহিদার প্রভাব দ্বারাই নিরূপিত হয়। স্বল্পকালীন দাম স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম নামেও অভিহিত। ইহা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। দীর্ঘকালীন দাম বা দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সূত্র দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। অতি দীর্ঘকালীন দাম রুচি ইত্যাদির পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

উপসংহার: উপভোগ সর্বাধিক করা এবং মুনাফা সর্বাধিক করা যথাক্রমে ক্রেতা ও বিক্রেতার লক্ষ্য বলিয়া যেখানে ইহাদের উভয়ই সর্বাধিক হয় সেখানেই দাম নির্ধারিত হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. Show how price is determined by the interaction of the forces of Demand and Supply. (C. U. 1954; B. U. 1961)

কিভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় তাহা দেখাও।

[১৪৭-৪৮ এবং ১৫৮-১৬০ পৃষ্ঠা]

2. How is price determined in a market under conditions of perfect competition? (En. 1961)

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার অধীনে বাজারে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়? [১৫৮-১৬০ এবং ১৭২-১৭৩ পৃষ্ঠা]

3. **Explain how price is determined in the market under conditions of competition.** (C. U. 1961 ; P. U. 1961)

কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর। [১৪৭-১৪৮ এবং ১৫৮-১৬০ পৃষ্ঠা]

4. **Distinguish between Market Price and Normal Price. Explain, how Market Price of a commodity is determined.** (C. U. 1950)

বাজার-দাম ও স্বাভাবিক দামের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। কিভাবে বাজার-দাম নির্ধারিত হয় তাহা ব্যাখ্যা কর। [১৭২-১৭৪ এবং ১৫৮-১৬০ পৃষ্ঠা]

5. **'The normal price of a commodity, under conditions of competition, tends to be equal to its marginal cost of production.' Discuss** (C. U. 1951, '59)

'প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় স্বাভাবিক দামের পক্ষে দ্রব্যের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়।'—আলোচনা কর। [১৭৪-১৭৫ পৃষ্ঠা]

6. **"As a general rule, the shorter the period which we are considering, the greater must be the share of our attention which is given to the influence of demand on Value ; and the longer the period, the more important will be the influence of cost of production on Value." Explain the statement.** (C. U. 1960)

"সাধারণ নিয়ম অনুসারে সময় যত স্বল্প হইবে দামের উপর চাহিদার প্রভাব তত অধিক দেখা যাইবে এবং সময় যত দীর্ঘ হইবে দামের উপর উৎপাদন-ব্যয়ের প্রভাব তত গুরুত্বপূর্ণ হইবে।" উক্তিটির পর্যালোচনা কর। [১৭৫-১৭৬ পৃষ্ঠা]

ষোড়শ অধ্যায়

একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম
(Price under Monopoly)

যখন কোন দ্রব্যের উৎপাদন বা বিক্রয় মাত্র একজন ব্যক্তি বা একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে তখন ঐ অবস্থাকে একচেটিয়া কারবার বলা হয়।

একচেটিয়া কারবারের অর্থ

একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের সমস্তটাই নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাহার দ্রব্যের কোন বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য (close substitute) পাওয়া যায় না। এখানে পুনরায় উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ করপোরেশনই একচেটিয়া কারবারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।*

মুনাফা সর্বাধিক করা ব্যবসায়ীর লক্ষ্য

সকল প্রকার কারবারেই ব্যবসায়ী তাহার মুনাফাকে সর্বাধিক করিতে চায়। একচেটিয়া কারবারীরও লক্ষ্য হইল মুনাফাকে সর্বাধিক (maximisation of profit) করা। কিন্তু প্রতিযোগিতার সহিত একচেটিয়া কারবারের পার্থক্য রহিয়াছে। প্রতিযোগিতায় বহুসংখ্যক উৎপাদক বা বিক্রেতা থাকে এবং প্রত্যেকে

---

* ১৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।

বাজারে মোট দ্রব্যের অতি ক্ষুদ্রাংশই যোগান দিয়া থাকে। কোন একজনের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বাজারে ঐ দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হয় না।

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কিভাবে এই লক্ষ্য সাধন করে

প্রতিযোগিতা থাকে বলিয়া প্রত্যেক উৎপাদককে বাজারে প্রচলিত দামে দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়। কেহ বাজারে প্রচলিত দাম অপেক্ষা অধিক চাহিলে ক্রেতারা অন্য বিক্রেতাদের নিকট চলিয়া যাইবে। এইজন্য প্রতিযোগী কারবারী সর্বপ্রকারে ব্যয়সংক্ষেপের প্রচেষ্টা করে। কিন্তু ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধির কার্যকারিতার দরুন এই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উৎপাদনবৃদ্ধির ফলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দাম অপেক্ষা কম থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার পক্ষে উৎপাদনবৃদ্ধি করা লাভজনক হয়। সুতরাং সে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় দামের সমান না-হওয়া পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া চলে। ফলে শেষ পর্যন্ত দাম প্রত্যেক উৎপাদকের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়।

একচেটিয়া কারবারে কিন্তু উৎপাদক বা ব্যবসায়ী দ্রব্যের যোগানের সমস্তটাই নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। ফলে তাহার দাম (প্রান্তিক) উৎপাদন-ব্যয়ের অধিক হইতে পারে।

একচেটিয়া কারবারী মুনাফাকে সর্বাধিক করিবার উদ্দেশ্যে ব্যয়সংক্ষেপের প্রচেষ্টা বিশেষ না করিয়া যোগানকেই নিয়ন্ত্রণ করে। যখন তাহার প্রান্তিক

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় সমান হইলেই একচেটিয়া মুনাফা সর্বাধিক হয়

উৎপাদন-ব্যয় (Marginal Cost)—দামের নহে, প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের (Marginal Revenue) সমান হয় তখনই তাহার মুনাফা হইয়া দাঁড়ায় সর্বাধিক।* সুতরাং যতটা পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় তাহার প্রান্তিক আয়ের সমান দাঁড়াইবে ততটা পরিমাণ দ্রব্যই সে উৎপাদন করিবে বা যোগান দিবে, কারণ ইহা করিলেই তাহার লাভ সর্বাধিক হইবে।

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বলিতে এক একক (unit) অতিরিক্ত (বা প্রান্তিক) দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে-ব্যয় পড়ে তাহাকে বুঝায়। যেমন, ১০ একক দ্রব্য

কিভাবে কারবারী ইহা করিতে চেষ্টা করে

উৎপাদন করিতে যদি ১০০ টাকা ব্যয় হয় এবং ১১ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে যদি ১০৫ টাকা পড়ে তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়—অর্থাৎ, এক একক অতিরিক্ত দ্রব্যের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হইল (১০৫ টাকা—১০০ টাকা=) ৫ টাকা। অপরদিকে এক একক

* পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে একটু বেশী বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয় না বলিয়া দাম ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অভিন্ন হয় ; কিন্তু একচেটিয়া কারবারীকে বেশী বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয় বলিয়া প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় দাম অপেক্ষা কম হয়। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দাম ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়—উভয়েরই সমান হয়। কিন্তু একচেটিয়া কারবারে উহা মাত্র প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয়।

অতিরিক্ত (বা প্রান্তিক) দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কোন কারবারী বা প্রতিষ্ঠান যে অতিরিক্ত আয় করে তাহাকে বলা হয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়। যেমন, প্রতি একক দ্রব্য ১২ টাকা করিয়া দামে ১০টি দ্রব্য বিক্রয় করিলে মোট বিক্রয়-লব্ধ আয় দাঁড়ায় ১২০ টাকা। যখন সে ১১টি দ্রব্য বিক্রয় করে তখন যদি প্রতি এককের দাম কমিয়া ১১'৫০ টাকা হয় তাহা হইলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ১২৬'৫০ টাকা।* এ-ক্ষেত্রে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়—অর্থাৎ, এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত আয় হইবে (১২৬'৫০ টাকা—১২০ টাকা =) ৬'৫০ টাকা। এই উদাহরণে দেখা যায় যে কারবারী যখন এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করে তখন তাহার অতিরিক্ত ব্যয় পড়ে ৫ টাকা। উহা যখন বিক্রয় করে তখন অতিরিক্ত আয় হয় ৬'৫০ টাকা। সুতরাং তাহার অতিরিক্ত মুনাফা হয় (৬'৫০ টাকা—৫ টাকা =) ১'৫০ টাকা।

এখন, যতক্ষণ পর্যন্ত একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা অধিক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে উৎপাদন বাড়াইয়া চলিতে থাকে। কারণ, ইহাতে তাহার লাভের মোট অংক বাড়িয়াই যায়। অবশেষে যখন তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হয়, তখন মুনাফার পরিমাণ হয় সর্বাধিক। ইহার পর আর সে উৎপাদন বৃদ্ধি করে না। কারণ, তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় অপেক্ষা অধিক হইবে এবং প্রতি একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনে লোকসান যাইবে। নিম্নলিখিত ছকটি হইতে উপরি-উক্ত নিয়মটি সহজে বুঝা যাইবে :

উদাহরণ

(হিসাব টাকা ও নয়া পয়সায়)

দ্রব্যের পরিমাণ	প্রতি এককের দাম (টাকা)	মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (টাকা)	প্রান্তিক (অতিরিক্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটি পিছু) বিক্রয়লব্ধ আয়	মোট উৎপাদন-ব্যয়	প্রান্তিক (অতিরিক্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটি পিছু) উৎপাদন-ব্যয়	মোট মুনাফা (টাকা)
১০	১১	১১০	—	১০০	—	+১০
২০	৯	১৮০	৭	১৫০	৫	+৩০
৩০	৮	২৪০	৬	১৮৫	৩'৫০	+৫৫
৪০	৭	২৮০	৪	২২৪	৩'৯০	+৫৬
৫০	৬	৩০০	২	২৬৯	৪'৫০	+৩১
৬০	৫	৩০০	০	৩৩০	৬'১০	−৩০

* এখানে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের অধীন ধরা হইয়াছে।

এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে একচেটিয়া কারবারী যখন ৪০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিয়া ৭ টাকা দামে বাজারে বিক্রয় করে তখন তাহার মুনাফা (৫৬ টাকা) সর্বাধিক হয়। কারণ, ইহাতেই তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (৩ টাকা ৯০ নয়া পয়সা) তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় (৪ টাকা) প্রায় সমান সমান হইয়া দাঁড়ায়। অন্য কোন উৎপাদন ও মূল্যের স্তরে তাহার এতটা মুনাফা করা সম্ভব নয়।

ধরা যাউক, একচেটিয়া কারবারী উৎপাদন বাড়াইয়া ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে লাগিল। ইহার ফলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইবে ৪ টাকা ৫০ নয়া পয়সা কিন্তু প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ২ টাকা মাত্র। প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে অধিক হওয়ার ফলে তাহার মোট মুনাফার পরিমাণ ৫৬ টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৩১ টাকায় দাঁড়াইবে। সুতরাং একচেটিয়া উৎপাদনকারী ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন না করিয়া ৪০ একক দ্রব্যই উৎপাদন করিবে। অপরদিকে একচেটিয়া কারবারী যদি উৎপাদন কমাইয়া ৩০ একক দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা হইলে প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ৬ টাকা এবং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ৩ টাকা ৯০ নয়া পয়সা হইতে কমিয়া ৩ টাকা ৫০ নয়া পয়সা হইবে; এবং মোট লাভের পরিমাণ হইবে ৫৫ টাকা। এই অবস্থায় উৎপাদন বাড়াইয়া ৪০ একক করিলে তাহার মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়াই যাইবে।

প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমতা একচেটিয়া কারবারে দাম নির্ধারণ করে

অতএব দেখা যাইতেছে, যখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হয় তখনই একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা হয় সর্বাধিক। সুতরাং একচেটিয়া কারবারী যে-পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন এবং উহা যে-দামে বিক্রয় করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় পরস্পরের সমান হইবে সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন এবং সেই দামে উহা বিক্রয়ের চেষ্টা করিবে।

একচেটিয়া কারবারে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের এই সম্পর্ককে বুঝাইবার জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠায় চিত্রটি দেওয়া হইল:

চিত্রটির প্রত্যেক স্তম্ভের লম্বালম্বি—অর্থাৎ, উপর-নীচের লাইনগুলির দ্বারা প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ বুঝানো হইয়াছে, আর পাশাপাশি লাইনগুলির দ্বারা প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের পরিমাণ বুঝানো হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যে ২০ একক উৎপাদন করিলে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইবে ক খ (৫ টাকা) এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ক গ (৭ টাকা); সুতরাং প্রান্তিক মুনাফা (marginal profit) হইল খ গ (৭ টাকা − ৫ টাকা =) ২ টাকা। ৪০ একক দ্রব্য উৎপাদনের বেলায় দেখা যায় যে ৩য় স্তম্ভটির প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের অংশ এবং প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ প্রায় পরস্পরের সমান
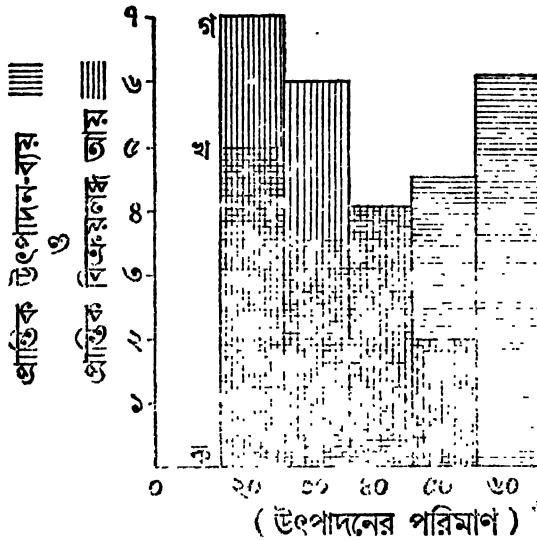
হইতেছে। অতএব, ৪০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিলেই একচেটিয়া কারবারীর সর্বাধিক মুনাফা হইবে। ইহার পর হইতে স্তম্ভের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের অংশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে: ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে যে একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক মুনাফা ত হইতেছেই না, বরং প্রতি একক অতিরিক্ত দ্রব্যের উৎপাদনে লোকসান যাইতেছে।

বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার (Discriminating Monopoly) : আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত ধরিয়া লইয়াছি যে একচেটিয়া কারবারী সকলের নিকটে একই দামে তাহার দ্রব্য বিক্রয় করে। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে একচেটিয়া কারবারী একই দ্রব্য বিভিন্ন ক্রেতার নিকট পৃথক পৃথক দামে বিক্রয় করে। একচেটিয়া কারবারী যখন একই জিনিস বিভিন্ন ক্রেতার নিকট পথক পৃথক দামে বিক্রয় করে তখন তাহাকে বলা হয় বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার (Discriminating Monopoly)। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এরূপ দাম পৃথকিকরণ সম্ভব হয় না। কারণ, বহু বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকায় কোন বিক্রেতা কোন ক্রেতার নিকট হইতে বাজার-দামের অধিক দাম লইতে পারে না।

বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার বলিতে কি বুঝায়

একচেটিয়া কারবারীর এই দাম পৃথকিকরণ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— ব্যক্তিগত দাম পৃথকিকরণ (personal discrimination), স্থানগত দাম পৃথকিকরণ (local discrimination) এবং ব্যবহারগত দাম পৃথকিকরণ (use discrimination)। (১) ব্যক্তিগত দাম পৃথকিকরণের বেলায় একই দ্রব্য বা সেবামূলক কার্যের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন দাম আদায় করা হয়। যেমন, কোন

তিন প্রকারের পৃথকিকরণ

চিকিৎসক ধনীদের নিকট হইতে বেশী 'ফী' এবং দরিদ্রের নিকট হইতে কম 'ফী' চাহিতে পারেন; আবার রেলগাড়ীর প্রথম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে সুযোগসুবিধার পার্থক্য থাকে তাহার তুলনায় অনেক বেশী ভাড়া প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট হইতে আদায় করা হয়। (২) যখন এক স্থান এবং অপর স্থানের মধ্যে একই জিনিসের দামের পার্থক্য করা হয় তখন তাহাকে স্থানগত দাম পৃথকিকরণ বলা হয়। যেমন, বড় বড় যে-সকল দোকানে অভিজাতশ্রেণী জিনিসপত্র ক্রয় করে সেখানে দাম অপেক্ষাকৃত অধিক হয় অথচ সেই সকল দ্রব্যই সাধারণ দোকানে অপেক্ষাকৃত স্বল্প দামে পাওয়া যায়। আবার একচেটিয়া কারবারী দেশের বাজারে দামের তুলনায় বিদেশের বাজারে স্বল্প দামে দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। (৩) যখন বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য একই জিনিসের পৃথক পৃথক দাম আদায় করা হয় তখন তাহাকে ব্যবহারগত দাম পৃথকিকরণ বলা হয়। যেমন, বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কারখানার নিকট স্বল্প দাম কিন্তু গৃহস্থের নিকট হইতে বেশী দাম আদায় করে।

একচেটিয়া কারবারীর সীমাবদ্ধতা (Limits to the Power of a Monopolist): অনেক সময়ই একচেটিয়া কারবারী যতটা দাম বৃদ্ধি করিতে সমর্থ কার্যত তাহা করে না। একাধিক কারণের জন্যই সে দাম কতকটা কম রাখিতে বাধ্য হয়। প্রথমত, দাম খুব উচ্চ হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারী আসিয়া ব্যবসায় খুলিতে পারে। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যের দাম বেশী হইলে লোকে পরিবর্ত-দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। যেমন, বিদ্যুতের দাম অত্যধিক হইলে লোকে কেরোসিন তৈলের বাতি জ্বালাইতে পারে। তৃতীয়ত, দাম উচ্চ হইলে সরকার জনসাধারণের স্বার্থে একচেটিয়া কারবারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। চতুর্থত, একচেটিয়া কারবারী দাম উঁচু করিতে চাহিলে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিরুদ্ধ আন্দোলন এরূপ আকার ধারণ করিতে পারে যে একচেটিয়া কারবারই উঠিয়া যাইতে পারে।

চারিটি বাধা

সংক্ষিপ্তসার

একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম: সকল প্রকার ব্যবসায়েই কারবারীর উদ্দেশ্য হইল মুনাফাকে সর্বাধিক করা; কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন একজন বিক্রেতা বাজার-দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। তাহাকে বাজারের প্রচলিত দামেই দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়। সুতরাং তাহার পক্ষে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিয়াই মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রচেষ্টা করিতে হয়। একচেটিয়া কারবারী সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের একমাত্র সরবরাহকারী বলিয়া সে যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া বাজারের দামকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে।

সে সেইভাবেই যোগান নিয়ন্ত্রণ করে যাহাতে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয়। যেখানে তাহার প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয় ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় সমান সমান হয় সেখানেই তাহার মুনাফা হয় সর্বাধিক, এবং বাজারে দাম ঐ পরিমাণ উৎপাদন এবং উহার জন্য ক্রেতাদের চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার : অনেকক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দামে একই দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। এই প্রকার দাম পৃথকিকরণ তিন প্রকারের হইতে পারে—(১) ব্যক্তিগত দাম পৃথকিকরণ, (২) স্থানগত দাম পৃথকিকরণ, এবং (৩) ব্যবহারগত দাম পৃথকিকরণ।

একচেটিয়া কারবারীর সীমাবদ্ধতা : প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরিবর্ত দ্রব্যের ব্যবহার, সরকারী হস্তক্ষেপ, এবং জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের ভয়ে একচেটিয়া কারবারী দাম অত্যধিক করিতে পারে না।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by Monopoly? Show how price is determined under conditions of Monopoly. (P. U. 1962, '64)

একচেটিয়া কারবার বলিতে কি বুঝায়? কিভাবে একচেটিয়া কারবারের আওতায় দাম নির্ধারিত হয় দেখাও। [১৭৮-১৮২ পৃষ্ঠা]

2. What is Discriminating Monopoly? What are its different varieties?

বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার বলিতে কি বুঝায়? ইহা কত প্রকারের হইতে পারে? [১৮২-১৮৩ পৃষ্ঠা]

3. What are the limits to the power of a monopolist?

একচেটিয়া কারবারীর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা কি কি? [১৮৩ পৃষ্ঠা]

সপ্তদশ অধ্যায়

বিভিন্ন উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়

(Different Types of Factor Incomes)

আমরা দেখিয়াছি যে উৎপাদনের উপাদান সংখ্যায় চারিটি—(ক) জমি, (খ) শ্রম, (গ) মূলধন, এবং (ঘ) সংগঠন। ইহারাই পারস্পরিক সহযোগিতায় জাতীয় আয় সৃষ্টি করে; এবং নীট জাতীয় আয় ইহাদের মধ্যে খাজনা মজুরি সুদ ও মুনাফা হিসাবে বণ্টিত হয়। এই কর্মগত বণ্টনই অর্থবিদ্যায় বণ্টন (Distribution) বলিয়া অভিহিত; এবং খাজনা মজুরি সুদ ও মুনাফাকে উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় (Factor Incomes) বলা হয়।

উৎপাদনের উপাদান-সমূহের মধ্যে জাতীয় আয়ের বণ্টন

কিভাবে নীট জাতীয় আয় উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয়? (How is Net National Income distributed among the Factors of Production?) :

নীট জাতীয় আয়কে লভ্যাংশ বা বণ্টনযোগ্য জাতীয় আয় (National Dividend) বলা হয়। নীট জাতীয় আয়ের যে যে অংশ উৎপাদনের উপাদানসমূহ পাইয়া থাকে তাহা উহাদের উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণের জন্য দাম ছাড়া আর কিছুই নয়। উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণের জন্য জমির দাম হইল খাজনা, শ্রমের দাম মজুরি, মূলধনের দাম
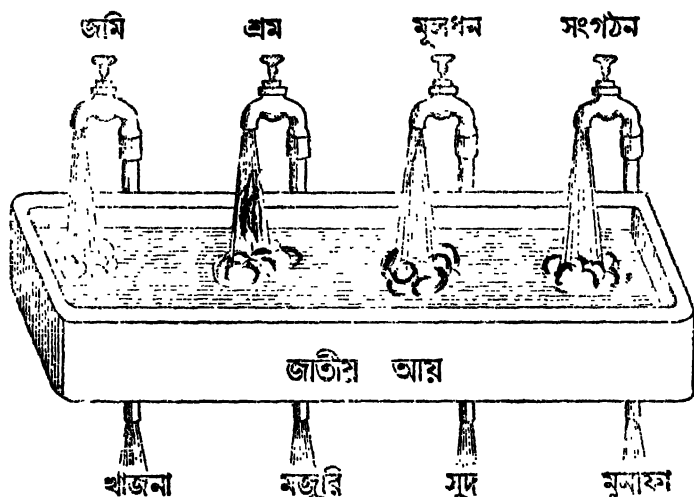
সুদ এবং সংগঠন-নৈপুণ্যের দাম মুনাফা। সুতরাং সাধারণ দাম যেভাবে নির্ধারিত হয়, ইহারাও সেইভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়।

উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদা সৃষ্টি করে সংগঠক এবং উপাদান যোগান দেয় উহার মালিক। যোগানের দিক দিয়া সাধারণ দ্রব্যাদির সহিত উৎপাদনের উপাদানসমূহের কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমত, সকল উপাদানের যোগানই প্রয়োজনমত বাড়ানো যায় না। উদাহরণস্বরূপ, জমির যোগান প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ, শ্রমের যোগান কতকটা জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, চাহিদা কমিলে জমির যোগানের হ্রাসও ঘটে না এবং শ্রমিকদের স্বল্প মজুরিতে কাজ করিতে হয়। তৃতীয়ত, অনেকক্ষেত্রে যোগানবৃদ্ধি যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহার উপর সরবরাহকারীর বিশেষ হাত থাকে না। মূলধনের পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে জাতীয় আয়, দেশের শান্তিশৃংখলা, ব্যাংক-ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর। এগুলি সঞ্চয়কারীর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে।

উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদা ও যোগান

তবুও বলা যায় যে, মোটামুটিভাবে উৎপাদনের উপাদানসমূহের যোগান বিভিন্ন শিল্প (Industry) ও বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের (Firm)* মধ্যে

* এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশেষ বিশেষ শিল্পের এক একটি প্রতিষ্ঠানকে শিল্প-প্রতিষ্ঠান বলা হয়; যেমন, কারখানা একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সকল লৌহ ও ইস্পাত কারখানা মিলাইয়া হইল লৌহ ও ইস্পাত শিল্প।

পরিবর্তনশীল। ভূগর্ভে সঞ্চিত কয়লা সীমাবদ্ধ হইলেও উহা বিদ্যুৎ সরবরাহ বা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে চাহিদামত যোগান দেওয়া যাইতে পারে। বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্প যদি কয়লার দাম কম দেয় তবে উহা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেই যোগান দেওয়া হইবে। আবার বিভিন্ন লৌহ ও ইস্পাত কারখানার মধ্যে যেটি বেশী দাম দিতে চাহিবে সেইটিতেই কয়লা যোগান দেওয়া হইবে।

চাহিদার দিক হইতে অবশ্য সাধারণ দ্রব্য ও উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ব্যক্তি যেমন তাহার প্রান্তিক উপযোগ বাজার দামের সমান না-হওয়া পর্যন্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়া চলে, উৎপাদকও তেমনি কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন (Marginal Product) উহার দামের সমান না-হওয়া পর্যন্ত উহা নিয়োগ করিয়া চলে।

উৎপাদনের উপাদানের দাম প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়

ধরা যাউক, একটি কারখানায় ১০০ জন শ্রমিক নিযুক্ত আছে। এই ১০০ জন শ্রমিকের জন্য যে মোট উৎপাদন হয় তাহা হইতে ৯৯ জন শ্রমিকের মোট উৎপাদন বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন। ইহা ৫০ টাকা হইলে ১০০ জন শ্রমিককেই যদি নিযুক্ত রাখিতে হয় তবে নিয়োগকর্তা কাহাকেও ৫০ টাকার বেশী মজুরি দিতে পারে না। ১০০-এর উপর যদি আরও ৩ জন শ্রমিক নিয়োগ করিতে হয় তবে প্রান্তিক উৎপাদন (ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর হইলে) ৫০ টাকারও কম হইবে। সুতরাং সকল শ্রমিকেরই মজুরি কমিয়া যাইবে।

কিন্তু শ্রমিক কম মজুরি লইতে রাজী হইবে কেন? হইবে কি না-হইবে তাহা নির্ভর করিবে অন্যান্য শিল্প ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের চাহিদার উপর। অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিক যদি ৫০ টাকা পায় তবে সে ৫০ টাকার কমে কাজ করিতে রাজী হইবে না। তেমনি মূলধন-মালিকও যে-প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত কম সুদ দিতে চাহিবে তাহাকে মূলধন যোগাইতে সাধারণ ক্ষেত্রে সম্মত হইবে না। এইভাবে নিয়োগকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সকল ক্ষেত্রেই এক হয়।

উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান আবার পরস্পরের পরিবর্ত (substitute) হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। একটি যন্ত্রের পরিবর্তে দুইজন শ্রমিক নিয়োগ অথবা দুইজন শ্রমিকের পরিবর্তে একটি যন্ত্র বসানো যাইতে পারে। এই কারণে মূলধনের যোগান-দাম (Supply Price) অপেক্ষাকৃত অধিক হইলে সংগঠক অধিক শ্রমিক নিয়োগের দিকে ঝুঁকিবে এবং শ্রমের যোগান-দাম অনুরূপ হইলে সংগঠক যন্ত্র বসাইতে (মূলধন নিয়োগ) আগ্রহান্বিত হইবে। ইহার ফলে উৎপাদনের সকল উপাদানেরই প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইবে।

এই সকলের ফলে উৎপাদনের প্রত্যেক উপাদানের চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হইয়া ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি করিবে। ভারসাম্য অবস্থায় (১) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সকল নিয়োগের (employment) ক্ষেত্রেই এক হইবে; (২) প্রত্যেক নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইবে; এবং (৩) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন উহার দামের সমান হইবে। ইহাই কর্মগত বণ্টনের তত্ত্ব। ইহা চাহিদা ও যোগানের তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নয়।

উৎপাদনের উপাদানের চাহিদা ও যোগান সমান হইয়া ভারসাম্য সৃষ্টি করে

সংক্ষিপ্তসার

উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে জাতীয় আয় বণ্টিত হয়। এই বণ্টিত জাতীয় আয়ই 'উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয়' এবং এইরূপ বণ্টন 'কর্মগত বণ্টন' বলিয়া অভিহিত।

উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় উপাদানের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। চাহিদার দিক দিয়া ইহা উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়। বিভিন্ন শিল্প ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে প্রান্তিক উৎপাদন সকল ক্ষেত্রেই এক হয়। আবার বিভিন্ন উপাদান পরস্পরের পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া বিভিন্ন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনও পরস্পরের সমান হয়। ভারসাম্য অবস্থায়—যেখানে উৎপাদনের উপাদানের চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান হয়—(১) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে এক হয়, (২) প্রত্যেক নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়, এবং (৩) প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন উহার আয় বা দামের সমান হয়।

প্রশ্নোত্তর

1. What are the general principles for determining the rate of remuneration of a factor of production?

কি নীতি অনুসারে উৎপাদনের উপাদানের আয় নির্ধারিত হয়? [১৮৪-১৮৭ পৃষ্ঠা]

2. What is meant by Functional Distribution? Briefly describe the general Theory of Distribution.

কর্মগত বণ্টন বলিতে কি বুঝায়? সাধারণ বণ্টনতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[ইংগিত: সাধারণ বণ্টনতত্ত্ব বলিতে 'কর্মগত বণ্টন' বুঝায়।...(১৮৪-১৮৭ পৃষ্ঠা)]

3. What are Factor Incomes? Briefly discuss the pri ciples according to which Factor Incomes are determined.

উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় বলিতে কি বুঝায়? যে নীতি অনুসারে উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা কর। [১৮৪-১৮৭ পৃষ্ঠা]

অষ্টাদশ অধ্যায়

খাজনা

(Rent)

চুক্তি অনুযায়ী খাজনা এবং অর্থনৈতিক খাজনা (Contract Rent and Economic Rent) : জমিজায়গা ব্যবহারের জন্য বৎসরান্তে জমির মালিককে যে অর্থ বা ভাড়া দেওয়া হয় সাধারণ ভাষায় তাহাকেই খাজনা বলে। অর্থবিদ্যায় এই খাজনা 'চুক্তি অনুযায়ী খাজনা' (Contract Rent) নামে অভিহিত। চুক্তি অনুযায়ী খাজনা লইয়া অর্থবিদ্যায় আলোচনা করা হয় না। অর্থবিদ্যার আলোচ্য খাজনাকে 'অর্থনৈতিক খাজনা' (Economic Rent) বলা হয়। অর্থনৈতিক খাজনা বলিতে উৎপাদনের কোন উপাদানের যোগানের সীমাবদ্ধতার দরুন যে-আয় হয় তাহাকে বুঝায়। জমির যোগান প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং শুধু জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য যে-আয় হয় তাহাই অর্থনৈতিক খাজনা।* জমির উপর ঘরবাড়ী, কূপ-নলকূপ থাকিলে উহাদের জন্য দেয় অর্থ অর্থনৈতিক খাজনার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই সকল ঘরবাড়ী, কূপ-নলকূপ মূলধন ব্যতীত কিছুই নয়। সুতরাং উহাদের দরুন যে-অর্থ প্রদান করা হয় তাহাকে সুদ হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে, খাজনা হিসাবে নহে। দ্বিতীয়ত, জমি ভাড়া দিয়াও মালিক কিছু কিছু তদারককার্য করিতে পারে এবং ইহার দরুনও সে কিছু অর্থ আদায় করিতে পারে। ইহাও অর্থনৈতিক খাজনার অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ ইহা পারিশ্রমিক বা মজুরি হিসাবে গণ্য। এইভাবে চুক্তি অনুযায়ী বা মোট (gross) খাজনা হইতে সুদ, মজুরি প্রভৃতি বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই অর্থনৈতিক খাজনা।

চুক্তি অনুযায়ী খাজনা কাহাকে বলে

অর্থবিদ্যায় অর্থনৈতিক খাজনা লইয়া আলোচনা করা হয়

অর্থনৈতিক খাজনা কাহাকে বলে

অর্থনৈতিক খাজনাকে 'উৎপাদকের উদ্বৃত্ত' (Producers' Surplus) এই আখ্যা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, উৎপাদন-ব্যয়ের (স্বাভাবিক মুনাফা ধরিয়া) অতিরিক্ত যাহা কিছু থাকে তাহাই অর্থনৈতিক খাজনা। কোন জমি হইতে যদি ১০০ টাকার ফসল পাওয়া যায় এবং ঐ জমি চাষ করার দরুন মোট ৯০ টাকা ব্যয় হয় তবে ১০ টাকা হইল অর্থনৈতিক খাজনা। বিষয়টিকে আরও একটু ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাউক, ঐ জমিতে ফসল উৎপাদন করিতে কৃষকের বীজ সার গরু-লাঙল প্রভৃতি বাবদ ব্যয় হইয়াছে ৫০ টাকা, সে নিজের পরিশ্রমের দাম

অর্থনৈতিক খাজনা উৎপাদকের উদ্বৃত্ত

---

* প্রতিভাবান শ্রমিক বা সংগঠকের যোগানও সীমাবদ্ধ। সুতরাং প্রতিভার দরুন যদি কোন শ্রমিক বা সংগঠক অন্যান্য শ্রমিক ও সংগঠক অপেক্ষা কিছু বেশী পায় তবে ঐ অতিরিক্ত প্রাপ্তিকে অর্থনৈতিক খাজনা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

ধরিয়াছে ৩০ টাকা এবং মুনাফা* বাবদ ধরিয়াছে ১০ টাকা। তাহা হইলে মোট উৎপাদন-ব্যয় দাঁড়ায় (৫০ + ৩০ + ১০ =) ৯০ টাকা ; কিন্তু ফসল বিক্রয় হইয়াছে ১০০ টাকায়। এই (১০০ টাকা—৯০ টাকা=) ১০ টাকা হইল উৎপাদকের উদ্বৃত্ত। কৃষক ইহা মজুরি হিসাবে লইতে পারে না, মুনাফা বলিয়াও দাবি করিতে পারে না। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ জমিরই দান ; ফলে ইহা জমির মালিকের নিকটই যাইবে। কৃষক যদি নিজে জমির মালিক হয় তবে সে নিজেই ইহা গ্রহণ করিবে ; অপর কেহ মালিক হইলে তাহাকে দিতে হইবে। কৃষক জমির মালিককে উদ্বৃত্ত টাকা দিতে রাজী না হইলে মালিক হয় নিজেই চাষের ব্যবস্থা করিবে, না-হয় ঐ জমি অপর একজনকে বন্দোবস্ত দিবে।

খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর তত্ত্ব (Ricardo's Theory of Rent) : অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব হয় কেন, এ-সম্বন্ধে প্রথম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন বিখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদ ডেভিড রিকার্ডো। রিকার্ডোর তত্ত্বের সংশোধিত রূপই বর্তমানের স্বীকৃত খাজনাতত্ত্ব (Theory of Rent)।

রিকার্ডোর তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার

রিকার্ডোর মতে, জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর উৎপাদিকাশক্তির জন্য দেয় অর্থই খাজনা। খাজনার উদ্ভব হয় তিনটি কারণে—(ক) জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধতা, (খ) বিভিন্ন জমির উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য, এবং (গ) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা। তৃতীয় কারণটির জন্য একটিমাত্র জমি হইতে দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না ; সুতরাং প্রয়োজন হয় বিভিন্ন জমি চাষ করিবার। কিন্তু সকল জমির উৎপাদিকাশক্তি সমান নহে বলিয়া একই ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকার জমি হইতে উৎপন্ন ফসলের পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যের পরিমাণই হইল অধিক উর্বর জমির খাজনা।

রিকার্ডোকে অনুসরণ করিয়া একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে এই সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা

বর্তমানে দণ্ডকারণ্যে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা চলিতেছে। উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে গিয়া বসবাস করিতে বিশেষ চাহিতেছে না। যাহা হউক, দণ্ডকারণ্য পরিষ্কার করিয়া বহু পরিমাণ জমিকে চাষযোগ্য করা হইল এবং কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুকে বুঝাইয়া-সুজাইয়া লইয়া যাওয়া হইল এবং প্রথম প্রথম তাহাদের বিনা খাজনায় জমি চাষ করিতে দেওয়া হইল। এই সকল উদ্বাস্তু গিয়া প্রথমে সর্বাপেক্ষা ভাল জমিগুলি বাছিয়া লইয়া কৃষিকার্য সুরু করিবে। ভাল জমির যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ না হওয়ার জন্য কেহই কোন খাজনা দিবে না ; এবং ঐ সকল জমি হইতে উৎপন্ন ফসল স্বল্প-সংখ্যক উদ্বাস্তুর জন্য পর্যাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

---

* স্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।...১৫৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখ।

এই প্রথম দল উদ্বাস্তু যদি দণ্ডকারণ্যে সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে থাকে তবে আরও উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য অভিমুখে যাত্রা করিবে। প্রথম দল উদ্বাস্তুর মধ্যে জনসংখ্যা স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে ক্রমে এমন একদিন আসিবে যখন প্রথম শ্রেণীর বা সর্বাপেক্ষা উর্বর জমি আর পড়িয়া থাকিবে না। তখন লোকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমি চাষ করিতে বাধ্য হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলেও উৎপাদন কিন্তু প্রথম শ্রেণীর জমির তুলনায় কম হইবে। প্রথম শ্রেণীর জমিতে যদি বিঘা প্রতি ১০০ টাকা ব্যয় করিয়া ২৫ কুইন্টাল শস্য উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে বিঘা প্রতি ঐ পরিমাণ ব্যয়ে হয়ত ২০ কুইন্টাল শস্য উৎপন্ন হইবে। এ-ক্ষেত্রে, (২৫ কুইন্টাল—২০ কুইন্টাল=) ৫ কুইন্টাল হইবে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উপর প্রথম শ্রেণীর উদ্বৃত্ত বা প্রথম শ্রেণীর জমির অর্থনৈতিক খাজনা। এখন সুযোগ বুঝিয়া সরকার উদ্বাস্তু কৃষকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা চালু করিয়া এ-খাজনা কার্যক্ষেত্রে আদায়ও করিতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে কিন্তু এই সময় কোন খাজনার উদ্ভব হইবে না। কারণ, উহা হইতে উৎপন্ন ফসলের দাম উৎপাদন-ব্যয়ের ঠিক সমান হয়—কোনই উদ্বৃত্ত থাকে না। আমাদের উদাহরণে উৎপাদন-ব্যয় প্রত্যেক ক্ষেত্রে ১০০ টাকা করিয়া ধরা হইয়াছে। প্রতি কুইন্টাল ফসলের দাম যদি ৫ টাকা করিয়া হয় তবে প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে ১২৫ টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি হইতে ১০০ টাকা করিয়া পাওয়া যাইবে। ১০০ টাকাই উৎপাদন-ব্যয় হওয়ার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির কৃষক খাজনা হিসাবে কিছুই দিতে পারিবে না। জোর করিয়া কিছু আদায় করা হইলে সে ঐ শ্রেণীর জমি চাষ করা ছাড়িয়া দিবে; এবং প্রয়োজন হইলে দণ্ডকারণ্য হইতে সে আবার পশ্চিমবংগে ফিরিয়া আসিবে।

প্রান্তিক জমি

এইরূপ যে-সকল জমি হইতে শুধু উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান হয়—কোন উদ্বৃত্ত থাকে না, রিকার্ডো তাহাদিগকে 'নিকৃষ্ট জমি' (Inferior Land) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বর্তমানে উহাদিগকে 'প্রান্তিক জমি' (Marginal Land) বলা হয়।

দণ্ডকারণ্যে জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলে ফসলের দাম বাড়িতে থাকিবে। তখন লোকে তৃতীয় শ্রেণীর জমির দিকে ঝুঁকিবে। ধরা যাউক, তৃতীয় শ্রেণীর জমি হইতে বিঘা প্রতি ১৫ কুইন্টাল ফসল উৎপন্ন হয় এবং ইহার দাম ঠিক ১০০ টাকা—অর্থাৎ, উৎপাদন-ব্যয়ের সমান। এখন এই তৃতীয় শ্রেণীর জমিই প্রান্তিক বা খাজনাহীন জমি বলিয়া পরিগণিত হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে (২৫ কুইন্টাল—১৫ কুইন্টাল=) ১০ কুইন্টাল; দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে (২০ কুইন্টাল—১৫ কুইন্টাল=) ৫ কুইন্টাল। এই ১০ কুইন্টাল ও ৫ কুইন্টাল

হইল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির বিঘা প্রতি খাজনা। তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে কৃষিকার্য সুরু হওয়ার ফলে প্রথম শ্রেণীর জমির অর্থনৈতিক খাজনা ৫ কুইণ্টাল হইতে বাড়িয়া ১০ কুইণ্টালে দাঁড়াইয়াছে। দণ্ডকারণ্যের কৃষকদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকিলে খাজনার সমস্তটাই ঐখানকার জমির মালিক সরকারের হস্তে যাইবে। আর সরকার যদি অর্থনৈতিক খাজনার অতিরিক্ত দাবি করে তবে উদ্বাস্তু বাঙালী আবার পশ্চিমবংগ অভিমুখে যাত্রা করিবে।

১নং জমি ২নং জমি ৩নং জমি

সমালোচনা: তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে বিভিন্ন উর্বরতাসম্পন্ন জমির উৎপাদনে যে-পার্থক্য তাহাই অর্থনৈতিক খাজনা। রিকার্ডোর আর একটি প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে খাজনা দামের অংগীভূত নহে, কারণ চাহিদাবৃদ্ধির ফলে ফসলের মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার জন্যই খাজনার উদ্ভব ও বৃদ্ধি ঘটে এবং এই কারণেই প্রান্তিক জমির উপর কোন খাজনা দেওয়া হয় না।

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ রিকার্ডোর উপরি উক্ত তত্ত্বের সারাংশ স্বীকার করিয়া লইলেও ইহার কতকগুলি বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমত, বলা হয় যে জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তি বলিয়া কিছুই নাই। নিয়মিত কৃষিকার্যের ফলে জমির উর্বরতাশক্তি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। অপরদিকে মানুষ সার প্রয়োগ, সেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

সমালোচনা:
১। জমির অবিনশ্বর শক্তি বলিয়া কিছুই নাই

২। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের জন্যও খাজনার উদ্ভব হয়

দ্বিতীয়ত, শুধু বিভিন্ন জমির উর্বরতাশক্তির পার্থক্য হেতুই খাজনার উদ্ভব হয় না; একই জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়ার ফলেও ইহা হইতে পারে।

তৃতীয়ত, রিকার্ডো যে প্রান্তিক জমির কল্পনা করিয়াছেন তাহাও ভ্রান্ত। কোন জমি কোন বিশেষ ফসল উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিলে উহা প্রান্তিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে; কিন্তু ইহা অন্য এক কার্যে ব্যবহৃত হইলে ইহার উপর উদ্বৃত্ত বা খাজনার সাক্ষাৎ মিলিতে পারে। কোন জমিতে ধান্য উৎপন্ন হইলে উহাতে মাত্র

৩। প্রান্তিক জমির কল্পনা ভুল

উৎপাদন-ব্যয় পোষাইতে পারে, কিন্তু গম উৎপাদন করা হইলে উৎপাদন-ব্যয় কুলাইয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে।

পরিশেষে, খাজনা দামের অংগীভূত নহে বলিয়া রিকার্ডোর যে-অভিমত, আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ তাহারও বিরোধিতা করেন। এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

৪। খাজনা দামের অংগীভূত হইতে পারে

চূড়ান্ত বা আধুনিক খাজনাতত্ত্ব (Final or Modern Theory of Rent): রিকার্ডোর মতবাদের সংশোধিত রূপই চূড়ান্ত বা আধুনিক খাজনাতত্ত্ব। সংক্ষেপে ইহাকে এইভাবে বর্ণনা করা যায়: খাজনা উৎপাদকের উদ্বৃত্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। উৎপাদনের উপাদানের যোগানের সীমাবদ্ধতার জন্যই ইহার উদ্ভব হয়। জমির ক্ষেত্রে যোগান প্রকৃতি দ্বারা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট এবং জমি ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির অধীন বলিয়া উৎপাদকের উদ্বৃত্তের উদ্ভব হইতে দেখা যায়। ফসলের উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে লোকে একই জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিতে পারে, অথবা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি কৃষিকার্যের অধীনে আনয়ন করিতে পারে। বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্ পন্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা নির্ভর করে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির হার ও নিকৃষ্ট জমির উৎপন্নের হারের পার্থক্যের উপর। শ্রম ও মূলধন বাবদ ১০০ টাকা একই জমিতে দ্বিতীয়বার নিয়োগ করা হইলে যদি ২০ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হয় এবং ঐ টাকা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে নিয়োগ করিলে যদি ১৮ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হয় তবে কৃষক প্রথম পন্থাই অবলম্বন করিবে। এ-ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে প্রথম দফা শ্রম ও মূলধন নিয়োগের ফলে ২৫ কুইণ্টাল ফসল উৎপন্ন হইলে, দ্বিতীয় দফা শ্রম ও মূলধন নিয়োগের ফলে প্রথমবারের দরুন উদ্বৃত্ত হইবে (২৫ কুইণ্টাল—২০ কুইণ্টাল=) ৫ কুইণ্টাল ফসল। ইহাই এই জমির খাজনা, তাহা কৃষক বা জমির মালিক যে-কেহই গ্রহণ করুক না কেন।

উৎপাদনের উপাদানের সীমাবদ্ধতার জন্যই খাজনার উদ্ভব হয়

খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Rent and Price): রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে খাজনা দামের অংগীভূত নহে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে খাজনা ও দামের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। দাম বৃদ্ধি পাইলেই নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর জমি কৃষিকার্যের অধীনে আনয়ন করা হয়। ইহাকে ব্যাপক কৃষিকার্য বলে। ইহার ফলে উৎকৃষ্ট জমিতে খাজনার উদ্ভব হয় এবং ক্রমশ ইহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

দামবৃদ্ধির ফলেই খাজনার উদ্ভব ও বৃদ্ধি ঘটে

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ বলেন, খাজনা দামের অংগীভূত হয় না, এইরূপ বলাও সর্বাবস্থায় ঠিক নয়। জমি নানা কার্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া একটি উৎপাদন-ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া উহাকে অন্য উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত করিলে দাম বাবদ কিছু দিতে হয়। এই দামই খাজনা এবং ইহা উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ হিসাবে

পরিগণিত হয়। ফলে ইহা দামের অংগীভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে, দাম চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় বলিয়া, জমির যোগান চাহিদার তুলনায় স্বল্প হইলে কোন উৎপাদনকার্যে উহাকে ব্যবহার করার জন্য সংগঠককে উহার দাম দিতেই হইবে। এই দাম সে উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে ধরিবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের দাম হইতে উহার সংকুলানের ব্যবস্থা করিবে। যেমন, কৃষক যদি কোন জমি হইতে ১০০ টাকার ফসল পায়, তবে তাহাকে উহার মধ্য হইতেই খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং ব্যক্তিগত উৎপাদকের দিক হইতে খাজনাকে দামের অংগীভূত হইতে দেখা যায়।

খাজনা দামের অংগীভূতও হয়

খাজনা ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Rent and Population): জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পায় বলিয়া দেশ ব্যাপক অথবা আত্যন্তিক কৃষিকার্যের পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ, হয় তখন অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি চাষ করিতে সুরু করে, না-হয় একই জমিতে অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিতে থাকে।* এই দুইটি পদ্ধতির যে-কোনটিই অবলম্বন করা হউক না কেন, ফসল উৎপাদনের হার পূর্বাপেক্ষা কম হইবে। সুতরাং উদ্ভব ঘটিবে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত (producers' surplus) বা অর্থনৈতিক খাজনার। ইহার পর জনসংখ্যা যতই বাড়িতে থাকিবে, আরও নিকৃষ্ট জমিতে চাষ বা পুরাতন জমিতে আরও শ্রম ও মূলধন নিয়োগের দরুন খাজনার পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাইয়া চলিবে। আমাদের উদাহরণে (১৯০ পৃষ্ঠা) দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে কৃষিকার্য সুরু হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির মধ্যে উৎপাদনের পার্থক্য দেখা দিল ৫ কুইণ্টাল শস্য। ইহাই প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা। ইহার পর জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলে যখন তৃতীয় শ্রেণীর জমিতেও চাষ আরম্ভ হইল তখন প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনাবৃদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল ১০ কুইণ্টালে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে খাজনার উদ্ভব ঘটিল।

জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে খাজনা বৃদ্ধি পায়

অতএব, জনসংখ্যাবৃদ্ধির সংগে সংগে খাজনা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে জনসংখ্যাহ্রাসের ফলে খাজনা হ্রাস পায়। এই প্রসংগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে জনসংখ্যাবৃদ্ধি বলিতে শুধু দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধি বুঝায় না; সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যাবৃদ্ধিই বুঝায়, কারণ এক দেশের উৎপন্ন শস্য অন্য দেশে চালান যায়। মোটকথা যে দেশেই হউক না কেন, জনসংখ্যাবৃদ্ধির দরুন ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেই খাজনা বৃদ্ধি পাইবে।

সংক্ষিপ্তসার

খাজনা দুই রকমের হইতে পারে—(ক) চুক্তি অনুযায়ী খাজনা, এবং (খ) অর্থনৈতিক খাজনা। অর্থবিদ্যায় অর্থনৈতিক খাজনা লইয়াই আলোচনা করা হয়। অর্থনৈতিক খাজনা হইল 'উৎপাদকের

* ৫২ পৃষ্ঠা দেখ।

উদ্বৃত্ত'। উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বলিতে মোট উৎপন্ন হইতে উৎপাদন-ব্যয় (স্বাভাবিক মুনাফা সমেত) বাদ দিয়া যাহা থাকে তাহাকে বুঝায়।

খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর তত্ত্ব: খাজনাতত্ত্বের প্রথম ব্যাখ্যা করেন রিকার্ডো। রিকার্ডোর মতে, জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর উৎপাদিকাশক্তির জন্য দেয় অর্থই খাজনা। খাজনার উদ্ভব হয় তিনটি কারণে: (১) জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধতা, (২) বিভিন্ন জমির উর্বরতাশক্তিতে পার্থক্য, এবং (৩) ক্রমহ্রাসমান বিধির কার্যকারিতা। তৃতীয় কারণটির জন্য সমাজকে বিভিন্ন জমি চাষ করিতে হয়; ফলে দেখা যায়—উৎপন্ন ফসলে পার্থক্য। এই পার্থক্যের পরিমাণই খাজনা।

উদাহরণের সাহায্যে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমে যখন জনসংখ্যা পরিমিত এবং খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা স্বল্প থাকে তখন সর্বোৎকৃষ্ট জমিই চাষ করা হয়। পরে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কৃষির অধীনে আনয়ন করা হইলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে 'উদ্বৃত্ত' বা খাজনার উদ্ভব হয়। যে-জমিতে কোন উদ্বৃত্ত থাকে না তাহাকে প্রান্তিক বা খাজনাহীন জমি বলে। রিকার্ডোর মতে, খাজনা দামের অংগীভূত নহে।

নানাভাবে রিকার্ডোর তত্ত্বের সমালোচনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল (১) জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তি বলিয়া কিছুই নাই; (২) মাত্র বিভিন্ন জমি চাষ করিলেই খাজনার উদ্ভব হয় না, একই জমিতেও খাজনা উদ্ভূত হইতে দেখা যায়; (৩) প্রান্তিক জমির কল্পনা ভুল; এবং (৪) কয়েক ক্ষেত্রে খাজনা দামের অংগীভূত হইতে পারে।

চূড়ান্ত বা আধুনিক খাজনাতত্ত্ব: এই সমালোচনার ভিত্তিতে যে চূড়ান্ত বা আধুনিক খাজনাতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা অনুসারে উৎপাদনের উপাদানের সীমাবদ্ধতার দরুনই খাজনার উদ্ভব হয়। ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি এই সীমাবদ্ধতারই একটি দিক।

খাজনা ও দাম: দামবৃদ্ধির ফলে খাজনার উদ্ভব হয় ও বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং খাজনা দামের অংগীভূত নহে। কিন্তু কয়েক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর দিক দিয়া ইহা দামের অংগীভূত হয়।

খাজনা ও জনসংখ্যা: জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে খাজনা বৃদ্ধি পায়। তবে এই খাজনাবৃদ্ধি যে দেশেই ঘটিবে এমন কোন কথা নাই, ইহা বিদেশেও ঘটিতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

1. Why is it necessary to pay rent on land, although land is a gift of nature?

জমি প্রকৃতির দান হইলেও জমি ব্যবহারের দরুন খাজনা দিতে হয় কেন?

[ইংগিত: জমি প্রকৃতির দান হইলেও জমির যোগান সীমাবদ্ধ। রিকার্ডোর ভাষায়, 'প্রকৃতির এই কৃপণতা'ই ('niggardliness of nature') হইল জমি হইতে খাজনার উদ্ভবের প্রকৃত কারণ। যদি উর্বর জমি অফুরন্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত তাহা হইলে খাজনার উদ্ভব হইত না। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায় খাজনার উদ্ভবের তিনটি কারণ হইল—(১) জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধতা, (২) বিভিন্ন জমির মধ্যে উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য, এবং (৩) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির কার্যকারিতা। ১৮৯-১৯১ পৃষ্ঠা]

2. Distinguish between Contract Rent and Economic Rent. Show how Economic Rent originates.

চুক্তি অনুসারে খাজনা এবং অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। কিভাবে অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব হয় তাহা দেখাও। [১৮৮-১৮৯ এবং ১৮৯-১৯১ পৃষ্ঠা]

3. Explain Ricardo's Theory of Rent. What is the effect of the pressure of population on Rent? (C. U. 1952, '58)

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। খাজনার উপর জনসংখ্যাবৃদ্ধির কি ফল দেখা যায়?

[১৮৯-১৯১ এবং ১৯৩ পৃষ্ঠা]

4. Write a note on the Ricardian Theory of Rent. (En. 1964)

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের উপর একটি টীকা লিখ। [১৮৯-১৯২ পৃষ্ঠা]

5. **Discuss the origin and significance of Rent.**
খাজনার উদ্ভব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।
[ইংগিত: খাজনার তাৎপর্য বলিতে বুঝায় খাজনা দিতে হয় কেন?...(১৮৯-১৯১ এবং ১৯২ পৃষ্ঠা)]
6. **Define Rent and examine the factors that determine Rent.** (**En. 1962**)
খাজনার সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং কি কি বিষয় দ্বারা খাজনা নির্ধারিত হয় দেখাও।
[১৮৮-১৮৯ এবং ১৮৯-১৯১ পৃষ্ঠা]

উনবিংশ অধ্যায়

মজুরি

(Wages)

আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরি (Money Wages and Real Wages): উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের দাম বা মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার আলোচনা করিবার পূর্বে আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। শ্রমিককে যে মাস-মাহিনা অথবা সাপ্তাহিক বা দৈনিক মজুরি দেওয়া হয় তাহাই তাহার আর্থিক মজুরি। এই মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক তাহার ভোগ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করে। অনেক সময় আবার মজুরি আংশিকভাবে টাকাকড়িতে এবং আংশিকভাবে জিনিসপত্রে প্রদান করা হয়। মোটকথা, শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক যে-সকল দ্রব্য ও সেবা ভোগ করিতে পারে তাহাই তাহার প্রকৃত মজুরি। আর্থিক মজুরি স্বল্প হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক হইতে পারে, কারণ শ্রমিক হয়ত বিনা পয়সায় বসবাসের স্থান পায়, সস্তায় খাদ্যদ্রব্য পায়, বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগসুবিধা পায়, ইত্যাদি।

প্রকৃত মজুরি নির্ধারণ করিতে হইলে আর্থিক মজুরি ব্যতিরেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

প্রকৃত মজুরি কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়

অস্থায়ী চাকরির আর্থিক মজুরি আপাতদৃষ্টিতে অধিক হইলেও স্থায়ী চাকরির স্বল্প মজুরি শ্রেয়। ইহাতে প্রকৃত মজুরি অনেক বেশী। কারণ, অস্থায়ী চাকরির স্থায়িত্ব নাই বলিয়া শ্রমিক যে-কোন সময় বেকার হইয়া পড়িতে পারে। ফলে তাহার মোট উপার্জন কম হইতে পারে।

যে-সকল চাকরিতে উপরি-আয়ের সম্ভাবনা আছে (যেমন, শিক্ষকদের গৃহ-শিক্ষকতার কার্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করা, টাইপিষ্টদের দৈনিক কার্যের পরে অন্যত্র কিছু উপরি-কাজ, ইত্যাদি) সেই সকল চাকরিতে প্রকৃত মজুরি বেশী। ইহা ব্যতীত অনেক চাকরিতে অন্য রকম সুবিধাও দেওয়া হয়—যেমন, পূর্বোল্লিখিত বিনা পয়সায় বসবাসের স্থান, সস্তায়

খাদ্যদ্রব্য, বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ, বিনামূল্যে রেলভ্রমণ, বাৎসরিক বোনাস, পেনসন, পারিবারিক পেনসন্ ইত্যাদি নানা রকম সুবিধা দেওয়া হয়। ঐ সকল চাকরিতে আর্থিক মজুরি অপেক্ষাকৃত স্বল্প হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক। অপ্রীতিকর কার্য বা আয়াসসাধ্য কার্যের—যথা, ইঞ্জিন-চালকের কার্যের আর্থিক মজুরি অধিক হইলেও প্রকৃত মজুরি কম, কারণ তাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া কাজ করিতে পারে না বলিয়া সারা জীবনে মোট উপার্জন কম করে।

প্রকৃত মজুরি বিশেষভাবে নির্ভর করে মূল্যস্তরের উপর

প্রকৃত মজুরি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বিশেষ করিয়া জিনিসের মূল্যস্তরের উপর নির্ভর করে। বর্তমানে ৫ টাকা দিয়া যে ভোগ্যবস্তু ক্রয় করা যায় যুদ্ধের পূর্বে তাহা ১ টাকায় ক্রয় করা চলিত। সুতরাং যুদ্ধের পূর্বে যাহারা ১০০ টাকা উপার্জন করিত তাহাদের প্রকৃত মজুরি বর্তমানে যাহারা ১০০ টাকা উপার্জন করে তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। অতএব, স্মরণ রাখিতে হইবে যে মূল্যস্তরের পরিবর্তনের সংগে প্রকৃত মজুরি কমিতে বা বাড়িতে পারে।

প্রকৃত মজুরিই জীবনযাত্রার মানের পরিচায়ক

শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বা জীবনযাত্রার মান তাহাদের আর্থিক মজুরির উপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে প্রকৃত মজুরির উপর। শ্রমিকদের অবস্থা ভাল কি মন্দ, তাহাদের মজুরি যথেষ্ট কি না তাহা বিচার করিতে হইসে দেখা দরকার তাহারা কি পরিমাণ সুযোগসুবিধা ও ভোগ্যবস্তু ব্যবহারে সমর্থ। তাহাদের আর্থিক মজুরির পরিমাণ দেখিয়া শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থার বিচার করা চলে না।

প্রকৃত মজুরিই শ্রমিককে আকর্ষণ করে

আবার জীবনযাত্রার মান ছাড়াও সামাজিক মর্যাদা, পদোন্নতির সুযোগ, সাফল্যের আশা, স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি এমন অনেক বিষয় আছে অর্থের মাপকাঠিতে যাহাদের পরিমাপ করা চলে না। প্রকৃত মজুরি নির্ধারণের সময় এগুলি সম্পর্কেও বিচার করিতে হইবে। কেন শ্রমিক অনেক ক্ষেত্রে অধিক মজুরির কাজ ছাড়িয়া অল্প মজুরির কাজই পছন্দ করে তাহার কারণও এই বিচারের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। মার্শালের ভাষায়, কোন বৃত্তির আকর্ষণ উহার আর্থিক মজুরির উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে উহার নীট সুবিধার (net advantages) উপর। অর্থাৎ, এক ক্ষেত্রে আর্থিক মজুরি যতটা বেশী অন্য ক্ষেত্রে অন্যান্য সুযোগসুবিধা যদি তাহা অপেক্ষা অধিক হয় তবে শ্রমিক দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিয়োগের দিকেই ঝুঁকিবে। কারণ, ইহাতে তাহার প্রকৃত মজুরি অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে।

মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয়? (How is the Rate of Wages Determined?): মজুরির হার নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে দুইটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(ক) প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব, এবং (খ) জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব।

প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব (Marginal Productivity Theory of Wages) : এই তত্ত্বানুসারে ধরিয়া লওয়া হয় যে শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট এবং সকল শ্রমিকই সমান দক্ষতাসম্পন্ন। ইহার ফলে মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং সকল শ্রমিক একই মজুরি পায়। অতএব, মজুরি হইল সর্বাপেক্ষা কম উৎপাদনশীল শ্রমিকের (least productive worker) উৎপাদনের সমান।

প্রান্তিক উৎপাদন-তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার

শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি করে নিয়োগকর্তা। সুতরাং নিয়োগকর্তা যে-মজুরি দিতে রাজী থাকে তাহাই শ্রমের চাহিদা-দাম (Demand Price)। ভোগ্য-দ্রব্যের ক্ষেত্রের ন্যায় শ্রমের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন চাহিদা-দামে বিভিন্ন পরিমাণ শ্রমের চাহিদা থাকে। নিয়োগকর্তা ক্রমাগত শ্রমিক নিয়োগ করিয়া গেলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধির ক্রিয়ার জন্য শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমিতে থাকে ; ফলে শ্রমের চাহিদার পরিমাণও কমিয়া যায়। কমিতে কমিতে প্রান্তিক উৎপাদন এমন এক অবস্থায় আসে যেখানে উহা বাজারে প্রচলিত মজুরির সমান হয়। ইহার পর আরও শ্রমিক নিয়োগ করিলে নিয়োগকর্তার লোকসান হইবে। সুতরাং সে সেইখানেই থামে। সকল শ্রমিকের দক্ষতা সমান বলিয়া এই প্রান্তিক শ্রমিকের উৎপাদনই মজুরির হার নির্ধারিত করে।

প্রান্তিক উৎপাদন-তত্ত্বের ব্যাখ্যা

ধরা যাউক, কোন নিয়োগকর্তা ইতিমধ্যেই ৯০ জন শ্রমিক নিযুক্ত করিয়াছে এবং আরও এক বা একাধিক শ্রমিক নিযুক্ত করা হইবে কি না তাহাই তাহার সমস্যা। এ-ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা ৯১-তম, ৯২-তম ইত্যাদি শ্রমিক নিয়োগ করিলে প্রান্তিক উৎপাদন কিরূপ হইবে তাহা হিসাব করিবে। যদি ৯০ জন শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ৪০ টাকা, ৯১ জনের প্রান্তিক উৎপাদন ৩৫ টাকা এবং ৯২ জনের প্রান্তিক উৎপাদন ৩০ টাকা হয় তবে ৯২ জন শ্রমিককে নিয়োগ করিতে গেলে সংগঠক ঐ শেষ শ্রমিককে ৩০ টাকার অধিক মজুরি দিতে পারিবে না ; ৯১ জন শ্রমিককে নিয়োগ করিলে অবশ্য শেষ বা প্রান্তিক শ্রমিককে ৩৫ টাকা করিয়া মজুরি দেওয়া যায়। ধরা যাউক, ৯২-তম শ্রমিক ৩০ টাকা মজুরিতেই কাজ করিতে রাজী হইল। তখন সকল শ্রমিককেই ঐ মজুরি লইতে হইবে, কারণ তাহারা সকলে সমদক্ষতা-সম্পন্ন। কেহ যদি উহার বেশী দাবি করে তবে সংগঠক তাহাকে বরখাস্ত করিয়া অন্য একজন শ্রমিককে নিযুক্ত করিবে।

উদাহরণ

এখন প্রশ্ন হইল, শ্রমিকরা ঐ ৩০ টাকা মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হইবে কেন? ইহার কারণ হইল যে অন্য কোন শিল্প বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান ইহার অধিক মজুরি দিবে না। সংগঠক বা নিয়োগকর্তাগণের মধ্যেও প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকে বলিয়া সকল ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়। যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের

প্রান্তিক উৎপাদন অধিক থাকে তাহা আরও শ্রমিক নিয়োগ করিয়া মুনাফা বাড়াইতে আগ্রহশীল হয়। কিন্তু অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিলে প্রান্তিক উৎপাদন কমিয়া আসে। এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রান্তিক উৎপাদন পরস্পরের সহিত সমতালাভের চেষ্টা করে। ভারসাম্য অবস্থায় মজুরির হার প্রত্যেক শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়; এবং প্রান্তিক উৎপাদন সকল ক্ষেত্রে সমান বলিয়া মজুরির হারও এক হয়।

প্রান্তিক উৎপাদন সমান বলিয়া মজুরিও সকল ক্ষেত্রে সমান হইবে

সমালোচনা: প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্বের প্রধান ত্রুটি হইল যে ইহা শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লয়। পণ্যের ক্ষেত্রে যোগান নির্দিষ্ট হইলে উহার দাম যেমন প্রান্তিক উপযোগ দ্বারাই নির্ণীত হয়, তেমনি শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট থাকিলে মজুরি প্রধানত শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট নাও থাকিতে পারে—প্রান্তিক উৎপাদন অতি স্বল্প বলিয়া শ্রমিক স্বল্প মজুরিতে কাজ করিতে রাজী নাও হইতে পারে। এরূপ ঘটিলে নিয়োগ-হ্রাসের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া মজুরির হার বাড়াইয়া দিবে। সুতরাং মজুরি-নির্ধারণ ব্যাপারে শুধু শ্রমের চাহিদার দিকেই দৃষ্টি দিলে চলিবে না। উহার যোগানের দিকও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

ইহা যোগানের দিকে দৃষ্টিপাত করে না

জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব (Standard of Living Theory of Wages): শ্রমের জীবনযাত্রার মানতত্ত্বে এই যোগানের দিকেরই বিচার করা হয়। প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করিতেন যে মজুরি শুধু জীবনযাত্রার মান দ্বারাই নির্ধারিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মজুরি শ্রমিকরা যে-জীবনযাত্রার মানে অভ্যস্ত তাহা বজায় রাখিবার সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা সেই মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হয় না। ফলে শ্রমের যোগান কমিয়া যায় এবং নিয়োগ-হ্রাসের জন্য প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবেই মজুরি বাড়িয়া জীবনযাত্রার মানের সমান হয়।

এই তত্ত্বও পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ইহা যোগানের দিকটাই দেখে—চাহিদার অবস্থার প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত করে না।

উপসংহার: উপসংহার হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব বা জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব কোনটাই মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা পুরাপুরি ব্যাখ্যা করে না। মজুরি হইল শ্রমের দাম। সুতরাং ইহা যে-কোন দামের ন্যায় চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে নিরূপিত হয়। চাহিদার দিকে মজুরির ঊর্ধ্বতন মাত্রা হইল শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন এবং যোগানের দিকে নিম্নতম মাত্রা হইল শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান বা জীবনযাত্রার জন্য ব্যয়। এই দুই মাত্রার মধ্যে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের দরাদরি দ্বারা মজুরি নির্ধারিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হয়

শ্রমিক-সংঘ ও মজুরি (Trade Unions and Wages): শ্রমিকরা নিয়োগকর্তার সহিত দর কষাকষি করে শ্রমিক-সংঘের মাধ্যমে। ইহাকে যৌথ দরাদরি (Collective Bargaining) বলা হয়। নিয়োগকর্তা অধিকাংশ সময়ই শক্তিশালী, তাহার সহিত একা দরাদরি করিয়া শ্রমিক পারিয়া উঠে না। উপরন্তু, একদিন শ্রম না করিলে উহা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়—অর্থাৎ, একদিন কর্মহীন অবস্থায় থাকিলে যে উপার্জন হ্রাস পায় তাহা কোনদিনই পূরণ হয় না। শ্রমিকদের অলস অবস্থায় বসিয়া থাকিবার সামর্থ্যও কম। এই সকল কারণের জন্য তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া দরাদরির মাধ্যমে নিয়োগকর্তার নিকট হইতে উপযুক্ত মজুরি আদায়ের চেষ্টা করে।

যৌথ দরাদরি—ইহার অর্থ

উপযুক্ত মজুরি বলিতে বুঝায় প্রান্তিক উৎপাদনের সমান মজুরি। মজুরির ঊর্ধ্বতন মাত্রা শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের দ্বারা নির্ধারিত হইলেও নিয়োগকর্তা সকল সময় শ্রমিককে ইহা অপেক্ষা অল্প দিতেই চেষ্টা করে। শ্রমিক-সংঘের কাজ হইল দুর্বল নিঃসহায় শ্রম-বিক্রয়কারীদের জন্য শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান মজুরি আদায়ের প্রচেষ্টা করা। ইহা ছাড়াও শ্রমিক-সংঘ শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাইয়া কৃত্রিম সংখ্যাল্পতার সৃষ্টি করে। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে যোগান কম হয় এবং প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মজুরি প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয় বলিয়া ইহাতে মজুরিও বৃদ্ধি পায়।

তবে যৌথ দরাদরির মাধ্যমে শ্রমিক-সংঘ যে সকল সময় মজুরি বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারিবে এমন কোন কথা নাই। আবার একবার মজুরি বাড়াইয়া লইতে সমর্থ হইলেও উহা বজায় রাখিতে পারিবে কি না, সে-বিষয়েও নিশ্চয়তা নাই। শ্রমিক-সংঘের মজুরি বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা এবং বর্ধিত মজুরি বজায় রাখিবার ক্ষমতা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি মজুরির হার কম হয় তবে শ্রমিক-সংঘের মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা বিফল হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, মজুরি বৃদ্ধির ফলে জিনিসের দাম বাড়িয়া যদি চাহিদা হ্রাস পায় তাহা হইলেও মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টা বিশেষ কার্যকর হইবে না। তৃতীয়ত, বর্ধিত মজুরি যদি প্রান্তিক উৎপাদনের অধিক হয় তবে উহা বজায় রাখা কঠিন হইবে, এবং বজায় থাকিলেও লোকসান এড়ানোর দরুন মালিক নিয়োগের পরিমাণ কমাইয়া দিবে। সে বর্তমানে যাহারা নিযুক্ত আছে তাহাদের ছাঁটাই করিতে সমর্থ না হইলেও নূতন লোক নিয়োগ করিবে না। অতএব, শ্রমিক-সংঘের মজুরি-বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সকল সময় সফল নাও হইতে পারে।

যৌথ-দরাদরি কতদূর সফল হইতে পারে

অবশ্য মজুরিবৃদ্ধির প্রচেষ্টাই শ্রমিক-সংঘের একমাত্র কার্য নহে; উহার অন্যান্য কার্যও রহিয়াছে। শ্রমিক-সংঘ নানাভাবে শ্রম-কল্যাণ (labour welfare) সাধন করে এবং শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। অতএব, বলা যায় যে শ্রমিকদের আর্থিক

শ্রমিক-সঙ্ঘের সংজ্ঞা

অবস্থার উন্নয়ন, শ্রম-কল্যাণসাধন ও অন্যান্যভাবে শ্রমিক-স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাহাদের যে স্থায়ী সংগঠন থাকে তাহাকেই শ্রমিক-সংঘ বলা হয়।

মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে, শ্রমিক-সংঘের কার্যাবলী দুই প্রকারের: (ক) সৌভ্রাত্রমূলক কার্য (fraternal functions), এবং (খ) সংগ্রামমূলক কার্য (militant functions)।

শ্রমিক-সংঘের দুই প্রকার কার্যাবলী:

সৌভ্রাত্রমূলক কার্য বলিতে পারস্পরিক কল্যাণের জন্য যে-সকল কার্য সম্পাদন করা হয় তাহাদের বুঝায়—যথা, নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বয়ঃপ্রাপ্তদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও পরিচালনা, খেলাধূলা ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। আমাদের দেশে অনেক শ্রমিক-সংঘ সম্প্রতি এই সকল দিকে দৃষ্টি দিয়াছে।

সৌভ্রাত্রমূলক কার্য

সংগ্রামমূলক কার্য বলিতে বুঝায় যৌথ দরাদরির মাধ্যমে মজুরি ও কার্যের সর্তাবলীর উন্নতিসাধন। ইহার মধ্যে আছে মজুরি ও মাগ্‌গি ভাতা বৃদ্ধি, শ্রমের সময়হ্রাস, কারখানার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন, নিয়োগহ্রাস বা ছাঁটাই-এ বাধা দেওয়া, ইত্যাদি।

সংগ্রামমূলক কার্য

যৌথ দরাদরির জন্য শ্রমিক-সংঘ যে-সকল পন্থা অবলম্বন করে তাহাদের মধ্যে (ক) কথাবার্তা চালানো (Negotiation), (খ) দাবি পেশ ও আপোষের প্রচেষ্টা (Conciliation), (গ) সালিসী বিচার (Arbitration), এবং (ঘ) ধর্মঘটই প্রধান। ধর্মঘটই শ্রমিক-সংঘের শ্রেষ্ঠ ও শেষ হাতিয়ার; ইহার দ্বারাই নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে শক্তির পরীক্ষা হয়। সুতরাং এই পদ্ধতি অবলম্বনে শ্রমিক-সংঘকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ধর্মঘট ব্যর্থ হইলে শ্রমিক-সংঘই ভাঙিয়া যাইতে পারে।

যৌথ দরাদরির পদ্ধতি

স্মরণ রাখিতে হইবে যে ধর্মঘটের মাধ্যমেই হউক আর অন্য পদ্ধতিতেই হউক শ্রমিক-সংঘ কখনও প্রান্তিক উৎপাদনের অধিক মজুরি আদায় করিতে পারে না। নিয়োগকর্তাকে যদি প্রান্তিক উৎপাদনের অধিক মজুরি দিতে বাধ্য করা হয় তবে তাহার পক্ষে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকিতে পারে না।

ইহার চরম ফল কি হইতে পারে

আপেক্ষিক মজুরি (Relative Wages): আপেক্ষিক মজুরি বলিতে বুঝায় বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে মজুরির হারের তারতম্য। শ্রম-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি অবাধ প্রতিযোগিতা চালু থাকে এবং শ্রম যদি সম্পূর্ণ গতিশীল হয়—অর্থাৎ, শ্রমিক যদি এক কাজ হইতে সহজে অন্য কাজে যাইতে পারে—তবে সকল ক্ষেত্রেই মজুরির হার এক হইবে। দেশে ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা বাড়িলে সকল উকিল যদি ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিতে পারেন—তবে ইঞ্জিনিয়ার ও উকিলের উপার্জনে কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহা হয় না বলিয়াই মজুরির হারে তারতম্য দেখা যায়।

আপেক্ষিক মজুরি বলিতে কি বুঝায়

মজুরির হারে তারতম্যের কারণ

যে যে কারণে শ্রমের পূর্ণ গতিশীলতা বা শ্রম-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা থাকে না তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :

(ক) কার্যের সাধারণ আকর্ষণ : যে-কাজ যত বেশী অপ্রীতিকর তাহার মজুরি তত অধিক। সাধারণ মজুর অপেক্ষা মেথরকে যে বেশী পারিশ্রমিক দেওয়া হয় ইহাই তাহার কারণ। শিক্ষকতা কতকটা প্রীতিকর বলিয়া শিক্ষকদের বেতন অন্যান্য শ্রেণীর লোকের তুলনায় কম।

(খ) অনুশীলন বা শিক্ষানবীসকার্যে সুবিধা-অসুবিধা : যে-কার্য অনুশীলন করা যত কঠিন, যত ব্যয়সাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ তাহার মজুরিও তত অধিক হইবে। ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হইতে বহু অর্থ, সময় ও পরিশ্রম লাগে। সেইজন্য তাঁহারা সাধারণ গ্রাজুয়েট হইতে অধিক মজুরি পাইয়া থাকেন। এই কারণেই আবার দক্ষ শ্রমিকের মজুরি অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি হইতে অধিক হয়।

(গ) নিয়োগের স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা : যে সকল কার্যে নিয়োগ নিয়মিত তাহাদের মজুরি অপেক্ষাকৃত স্বল্প হয়। রাজমিস্ত্রীকে বৎসরে কয়েক মাস বসিয়া থাকিতে হয় বলিয়া স্বাভাবিকভাবেই সে অপেক্ষাকৃত অধিক মজুরি দাবি করে। অপরপক্ষে যে-শ্রমিক কারখানায় সারা বৎসর ধরিয়া নিযুক্ত থাকে সে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরিতে কাজ করিতে রাজী হয়।

(ঘ) দায়িত্বশীল বা দায়িত্বশূন্য কার্য : কার্য দায়িত্বশীল হইলে মজুরিও অধিক হইবে। খাজাঞ্চির কার্যের মজুরি বেশী, কারণ ইহাতে দায়িত্ব আছে; অপরদিকে যে-কেরাণী শুধু চিঠিপত্র ছাড়ার ব্যবস্থা করে (despatcher) তাহার কাজ কতকটা দায়িত্বশূন্য বলিয়া তাহার মজুরিও কম।

(ঙ) ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা : ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা থাকিলে লোকে বর্তমানে স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিতে রাজী হয়। এইজন্য শিক্ষানবীসরা (apprentices) সামান্য ভাতাতেই কাজ করে; আইন-ব্যবসায়ীদেরও প্রথম প্রথম সামান্য পারিশ্রমিকে ও বিনা-পারিশ্রমিকে কাজ করিতে দেখা যায়।

(চ) আঞ্চলিক কারণ : আঞ্চলিক কারণেও মজুরির হারের তারতম্য দেখা যায়। যে-ব্যক্তি সহরে বাস চালাইয়া থাকে সে পল্লীগ্রামের বাসচালক অপেক্ষা অধিক বেতন পায়; সহরের দিনমজুরও পল্লীগ্রামের দিনমজুর হইতে অধিক মজুরি পায়। আবার আসাম, মণিপুর, হিমাচলপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে মজুরির যে-হার তাহা অপেক্ষা পশ্চিমবংগ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে মজুরির হার অধিক।

উপরে যে-বিষয়গুলি বর্ণনা করা হইল তাহারা শ্রমের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়াই বিভিন্ন ক্ষেত্রে মজুরির হারের তারতম্য দেখা যায়। যে উৎপাদন ও

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান অধিক সেখানে মজুরির হারও কম। শিক্ষক বহু সংখ্যায় পাওয়া যায় বলিয়া শিক্ষকগণ অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিতে বাধ্য হন; কেরাণীর কাজের জন্য শ্রমের যোগান অধিক বলিয়া কেরাণীর বেতন অধিক হয় না। অনুরূপভাবেই চাহিদার তুলনায় যোগান অধিক বলিয়া গ্রামাঞ্চলে বা অনুন্নত অঞ্চলে মজুরি কম এবং নগরাঞ্চল ও উন্নত অঞ্চলে মজুরি বেশী হয়।

চাহিদার তুলনায় যোগান কম হইলেই মজুরি অধিক হয়

সংক্ষিপ্তসার

আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরি: মজুরি হিসাবে যে-টাকাকড়ি পাওয়া যায় তাহা আর্থিক মজুরি; ইহার বিনিময়ে যে-দ্রব্যাদি ভোগ করিতে পারা যায় তাহা হইল প্রকৃত মজুরি। প্রকৃত মজুরিই শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের পরিচায়ক এবং ইহা আর্থিক মজুরি ছাড়া অন্যান্য বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়।

মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয়: এই সম্বন্ধে দুইটি তত্ত্ব আছে—(ক) প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব ও (খ) জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব। প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব অনুসারে মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়। জীবনযাত্রার মানতত্ত্ব অনুসারে মজুরি শ্রমের যোগান দ্বারা নিরূপিত হয় এবং যোগান নির্ধারিত হয় জীবনযাত্রার মান দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে, মজুরি চাহিদা ও যোগান উভয় দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

শ্রমিক-সংঘ ও মজুরি: মজুরির ঊর্ধ্বতন মাত্রা হইল শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন এবং নিম্নতম মাত্রা জীবনযাত্রার মান। এই দুই-এর মধ্যে শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার দরাদরি দ্বারা মজুরি নির্ধারিত হয়। শ্রমিকের পক্ষে দরাদরি করে শ্রমিক-সংঘ। ইহাকে যৌথ দরাদরি বলা হয়। যৌথ দরাদরির মাধ্যমে শ্রমিক মজুরি বাড়াইয়া লইতে পারিবে কি না, তাহা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যৌথ দরাদরি ছাড়াও শ্রমিক-সংঘ শ্রমকল্যাণমূলক অন্যান্য কার্য সম্পাদন করে।

আপেক্ষিক মজুরি: আপেক্ষিক মজুরি বলিতে বুঝায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে মজুরির হারের তারতম্য। বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের যোগান কমবেশী হয় বলিয়া মজুরির হারেও তারতম্য দেখা যায়।

প্রশ্নোত্তর

1. Distinguish between Money Wages and Real Wages. Upon what factors do Real Wages depend? (En. 1961)

আর্থিক মজুরি এবং প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। প্রকৃত মজুরি কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে? [১৯৫-১৯৬ পৃষ্ঠা]

2. Distinguish between Real Wages and Nominal Wages and say Low wages are ordinarily determined. (En. 1963)

প্রকৃত মজুরি ও আর্থিক মজুরির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর এবং কিভাবে মজুরির হার সাধারণত নির্ধারিত হয় তাহা বল।

[প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরের ইংগিত: মজুরি হইল উৎপাদনকার্যে শ্রমের দাম। সুতরাং অন্যান্য দামের মতই উহা চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। চাহিদার দিক দিয়া ঊর্ধ্বতন মাত্রা নির্ধারিত করে প্রান্তিক উৎপাদন এবং যোগানের দিক দিয়া নিম্নতম মাত্রা নির্ধারণ করে জীবনযাত্রার মান। এই দুই মাত্রার মধ্যে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে দরাদরি দ্বারা মজুরি নির্ধারিত হয়।…১৯৫-১৯৬ এবং ১৯৬-১৯৮ পৃষ্ঠা]

3. Explain the relation between the standard of living and level of wages of a particular group of labourers. (C. U. 1962)

কোন এক বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের সহিত উহাদের মজুরির হার কিভাবে সম্পর্কিত ব্যাখ্যা কর। [১৯৬-১৯৮ পৃষ্ঠা]

4. Show how wages are determined. (P. U. 1962)
কিভাবে মজুরি নির্ধারিত হয় দেখাও। [১৯৬-১৯৮ পৃষ্ঠা]
5. Account for difference in wages between different occupations. (C. U. 1959, '61)
বিভিন্ন পেশার মধ্যে মজুরির হারের তারতম্যের কারণ ব্যাখ্যা কর। [২০০-২০২ পৃষ্ঠা]
6. What are the factors that attract labourers to a particular occupation ?
কি কি বিষয় শ্রমিককে বিশেষ বৃত্তির দিকে আকর্ষণ করে ? [১৯৫-১৯৬ পৃষ্ঠা]
7. Describe the functions and utility of Trade Unions.
শ্রমিক-সংঘের কার্যাবলী ও উপযোগিতা বর্ণনা কর। [১৯৯-২০০ পৃষ্ঠা]
8. Discuss the nature and effects of Collective Bargaining.
যৌথ দরাদরির প্রকৃতি ও ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা কর। [১৯৯-২০০ পৃষ্ঠা]

বিংশ অধ্যায়

সুদ

(Interest)

সুদ কাহাকে বলে ? (What is Interest ?) : মূলধন কর্জ লওয়ার জন্য যে-দাম দিতে হয় তাহাকেই সুদ বলে। সাধারণত বাৎসরিক হারে এই দামের হিসাব করা হয়। যেমন, কোন ঋণগ্রহীতা যদি ১০০ টাকা ধার লইয়া বৎসরান্তে ১০৬ টাকা ফেরত দিতে অংগীকারাবদ্ধ হয় তাহা হইলে আমরা বলিয়া থাকি যে সুদের বাৎসরিক হার হইল শতকরা ৬ টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে, ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে নির্দিষ্ট সময়ের পর আসল ছাড়াও যে অতিরিক্ত অর্থপ্রদান করে তাহাই সুদ।

সুদ কাহাকে বলে

নীট সুদ ও মোট সুদ (Net Interest and Gross Interest) : মাত্র মূলধন ব্যবহারের জন্য যে-দাম দিতে হয় তাহাকেই নীট (Net or Pure or Economic) সুদ বলা হয়; মূলধন কর্জ করিলেই এই সুদ দিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে যে-সুদ প্রদান করিয়া থাকে তাহার মধ্যে নীট সুদ ব্যতীত অন্যান্য জিনিসের দাম থাকে—যেমন, আদায় সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকিতে পারে, ঋণগ্রহীতার মৃত্যু বা দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। এই ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তার দরুন ঋণদাতা নীট সুদ ব্যতীত কিছু অতিরিক্ত আদায় করে। আবার লেনদেন সংক্রান্ত হিসাবপত্র প্রভৃতি বাবদ ঋণদাতাকে ব্যয় করিতে হয়; অনেক সময় তাহাকে ঋণ আদায়ের জন্য হাংগামা পোহাইতে হয়। ইহার দাম হিসাবেও ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিয়া থাকে। অতএব, ঋণগ্রহীতাকে সুদ হিসাবে যাহা দিতে হয় তাহার মধ্যে ঝুঁকি হাংগামা ও আদায়পত্রের খরচ প্রভৃতি বাবদ দেয় অর্থও থাকে। সুতরাং উহাকে মোট বা অপরিশুদ্ধ (gross)

নীট সুদ

মোট সুদ

সুদ বলা হয়। এই মোট সুদ হইতে ঝুঁকি, আদায়পত্রের খরচ প্রভৃতি বাবদ দেয় অর্থ বাদ দিলে নীট সুদ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, কোনপ্রকার ঝুঁকি বা ঝঞ্ঝাট না থাকিলে ঋণের জন্য যে-সুদ আদায় করা হয় তাহাই নীট সুদ।

এই কারণেই বিভিন্ন প্রকারের ঋণের মধ্যে সুদের পার্থক্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের যে অতিরিক্ত হারে সুদ দিতে হয় তাহার অন্যতম কারণ হইল যে এই ঋণের ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা এবং আদায়ের ঝঞ্ঝাট বেশী। অপরপক্ষে সরকারকে আমরা যে-ঋণ দিয়া থাকি তাহার সুদ যে অপেক্ষাকৃত স্বল্প হয় তাহার কারণ এইরূপ ঋণের পরিশোধ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বা আদায়ের ঝঞ্ঝাট কম।

সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়? (How is the Rate of Interest Determined ?): সুদ মূলধন ব্যবহারের দাম। সুতরাং জিনিসপত্রের দামের ন্যায়ই উহা চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। ঋণগ্রহীতাদের নিকট মূলধনের উপযোগিতা আছে বলিয়াই মূলধনের চাহিদা এবং উহার জন্য সুদ দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীশ্রেণী মূলধনের জন্য সুদ দিতে প্রস্তুত থাকে মূলধনকে উৎপাদনশীল কার্যে নিয়োজিত করা যায় বলিয়া : ঋণ-করা মূলধন সাজসরঞ্জাম, কাঁচামাল প্রভৃতিতে নিয়োগ করিয়া উৎপাদকগণ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে সচেষ্ট থাকে। মূলধন নিয়োগের ফলে উৎপাদকের যতটা আয় হয় ততটা পরিমাণ সুদই দিতে সে রাজী হইবে। মূলধনের নিয়োগের ফলে যে-আয় হয় সুদের হার তাহার অধিক হইলে সে ঋণ করিবে না। যেমন, ১০০ টাকা ধার করিয়া যদি উৎপাদক বৎসরে ৫ টাকা আয় করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে সে ৫ টাকার অধিক সুদ দিতে রাজী হইবে না। কারণ, তাহা হইলে তাহার লোকসান হইবে। সুতরাং সে যখন মূলধন বাড়ায় তখন সে দুইটি বিষয় বিচার করিয়া দেখে—(১) অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগের ফলে আয় কত হইবে? এবং (২) মূলধনের সুদ কত? যেখানে মূলধন হইতে আয় ও মূলধনের সুদ সমান হয় সেখানেই সে থামিয়া যায় এবং আর মূলধন কর্জ করিয়া উৎপাদনে নিয়োগ করে না। অন্যভাবে বলা যায়, চাহিদার দিক হইতে সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়।

মূলধনের চাহিদা

মূলধনের উৎপাদিকা-শক্তির জন্য সুদ দেওয়া হয়

চাহিদার দিক হইতে সুদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়

আমরা দেখিয়াছি যে, উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের সহিত ক্রমাগত একটিমাত্র উপাদান যোগ করা হইতে থাকিলে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্য করিতে থাকে।* এখন যদি অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া অধিক

* ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা দেখ।

মাত্রায় মূলধন নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদনের হার কমিতে থাকিবে। মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন কমিতে থাকিলে ব্যবসায়িগণ সুদ বেশী দিতে রাজী থাকিবে না এবং তাহাদের ঋণের চাহিদা হ্রাস পাইবে। অতএব, সুদের হার না কমাইলে লগ্নিদারেরা লগ্নি করিতে পারিবে না এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যে ঋণপ্রদানের জন্য প্রতিযোগিতার ফলে সুদের হার হ্রাস পাইবে। অতএব, চাহিদার দিক হইতে সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। সুদের হার অধিক হইলে মূলধনের চাহিদা কমিবে, কারণ যে-সকল ক্ষেত্রে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন বেশী মাত্র সেই সকল ক্ষেত্রেই মূলধন নিয়োজিত হইবে। আর সুদের হার স্বল্প হইলে মূলধনের চাহিদা অধিক হইবে, কারণ যে-সকল ক্ষেত্রে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন কম সে-সকল ক্ষেত্রেও মূলধন নিয়োজিত হইবে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যবসায়ী যখন উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য মূলধন নিয়োগ করে তখন সে মূলধন হইতে কতটা লাভের সম্ভাবনা (expectation) আছে সেই বিচার দ্বারাই পরিচালিত হয়। লাভের সম্ভাবনা বিচার করিয়া সে কত সুদে ঋণ করিবে তাহা ঠিক করে।

সুদের হারের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে মূলধনের চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি হয়

ব্যবসায়ী লাভের সম্ভাবনা বিচার করিয়া ঋণগ্রহণ করে

ব্যবসায়ী ছাড়া সাধারণ লোক এবং সরকার ঋণ করিয়া থাকে। ইহারাও মূলধনের বাজারে চাহিদার সৃষ্টি করে। সাধারণ লোকে বাড়ীঘর বা প্রত্যক্ষ ভোগের জন্য ঋণ করিয়া থাকে। সরকার যুদ্ধ পরিচালনার মত অনুৎপাদনশীল কার্যের জন্য এবং ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প, সমাজ-কল্যাণকর কার্য প্রভৃতির জন্য ঋণ করে। যুদ্ধের জন্য সরকার যে-ঋণ করে তাহা সুদের হারের উপর বিশেষ নির্ভর করে না, কারণ যুদ্ধজয়ের জন্য যে-কোন সুদেই সরকারকে ঋণ করিতে হয়। শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারকে ঋণ করিবার সময় সুদের হারের সহিত উৎপাদনকে বিচার করিয়া দেখিতে হয়। যাহা হউক, চাহিদা যে-সূত্র হইতেই আসুক না কেন উহা অধিক হইলে মূলধনের সুদ বাড়িবে এবং উহা স্বল্প হইলে সুদ কম হইবে।

এই ত গেল চাহিদার দিক। এখন যোগানের দিকও দেখা প্রয়োজন। সঞ্চয় হইতে লগ্নি-মূলধন আসে। এই সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রধানত লোকের আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আয়ের পরিমাণ ঠিক থাকিলে এবং সুদের হার বেশী হইলে লোকে অধিক সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইবে; আর সুদের হার যদি কম হয় তাহা হইলে লোকে ততটা সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হইবে না। কিছু লোক হয়ত সুদ না থাকিলেও সঞ্চয় করে; কিন্তু সঞ্চয়ের জন্য দাম হিসাবে সুদ দেওয়া না হইলে অধিকাংশ লোকই সঞ্চয় করিতে আগ্রহান্বিত হয় না। ইহার কারণ, লোকে ভবিষ্যতের

মূলধনের যোগান

তুলনায় বর্তমানের ভোগকে অধিক কাম্য মনে করে। সঞ্চয় করিবার অর্থ হইল বর্তমানের ভোগকে স্থগিত রাখিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করা। অতএব, এই প্রতীক্ষার (waiting) জন্য উপযুক্ত মূল্য না দেওয়া হইলে লোকে সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিবে কেন? যেমন, ১০০ টাকা ধার দিয়া যদি দশ বৎসর পরে ঐ ১০০ টাকাই মাত্র ফেরত পাওয়া যায়, তাহা হইলে সাধারণত লোকে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে চাহিবে না। মানুষ বর্তমান সময়কে যতটা প্রাধান্য দেয় ভবিষ্যৎকে ততটা দেয় না। সেইজন্য লোককে বর্তমান ভোগপ্রবৃত্তি ও বর্তমান সময়প্রীতি হইতে মুক্ত করিয়া সঞ্চয়ে উৎসাহিত করিতে হইলে সুদ দিতে হয়। এই সুদই হইল প্রতীক্ষার বা বর্তমান সময়ের প্রতি আকর্ষণকে পরিহার করিবার জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেয় দাম।

বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখা বা ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করার অনিচ্ছাকে জয় করার জন্য সুদ দিতে হয়

লোককে যত অধিক সঞ্চয় করিতে হয় তত অধিক বর্তমান ভোগ বা বর্তমান সময়ের প্রতি আকর্ষণকে ত্যাগ করিতে হয়। অর্থাৎ, সঞ্চয়ের দরুন ত্যাগস্বীকারের মাত্রা সঞ্চয়-বৃদ্ধির সংগে সংগেই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং লোককে অধিক মাত্রায় ত্যাগস্বীকার করিতে রাজী করাইবার জন্য অধিক হারে সুদ প্রদান করিতে হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সুদের হার উচ্চ হইলে লোকে অধিক সঞ্চয়ের যোগান দিবে, আর সুদের হার কম হইলে সঞ্চয়ের যোগান কমিয়া যাইবে।

দেখা গেল যে, সুদের হার বেশী হইলে মূলধনের চাহিদা কমে, কিন্তু যোগান বাড়ে। অপরদিকে সুদের হার কম হইলে উহার চাহিদা বাড়ে কিন্তু যোগান কমে।

ভারসাম্য অবস্থায় সুদের হার

এইভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে যে হারে মূলধনের চাহিদার পরিমাণ মূলধনের যোগানের পরিমাণের সমান হয় সেই হারই বাজারে সুদের হার বলিয়া গণ্য হয়। ইহাকে সাম্যাবস্থার সুদের হার (Equilibrium Rate of Interest) বলে।

চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা বাজারে সুদের হার সাম্যাবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়

সুদের হার ইহার অধিক হইলে বাজারে মূলধনের যোগান মূলধনের চাহিদা অপেক্ষা অধিক হইবে; ফলে ঋণদাতাদের মধ্যে ঋণপ্রদানের জন্য প্রতিযোগিতা চলিবে এবং সুদের হার কমিয়া আবার সাম্যাবস্থার হারে দাঁড়াইবে। অপরদিকে সুদের হার সাম্যাবস্থার হার হইতে কম হইলে মূলধনের চাহিদা মূলধনের যোগান অপেক্ষা অধিক হইবে; ফলে ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ঋণগ্রহণের জন্য প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিবে এবং সুদের হার আবার বাড়িয়া সাম্যাবস্থার হারে আসিয়া দাঁড়াইবে।

পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠার উদাহরণটি হইতে সুদ নির্ধারণের উপরি-উক্ত নিয়মটি সহজেই বুঝা যাইবে:

(হিসাব টাকায়)

সুদের হার (শতকরা)	মূলধনের চাহিদা	মূলধনের যোগান
৮	১৫,০০০	৫০,০০০
৭	১৮,০০০	৪০,০০০
৬	২২,০০০	৩০,০০০
৫	২৫,০০০	২৫,০০০
৪	৩৫,০০০	২০,০০০
৩	৫০,০০০	১৫,০০০

এই হিসাবে দেখা যায় যে বাজারে সুদের হার মূলধনের চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে ৫ টাকায় আসিয়া স্থির হইবে, কারণ ঐ সুদে মূলধনের যতটা চাহিদা ঠিক ততটাই যোগান হয়। সুদ যদি ৬ টাকা হয় তাহা হইলে ঋণগ্রহীতারা ২২,০০০ টাকা ঋণ করিতে ইচ্ছুক থাকে, কিন্তু ঋণদাতারা ৩০,০০০ টাকা লগ্নি করিতে চাহে। ফলে ঋণদাতাদের মধ্যে ঋণপ্রদানের জন্য প্রতিযোগিতা চলে এবং সুদের হার ৫ টাকায় নামিয়া আসে। অপরদিকে সুদ যখন ৪ টাকা তখন ঋণগ্রহীতারা ৩৫,০০০ টাকা ঋণ করিতে ব্যগ্র কিন্তু ঋণদাতারা মাত্র ২০,০০০ টাকা লগ্নি করিতে রাজী থাকে। ফলে ঋণগ্রহণের জন্য ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে এবং সুদের হার বাড়িয়া ৫ টাকা হয়। সুতরাং ৫ টাকা সুদের হারেই চাহিদা ও যোগান সাম্যাবস্থায় আসে।

সুদের হারে পার্থক্য (Differences in the Rate of Interest): যেমন, একই ধরনের পণ্যের দাম প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যোগান ও চাহিদার ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে একই থাকে, তেমন একই ধরনের ঋণের সুদও বাজারে একই থাকার প্রবণতা দেখা যায়। তবে ঋণের শ্রেণীবিভাগ আছে এবং এইজন্য বাজারে বিভিন্ন ধরনের ঋণের সুদ বিভিন্ন হইতে দেখা যায়।

মেয়াদ অনুসারে সুদের পার্থক্য

দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদ স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুদ অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবেই অধিক। কারণ, এ-ক্ষেত্রে মহাজনের বিনিয়োগযোগ্য অর্থ দীর্ঘকালব্যাপী ঋণগ্রহীতার প্রয়োজন মিটায়।

ঋণের অনিশ্চয়তার জন্য সুদের পার্থক্য

অনেক সময় ঋণে অনিশ্চয়তা থাকিয়া যায়। দরিদ্র, অপরিচিত ও অসাধু ব্যক্তিকে ঋণদানে মহাজনরা অনিচ্ছুক হয় বা ঋণ দিতে স্বীকৃত হইলেও জামিন রাখিয়া দেয় বা অতি উচ্চ হারে সুদ দাবি করে। কারণ, অনেক সময় এরূপ ক্ষেত্রে আসল টাকা ফেরত না পাইবার আশংকা থাকে। সুতরাং ঝুঁকি বেশী হইলে মহাজনরা উচ্চ হারে সুদ দাবি করে।

অনেক সময় সুদ আদায়ের জন্য পরিশ্রম ও ব্যয় হয়। চিঠিপত্র লেখা, লোক নিয়োগ করা ইত্যাদির জন্য হাংগামা বেশী হইলে সুদ বেশী দিতে হয়। আমাদের দেশে কাবুলিওয়ালারা যে উচ্চ হারে সুদ গ্রহণ করে তাহার অন্যতম কারণ আদায়ের অসুবিধা।

আদায়ের পরিশ্রম ও খরচের পার্থক্য

সরকার অনেক সময় জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। স্থায়িত্ব অনুসারে এই ঋণের উপর বার্ষিক শতকরা স্বল্প হারে সুদ দেওয়া হয়। এই স্বল্প সুদে ঋণগ্রহণে কেন সরকার সফল হয় তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। সরকারের নিকট হইতে মূলধন ফেরত না পাওয়ার কোন আশংকা থাকে না। সরকারের ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতায় লোকের সম্পূর্ণ আস্থা থাকে। উপরন্তু, এই ঋণের জন্য সুদ আদায়ের কোন হাংগামা নাই। আইনের বলে কোম্পানীগুলি, বীমা কোম্পানী ও ব্যাংকগুলি সরকারী ঋণপত্রে টাকাকড়ি খাটাইতে বাধ্য হয়। সুতরাং যোগান অধিক বলিয়া সরকারী ঋণের সুদের হার কম হয়।

সরকারী ঋণের সুদ স্বল্প হওয়ার কারণ

কৃষকদের বেলায় অবস্থা ঠিক বিপরীত। তাহাদের ঋণের চাহিদা প্রচুর। কিন্তু গ্রামে ঋণ দিবার মত সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ স্বল্প। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে মহাজনই হইল ঋণপ্রদানের প্রধান সূত্র। দ্বিতীয়ত, দরিদ্র কৃষককে ঋণ দেওয়ার মধ্যে অনেক ঝুঁকি থাকে। শস্যের ফলন ভাল হইলে ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা থাকে, না-হইলে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা কম হয়! অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া কৃষকেরা ধার লইবার সময় কোন জামিন বা বন্ধক দিতে পারে না। সমবায় সমিতির ঋণ, তাকাভি ঋণ বা জমিবন্ধকী ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণও অতি স্বল্প বলিয়া মহাজনরা অতি উচ্চ হারে সুদ দাবি করে এবং কৃষকদের প্রয়োজন বেশী বলিয়া উহা দিতে বাধ্য হয়।

কৃষকদের ঋণের সুদ অধিক হওয়ার কারণ

সহরের ব্যাংকগুলি শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীকে যে স্বল্পমেয়াদী ধার দেয় তাহার জন্য জামিন রাখিয়া দেয়; এইজন্য ঋণের ঝুঁকি বিশেষ থাকে না। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ীদের আয় কৃষকদের আয়ের মত অতটা অনিশ্চিত নয়; সুতরাং মূলধন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম। এই সকল কারণে সহরের ব্যাংকগুলি মহাজনদের তুলনায় অনেক স্বল্প সুদে টাকা ধার দেয়।

ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের ঋণের সুদ অপেক্ষাকৃত কম

সংক্ষিপ্তসার

মোট সুদ ও নীট সুদ: মাত্র মূলধন ব্যবহারের জন্য যে-সুদ দেওয়া হয় তাহাকে নীট সুদ বলে। নীট সুদের উপর যদি কিছু আদায় করা হয় তবে মোট দেয় অর্থকে মোট সুদ বলা হয়।

সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়: সুদ নির্ধারিত হয় মূলধনের চাহিদা ও যোগান দ্বারা। চাহিদার দিক হইতে সুদ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়। সুদের হারের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে মূলধনের চাহিদাও বাড়াকমা করে। সঞ্চয় হইতেই মূলধন যোগান দেওয়া হয়। সঞ্চয়ের অর্থই বর্তমান ভোগকে স্থগিত

রাখা। এই বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখা বা অপেক্ষা করার অনিচ্ছাকে জয় করার জন্যই সুদ দিতে হয়। সুদের হার যত অধিক হইবে লোকে ততই বর্তমান ভোগকে স্থগিত রাখিতে আগ্রহান্বিত হইবে। এইভাবে চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারা সুদের হার ভারসাম্য অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়।

সুদের হারে পার্থক্য: এক ধরনের পণ্যের দাম বাজারে যেমন একই থাকে তেমনি এক ধরনের ঋণের সুদও এক হয়। কিন্তু সকল সুদ এক ধরনের নয় বলিয়া সুদের হারেও পার্থক্য দেখা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ, মেয়াদ অনুসারে সুদের হারে পার্থক্য, অনিশ্চয়তার জন্য সুদের হারে পার্থক্য, আদায়ের পরিশ্রম ও ব্যয়ের জন্য সুদের হারে পার্থক্যের উল্লেখ করা যায়।

প্রশ্নোত্তর

1. Distinguish between Gross Interest and Net Interest. How is the rate of Interest determined? (C. U. 1951; P. U. 1963)

মোট সুদ ও নীট সুদের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়?

[২০৩-২০৪ এবং ২০৪-২০৭ পৃষ্ঠা]

2. Account for the variation in the rates of Interest borne by different types of loans. (C. U. 1950, '51)

বিভিন্ন ধরনের ঋণের জন্য সুদের হারের পার্থক্যের বর্ণনা কর। [২০৭-২০৮ পৃষ্ঠা]

3. Why does a lender demand the payment of interest on a loan? Why does he charge different rates of interest for different types of loans? (C. U. 1960)

ঋণদাতা ঋণের উপর সুদ দাবি করে কেন? সে বিভিন্ন ধরনের ঋণের উপর বিভিন্ন হারে সুদ দাবি করে কেন? [২০৫-২০৬ এবং ২০৭-২০৮ পৃষ্ঠা]

একবিংশ অধ্যায়

মুনাফা

(Profit)

মুনাফার প্রকৃতি (Nature of Profit): উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয় হইতে মুনাফার প্রকৃতি একটু পৃথক। প্রথমত, মুনাফা হইল পরিচালনা ও ঝুঁকি বহনের জন্য সংগঠকের পুরস্কার বা দাম। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের দাম চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট থাকে। জমির মালিক কত খাজনা পাইবে, শ্রমিক কত মজুরি পাইবে এবং মূলধন সরবরাহকারী কত সুদ পাইবে তাহা এই সকল ব্যক্তি ও সংগঠকের মধ্যে পূর্ব চুক্তি অনুসারে নির্ধারিত থাকে। কিন্তু সংগঠকের পুরস্কার এইভাবে কোনমতে নির্দিষ্ট থাকে না।

মুনাফার সহিত উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয়ের পার্থক্য

দ্বিতীয়ত, জমি (কাঁচামাল ও খাজনা), শ্রমিক ও মূলধন সরবরাহকারীর প্রাপ্য মিটাইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তবে তাহাই মুনাফা হিসাবে পরিগণিত হয়। এই কারণে মুনাফা একেবারে শূন্য হইতে পারে, অথবা ঋণাত্মক (negative) হইতে পারে। খাজনা, মজুরি বা সুদ কিন্তু কখনই ঋণাত্মক হয় না। তৃতীয়ত,

খাজনা, মজুরি ও সুদের হারের সহসা খুব বেশী পরিবর্তন হয় না; কিন্তু মুনাফার হারে অত্যধিক পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। এক বৎসর হয়ত মুনাফা প্রচুর হইল, পরের বৎসর প্রচুর ক্ষতি হইল—এইরূপও দেখা যায়।

মোট ও নীট মুনাফা (Gross and Net Profit): ব্যবসায়-সংগঠক প্রাপ্ত আয় হইতে খাজনা, মজুরি ও সুদ চুকাইয়া দিয়া যে-অর্থ পুরস্কার বা সংগঠন পরিচালনার দাম বলিয়া দাবি করে তাহাকে মুনাফা বলে। অনেক সময় সংগঠক নিজের জমিতে উৎপাদন করে এবং নিজেই উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে ও মূলধন নিয়োগ করে। সে-ক্ষেত্রে মজুরি বাদ দিয়া আয়ের সবটাই সে মুনাফা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কারণ, নিজের জমি ও মূলধন বলিয়া খাজনা ও সুদ অপরকে দিতে হয় না। এই মুনাফাকে মোট মুনাফা (Gross Profit) বলা হয়। কিন্তু জমি ও মূলধন নিজেরই হউক বা পরেরই হউক মোট মুনাফা হইতে নির্দিষ্ট হারে খাজনা, মজুরি ও সুদ বাদ দিলে যে উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকে নীট মুনাফা (Net Profit) বলা হয়। নীট মুনাফার মধ্যে নিম্নোক্ত উপাদানগুলি থাকে:

মোট মুনাফা কাহাকে বলে

নীট মুনাফার উপাদান

(ক) সংগঠক ব্যবসায়ে স্বয়ং পরিশ্রম করার জন্য পারিশ্রমিক দাবি করে। এই ধরনের শ্রমের জন্য লোক রাখিতে হইলে তাহাকে মজুরি দিতে হইত, অথবা সংগঠক যদি অন্যত্র কাজ করিত তাহা হইলেও সে পারিশ্রমিক পাইত। সুতরাং সংগঠকের নিজের শ্রমের মজুরি হইল মুনাফার একটি উপাদান।*

(খ) সংগঠকের সর্বপ্রধান কার্য ঝুঁকি বহন করা। 'হয় রাজা নয় ফকির' হইবার সম্ভাবনা সকল ব্যবসায়ে অল্পবিস্তর আছেই। সংগঠকের যেমন লাভের আশা আছে তেমনি লোকসানের আশংকাও আছে। এই ঝুঁকিবহনের জন্য সে যে-অর্থ দাবি করে তাহাই মুনাফার প্রধান অংশ। অর্থাগমের আশা না থাকিলে কেহই ঝুঁকি লইতে স্বীকৃত হইত না।

(গ) অনেক সময় একচেটিয়া বা আংশিক একচেটিয়া কারবার থাকিলে সংগঠক অধিক মুনাফার আশা করে। এই ধরনের মুনাফাকে 'একচেটিয়া কারবারের মুনাফা' বলা হয়। বাস্তব জগতে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বিরল বলিয়া অধিকাংশ ব্যবসায়ের মধ্যে 'একচেটিয়া মুনাফা'র অংশ অল্পবিস্তর আছেই।

(ঘ) অনেক সময় হঠাৎ সুযোগ আসিলে সংগঠকরা 'বেশ মোটা' লাভ করিয়া থাকে। বর্তমানে অনেক জিনিসের আমদানি বন্ধ হওয়ায় যাহাদের নিকট ঐ জিনিস পূর্ব হইতেই মজুত করা আছে, তাহারা অচিন্তনীয় মুনাফা করিতেছে। গত যুদ্ধের সময় এক পাউণ্ড কুইনাইন্ অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। এই ধরনের মুনাফাকে আকস্মিক মুনাফা (windfall profit) বলা হয়।

---

* অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য ইহা বাদ দিয়াই মুনাফা হিসাব করা হয়।

স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit) : স্বাভাবিক মুনাফার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। সংগঠকের পক্ষে পরিচালনার পারিশ্রমিক ও ব্যবসায় বা উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করিবার পুরস্কারকে স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। স্বল্পদিনের জন্য সে বেগার খাটিতে পারে, ভবিষ্যৎ লাভের আশায় উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের কথা ধরিলে প্রত্যেক ব্যবসায়ী ঝুঁকিবহন ও পরিশ্রম বাবদ কিছু মুনাফা অর্জন করিবেই। নচেৎ, সে ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিবে।

সংক্ষিপ্তসার

মুনাফা উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয় হইতে পৃথক : ১। মুনাফা চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয় না; ২। মুনাফা ঋণাত্মক হইতে পারে; ৩। মুনাফার হারের ভীষণ পরিবর্তন হয়।

মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা : অন্যান্য সকলকে প্রদান করিয়া সংগঠকের হস্তে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই মোট মুনাফা। ইহা হইতে সংগঠকের নিজস্ব মূলধন ও জমির দরুন প্রাপ্য বাদ দেওয়া হইলে নীট মুনাফা পাওয়া যায়। নীট মুনাফার উপাদানের মধ্যে ১। সংগঠকের পারিশ্রমিক, ২। ঝুঁকিবহনের পুরস্কার, ৩। একচেটিয়া কারবারের লাভ, ৪। আকস্মিক লাভ প্রভৃতি থাকে। ইহা হইতে আবার শেষের দুইটি—অর্থাৎ, একচেটিয়া কারবারের লাভ ও আকস্মিক লাভ বাদ দেওয়া হইলে তাহাকে স্বাভাবিক মুনাফা বলে।

প্রশ্নোত্তর

1. How is Profit distinguished from other Facto Incomes ? Indicate the different elements of Profit.

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয় হইতে মুনাফার পার্থক্য কোথায়? মুনাফার উপাদানগুলি কি কি দেখাও। [২০৯-২১০ পৃষ্ঠা]

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সরকারী আয়-ব্যয়

(Government Finance)

সরকারী আয়-ব্যয়কে সাধারণের আয়-ব্যয়ও (Public Finance) বলা হয়। সরকারী বা সাধারণের আয়-ব্যয়ে সরকারের আয় ও ব্যয় এবং উভয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধনের সমস্যা আলোচনা করা হয়। এই সরকারী আয়-ব্যয়ের চারিটি প্রধান শাখা আছে—যথা, (ক) সরকারী আয়, (খ) সরকারী ব্যয়, (গ) সরকারী ঋণ, এবং (ঘ) উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য অর্থসংস্থান (financing of development)।*

সরকারী আয়-ব্যয়ের বিভিন্ন শাখা

* আয়-ব্যয় পরিচালনা (financial administration) সরকারী আয়-ব্যয়ের আর একটি শাখা। কিন্তু প্রাথমিক অর্থবিদ্যায় ইহার আলোচনা করা হয় না; উচ্চতর পর্যায়ে করা হয়।

সরকারের কার্যক্ষেত্রের দিন দিন প্রসার ঘটিতেছে বলিয়া সরকারী আয়-ব্যয় ব্যবস্থারও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিভিন্ন প্রকারের আয়-ব্যয় পদ্ধতি (Different Systems of Public Finance) : সরকারী আয়-ব্যয় পদ্ধতি প্রধানত তিন প্রকারের হইতে পারে :

তিন প্রকারের সরকারী আয়-ব্যয় পদ্ধতি

(ক) পূর্ব-নির্দিষ্ট আয়ের পদ্ধতি (System of Predetermined Income) : এই পদ্ধতি ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় পদ্ধতির অনুরূপ। ইহাতে আয় অনুসারেই ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারের আয় যখন মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে এবং বৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না তখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ভারতে যখন ভূমি-রাজস্বই ছিল আয়ের সর্বপ্রধান সূত্র তখন সরকারকে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কারণ, ভূমি-রাজস্ব হইতে আয় ছিল মোটামুটি নির্দিষ্ট।

(খ) পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যয়-পদ্ধতি (System of Predetermined Expenditure): এই দ্বিতীয় পদ্ধতিই বর্তমান ভারতে অনুসরণ করা হয়। বস্তুত, ইহাকে একরূপ সকল সভ্য দেশে অনুসৃত পদ্ধতি বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ইহাতে আয় অনুসারে ব্যয়নির্বাহ করা হয় না; পূর্ব হইতেই ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া কিভাবে ঐ অর্থ সংগ্রহ করা হইবে তাহা স্থির করা হয়।

এই প্রসংগে অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সরকার ইচ্ছামত ব্যয়ের পরিকল্পনা করিয়া প্রয়োজনমত অর্থসংগ্রহ করিতে পারে না। সুতরাং ব্যয় নির্ধারণ করিবার সময়ে কি পরিমাণ আয় হওয়া সম্ভব সে-বিষয়ে বিবেচনা করিতে হয়।

(গ) বাণিজ্যিক পদ্ধতি (Commercial System) : ইহাতে আয় বা ব্যয় কোনটাই পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট হয় না। দেখা হয় যে আয় কিরূপ হইবে এবং ব্যয় বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যাইবে কি না সে-বিষয়েও বিবেচনা করা হয়। আবার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মত ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া আয় বৃদ্ধি করা যায় কি না তাহাও দেখা হয়। সাধারণত সরকার-পরিচালিত ব্যবসাবাণিজ্যেই—যেমন, রেলপথ ও সরকারী বাস চলাচলের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, প্রকৃত সরকারী আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে নহে।

সরকারী আয় বা রাজস্ব (Public Income or Revenues) : সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে দুই ধরনের রাজস্ব সংগ্রহ করে। (ক) সরকার কর্তৃক পরিচালিত জনহিতকর সংস্থাসমূহ যে সেবামূলক কার্যাদি পরিবেশন করে তাহার ব্যবহারের জন্য জনসাধারণকে দাম দিতে হয়। কলিকাতায় সরকারী বাসে বা রেলগাড়ীতে

দুই প্রকারের রাজস্ব

ভ্রমণ করিলে টিকিট বাবদ পয়সা দিতে হয়, খাম পোষ্টকার্ড ক্রয় করিলে দাম দিতে হয়, ইত্যাদি। এই ধরনের রাজস্বকে কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব (non-tax revenue) বলে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে লোকে কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব দিতে বাধ্য নয়। যেমন, রেলভ্রমণ না করিলে টিকিটের জন্য অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় না।

ক। কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব

কিন্তু সরকারের রাজস্বের অধিকাংশ সংগৃহীত হয় জনসাধারণের পক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে দেয় অর্থ হইতে। এই বাধ্যতামূলকভাবে দেয় অর্থকে কর (tax) বলে। রেলে ভ্রমণ না করিলে লোকে টিকিট বাবদ পয়সা দিতে বাধ্য নয়, কিন্তু উচ্চ আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়-কর দিতেই হইবে। করের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহার বদলে কর-প্রদানকারী কোন বিশেষ সুবিধা দাবি করিতে পারে না। যে-ব্যক্তি রেল-গাড়ীতে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটে সে আরামে ভ্রমণের দাবি করিতে পারে, কিন্তু যে-ব্যক্তি বহু অর্থ আয়কর হিসাবে প্রদান করে সে দাবি করিতে পারে না যে তাহার গৃহের সম্মুখে ৪ জন পুলিস-পাহারা মোতায়েন করিয়া রাখা হউক। সুতরাং করের সহিত সুবিধার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই ; কর ধার্য করা হয় রাষ্ট্রের সাধারণ ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য। কর হইতে যে-রাজস্ব সংগৃহীত হয় তাহাকে কর-রাজস্ব (tax revenue) বলে।

কর কাহাকে বলে

খ। কর-রাজস্ব

করসংগ্রহের নীতি (Canons of Taxation) : রাষ্ট্রের সাধারণ কার্য সম্পাদনের জন্য সরকার বাধ্যতামূলকভাবে করসংগ্রহ করে। অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, এই সংগ্রহকার্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এ্যাডাম স্মিথই প্রথমে নিম্নলিখিত সাতটি নীতির প্রথম চারিটি ব্যাখ্যা করেন।

করসংগ্রহের প্রধান সাতটি নীতি

(ক) সমতার নীতি (Canon of Equality) : রাষ্ট্র ধনী-দরিদ্র সকলেরই পক্ষে প্রয়োজনীয় ; রাষ্ট্র না থাকিলে কাহারও জীবন বা সম্পত্তি নিরাপদ থাকিতে পারে না। সুতরাং সকলকেই রাষ্ট্রের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য করপ্রদান করিতে হইবে। কিন্তু সকলকে সমপরিমাণ কর দিতে বলা অন্যায়। যাহার আয় মাত্র ১ শত টাকা তাহার ১ হাজার টাকা আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির মত করপ্রদান করিবার ক্ষমতা থাকে না। অতএব, প্রত্যেকে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ীই করপ্রদান করিবে, রাষ্ট্রের পক্ষে এই নীতিই গ্রহণ করা সমীচীন। ইহাকে সমতার নীতি বলা হয়।

সমতার নীতি বলিতে কি বুঝায়

(খ) নিশ্চয়তার নীতি (Canon of Certainty) : ধার্য করের পরিমাণ, করপ্রদানের সময় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে করদাতার পূর্ব হইতেই সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। ইহা না থাকিলে লোকে আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে পারিবে না

এবং নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিবে। হয়ত যখন লোককে কর দিতে বলা হইবে তখন তাহার হাতে মোটেই টাকাকড়ি থাকিবে না; ফলে তাহাকে ঋণ করিতে হইবে। করধার্য ব্যাপারে এই নীতি নিশ্চয়তার নীতি নামে পরিচিত।

(গ) সুবিধার নীতি (Canon of Convenience): জনসাধারণের নিকট হইতে কর এমনভাবে আদায় করা উচিত যাহাতে তাহাদের বিশেষ অসুবিধা না হয়। সমগ্র প্রাপ্য একসংগে চুকাইয়া দিতে বলিলে, অথবা অসময়ে করপ্রদান করিতে বলিলে লোকের অসুবিধা হয়। এইজন্য বেতনভুক্ ব্যক্তিদের আয়কর মাহিনা হইতে মাসে মাসে কাটিয়া লওয়া হয়; কৃষকদের নিকট হইতে কিস্তিতে কিস্তিতে ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হয়। আবার কিস্তির যাহা বাকী থাকে তাহা ফসল তুলিবার পরই দাবি করা হয়। করধার্যের এই নীতি সুবিধার নীতি বলিয়া অভিহিত।

(ঘ) ব্যয়সংক্ষেপের নীতি (Canon of Economy): করসংগ্রহ করিতে বিপুল ব্যয় হইলে রাষ্ট্রের কোষাগারে সামান্য রাজস্বই জমা পড়ে। সুতরাং ব্যয়সংক্ষেপের নীতিও অনুসরণ করিতে হইবে। যে-কর আদায় করা ব্যয়বহুল তাহা বাদ দিতে হইবে এবং যত স্বল্প ব্যয়ে করসংগ্রহ করা যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

(ঙ) পরিবর্তনশীলতার নীতি (Canon of Elasticity): করধার্য এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনবোধে করের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি করা চলে। ইহা হইলে সরকারী কার্যসম্পাদন ব্যাহত হইবে না, জনসাধারণও অসুবিধা ভোগ করিবে না। উদাহরণ-স্বরূপ, আয়কর ও ভূমি-রাজস্বের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আয়কর পরিবর্তনশীল। অধিক রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়োজন হইলে আয়করের হার বর্ধিত করিলেই হইল। আবার যদি মনে হয় যে করভার হ্রাস করা প্রয়োজন তবে করের হার কমাইয়া দিলেই চলিবে। ভূমি-রাজস্ব কিন্তু সাধারণত নির্দিষ্ট। প্রয়োজনমত সরকার ইহার বৃদ্ধি করিতে পারে না; আবার অজন্মার বৎসরে ইহার হ্রাস করিয়া কৃষককে সুবিধাও দিতে পারে না। তবে একেবারে দুর্ভিক্ষের অবস্থা হইলে ভূমি-রাজস্ব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মকুফ করিতে পারে।

পরিবর্তনশীলতার গুরুত্ব

(চ) উৎপাদনশীলতার নীতি (Canon of Productivity): কর হইতে সরকারের যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থাগম হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে-কর হইতে আদায়ের পরিমাণ অতি সামান্য তাহা ধার্য না করাই যুক্তিযুক্ত। অন্যভাবে বলা যায়, প্রত্যেক করই যথাসম্ভব উৎপাদনশীল হইবে। যে কর-ব্যবস্থায় সামান্য সামান্য আয় হয় এরূপ কর থাকা অপেক্ষা দেশের কয়েকটি উৎপাদনশীল কর থাকাই বাঞ্ছনীয়। উৎপাদনশীলতার নীতি

এরূপভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যে দেশের উৎপাদনকার্য ব্যাহত হইয়া যেন মোট রাজস্ব প্রাপ্তিতে হ্রাস না ঘটায়।*

(ছ) সরলতার নীতি (Canon of Simplicity) : পরিশেষে, সরলতার নীতিও অনুসরণের চেষ্টা করিতে হইবে। যে-সকল কর ধার্য করা হইবে তাহাদের সম্পর্কে সকল বিষয় জনসাধারণ যেন সহজে বুঝিতে পারে।

উক্ত সাতটি নীতিকে উত্তম কর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বলিয়া অভিহিত করা হয়

করসংগ্রহের উপরি-উক্ত নীতিগুলিকে উত্তম কর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (characteristics of the good tax-system) বলিয়াও অভিহিত করা হয়। যে কর-ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটিই পরিলক্ষিত হয় তাহাকেই সর্বাপেক্ষা উত্তম কর-ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু সকল নীতি বা সকল বৈশিষ্ট্য কোন কর বা কোন কর-ব্যবস্থাতেই দেখা যায় না। সুতরাং যাহাতে অধিকাংশগুলি পরিদৃষ্ট হয় তাহাই যথাক্রমে উত্তম কর বা উত্তম কর-ব্যবস্থা।

বিভিন্ন প্রকারের কর (Types of Taxes) : কর প্রধানত দুই শ্রেণীর—(ক) প্রত্যক্ষ (direct), এবং (খ) পরোক্ষ (indirect)। যে-করের

কর প্রধানত দুই শ্রেণীর : প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

ভার অন্যের উপর সরানো যায় না তাহাকেই প্রত্যক্ষ কর বলে—যথা, আয়কর, ব্যয়কর, সম্পদকর, দানকর ইত্যাদি। যাহাদের উপর এগুলিকে ধার্য করা হয় তাহাদিগকেই উহার ভার বহন করিতে হয়। অপরদিকে, পরোক্ষ করের ভার অপরের নিকট স্থানান্তরিত করা যায়। যেমন, বিক্রয়কর বা উৎপাদন-শুল্ক (excise duties), সরকার বিক্রেতা বা উৎপাদনকারীর নিকট হইতে আদায় করে ; কিন্তু উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা উহা ক্রেতার উপর চাপাইয়া দেয়।

প্রত্যক্ষ করের সুবিধা-অসুবিধা : প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে ধনীদের নিকট

প্রত্যক্ষ করের সুবিধা :
১। ইহা ন্যায্য কর

হইতে বেশী এবং স্বল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে কম আদায় করা যায়। প্রয়োজন হইলে দরিদ্রকে করপ্রদান হইতে রেহাইও দেওয়া চলে। সুতরাং ইহা সমতার নীতির অনুকূল। যে-পদ্ধতিতে ইহা করা সম্ভব তাহাকে গতিশীলতার নীতি (principle of progression) বলা হয়। এ-সম্বন্ধে একটু পরেই আলোচনা করা হইতেছে।

২। ইহা নির্দিষ্ট

প্রত্যক্ষ করের নির্দিষ্টতা আছে। কত আয়কর প্রদান করিতে হইবে তাহা করপ্রদানকারী সুনিশ্চিতভাবে জানে বলিয়া তাহার জন্য ব্যবস্থা করিতে পারে।

৩। ইহা পরিবর্তনশীল

প্রয়োজনমত প্রত্যক্ষ কর হইতে আয় বৃদ্ধি করা যায়, আবার দরকারমত উহার ভারও হ্রাস করা যায়।

---

* উদাহরণস্বরূপ আয়করের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আয়করের হার অতিরিক্ত হইলে লোকের উপার্জনের ইচ্ছা হ্রাস পায় বলিয়া শেষ পর্যন্ত আয়কর হইতে প্রাপ্তির পরিমাণ কমিয়াই যায়।

প্রত্যক্ষ কর হইতে যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্বও সংগৃহীত হয়। অতএব উহা উৎপাদনশীল। প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ করিতে ব্যয়ও কম।

৪। ইহা উৎপাদনশীল

পরিশেষে, সচেতন নাগরিকতার দিক দিয়াও প্রত্যক্ষ কর সমর্থন করা হয়। লোকে জানিয়া-শুনিয়া করপ্রদান করে বলিয়া সরকার করলব্ধ অর্থ কিভাবে ব্যয় করিতেছে সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকে। ইহার ফলে জনকল্যাণ প্রসারলাভ করে।

৫। ইহা নাগরিকতার প্রসার করে

প্রত্যক্ষ করের কয়েকটি বিশেষ ত্রুটিও আছে। প্রথমতঃ, এই প্রকার কর সরাসরি দিতে হয় বলিয়া ইহা মোটেই জনপ্রিয় নয়। এই কারণে প্রত্যক্ষ করের হার অধিক হইলে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ, সমালোচনা প্রভৃতির পরিমাণ বাড়িতে থাকে।

অসুবিধা :
১। ইহা অপ্রিয়

প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেওয়াও সহজ। আয়ের মিথ্যা হিসাব দাখিল করিলে আয়কর হইতে অনেকাংশে রেহাই পাওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যক্ষ কর দেশে শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির প্রসার ঘটায়। দেশে পৌরচেতনা জাগ্রত না হইলে এবং শিক্ষার প্রসার না হইলে প্রত্যক্ষ কর পরিচালনা করা অনেকটা কঠিন হইয়া পড়ে। লোকে যদি বুঝিতে না পারে যে সরকার জনসাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের জন্যই করসংগ্রহ করিতেছে তবে তাহারা স্বয়ং অগ্রসর হইয়া হিসাব দাখিল করে না ; আবার অশিক্ষার জন্য কখন কিভাবে হিসাব দাখিল করিতে হইবে তাহাও বুঝিতে পারে না। ফলে সরকারকে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।*

২। ইহা ফাঁকি দেওয়া সহজ

প্রত্যক্ষ কর সকলের নিকট হইতে আদায় করা যায় না বলিয়া ইহাতে সকলের নাগরিক-চেতনার উন্মেষ ঘটে না। লোকে যখন নিজে করপ্রদান করে মাত্র তখনই সরকার কিভাবে অর্থ-ব্যয় করিতেছে সে-সম্বন্ধে সজাগ থাকে। সুতরাং প্রত্যক্ষ কর মাত্র আংশিক নাগরিক-চেতনা বৃদ্ধি করে।

৩। ইহা আংশিক নাগরিক-চেতনা বৃদ্ধি করে

পরোক্ষ করের সুবিধা-অসুবিধা : দ্রব্যাদির দামের মধ্যেই অনেক সময় পরোক্ষ কর ধরা থাকে বলিয়া লোকে যে করপ্রদান করিতেছে ইহা সব সময়ে বুঝিতে পারে না। যেমন, দর্শক যখন সিনেমার বা খেলার মাঠের টিকিট কাটে তখন টিকিটের সম্পূর্ণ দামকেই দর্শনী বলিয়া ধরিয়া লয়। অনুরূপভাবে, লোকে ৬ বা ৭ নয়া পয়সার একটি দিয়াশলাই ক্রয় করিবার সময় ইহার মধ্যে যে উৎপাদন-শুল্ক

সুবিধা :
১। ইহা জনপ্রিয়

* দোকানদার ও উৎপাদনকারীও অনেক সময় সঠিক হিসাব দাখিল করে না। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা সাধারণ ব্যক্তির সংখ্যা অপেক্ষা স্বল্প ; ফলে ইহাদের নিকট হইতে প্রাপ্য কর আদায় করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

ধরা আছে সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। ফলে পরোক্ষ করের বিরুদ্ধে অসন্তোষ কম হয়।

প্রত্যক্ষ করের মত পরোক্ষ করও বেশ রাজস্ব সংগ্রহে সহায়তা করে। চিনি, দিয়াশলাই, সুপারি, কেরোসিন তৈল, তামাক প্রভৃতির উপর ধার্য পরোক্ষ করই বর্তমানে ভারত সরকারের রাজস্বের সর্বপ্রধান উৎস। রাজ্যসমূহের বেলাতেও দেখা যায় যে বিক্রয়কর হইতে বহু পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়।

২। ইহাও উৎপাদনশীল

পরোক্ষ কর সকলকেই স্পর্শ করে। সুতরাং রাষ্ট্রকার্য পরিচালনার জন্য ধনী-দরিদ্র সকলেই অর্থপ্রদান করিবে এই নীতি পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। উচ্চ হারে পরোক্ষ কর ধার্য করিয়া অনিষ্টকারক দ্রব্যাদির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা যায়। আমাদের দেশে এই উদ্দেশ্যে মদ্য গঞ্জিকা অহিফেন প্রভৃতির উপর উৎপাদন-শুল্ক ধার্য করা হয়।

৩। ইহা সকলকেই স্পর্শ করে

কিন্তু পরোক্ষ কর ন্যায্য কর নহে। ইহার ভার ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের উপরই অধিক পড়ে। এক টাকার জিনিস ক্রয় করিলে ৫ নয়া পয়সা বিক্রয়কর দিতে হইবে।* একজন ধনীর পক্ষে ৫ নয়া পয়সা কিছুই নয়, কিন্তু একজন দরিদ্র ব্যক্তি উহাতে কষ্টবোধ করিতে পারে।

অসুবিধা :
১। ইহা ন্যায্য কর নহে

দ্বিতীয়ত, অজ্ঞতা যদি কাম্য বলিয়া বিবেচিত না হয় তবে পরোক্ষ করকে সমর্থন করা যাইতে পারে না। পরোক্ষ করপ্রদানকারী করপ্রদান সম্বন্ধে সচেতন থাকে না বলিয়া তাহার পৌর-চেতনার উন্মেষ হয় না।

২। ইহার দ্বারা পৌরচেতনার উন্মেষ ঘটে না

অনেক সময় পরোক্ষ করও সংগ্রহ করিতে সরকারের বিশেষ অসুবিধা ও বহু ব্যয় হয়। আমাদের দেশে লোকে আয়কর বহু পরিমাণে ফাঁকি দেয় সত্য, কিন্তু বিক্রয়কর বড় কম ফাঁকি দেয় না।

৩। সংগ্রহ ব্যাপারেও ত্রুটি দেখা যায়

সমানুপাতিক ও গতিশীল কর (Proportional and Progressive Taxes) : করসংগ্রহের অন্যতম নীতি হিসাবে এ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছেন যে প্রত্যেককে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ীই করপ্রদান করিতে হইবে—অর্থাৎ, কর-নির্ধারণ সমতার নীতির (principle of equality) অনুকূল বা ন্যায্য হইবে। এখন প্রশ্ন হইল, কিভাবে এই সমতার নীতি অনুসরণ করা যায়? এ্যাডাম স্মিথের মতে, সমানুপাতিক হারে কর ধার্য করিলেই ইহা সম্ভব। যাহার ১০০ টাকা আয় সে যদি ১০ টাকা আয়কর প্রদান করে, তাহা

প্রাচীন লেখকগণ মনে করিতেন, সমানুপাতিক হারে কর-নির্ধারণ করিলেই সমতার নীতি পালিত হয়

* পশ্চিমবংগে অধিকাংশ দ্রব্যের উপর টাকা প্রতি ৫ ন. প. এবং কয়েকটি বিলাস-দ্রব্যের উপর ৭ ন. প. করিয়া বিক্রয়কর দিতে হয়।

হইলে যাহার ১০০০ টাকা আয় তাহার নিকট হইতে ১০০ টাকা কর আদায় করিলেই ন্যায্য ব্যবস্থা করা হইবে।

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ বলেন ইহার জন্য করকে গতিশীল করা প্রয়োজন

কিন্তু সমানুপাতিক হারে কর-নির্ধারণ করিলেই যে সমতার নীতি পালিত হয় আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ তাহা স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতে, লোকের আয়বৃদ্ধির ফলে করপ্রদানের ক্ষমতা সমানুপাতিক হার অপেক্ষাও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, যাহার আয় ১০০ টাকা সে যদি আয়ের শতকরা ১০ ভাগ করপ্রদান করে, যাহার আয় ১০০০ টাকা তাহাকে শতকরা ১০ ভাগের অধিক হারেই কর দিতে হইবে। এইরূপ করকে গতিশীল কর (progressive tax) বলা হয়। এই গতিশীল করই ধনী-দরিদ্রের মধ্যে 'ত্যাগের সমতা' (equality of sacrifice) প্রতিষ্ঠা করে; 'সমতার নীতি' বলিতে এই ত্যাগের সমতাই বুঝায়।

গতিশীল কর দ্বারাই ত্যাগের সমতা প্রতিষ্ঠা করা যায়

গতিশীল হারে করধার্য বর্তমানে সকল সভ্য দেশেই কর-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত হয়। ইহার দ্বারা ত্যাগের সমতা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও আর্থিক বৈষম্য হ্রাস করা হয়। আমাদের দেশে প্রবর্তিত আয়কর সম্পদকর দানকর ব্যয়কর সম্পত্তিকর প্রভৃতি সকল করই গতিশীল। পরোক্ষ করকে গতিশীল করা কঠিন। সিনেমা বা খেলার মাঠে উচ্চ শ্রেণীর টিকিটের উপর অধিক হারে প্রমোদকর ধার্য করা যায়; কিন্তু সুপারি, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি সাধারণ ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর একই হারে কর বসানো ছাড়া গত্যন্তর নাই।

ভারতের গতিশীল কর-ব্যবস্থা

সরকারী ব্যয় (Public Expenditure): বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, দেশের অভ্যন্তরে শান্তিশৃংখলা রক্ষা, শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসংরক্ষণ, শিল্পোন্নয়ন, পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থার পরিচালনা প্রভৃতি নানা কার্যে সরকারকে অর্থব্যয় করিতে হয়। নানাভাবে এই সকল ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে—যথা, ক্ষেত্র অনুসারে, সুবিধার প্রকৃতি অনুসারে, উদ্দেশ্য অনুসারে, ইত্যাদি।

তিন প্রকারের সরকারী ব্যয়:

(ক) ক্ষেত্র অনুসারে শ্রেণীবিভাগ বলিতে বুঝায় কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় সরকারসমূহের পৃথক পৃথক ব্যয়। আমাদের দেশে ভারত সরকার দেশরক্ষার জন্য ব্যয় করে, রাজ্য সরকার পুলিস জেল ও শিক্ষার জন্য ব্যয় করে, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি রাস্তাঘাট উন্নতির জন্য ব্যয় করে, ইত্যাদি।

১। ক্ষেত্র অনুসারে

(খ) সুবিধার প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিভাগ বলিতে বুঝায় কে কে বা কাহারা সুবিধা (benefit) ভোগ করিতেছে তাহা দেখা। কতকগুলি ব্যয়

সকলের সুবিধার জন্যই করা হয়—যেমন, দেশরক্ষার জন্য ব্যয়, শিক্ষার জন্য ব্যয়, ইত্যাদি। আবার কতকগুলি ব্যয় বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকের জন্যই করা হয়। যেমন, পেনসন্; ইহা মাত্র অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরাই পাইতে পারে, সকলে নহে।

২। সুবিধার প্রকৃতি অনুসারে

(গ) উদ্দেশ্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগে দেখা হয় যে ঐ বিশেষ ব্যয় উৎপাদনশীল না অনুৎপাদনশীল। রেলপথ, জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদির জন্য ব্যয় যে উৎপাদনশীল ইহা সহজেই অনুমেয়। এগুলিতে ব্যয় করিলে ভবিষ্যতে সরকারের আয় বাড়িবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য ব্যয়কেও উৎপাদনশীল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কারণ, এগুলির জন্য ভবিষ্যতে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। তবে ইহারা পরোক্ষভাবে উৎপাদনশীল মাত্র, প্রত্যক্ষভাবে নহে। ইহাদের জন্য ব্যয় করিলে সরাসরি সরকারের আয়বৃদ্ধি ঘটে না।

৩। উদ্দেশ্য অনুসারে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ব্যয়

যুদ্ধ, সৈন্যবাহিনী পোষণ প্রভৃতির জন্য ব্যয়কে সাধারণত অনুৎপাদনশীল বলিয়া ধরা হয়। তবে দেশরক্ষার জন্য ব্যয় অপরিহার্য বলিয়া ইহার একাংশকে উৎপাদনশীল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

দেখা যাইতেছে, উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের মধ্যে সীমারেখা অতি অস্পষ্ট। বর্তমানে সমাজ-কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত সরকারের প্রায় সকল ব্যয়কেই উৎপাদনশীল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু অতিমাত্রায় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ প্রভৃতির জন্য যে-ব্যয় তাহাকে অনুৎপাদনশীল ব্যয় বলিয়া গণ্য না করিয়া উপায় নাই। কারণ, ইহাতে সমাজের ক্ষতিই হয়।

উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের মধ্যে সীমারেখা অতি অস্পষ্ট

এ্যাডাম স্মিথের ন্যায় প্রাচীন লেখকগণ সরকারী ব্যয় লইয়া আলোচনা করেন নাই, কারণ তাঁহারা ইহা সুনজরে দেখিতেন না। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে সরকার যত কম ব্যয় করে ততই ভাল। এই ধারণা সরকারের কার্যাবলী সম্বন্ধে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের ফল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে সরকারের কার্যাবলী হইল ন্যূনতম। সুতরাং সরকারের ব্যয়ও হইবে ন্যূনতম।

পূর্বে সরকারী ব্যয় লইয়া আলোচনা করা হইত না

বর্তমানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিন শেষ হইয়াছে বলিয়া সরকারী ব্যয় সম্বন্ধে উক্ত ধারণা আর পোষণ করা হয় না। বর্তমানের ধারণা হইল যে সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া চলিতে হইবে। শুধু দেশরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষা নয়—শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন, বেকার-সমস্যার সমাধান, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যোন্নয়ন, গ্রামোন্নয়ন, পরিবহণের সুব্যবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়ের জন্যই সরকারকে প্রয়োজনমত ব্যয় করিতে হইবে।

কিন্তু বর্তমানে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়

সরকারী ঋণ (Public Debt) : প্রয়োজনমত ব্যয় করিবার জন্য অনেক সময়ই সরকারকে ঋণ করিতে হয়। এই ঋণকে সরকারী ঋণ বা সাধারণের ঋণ (Public Debt) বলা হয়। দেখা যায় যে সরকার সাধারণত তিন প্রকার ব্যয়ের জন্য ঋণ করে : (ক) বাজেটের সাধারণ ঘাটতি মিটাইবার জন্য ব্যয়, (খ) যুদ্ধ ইত্যাদির জন্য জরুরী ব্যয়, এবং (গ) উৎপাদনশীল বা উন্নয়নমূলক ব্যয়।

সরকারী ঋণের কারণ

(ক) বাজেটের সাধারণ ঘাটতি মিটাইবার জন্য ঋণ : আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ কিছু অধিক হইলেই কর-পদ্ধতির পরিবর্তনসাধন করা উচিত নহে। দেখিতে হইবে যে এই ব্যয়াধিক্য অনিশ্চিত (casual) না নিয়মিত ধরনের। অনিশ্চিত ধরনের ব্যয়াধিক্য মিটাইবার জন্য ঋণগ্রহণ করাই যুক্তিসংগত ; কিন্তু ঘাটতি যদি নিয়মিত হইতে থাকে তবে করের মাধ্যমে অধিক রাজস্ব সংগ্রহের চেষ্টাই করিতে হইবে।

(খ) যুদ্ধ ব্যাপারে জরুরী ব্যয়ের জন্য ঋণ : অনেক দেশেই সরকারী ঋণের এক মোটা অংশ যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহের জন্য গৃহীত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে এইপ্রকার ঋণের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ড অন্যতম প্রধান উত্তমর্ণ দেশ (creditor country) ছিল ; যুদ্ধের ফলে উহা অধমর্ণ দেশ (debtor country) হইয়া পড়ে। ভারতের সরকারী ঋণের একাংশ যুদ্ধের জন্য গৃহীত।

(গ) উন্নয়নমূলক ব্যয়ের জন্য ঋণ : ব্রিটিশ আমলে ভারতে রেলপথ নির্মাণ, জলসেচ-ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতির জন্য বহু ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল। বর্তমানেও পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদনের জন্য সরকার নিয়মিত ঋণ গ্রহণ করিতেছে।

সরকারী ঋণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Public Debt) : নানাভাবে সরকারী ঋণের শ্রেণীবিভাগ করা চলে। তন্মধ্যে একটি শ্রেণীবিভাগ হইল বহিঃসূত্র হইতে প্রাপ্ত (external) এবং আভ্যন্তরীণ (internal) ঋণের মধ্যে। সরকার যখন দেশের বাহির হইতে ঋণ সংগ্রহ করে তখন উহাকে বহিঃসূত্র হইতে প্রাপ্ত ঋণ বলা হয় ; এবং দেশের লোকের নিকট হইতে ঋণ লইলে উহাকে আভ্যন্তরীণ ঋণ বলে।

১। বহিঃসূত্র হইতে প্রাপ্ত ও আভ্যন্তরীণ ঋণ

দ্বিতীয়ত, সরকারী ঋণ স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন হইতে পারে। অতি স্বল্পকালীন ঋণ—যেমন, ৩ অথবা ৬ মাসের জন্য ঋণ সরকার সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে গ্রহণ করে, এবং দীর্ঘকালীন হইলে উহা জনসাধারণের নিকট হইতে সংগ্রহ করে।

২। স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ঋণ

সরকারী ঋণ আবার উৎপাদনশীল (productive) এবং অনুৎপাদনশীল (unproductive) উভয় প্রকারেরই হয়। উৎপাদনশীল ঋণ রেলপথ, বিমান,

শিল্পোন্নয়ন প্রভৃতি লাভজনক কার্যে নিয়োগ করা হয়, এবং অনুৎপাদনশীল ঋণ বাস্তুহারাদের সাহায্যদান, দুর্ভিক্ষত্রাণ ইত্যাদির জন্য ব্যয় করা হয়। ঋণ উৎপাদনশীল হইলে ঋণ দ্বারা সৃষ্ট সম্পত্তির (assets) আয় হইতে ঐ সুদ ও ধীরে ধীরে আসল মিটানো চলে; কিন্তু ঋণ অনুৎপাদনশীল হইলে অন্যান্য সূত্রে সংগৃহীত রাজস্ব সুদ বাবদ ব্যয় করিতে হয়।

৩। উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ঋণ

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সরকারী ঋণ যুক্তিযুক্ত (When Public Debt is Justified): দেখা গিয়াছে, মোটামুটি তিন প্রকার কারণে সরকার ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে—যথা, বাজেটের ঘাটতি মিটাইবার জন্য, যুদ্ধ ইত্যাদির দরুন জরুরী ব্যয়নির্বাহের জন্য এবং উন্নয়নকার্যের জন্য। এখন প্রশ্ন হইল, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সরকারী ঋণ সমর্থনযোগ্য?

প্রথমত, জরুরী অবস্থায় সরকারী ঋণ যে যুক্তিসংগত, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। করের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার বলিয়া জরুরী প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বেশ কিছুটা ঋণসংগ্রহ করিতেই হয়।

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের ন্যায় জরুরী অবস্থায় প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পরিমাণ এত অধিক হইতে পারে যে শুধু করের উপর নির্ভর করিলে চলে না। এই অবস্থাতেও সরকারী ঋণ সম্পূর্ণ অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হয়।

তৃতীয়ত, ঋণ উৎপাদনশীল হইলে উহাকে যুক্তিসংগত বলিয়া মনে করা হয়।

চতুর্থত, রাস্তাঘাট নির্মাণ, হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতে সুরু করিয়া সর্বাংগীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণগ্রহণ বিশেষভাবে সমর্থিত হয়।

পরিশেষে, মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাইবার জন্য, বেকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ইত্যাদির জন্য সরকারী ঋণকে সমর্থনযোগ্য বলিয়া ধরা হয়।

বিপরীত দিকে কিন্তু বাজেটের সাধারণ ঘাটতি মিটাইবার জন্য ঋণ অযৌক্তিক বলিয়াই বিবেচিত হয়।

উন্নয়নকার্যের জন্য অর্থসংস্থান (Financing of Development): সামান্য ঋণসংগ্রহ করিয়া অথবা রাজস্ব হইতেই ব্যবস্থা করিয়া সাধারণ উন্নয়নমূলক কার্যের ব্যয়নির্বাহ করা চলে। কিন্তু ভারতের ন্যায় বিশাল উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকর করিবার জন্য অর্থসংস্থানের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে অতিরিক্ত করস্থাপন, অধিক ঋণসংগ্রহ—বিশেষ করিয়া স্বল্প সঞ্চয়সংগ্রহ—রেলপথ ইত্যাদির ন্যায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হইতে মুনাফার প্রচেষ্টা, বিদেশে অর্থসংগ্রহ এবং ঘাটতি ব্যয়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য কিভাবে অর্থসংগ্রহ করা হয়

অতিরিক্ত করস্থাপনের দ্বারা অর্থসংগ্রহ প্রধানত দেশের জনসাধারণের করপ্রদানক্ষমতার (taxable capacity) উপর নির্ভরশীল। জনসাধারণ যদি ইতিমধ্যেই করপ্রদানক্ষমতার সীমায় গিয়া পৌছিয়া থাকে তবে অতিরিক্ত করস্থাপন করিলে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হইয়া মোট কর-রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পাইবে।

১। অতিরিক্ত করধার্য ও ইহার সীমা

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলা চলে। মুনাফা যদি ইতিমধ্যেই উচ্চমাত্রায় গিয়া পৌছিয়া থাকে তবে আয়বৃদ্ধির আশা করা ভুল। উদাহরণস্বরূপ, বাসের বা রেলপথের মাশুল বা পণ্য-পরিবহণের ভাড়া সীমা ছাড়াইয়া বৃদ্ধি করিলে লোকে রেলে বা বাসে ভ্রমণ কমাইতে বাধ্য হইবে। ফলে ইহাদের মোট আয় কমিতেই থাকিবে। অবশ্য ভাড়া বা মূল্য বাড়াইয়া আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করা গেলেও সুপরিচালনার মাধ্যমে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া মুনাফা কতকটা বাড়ানো যায়। অনুরূপভাবে কর-প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

২। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আয়বৃদ্ধি ও ইহার সীমা

ঋণসংগ্রহ দুইটি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়—(ক) জনসাধারণের মোট সঞ্চয়, এবং (খ) এই সঞ্চয়সংগ্রহ করিবার জন্য সংগঠন (machinery for collection of savings)। দেশের লোকের সঞ্চয় যদি অত্যল্প হয় তাহা হইলে ঋণের মাধ্যমে বিশেষ কিছু সংগ্রহ করা যায় না। আবার সংগ্রহের জন্য সংগঠন যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহা হইলেও চলিবে না। সুতরাং সরকারের কার্য হইবে সকলকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থার সাহায্যে এই সঞ্চয় সংগ্রহ করা। স্বল্পোন্নত দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র বলিয়া স্বল্প সঞ্চয়-সংগ্রহের প্রতি সরকারকে অধিক মনোযোগ দিতে হইবে।

৩। ঋণসংগ্রহ—ইহা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল

কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঋণসংগ্রহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট বিবেচিত হয় না। সুতরাং বিদেশেও অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হয়। বৈদেশিক সরকার, বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণসংগ্রহ এবং বৈদেশিকগণকে সংশ্লিষ্ট দেশে বিনিয়োগ করিতে উৎসাহিত করিয়াই এই অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। বিদেশ হইতে অর্থসংগ্রহের আর একটি প্রয়োজন হইল যন্ত্রপাতি, কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি প্রাপ্তির সুবিধালাভ। দেশে ঋণসংগ্রহ করা সম্ভব হইলেও সকল সময় ইহার দ্বারা বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আনয়ন করা যায় না। কিন্তু বিদেশে সংগৃহীত অর্থকে সরাসরি মূলধন-দ্রব্যে (capital goods) রূপান্তরিত করিয়া আমদানি করা চলে।

৪। বৈদেশিক মূলধন—ইহার প্রয়োজনীয়তা

অবশেষে, ভারতের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ন্যায় বিরাট উন্নয়নকার্যের জন্য সরকারকে কিছু কিছু ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

৮। ঘাটতি ব্যয়

ঘাটতি ব্যয় (Deficit Financing): সাধারণত কর-রাজস্ব, রেলপথের ন্যায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের লাভ প্রভৃতি হইতে সরকারের যে চলতি আয় হয় তাহার অধিক ব্যয় করা হইলে সেই ব্যয়কে 'ঘাটতি ব্যয়' বলা হয়। সরকার ঋণ করিয়া বা জমা অর্থ তুলিয়া বা নোট ছাপাইয়া ঐ ব্যয় সংকুলানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ঘাটতি ব্যয়ের যে-সংজ্ঞা দিয়াছে তাহা একটু অন্য ধরনের। ইহাতে জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থকে ঘাটতি ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয় নাই। অর্থাৎ, কর-রাজস্ব, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের মুনাফা এবং জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত বিভিন্ন প্রকারের ঋণ—এই তিন সূত্রে প্রাপ্ত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় করা হইলেই তাহা ঘাটতি ব্যয় বলিয়া গণ্য। সুতরাং এই ব্যয় সংকুলানের পদ্ধতি হইল দুইটি: (১) সরকারী সঞ্চয় হইতে অর্থ তোলা, এবং (২) রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা। সরকারী সঞ্চয় হইতে অর্থ তুলিয়া ব্যয় করিলে ঐ টাকা ক্রিয়াশীল (active) হইয়া উঠে;* এবং রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে রিজার্ভ ব্যাংক উহা নোট ছাপাইয়া প্রদান করে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই একরূপ 'নব-সৃষ্ট' টাকাকড়ি বাজারে বিনিময়ের কার্য করিতে থাকে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে, কারণ টাকাকড়ি বৃদ্ধি পাইলেও সংগে সংগে জিনিসপত্রের যোগান বৃদ্ধি পায় না।

ঘাটতি ব্যয় কাহাকে বলে

ভারতের ঘাটতি ব্যয়

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থসংগ্রহ (Financing of India's Five Year Plans): আমাদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিভাবে অর্থসংস্থান করা হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে তাহার ব্যাখ্যা পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকটির মাধ্যমে করা হইল। ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে ঘাটতি ব্যয় ছাড়া অন্যান্য সূত্র হইতে অর্থসংস্থানের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১২০০ কোটি টাকার মত ঘাটতি ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঘাটতি ব্যয় হয় মাত্র ৯৪৮ কোটি টাকা। পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকটিতে ইহাও দেখা যাইবে যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয় ইহার প্রায় অর্ধেক বা ৫৫০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

---

* সরকারের টাকা যতক্ষণ জমা অবস্থায় ছিল ততক্ষণ উহার কোন কার্য (বিনিময় সম্পাদনের কার্য) ছিল না; সুতরাং টাকাকড়ির মোট যোগানের পরিমাণও কম ছিল; এখন জমা হইতে তুলিয়া খরচের ফলে ঐ টাকা বিনিময়কার্যে নিযুক্ত হওয়ায় উহা 'ক্রিয়াশীল' হইল; এবং ফলে টাকাকড়ির যোগানও বাড়িল।

আরও উল্লেখযোগ্য যে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থসংস্থানের যে-হিসাব দেওয়া হইল তাহা হইল চূড়ান্ত হিসাব।

(হিসাব কোটি টাকায়)

অর্থসংস্থানের বিভিন্ন সূত্র	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা (পরিবর্তিত)	তৃতীয় পরিকল্পনা
১। কর-রাজস্ব এবং রেলপথ ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত	৭৫২	১১৫২	২৮১০
২। বিভিন্ন-সূত্রে সঞ্চয়সংগ্রহ	৫০৯	১৪১০	১৯৪০
৩। বৈদেশিক সাহায্য	১৮৮	১০৯০	২২০০
৪। ঘাটতি ব্যয়	৪২০	৯৪৮	৫৫০
৫। বিবিধ সূত্র	৯১	—	—
মোট	১৯৬০	৪৬০০	৭৫০০

সংক্ষিপ্তসার

সরকারী আয়-ব্যয়কে জনসাধারণের আয়-ব্যয়ও বলা হয়। ইহার প্রধান শাখা চারিটি—(ক) সরকারী আয়, (খ) সরকারী ব্যয়, (গ) সরকারী ঋণ, এবং (ঘ) উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য অর্থসংস্থান।

সরকারী আয়-ব্যয়ের পদ্ধতি প্রধানত তিনটি—(ক) পূর্ব-নির্দিষ্ট আয়ের পদ্ধতি, (খ) পূর্ব-নির্দিষ্ট ব্যয়ের পদ্ধতি, এবং (গ) বাণিজ্যিক পদ্ধতি।

সরকারের আয় বা রাজস্ব : সরকারী রাজস্ব দুই প্রকারের—(ক) কর-রাজস্ব, এবং (খ) কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব। কর হইতে সংগৃহীত রাজস্বকে কর-রাজস্ব এবং সেবামূলক কার্যাদি হইতে সংগৃহীত রাজস্বকে কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব বলে।

কর-সংগ্রহের নীতি : সরকার করসংগ্রহ কায কয়েকটি নীতি অনুসারে সম্পাদন করে। ইহাদের মধ্যে ১। সমতার নীতি, ২। নিশ্চয়তার নীতি, ৩। সুবিধার নীতি, ৪। ব্যয়সংক্ষেপের নীতি, ৫। পরিবর্তনশীলতার নীতি, ৬। উৎপাদনশীলতার নীতি, এবং ৭। সরলতার নীতি—এই সাতটিই প্রধান। এই নীতিগুলিকে উত্তম কর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বলিয়াও অভিহিত করা যায়। যে কর-ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকাংশ পরিদৃষ্ট হয় তাহাকেই উত্তম কর-ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

বিভিন্ন প্রকারের কর : কর প্রধানত দুই শ্রেণীর—(ক) প্রত্যক্ষ কর, এবং (খ) পরোক্ষ কর। যে করের ভার অন্যের উপর সরানো যায় না তাহাকে প্রত্যক্ষ কর এবং যে করের ভার অন্যের উপর সরানো যায় তাহাকে পরোক্ষ কর বলে। আয়কর, ব্যয়কর, দানকর, সম্পদকর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করের এবং বিক্রয়কর, উৎপাদন-শুল্ক প্রভৃতি পরোক্ষ করের উদাহরণ।

প্রত্যক্ষ করের নিম্নলিখিত কয়েকটি সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায় : ১। ইহা ন্যায্য কর, ২। ইহা নির্দিষ্ট, ৩। ইহা পরিবর্তনশীল, ৪। ইহা উৎপাদনশীল, ৫। ইহা নাগরিকতার প্রসার করে। ইহার অসুবিধাগুলি হইল যে, ১। ইহা অপ্রিয়, ২। ইহাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ, ৩। ইহা আংশিক নাগরিক-চেতনা বৃদ্ধি করে।

পরোক্ষ করের সুবিধা-অসুবিধা ঠিক ইহার বিপরীত। সুবিধা হইল যে—১। ইহা জনপ্রিয়, ২। ইহাও উৎপাদনশীল, ৩। ইহা সকলকেই স্পর্শ করে। কিন্তু ১। ইহা ন্যায্য কর নহে, ২। ইহার দ্বারা পৌরচেতনার উন্মেষ ঘটে না, ৩। করসংগ্রহের ব্যাপারেও ত্রুটি দেখা যায়।

সমানুপাতিক ও গতিশীল কর: প্রাচীন লেখকগণ মনে করিতেন যে, সমানুপাতিক হারে কর ধার্য করিলেই সমতার নীতি পালিত হয়। আধুনিক অর্থবিজ্ঞাবিদগণ কিন্তু বলেন যে ইহার জন্য গতিশীল হারে কর ধার্য করা প্রয়োজন। গতিশীল কর বলিতে বুঝায় ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য করা। গতিশীল করধার্য বর্তমানে প্রায় সকল সভ্য দেশেই নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। ভারতও ইহার ব্যতিক্রম নহে।

সরকারী ব্যয়: সরকারী ব্যয়ের তিনপ্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়—(ক) ক্ষেত্র অনুসারে, (খ) সুবিধার প্রকৃতি অনুসারে, এবং (গ) উদ্দেশ্য অনুসারে। ক্ষেত্র অনুসারে ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ বলিতে বুঝায় কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার প্রভৃতির ব্যয়। সুবিধার প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, ব্যয় জনসাধারণের সুবিধা বা কোন বিশেষ শ্রেণীর সুবিধার জন্য করা হয়। উদ্দেশ্য অনুসারে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। অবশ্য উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ব্যয়ের মধ্যে সীমারেখা অতি অস্পষ্ট।

আধুনিক কর্মমুখর রাষ্ট্রে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

সরকারী ঋণ: সরকার মোটামুটি তিনটি কারণে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে: (ক) বাজেটের সাধারণ ঘাটতি মিটাইবার জন্য, (খ) যুদ্ধ ইত্যাদি জরুরী ব্যয়ের জন্য, এবং (গ) উন্নয়নমূলক ব্যয়ের জন্য। এই ঋণের আবার তিনপ্রকার শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে—(ক) বহিঃসূত্র হইতে প্রাপ্ত ও আভ্যন্তরীণ ঋণ (খ) স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ঋণ, এবং (গ) উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ঋণ।

উন্নয়নকার্যের জন্য অর্থসংস্থান: উন্নয়নকার্যের জন্য সরকার নানাভাবে অর্থসংগ্রহ করে—যথা, ১। অতিরিক্ত করধার্য, ২। সেবা ও দ্রব্য সরবরাহকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফাবৃদ্ধির প্রচেষ্টা, ৩। ঋণসংগ্রহ, ৪। বৈদেশিক মূলধনসংগ্রহ, এবং ৫। ঘাটতি ব্যয়।

এই কয়টি সূত্র হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ কার্যকর করা হইতেছে।

প্রশ্নোত্তর

1. "The revenue of the Government may be divided into two parts, namely, Tax revenue and Non-Tax revenue." Illustrate this proposition.

"সরকারের রাজস্বকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—কর-রাজস্ব ও কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব।" উক্তিটির ব্যাখ্যা কর। [২১২-২১৩ পৃষ্ঠা]

2. Define a Tax. Explain the characteristics of a good Tax. (C. U. 1951)

করের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। উত্তম করের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। [২১৩ এবং ২১৩-২১৫ পৃষ্ঠা]

3. Distinguish between a Direct and an Indirect Tax. Discuss the merits and demerits of Direct and Indirect Taxes. (En. 1962 ; P. U. 1963)

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। উহাদের গুণাগুণ আলোচনা কর। [২১৫-২১৭ পৃষ্ঠা]

4. Distinguish between a Direct Tax and an Indirect Tax. Discuss the arguments in favour of direct taxation. (En. 1964)

প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। প্রত্যক্ষ করের সপক্ষে যুক্তিযুক্ত আলোচনা কর। [২১৫-২১৬ পৃষ্ঠা]

5. Distinguish between a Progressive and a Proportional Tax. Why is the principle of progression preferred to that of proportion in the Tax-system of a modern community?

গতিশীল কর ও সমানুপাতিক করের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। বর্তমান সময়ের কর-ব্যবস্থায় সমানুপাতের নীতি অপেক্ষা গতিশীলতার নীতিকে সমর্থন করা হয় কেন? [২১৩ এবং ২১৭-২১৮ পৃষ্ঠা]

6. What is Progressive Taxation, and what are its merits? Give two examples of progressive taxes. **(C. U. 1959)**

গতিশীল হারে কর ধার্য বলিতে কি বুঝায়? ইহার গুণ কি কি? দুইটি গতিশীল করের উদাহরণ দাও।

[ইংগিত: ভারতের আয়কর, সম্পদকর, সম্পত্তিকর প্রভৃতি এই করের উদাহরণ এবং............... ২১৩ ২১৭-২১৮ পৃষ্ঠা]

7. What is Public Debt? When is borrowing on the part of the Government justified?

সরকারী ঋণ কাহাকে বলে? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ সমর্থিত হইতে পারে?

[২২০ এবং ২২১ পৃষ্ঠা]

8. Show how a Government finances Development Programmes. Illustrate your answer with reference to India.

কিভাবে সরকার উন্নয়নকার্যের জন্য অর্থসংস্থান করে তাহা দেখাও; ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা হইতে দৃষ্টান্ত লইয়া বিষয়টিকে বুঝাইয়া দাও। [২২১-২২৪ পৃষ্ঠা]

ভারতের
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

প্রথম অধ্যায়

অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা

(Role of the Government in Economic Development)

সুন্দর জীবন সম্ভব করিবার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। বহু শতাব্দী পূর্বে গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটল এই উক্তি করিয়াছিলেন। উক্তিটির তাৎপর্য হইল যে রাষ্ট্রশক্তি বা সরকার সর্বসাধারণের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত থাকিবে এবং ইহাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোটামুটি-ভাবে সকলে একমত। কিন্তু কোন্ কোন্ কার্য সম্পাদন করিয়া রাষ্ট্র এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে সে-সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

উনবিংশ শতাব্দীর ধারণা ছিল যে সরকারের কার্য হইবে ন্যূনতম এবং ফলে ব্যক্তির থাকিবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা। অর্থাৎ, সরকার যদি মাত্র প্রতিরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকিয়া অন্যান্য বিষয়ের ভার ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়া দেয় তবেই সুন্দর জীবন গঠন করা সম্ভবপর হইতে পারে—এই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ধারণা। এই মতবাদকে বলা হয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং উনবিংশ শতাব্দীকে আখ্যা দেওয়া হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যুগ বলিয়া।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যুগ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পর এই বর্তমান যুগ সুরু হয়। ইহাকে সংক্ষেপে সমষ্টিবাদের যুগ (Age of Collectivism) বলা যায়। সমষ্টিবাদ অনুসারে সরকারের কার্যাবলীর কোন সীমারেখা নাই। জনকল্যাণের প্রয়োজনে সরকারকে সমাজের সকল কাজকর্মকেই নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, সকল কাজকর্মই সম্পাদন করিতে হইবে। এই সকল কাজকর্মের মধ্যে আবার অর্থনৈতিক কাজকর্মই প্রধান। অর্থনৈতিক কাজ-কর্মের নিয়ন্ত্রণ ও সম্পাদন দ্বারা সরকারকে সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণসাধন করিতে হইবে।

বর্তমান সমষ্টিবাদের যুগ

সমষ্টিবাদ আবার দুই প্রকারের হয়—পূর্ণ ও আংশিক। পূর্ণ সমষ্টিবাদকে সমাজতন্ত্রবাদ বলা হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিতে কিছু থাকে না—সকল অর্থনৈতিক কাজকর্মই সরকারী নির্দেশে ও সরকারী পরিচালনায় সম্পাদিত হয়। আংশিক সমষ্টিবাদের অধীনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কিছু কিছু অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই আংশিক সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রগুলিকে সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র (Social Welfare States) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মোটকথা, রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক হউক

দুই প্রকারের সমষ্টিবাদ

আর সমাজকল্যাণকরই হউক, সক্রিয়ভাবে উহা সমাজের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত থাকে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এইরূপ রাষ্ট্র চায় জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করিতে।

অভাব হইতে মুক্তি (freedom from want) বর্তমানে কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—যথা, উন্নত জীবনযাত্রার মান, বেকার-সমস্যার সমাধান, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যহ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তা, টাকাকড়ির মূল্যের স্থায়িত্ব, ইত্যাদি। ইহাদের মাধ্যমে প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রই বর্তমানে জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করে।

কিন্তু অভাব হইতে মুক্ত হওয়াই সভ্য মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সংগে সংগে সে চায় কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়ন (better working conditions)। বিশ্রামবিহীনভাবে উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া মানুষকে যদি দৈনন্দিন অন্নসংস্থান করিতে হয় তবে একমাত্র 'অভাব হইতে মুক্তি'কে সে যথেষ্ট বলিয়া মনে করে না। সুতরাং মানুষের পক্ষে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকার-সমস্যার সমাধান প্রভৃতির সংগে সংগে কার্যের সর্তাবলীরও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আধুনিক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রসমূহ তাহাই করে।

সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী (Economic Functions of the Government): উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলী প্রধানত দুইটি—(ক) জনসাধারণকে অভাব অনটন হইতে মুক্ত করা, এবং (খ) তাহাদের কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়ন করা। জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য সরকারকে যে যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয় এখন তাহার আলোচনা করা হইতেছে।

সরকারের দুইটি প্রধান অর্থনৈতিক কাষ

(১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: সাধারণ লোকে সর্বদাই উন্নততর-জীবনযাত্রার মান কামনা করে। অর্থাৎ, তাহারা চায় আরও ভালভাবে বাঁচিতে, আরও অধিক ভোগ করিতে। সুতরাং জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য সরকারকে প্রথমেই তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট হইতে হয়। অবশ্য উন্নয়ন অপেক্ষা সংরক্ষণই অধিকতর প্রয়োজনীয়। সুতরাং বর্তমান জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিয়াই সরকারকে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের অর্থ হইল ভোগ্যদ্রব্য ও সেবার পরিমাণ বৃদ্ধি করা, আর্থিক আয় বৃদ্ধি করা নহে। সুতরাং সরকারকে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হয়, পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থা সুসংগঠিত করিতে হয়, স্কুলকলেজ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, ইত্যাদি। মোটকথা, যাহাতে ভোগ্যদ্রব্যাদির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য সকল প্রচেষ্টাই করিতে হয়।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সমস্যা সকল দেশের পক্ষে একরকম নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জীবনযাত্রার মান ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত। সুতরাং ইহাকে বজায় রাখিয়া সামান্য পরিমাণে উন্নতির প্রচেষ্টাই হইল তাহাদের লক্ষ্য। কিন্তু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে প্রধান সমস্যা হইল দ্রুত উন্নয়নের সমস্যা। এইজন্য স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সমস্যা সকল দেশে এক নহে

(২) বেকার-সমস্যার সমাধান: জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য পরবর্তী প্রয়োজনীয় বিষয় হইল বেকার-সমস্যার সমাধান করা। বেকার অবস্থায় থাকিলে মানুষ কোনমতেই অভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং অনেকের মতে, এই বেকার-সমস্যার সমাধানই বর্তমান দিনের সরকারের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্য। আবার দেশে বেকারের সংখ্যা অধিক হইলে নানারূপ অশান্তি ও গোলযোগ দেখা যায়। তখন সরকারকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবর্তে এই গোলযোগ দমনেই অধিক মনোযোগ দিতে হয়। এই কারণেও বেকার-সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা সরকারের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

ইহা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্য

(৩) সামাজিক নিরাপত্তা: সামাজিক নিরাপত্তা (social security) বলিতে বুঝায় সমাজের সকলকেই ভবিষ্যৎ আর্থিক অনিশ্চয়তার চিন্তা হইতে রক্ষা করা। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি হঠাৎ মারা যাইতে পারে, উপার্জনক্ষম অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরিয়া পীড়িত হইয়া থাকিতে পারে, বেকার হইয়া পড়িতে পারে, দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া অংগপ্রত্যংগ হারাইতে পারে। এইরূপ ঘটিলে ব্যক্তি ও পরিবারের আয় সহসা বন্ধ হইয়া যায়। ইহার উপর আছে সাধারণ বার্ধক্য যখন আর কর্ম করিবার সামর্থ্য থাকে না।

সামাজিক নিরাপত্তার অর্থ

পূর্বে এইভাবে ব্যক্তির আয়ের পথ রুদ্ধ হইলে সরকারের কিছুই করণীয় নাই বলিয়া মনে করা হইত; বর্তমানে কিন্তু এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে সরকারকেই অগ্রণী হইয়া সমাজস্থ সকলের আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে।*

সুসভ্য দেশসমূহে এই আর্থিক নিরাপত্তা বা সামাজিক নিরাপত্তার জন্য যে-সকল ব্যবস্থা সাধারণত অবলম্বন করা হয় তাহার মধ্যে বার্ধক্যে পেনসন্, কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে অথবা কর্মক্ষম অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পরিবারের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড,

সুসভ্য দেশে সামাজিক নিরাপত্তা

* জার্মেনীতে বিসমার্ক এই ধারণার প্রথম প্রচার করেন এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহের মধ্যে জার্মেনীই প্রথম সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হয়।

পীড়িত অবস্থায় অর্থ ও অন্যপ্রকার সাহায্য, বেকার অবস্থায় ভাতা, দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে বীমা ও ক্ষতিপূরণ—এই কয়টিই হইল প্রধান। ইহাদের ফলে উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তিগণ অভাব হইতে কতকটা মুক্ত হইতে পারে। আমাদের দেশেও এইরূপ সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

(৪) ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানহ্রাস: ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আর্থিক বৈষম্যের হ্রাস দ্বারাও সরকার জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করে। আর্থিক বৈষম্যহ্রাসের অর্থ হইল জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করা। জাতীয় আয়ের অধিকাংশ যদি মুষ্টিমেয় লোকের হস্তগত হয় তবে তাহাদের বিলাসব্যসনের পরিমাণ অধিক হইবে এবং অধিকাংশকে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাইতে হইবে। দেশে যখন খাদ্যের অভাব তখন হয়ত মোটরগাড়ী আমদানির ব্যবস্থা হইবে; সাধারণে যখন মাথা গুঁজিবার মত আশ্রয় জোগাড় করিতে পারিতেছে না তখন হয়ত ধনীর প্রাসাদোপম অট্টালিকার আর একটি মহল নির্মিত হইবে। সুতরাং দুর্গতদের অভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানহ্রাস করা সরকারের কর্তব্য।

এই ব্যবস্থার গুরুত্ব

প্রধানত, ধনীদের উপর অধিক করভার চাপাইয়া এই উদ্দেশ্যসাধনের প্রচেষ্টা করা হয়। ধনীদের নিকট হইতে করসূত্রে প্রাপ্ত অর্থে সরকার দরিদ্রের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা, বস্তি অপসারণ করিয়া গৃহনির্মাণ, খাদ্যদ্রব্যের দাম-হ্রাসের জন্য অর্থসাহায্য (subsidy) প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করে।

কিভাবে ইহা করা হয়

কিন্তু সকল সময় ইহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাই সরকারকে কিছু কিছু সমাজতন্ত্রমূলক ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে হয়। এইজন্য দেখা যায় যে সরকার শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম বা ন্যায্য মজুরি (minimum or fair wages) নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে, বড় বড় ব্যবসাবাণিজ্য রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়ন করিয়াছে, জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন করিয়া কৃষককে জমির মালিকানা প্রদান করিয়াছে, ইত্যাদি।

(৫) টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষা: 'অভাব হইতে মুক্তি'র জন্য টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্বও একরূপ প্রয়োজনীয়। লোকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য আর্থিক আয় বাড়াইবারই চেষ্টা করে। কিন্তু আর্থিক আয়বৃদ্ধির সংগে সংগে যদি জিনিসপত্রের দামও সমপরিমাণ বাড়িয়া যায়—অর্থাৎ, টাকাকড়ির মূল্য যদি সমপরিমাণ কমিয়া যায় তবে তাহারা পূর্বের ন্যায় অভাবগ্রস্তই থাকে। আবার যদি টাকাকড়ির মূল্য বা ক্রয়শক্তি আর্থিক আয় যতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার অপেক্ষাও কমিয়া যায়, তবে লোকের অভাবের পরিমাণ বৃদ্ধিই পায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, লোকের আর্থিক আয় হয়ত দ্বিগুণ হইল, কিন্তু ইতিমধ্যেই যদি

মুদ্রামূল্যের স্থায়িত্ব—ইহার প্রয়োজনীয়তা

জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া তিনগুণ হয় তবে অবস্থা পূর্বাপেক্ষা খারাপই হ । সুতরাং দ্রব্যমূল্যের তুলনায় আর্থিক আয়ের অধিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকিলে টাকাকড়ির ক্রয়শক্তিকে স্থায়ী রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

অন্য এক কারণেও এই স্থায়িত্ব প্রয়োজনীয়। সাধারণ লোক সারাজীবন খাটিয়া ও ভবিষ্যৎ অভাব মিটাইবার জন্য জীবন বীমা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতির মাধ্যমে কিছু কিছু সঞ্চয় করে। মুদ্রামূল্য যদি হ্রাস পায় তবে তাহারা দেখে যে তাহাদের সঞ্চয়ের মূল্য কমিয়া গিয়াছে এবং বিনা দোষে তাহারা প্রবঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের সঞ্চয়ের নিরাপত্তার জন্য মুদ্রামূল্যে যথাসম্ভব স্থায়িত্ব আনয়নের প্রচেষ্টা সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

মুদ্রামূল্যের স্থায়িত্ব আনয়নের সহিত আর একটি বিষয় জড়িত আছে। ইহা হইল মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা। মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে সরকারকে ইহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে হয়।

(৬) ব্যাংক-ব্যবস্থার সুসংগঠন: মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা সুসংগঠিত করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা রাষ্ট্রের আর একটি অর্থনৈতিক কার্য বলিয়া গণ্য। সরকার এই কার্য সম্পাদন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে।

মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ

(৭) একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণ: একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণকেও সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্য বলিয়া গণ্য করা হয়। একচেটিয়া কারবারী অত্যুচ্চ দাম ধার্য করিয়া পণ্য বাজারে ছাড়িতে পারে। ইহাতে ভোগী (consumer) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইজন্য সকল সুসভ্য দেশেই সরকার একচেটিয়া কারবারকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াই থাকে।

একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণ

কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়ন: অর্থনৈতিক কাজকর্মকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) অর্থোপার্জন বা উৎপাদন সংক্রান্ত কাজকর্ম, এবং (খ) অর্থব্যয় বা ভোগ সংক্রান্ত কাজকর্ম। সুতরাং মানুষের জীবনযাত্রার মানেরও দুইটি দিক আছে—কর্মের দিক এবং ভোগের দিক।

এই ভোগের দিক হইতেই মানুষ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকার-সমস্যার সমাধান, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহশীল হয়; কারণ এগুলি হইল তাহার অভাব হইতে মুক্তির মাধ্যম। কিন্তু কর্মের দিক দিয়া তাহার আগ্রহ হইল কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়নে। অর্থাৎ, শ্রমিক বা উৎপাদক হিসাবে প্রত্যেকেই কামনা করে যে তাহার কার্যের সর্তাবলী আরও সুবিধাজনক হউক। সূচনাতেই বলা হইয়াছে যে জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করিবার ন্যায় কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়নও রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক কার্য।

শ্রমিক হিসাবে মানুষ তাহার কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়ন কামনা করে

কার্যের সর্তাবলী উন্নয়নের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকার করিয়া আছে শ্রমের সময় (hours of work)। শ্রমের সময় নির্দিষ্ট করার পর বাসগৃহের সুবন্দোবস্ত, কারখানায় অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি প্রভৃতিও প্রয়োজনীয়। পরিশেষে, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক যাহাতে সৌহার্দ্যপূর্ণ হয় তাহার ব্যবস্থাও সরকারকে করিতে হইবে। কারখানা আইন, শিল্পবিরোধ নিষ্পত্তি আইন প্রভৃতি এই সকল উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়। অধিকাংশ প্রগতিশীল দেশেই এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

কার্যের সর্তাবলী বলিতে কি বুঝায় এবং ভারতে ইহার উন্নয়ন

সংক্ষিপ্তসার

সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করা হইয়াছে। বর্তমানে প্রত্যেক সভ্য দেশেই সরকার অর্থনৈতিক কাজকর্মকে অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। এইরূপ নিয়ন্ত্রণের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করা। অভাব হইতে মুক্তি কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—যথা, উন্নত জীবনযাত্রার মান, বেকার সমস্যার সমাধান, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যহ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তা, টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব ইত্যাদি। ভোগী (consumer) হিসাবে মানুষ এগুলি সর্বদাই কামনা করে; আর উৎপাদক বা শ্রমিক হিসাবে সে চায় তাহার কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়ন।

সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী: সুতরাং বলা যায়, সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী প্রধানত দুইটি—(ক) জনসাধারণকে অভাব-অনটন হইতে মুক্ত করা; এবং (খ) তাহাদের কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়ন করা।

(ক) জনসাধারণকে অভাব-অনটন হইতে মুক্ত করিবার জন্য সরকারকে নিম্নলিখিতভাবে অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করিতে হইবে:

১। উৎপাদনবৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন; ২। বেকার সমস্যার সমাধান; ৩। সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা বা সকলকেই আর্থিক অনিশ্চয়তার হাত হইতে রক্ষা করা; ৪। করপ্রথার সংস্কার প্রভৃতির মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানহ্রাস; ৫। মুদ্রা বা টাকাকড়ির মূল্যে স্থায়িত্ব রক্ষা করা; ৬। ব্যাংক-ব্যবস্থার সুসংগঠন করা; এবং ৭। একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণ করা।

(খ) কার্যের সর্তাবলীর উন্নয়নের জন্য সরকারকে ১। শ্রমের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে, ২। কারখানায় অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করিতে হইবে, ৩। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক যাহাতে সৌহার্দ্যপূর্ণ হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. Discuss the economic functions of the Government.

সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর আলোচনা কর। [২৩০-২৩৪ পৃষ্ঠা]

দ্বিতীয় অধ্যায়

সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

(Government and Development Planning)

জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করাই সরকারের প্রাথমিক অর্থনৈতিক কার্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বর্তমানে অধিকাংশ দেশই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকে ঝুঁকিয়াছে। স্বল্পোন্নত দেশসমূহে (underdeveloped countries) এই পরিকল্পনা-প্রবণতার আধিক্য দেখা যায়।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতি আকর্ষণের মূলে আছে অপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার তিক্ত অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ দেখিয়াছে যে পরিকল্পিত কর্মসূচী ব্যতিরেকে উৎপাদন, বণ্টন, সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন—অর্থ-ব্যবস্থার কোন কার্যই সম্যকভাবে সম্পাদিত হয় না।* প্রথমত, জাতীয় আয়ের বণ্টন হয় অতি অন্যায্যভাবে। অল্পসংখ্যক মূলধন-মালিক, জমিদার ও ব্যবসায়ী জাতীয় আয়ের অধিকাংশ হস্তগত করিয়া থাকে এবং বিপুল সংখ্যাধিক শ্রমিকদের ভাগ্যে জুটে অতি সামান্যই। দ্বিতীয়ত, ইহার ফলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং ধনীদের বিলাসের দ্রব্য উৎপাদনেই উপাদানসমূহ নিযুক্ত হয়। তৃতীয়ত, খাদ্যবস্ত্রের ন্যায় জীবনধারণের উপকরণের যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর হইলে দরিদ্ররা যাহাতে উহা পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয় না। চতুর্থত, উৎপাদন নিয়োগ প্রভৃতি অব্যাহত রহিল কি না এবং কিভাবে উৎপাদন ও নিয়োগের সম্প্রসারণ করা যায়—সে-দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয় না।

অপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য মানুষ পরিকল্পনার দিকে ঝুঁকিয়াছে

এইরূপ অকাম্য অর্থ-ব্যবস্থাকে পরিহার করিবার দাবির ফলেই পরিকল্পনা-প্রবণতা হইয়া উঠিয়াছে বিশ্বজনীন।

উপরি-উক্ত আলোচনার পর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে: অর্থ-ব্যবস্থার কার্যাবলী সম্যকভাবে সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসারে অগ্রসর হওয়াই হইল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। এই কর্মসূচী সরকার বা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিকল্পনা কমিশন দ্বারা প্রণীত হয় এবং উহা সরকার বা ঐ কমিশনের তত্ত্বাবধানেই কার্যকর হয়।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল কাম্য ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন, জাতীয় আয়ের কাম্য বণ্টন, অর্থনৈতিক অবস্থার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ প্রভৃতি সকলই।

---

* অর্থ-ব্যবস্থা ও ইহার কার্যাবলীর আলোচনার জন্য ৬-৮ পৃষ্ঠা দেখ।

কিন্তু সকল ক্ষেত্রে ইহাদের প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। যে-দেশ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইল সংরক্ষণ। অর্থাৎ, কিভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থা বজায় রাখা যায় তাহাই তাহার প্রধান সমস্যা; অপরদিকে, স্বল্পোন্নত দেশগুলির প্রধান লক্ষ্য হইল উন্নয়ন—জাতীয় আয় বৃদ্ধি দ্বারা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। অনুরূপভাবে, যেখানে আর্থিক বৈষম্য অতি প্রকট সেখানে ইহার হ্রাসই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার লক্ষ্য

যাহা হউক বলা যায় যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মোটামুটি দুই প্রকারের—(ক) সংরক্ষণ পরিকল্পনা (maintenance planning), এবং (খ) উন্নয়ন পরিকল্পনা (development planning)। কারণ, এই দুই উদ্দেশ্যেই পরিকল্পনার প্রবর্তন করা হয়।

দুই প্রকারের পরিকল্পনা: ক। সংরক্ষণ পরিকল্পনা, এবং খ। উন্নয়ন পরিকল্পনা

উন্নয়ন পরিকল্পনা (Development Planning): ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যে উন্নয়ন পরিকল্পনা হইবে তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এইরূপ কয়েকটি অন্তরায় রহিয়াছে যাহা সক্রিয় সরকারী হস্তক্ষেপ ব্যতীত দূরীভূত হইতে পারে না। উন্নত দেশসমূহে দেখা যায় যে সরকারী প্রচেষ্টা ব্যতীতও জাতীয় আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে নিশ্চল অবস্থায় থাকিতে অথবা ক্রমশ অবনতির পথে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ হইল, স্বল্পোন্নত দেশের দরিদ্র জনসাধারণের কাছে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া বিশেষ মুনাফা করিতে পারা যায় না বলিয়া শিল্পপতিগণ শিল্পবাণিজ্য প্রসারে আগ্রহান্বিত হয় না। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই এই সকল দেশের প্রগতিশীল সরকারকে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট হইতে হয়।

ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনা উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা

স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন সমস্যার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আছে কৃষি-ব্যবস্থা। কৃষিই এই সকল দেশের প্রধান উপজীবিকা; কিন্তু কৃষিকেই সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ দেখা যায়। প্রথমত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ জোত, জলসেচ বীজ সার প্রভৃতির অভাব, কৃষিকার্যের পুরাতন পদ্ধতি ইত্যাদির জন্য উৎপাদন অতি স্বল্প হয়। দ্বিতীয়ত, কৃষিজদ্রব্য বিক্রয়ের অব্যবস্থার জন্য যাহা উৎপন্ন হয় তাহারও সমগ্রটা কৃষক পায় না। তৃতীয়ত, জমির মালিকানা কৃষকের পরিবর্তে জমিদারের থাকে বলিয়া কৃষক জমির উন্নয়নে উৎসাহিত হয় না। চতুর্থত,

অনগ্রসর কৃষি স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন সমস্যার কেন্দ্রস্থল

দেখা যায় যে মহাজনগণ কৃষককে উচ্চ সুদে ঋণ প্রদান করিয়া চিরকাল ঋণগ্রস্ত অবস্থায় রাখে। এই সকলের ফলে ভারতের ন্যায় দেশে কৃষক কোনমতে অনাহারে অর্ধাহারে দিন গুজরান করিয়া বাঁচিয়া থাকে।

কৃষির এই সকল ত্রুটির স্বাভাবিক প্রতিবিধান হইল সক্রিয় সরকারী প্রচেষ্টার দ্বারা কৃষিকে সুসংগঠিত করা। কিন্তু একমাত্র কৃষির সুসংগঠনের দ্বারাই সকল উন্নয়ন সমস্যার সমাধান করা যায় না। বৃহদায়তনে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হইলে বহুসংখ্যক কৃষক কর্মহীন হইয়া পড়িবে। সুতরাং তাহাদের জন্যও বিকল্প নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমেই এই নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব। অতএব, সংগে সংগে শিল্পোন্নয়নের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে।

১। সুতরাং পরিকল্পনায় প্রথমে কৃষিকে সুসংগঠিত করিতে হইবে

অন্যান্য কারণেও শিল্পোন্নয়নের প্রতি মনোনিবেশের প্রয়োজন আছে। প্রথমত, একমাত্র কৃষির উন্নয়নের দ্বারা জাতীয় আয় প্রয়োজনমত বাড়ানো যায় না। দ্বিতীয়ত, কৃষিকার্যে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি বিশেষভাবে কার্যকর বলিয়া একটা সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাসই পাইতে থাকিবে। তৃতীয়ত, শিল্প-গঠন না করা হইলে দেশকে চিরকালই কাঁচামাল রপ্তানি এবং নির্মিত দ্রব্য আমদানি করিয়া কাল কাটাইতে হইবে।

২। তারপর প্রয়োজন শিল্পোন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া

স্বল্পোন্নত দেশসমূহে শিল্পোন্নয়নের পথে অনেক প্রতিবন্ধকও রহিয়াছে—যথা, মূলধন ও শিল্পদক্ষতার অভাব, পরিবহণের অব্যবস্থা, মূল শিল্পের অপ্রাচুর্য, জনসাধারণের স্বল্প ক্রয়শক্তি, ইত্যাদি। সুতরাং এইগুলিকে দূর করিয়াই শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই উন্নয়নের গতিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য আবার সুদৃঢ় মুদ্রা-ব্যবস্থা, ন্যায্য কর-পদ্ধতি এবং জন-কল্যাণকর আইন ও বিচার-ব্যবস্থার প্রয়োজন। পরিশেষে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে না পারিলে উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল হইতে পারে না।

৩। কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়

বলা যায় যে, স্বল্পোন্নত দেশের প্রগতিশীল সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট হয়। কিন্তু সরকারকে শুধু প্রগতিশীল হইলেই চলিবে না, শক্তিশালীও হইতে হইবে। সরকার শক্তিশালী না হইলে জমিদারী প্রথার বিলোপ, শিল্পবাণিজ্যকে প্রয়োজনমত রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়ন, ধনীদের উপর উচ্চ হারে করধার্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন বা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে না। ফলে পরিকল্পনাও সফল হইবে না।

উন্নয়ন পরিকল্পনার উপাদান (Factors of Development Planning): উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। মোটামুটি তিন প্রকার উপাদান বা ব্যবস্থা অবলম্বন অপরিহার্য:

উন্নয়ন পরিকল্পনার তিনটি উপাদান

(ক) কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য কৃষির সুসংগঠন ;

(খ) সুষম (balanced) শিল্পোন্নয়ন ;

(গ) পরিবহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান প্রভৃতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্যের সম্প্রসারণ।

(ক) কৃষির সুসংগঠন: কৃষির সুসংগঠনের জন্য যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহার ইংগিত কৃষিকার্যের বর্তমান পদ্ধতির ত্রুটি হইতে সহজেই পাওয়া যায়। প্রথমত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ (fragmented) কৃষি-জোতকে একত্রিত করিয়া, জলসেচ বীজ সার প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়া বৃহদায়তনে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, ভূমিস্বত্ব-ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া কৃষককে জমিতে চিরস্থায়ী অধিকার প্রদান এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খাজনা হ্রাস করিতে হইবে। ভূমিহীন কৃষি শ্রমিককে ভূমিদান এবং তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঋণের জন্য কৃষককে গ্রামীণ মহাজনের উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখা চলিবে না। যাহাতে কৃষক সহজে এবং স্বল্প সুদে ঋণ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত সমবায় সমিতি গঠন, গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। তারপর কৃষিজ পণ্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। সমবায় সমিতি এ-বিষয়েও শ্রেষ্ঠ পন্থা। পর্যাপ্ত সংখ্যায় সমবায় বিক্রয়-সমিতি স্থাপন করা হইলে ফড়িয়া ব্যাপারী আড়তদার মহাজন প্রভৃতির মত মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের (middlemen) পক্ষে আর কৃষককে প্রবঞ্চনা করিয়া মোট শস্যমূল্যের মোটা অংশ হস্তগত করা সম্ভব হইবে না। ইহা ছাড়া হাটবাজারে ওজন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং শস্য মজুত রাখিবার জন্য গুদামঘর স্থাপন করা প্রয়োজন।

কৃষির সুসংগঠনের জন্য অবলম্বনীয় ব্যবস্থাসমূহ

উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহ কিন্তু বিশেষ কার্যকর হইবে না, যদি-না কৃষকের মধ্যে নূতন পদ্ধতি এবং নূতন জীবন সম্পর্কে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করা যায়। এই কার্যের জন্য একদল কর্মী থাকিবে যাহারা গ্রামাঞ্চলের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া নবজীবনের বার্তা বহন করিয়া বেড়াইবে।* সংগে সংগে অবশ্য অন্যান্যভাবেও প্রচারকার্য চালাইতে হইবে। পরিশেষে, কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সর্বাংগীণ গ্রামোন্নয়নের

কৃষকের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে হইবে

* ভারতের এই ধরনের কর্মী 'গ্রামসেবক' এবং তাহাদের কার্য 'জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা' বলিয়া অভিহিত। বর্তমানে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকে সমাজোন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

ব্যবস্থা করিয়া নূতন জীবনের কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রামবাসীদের সম্মুখে ধরিতে হইবে। প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই ভারতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রগুলি খোলা হইয়াছে।

(খ) সুষম শিল্পোন্নয়ন : শিল্পসমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(ক) ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প, এবং (খ) বৃহদায়তন যন্ত্রচালিত শিল্প। উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্রতী সরকারকে দেখিতে হইবে যে—(১) এই দুই প্রকার শিল্প-ব্যবস্থা যেন সুষম পদ্ধতিতে গড়িয়া উঠে, এবং (২) বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প-ব্যবস্থাতেও যেন সামঞ্জস্য থাকে।

সুষম শিল্পোন্নয়ন বলিতে কি বুঝায়

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য ইহাদিগকে বৃহৎ যন্ত্রচালিত শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে বাঁচাইতে হইবে, কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া এবং মূলধন দিয়া সাহায্য করিতে হইবে, উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নয়নসাধন করিতে হইবে, বিক্রয়বাজারের প্রসার করিতে হইবে।

বৃহদায়তন যন্ত্রচালিত শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানা ও তত্ত্বাবধানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের মত মূল শিল্পসমূহ (basic industries)* গঠন করিতে হইবে। খনিজ শিল্পের ব্যাপারেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। যে-শিল্প বেসরকারী মালিকানায় ঠিকমত গঠিত হয় না তাহাদের স্থাপনের দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিটি শিল্পের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদনের লক্ষ্য (targets of production) স্থির করিতে হইবে। বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে (private sector) মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নবগঠিত শিল্পসমূহের ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হ্রাস করিতে হইবে এবং শিল্প-পরিচালনার উন্নতিসাধন করিতে হইবে।

শিল্পোন্নয়নের পদ্ধতি

(গ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্যের সম্প্রসারণ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্যকে 'সামাজিক মূলধন' (social capital) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মূলধনবৃদ্ধি ব্যতীত যেরূপ উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভবপর হয় না, তেমনি 'সামাজিক মূলধনে'র সম্প্রসারণ ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাও কার্যকর হয় না।

এই সকল সেবাকার্যকে সামাজিক মূলধন বলা হয়

এই সামাজিক মূলধনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থা (system of transport and communication), শিক্ষা, স্বাস্থ্য,

* যে শিল্পের উপর ভিত্তি করিয়া অন্যান্য শিল্প গড়িয়া উঠে তাহাকে 'মূল শিল্প' বলে। যেমন, কল-কারখানা স্থাপনের জন্য লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য অপরিহার্য বলিয়া লৌহ ও ইস্পাত শিল্প অন্যতম মূল শিল্প বলিয়া গণ্য।

বিদ্যুৎ উৎপাদন, বাসস্থান-ব্যবস্থা, গবেষণা, মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা ইত্যাদি। সুতরাং কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের আনুষংগিক উপাদান হিসাবেই এগুলির প্রতি উন্নয়নব্রতী সরকারকে মনোযোগ দিতে হইবে।

ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা (India's Development Plans) : ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যে উপরি-বর্ণিত ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা তাহা সহজেই অনুমেয়। এই পরিকল্পনার যুগ সুরু হইয়াছে ১৯৫১-৫২ সাল হইতে। পরিকল্পনা এক একবারে পাঁচ বৎসরের জন্য করা হয় বলিয়া প্রত্যেক পরিকল্পনা 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' নামে অভিহিত। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই পাঁচ বৎসর ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়; ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৬১ সালের মার্চ মাস অবধি ছিল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়; এবং ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৬৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত হইবে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগ ১৯৫১-৫২ সাল হইতে সুরু হইলেও পরিকল্পনার জল্পনাকল্পনা ভারতে বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে এ বিষয়ে কিছুই করা হয় নাই। যাহা হউক, শাসনক্ষমতা লাভ করিবার পর ভারতের জাতীয় সরকার এ সম্পর্কে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে একটি পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) গঠন করে। কমিশন ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করে। খসড়া পরিকল্পনার যে-সমস্ত সমালোচনা হয় তাহার বিচারবিবেচনা করিয়া অবশেষে কমিশন ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চূড়ান্ত আকারে পার্লামেণ্টের নিকট পেশ করে। ইতিমধ্যে যে সকল ছোট ছোট উন্নয়ন পরিকল্পনা চলিতেছিল তাহাদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া পরিকল্পনার সময় নির্দিষ্ট করা হয় পূর্বোক্ত ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত।

সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিক্রমা

পরিকল্পনা কমিশন

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (The First Five Year Plan) : প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দুইটি : (১) যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থ-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, এবং (২) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মপদ্ধতির গোড়াপত্তন করা। এই প্রসংগে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছিল যে মাত্র উৎপাদনবৃদ্ধিই পরিকল্পনার লক্ষ্য নহে; যাহাতে জনসাধারণ তাহাদের আত্মশক্তিকে বিকশিত করিয়া আশা-আকাংক্ষাকে উপলব্ধি করিতে পারে তাহার জন্য যোগ্য সামাজিক পরিবেশও গড়িয়া তুলিতে

প্রথম পরিকল্পনার দুইটি উদ্দেশ্য

হইবে। সুতরাং, উৎপাদনবৃদ্ধির সংগে সংগে আর্থিক বৈষম্যও হ্রাস করিতে হইবে। তবে ভারতে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন বলিয়া প্রথমাবস্থায় উৎপাদনবৃদ্ধির প্রতিই অধিক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল যথাসম্ভব শীঘ্র মাথাপিছু জাতীয় আয়কে দ্বিগুণ করা। ইহার জন্য একাধিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রয়োজন হইবে। আশা করা হইয়াছিল যে, প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে জাতীয় আয় শতকরা ১১ ভাগ এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় তদনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে।

প্রথম পরিকল্পনায় ব্যয়বরাদ্দ

পরিকল্পনায় প্রথমে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়; পরে ইহাকে বাড়াইয়া ২৩৫৬ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হয়। বিভিন্ন উন্নয়ন ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাথমিক ও পরিবর্তিত ব্যয়ের ভাগ নিম্নে দেখানো হইল:

(হিসাব কোটি টাকায়)

উন্নয়ন ক্ষেত্র	প্রাথমিক ব্যয়বরাদ্দ	পরিবর্তিত ব্যয়বরাদ্দ	শতকরা ভাগ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৩৬১	৩৫৭	১৫.১
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৫৬১	৬৬১	২৮.১
৩। শিল্প ও খনিজ	১৭৩	১৭৯	৭.৬
৪। পরিবহণ ও সংসরণ	৪৯৭	৫৫৭	২৩.৬
৫। সমাজসেবা	৩৪০	৫৩৩	২২.৬
৬। বিবিধ	৫২	৬৯	৩.০
মোট	২০৬৯	২৩৫৬	১০০.০

ছকটি হইতে দেখা যাইবে যে, ঐ পরিকল্পনায় কৃষি, জলসেচ এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনকে অগ্রাধিকার (top priority) প্রদান করা হইয়াছিল। এই দুই খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছিল ১০১৮ কোটি টাকা বা মোট বরাদ্দের শতকরা প্রায় ৪৩ ভাগ। এককভাবে কৃষির জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল মোট ব্যয়ের শতকরা ১৫ ভাগ। পরিবহণ ও সংসরণের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। এই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল শতকরা ২৩ ভাগের উপর। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের পক্ষে শিল্পোন্নয়নের প্রতি প্রয়োজনমত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। উপরন্তু, ঐ পরিকল্পনায় মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার (Mixed Economy) নীতি অনুসৃত হওয়ায়

প্রথম পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য: কৃষি, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনকে অগ্রাধিকার প্রদান

সরকারের পক্ষে শিল্পোন্নয়নের বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজনও হয় নাই। এই দুই কারণে পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের ভার মোটামুটি বেসরকারী উদ্যোগের (private enterprise) উপরই অর্পিত হইয়াছিল এবং বেসরকারী উদ্যোগ শিল্প ও অন্যান্য খাতে মোট ১৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করিয়াছিল।

মোট কত টাকা ব্যয় হয়

চূড়ান্ত হিসাব অনুসারে প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বরাদ্দ ২৩৫৬ কোটি টাকার মধ্যে মোট ব্যয় হয় ১৯৬০ কোটি টাকা। বিভিন্ন উন্নয়ন খাতের মধ্যে এই ১৯৬০ কোটি টাকার বণ্টন নিম্নের ছকটির সাহায্যে দেখানো হইল :

উন্নয়ন ক্ষেত্র	ব্যয়ের পরিমাণ	শতকরা ভাগ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	২৯১ কোটি টাকা	১৫
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৫৭০ " "	২৯
৩। শিল্প ও খনিজ	১১৭ " "	৬
৪। পরিবহণ ও সংসরণ	৫২৩ " "	২৭
৫। সমাজসেবা ও বিবিধ	৪৫৯ " "	২৩
মোট	১৯৬০ কোটি টাকা	১০০·০

ফলাফল

প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হইয়াছিল। ঐ পাঁচ বৎসরের মধ্যে মোট জাতীয় আয় শতকরা ১২ ভাগের পরিবর্তে শতকরা ১৮ ভাগের উপর এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় শতকরা প্রায় ১১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কৃষিজ উৎপাদনেরও অনুমিত বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল এবং শিল্প ও পরিবহণ ব্যবস্থা যথেষ্ট সম্প্রসারিত হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (The Second Five Year Plan) : প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল পরিমিত। ভবিষ্যতের জন্য উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে দেশের সম্মুখে যে খাদ্যাভাব, কাঁচামালের ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি সমস্যা বিশেষ প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের সমাধান করাই ছিল ইহার লক্ষ্য।

প্রথম পরিকল্পনার পটভূমিকা

প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল সম্পর্কে পূর্বেই সামান্য আলোচনা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে ঐ পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ উন্নত হয় নাই ; জনসাধারণের দুঃখদুর্দশার বিশেষ লাঘব হয় নাই। উন্নত দেশসমূহের তুলনায় জনসাধারণের

জীবনযাত্রার মান এখনও অত্যন্ত নিম্ন। ইহার উপর আছে ব্যাপক বেকার-সমস্যা। বৎসরের পর বৎসর জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে বেকার-সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিবে। এই সমস্ত বিষয়ের কথা চিন্তা করিয়াই ব্যাপকতর আকারে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করা হয়; এবং প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হওয়ার ফলেই দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যাপকতর রূপদান সম্ভবপর হয়। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করিতে হয় যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রবর্তনের পর হইতেই অর্থসংস্থান ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। ফলে, পরে পরিকল্পনাটির কিছু ছাঁটকাট এবং বেশ কিছু পরিবর্তন করিতে হয়। এই কারণে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোচনা দুই পর্যায়ে করা প্রয়োজন—(ক) মূল পরিকল্পনা, এবং (খ) পরিবর্তিত পরিকল্পনা। আলোচনা এইভাবেই করা হইতেছে।

ব্যাপকতর দ্বিতীয় পরিকল্পনার পটভূমিকা

দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য: ব্যাপকতর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (মূল এবং পরিবর্তিত উভয়েরই) চারিটি মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়: (ক) উন্নয়নের দ্রুততর গতি (quicker pace of development), (খ) শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি (wider industrial base), (গ) নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ (accent on employment), এবং (ঘ) সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত (socialist bias)। উদ্দেশ্যগুলি পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়াই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার কথা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘোষণা করা হইয়াছিল।

চারিটি মূল উদ্দেশ্য

(ক) উন্নয়নের দ্রুততর গতি: মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ জাতীয় আয় বৃদ্ধির আশা করা হইয়াছিল। প্রধানত, দ্রুত শিল্পপ্রসারের মাধ্যমেই এই লক্ষ্যসাধনের প্রচেষ্টা করা হইবে বলা হইয়াছিল।

(খ) শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি: পরিকল্পনা কমিশনের মতে, প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যের দরুন ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো অনেকটা শক্তিশালী হইয়াছিল। খাদ্যাভাব, কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা ও মুদ্রাস্ফীতিকে আয়ত্তের মধ্যে আনয়ন করা সম্ভবপর হইয়াছিল। সুতরাং শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। আরও বলা হইয়াছিল যে, কৃষি ও শিল্প পরস্পরের পরিপূরক বলিয়াও শিল্পোন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। শিল্প যেমন কাঁচামাল ও খাদ্যের যোগান ব্যতীত প্রসারলাভ করিতে পারে না, তেমনি কৃষির অগ্রগতিও শিল্পোন্নয়ন ব্যতীত সম্ভবপর হইতে পারে না। শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে লোকের আয় বাড়িলে তবেই কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদা

বৃদ্ধি পায় এবং শিল্প কৃষিজীবীদের জন্য বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকে।

শিল্পপ্রসারের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, সিমেন্ট, রাসায়নিক দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি মূল শিল্পের (basic industries) সংগঠন। কারণ, এগুলি হইতেই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই সকল মূল শিল্প গঠনের প্রতি সর্বাধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়।

(গ) নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ: মূল শিল্প গঠনের জন্য অবশ্য শ্রম অপেক্ষা মূলধনেরই অধিক প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেশে কর্মহীনতার পরিমাণ দিন দিন যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে শ্রমনিয়োগকারী কলা-কৌশলের (labour-intensive techniques) প্রবর্তনই পরিকল্পনা কমিশন যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিল। এইজন্য ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা এইরূপ শিল্প-সমূহের মাধ্যমে করা হইয়াছিল যাহারা মূলধন অপেক্ষা অধিক শ্রমিক নিয়োগ করে। মূল পরিকল্পনা অনুসারে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের আশা করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কৃষিজীবী, অর্ধ-বেকার, শিল্প-শ্রমিক, শিক্ষিত বেকার সকলই ছিল। পরে ঐ সংখ্যাকে কমাইয়া ৮০ লক্ষে লইয়া আসা হয়।

(ঘ) সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত: দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তনের কিছু পূর্বে ভারতীয় পার্লামেন্ট ভারতের জন্য সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা (socialist pattern of society) প্রতিষ্ঠার নীতির ঘোষণা করে। স্বাভাবিকভাবেই এই নীতি প্রতিফলিত হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। পরিকল্পনা অনুসারে শিল্পবাণিজ্যের উন্নয়নে সরকার উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ করিবে এবং বেসরকারী মালিকানাকে সংকুচিত করা হইবে। দ্বিতীয়ত, বেসরকারী মালিকানায় যে-সকল প্রতিষ্ঠান থাকিবে যথাসম্ভব তাহারা যাহাতে সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত হয় সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইবে। উপরন্তু, কর-ব্যবস্থার পরিবর্তন, বিলাস-দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিক-কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যের সম্প্রসারণ প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। এইভাবে নানা দিক দিয়া আর্থিক বৈষম্যহ্রাস এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার ন্যায্য বণ্টন দ্বারা ধীরে ধীরে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইবে।

মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে (public sector) ৪৮০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে (private sector) ২৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

সরকারী ব্যয়বরাদ্দ

সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যয় বণ্টন পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো হইল:

১	২	৩	৪
উন্নয়ন ক্ষেত্র	ব্যয়বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	শতকরা ভাগ	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনায় শতকরা কত ভাগ ব্যয়বৃদ্ধির প্রস্তাব
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৫৬৮	১২	৫৯
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৯১৩	১৯	৩৮
৩। শিল্প ও খনিজ	৮৯০	১৮	৩২৭
৪। পরিবহণ ও সংসরণ	১৩৮৫	২৯	১৪৯
৫। সমাজসেবা	৯৪৫	২০	৭৭
৬। অন্যান্য	৯৯	২	৪৪
মোট	৪৮০০	১০০	

উপরের ছকটির চতুর্থ কলমে প্রদত্ত ব্যয়বৃদ্ধির হার হইতে শিল্পের উপরে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ

বেসরকারী শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুমিত ২৪০০ কোটি টাকা ব্যয় বা বিনিয়োগের (investment) বণ্টন ছিল নিম্নলিখিতরূপ :

১।	সংগঠিত শিল্প ও খনিজ	৫৭৫ কোটি টাকা
২।	রোপণ শিল্প, পরিবহণ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	১২৫ " "
৩।	নির্মাণকার্য	১২৫ " "
৪।	কৃষি এবং গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩২৫ " "
৫।	বিবিধ	[illegible] " "
		মোট ২৪০০ কোটি টাকা

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমালোচনা : নানা দিক দিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমালোচনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে এইগুলিই প্রধান : (ক) এই পরিকল্পনা ছিল উচ্চাকাংক্ষা দোষে দুষ্ট ; (খ) কৃষির পরিবর্তে শিল্পের উপর অতটা গুরুত্ব আরোপ করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই ; এবং (গ) পরিকল্পনার জন্য অর্থসংস্থানের যে-ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা ত্রুটিপূর্ণ।

(ক) পরিকল্পনাকে উচ্চাকাংক্ষা দোষে দুষ্ট বলিয়া সমালোচনা করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন ইহা সম্ভব হইবে মনে করিলেও অনেকের ধারণা ছিল যে,

সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের ৪৮০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের ২৪০০ কোটি টাকা—এই ৭২০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়া পরিকল্পনাকে কার্যকর করা দুষ্কর হইবে। বিদেশ হইতে মোট ৮০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে উহা ঠিক তত সহজ কার্য নয়। অর্থসংস্থানের অসুবিধাহেতু ১৯৫৮ সালে যখন দ্বিতীয় পরিকল্পনার ছাঁটকাট করিতে হইল তখন পরিকল্পনা যে কতকটা উচ্চাকাংক্ষা দোষে দুষ্ট তাহা স্পষ্টতই প্রমাণিত হইল।

১। ইহা উচ্চাকাংক্ষা দোষে দুষ্ট

(খ) কৃষি হইতে গুরুত্ব সরাইয়া লওয়া যে ভুল হইয়াছিল তাহা দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রবর্তনের কিছুদিনের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল। পরিকল্পনা কমিশন মনে করিয়াছিল যে, খাদ্য-সমস্যা সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে। কিন্তু একরূপ দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাত হইতেই খাদ্য-সমস্যা নূতন আকারে দেখা দেয়। খাদ্যমূল্য এরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে কমিশনকে অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়াও খাদ্য উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্যকে পরিবর্তিত করিয়া শতকরা ১৫ ভাগ হইতে ২৫ ভাগে লইয়া যাইতে হয়।

২। কৃষি হইতে গুরুত্ব সরাইয়া লওয়া ভুল হইয়াছিল

(গ) পরিকল্পনা অনুসারে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতিতে (deficit financing) সংগ্রহ করা হইবে ঠিক হইয়াছিল। অর্থাৎ, সরকার এই অর্থ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিবে এবং রিজার্ভ ব্যাংক উহা নোট ছাপাইয়া প্রদান করিবে। এইভাবে নোট ছাপাইলে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে, তাহার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বিতীয় পরিকল্পনায় করা হয় নাই। ফলে শুধু খাদ্যদ্রব্যের নহে, সাধারণ মূল্যবৃদ্ধিই পরিকল্পনা কার্যকর করিবার পথে এক প্রধান অন্তরায় হিসাবে দেখা দেয়।

৩। অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিবর্তন (Changes in the Second Five Year Plan) : আলোচনার সূচনাতেই বলা হইয়াছে যে অর্থসংস্থানের অসুবিধাহেতু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কিছু ছাঁটকাট এবং বেশ কিছু পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। পরিবর্তনের ফলে পরিকল্পনাটি দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল—ক এবং খ অংশ। ক-অংশের অনুমিত ব্যয় ছিল ৪৫০০ কোটি টাকা। স্থির হইয়াছিল যে ক-অংশের জন্য এই ৪৫০০ কোটি টাকা প্রথমে ব্যয় করিয়া সম্ভব হইলে তবেই খ-অংশে হাত দেওয়া হইবে। সম্ভব না হইলে মোটেই হাত দেওয়া হইবে না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ৪৫০০ কোটি টাকার পরিবর্তে ৪৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়। পার্শ্ববর্তী পৃষ্ঠায় বিভিন্ন খাতের মধ্যে এই ব্যয়ের বণ্টন দেখানো হইল :

(হিসাব কোটি টাকায়)

উন্নয়ন ক্ষেত্র	প্রথম পরিকল্পনার ব্যয়	শতকরা ভাগ	দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয়	শতকরা ভাগ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	২৯১	১৫	৫৩০	১১
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৫৭০	২৯	৮৬৫	১৯
৩। গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	৪৩	২	১৭৫	৪
৪। বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ	৭৪	৪	৯০০	২০
৫। পরিবহণ ও সংসরণ	৫২৩	২৭	১৩০০	২৮
৬। সমাজসেবা ও অন্যান্য	৪৫৯	২৩	৮৩০	১৮
মোট	১৯৬০	১০০	৪৬০০	১০০

হিসাবটি হইতে দেখা যাইবে যে, প্রথম পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ খাতে কার্যক্ষেত্রে শতকরা ৫০০ ভাগ বা ৫ গুণ ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, যদিও মূল পরিকল্পনায় চার গুণের মত (শতকরা ৩৯৭ ভাগ) ব্যয়বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছিল।*

বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যয়

মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ২৪০০ কোটি টাকার মত বিনিয়োগ করা সম্ভব হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা সম্ভব হইয়াছিল ৩৩০০ কোটি টাকা। নিম্নে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অনুমিত বিনিয়োগ এবং প্রকৃত বিনিয়োগের বণ্টন দেখানো হইল :

(হিসাব কোটি টাকায়)

উন্নয়ন ক্ষেত্র	মূল পরিকল্পনায় অনুমিত বিনিয়োগ	শেষ পর্যন্ত বিনিয়োগের পরিমাণ
১। সংগঠিত শিল্প ও খনিজ	৫৭৫	৭২৫
২। পরিবহণ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	১২৫	১৭৫
৩। নির্মাণকার্য	৯২৫	১০০০
৪। কৃষি এবং গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩৭৫	৯০০
৫। বিবিধ	৪০০	৫০০
মোট	২৪০০	৩৩০০**

* [illegible] পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

** এই হিসাবের মধ্যে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র হইতে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে যাহা হস্তান্তর করা হয় তাহা ধরা হইয়াছে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বরাদ্দ অপেক্ষা কম ব্যয় করা সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যয় অনুমানকে বহু পরিমাণ ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এই দিক দিয়া যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বেসরকারী উদ্যোগের উপর আরও অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

পরিকল্পনার দশ বৎসরের হিসাবনিকাশ (Review of Ten Years of Planning): ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দশ বৎসর শেষ হয়। ঐ দশ বৎসরে (১৯৫১-৬১ সাল) অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও উন্নয়নের গতির একটি প্রাথমিক হিসাব তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ হিসাবে পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা যেখানে যেখানে আংশিক বিফল হইয়াছিল তাহাও দেখানো হইয়াছে।

এই দশ বৎসরে সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের (investment) পরিমাণ ১০,১১০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। ইহার উপর ছিল পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা, বিভিন্ন প্রকারের অর্থসাহায্য (subsidies) ইত্যাদির জন্য ১৩৫০ কোটি টাকার মত চলতি ব্যয় (current outlay)। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ব্যয় হইয়াছে ১১,৪৬০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের ব্যয় হইল ৬৫৬০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের ব্যয় হইল বাকী ৪৯০০ কোটি টাকা। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের সমস্তটাই বিনিয়োগ-ব্যয়।

দশ বৎসরে পরিকল্পনার ব্যয়

পরিকল্পনার দশ বৎসরে সম্প্রসারণ একভাবে ঘটে নাই। আন্তর্জাতিক গোলযোগ ও পরিকল্পনা কার্যকরকরণে ত্রুটির জন্য কখনও কখনও সম্প্রসারণের গতি বিশেষ ব্যাহত হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের অনুমিত বৃদ্ধি ঘটে। অপরদিকে কোন নূতন প্রতিবন্ধকও দেখা দেয় নাই। ফলে ঐ পরিকল্পনায় মোট জাতীয় আয় অনুমিত শতকরা ১২ ভাগের পরিবর্তে প্রায় শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং অন্যান্য উৎপাদন-লক্ষ্যে (targets of production) পৌঁছানো মোটামুটি সম্ভব হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় সফলতা

কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই দেখা যায় বৈদেশিক মুদ্রা সমস্যা যাহা ক্রমে সংকটে (foreign exchange crisis) পরিণত হয়। ইহার উপর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে ১৯৫৮ সালে পরিকল্পনার রদবদল ও ছাঁটকাট করিতে হয়।

ছাঁটকাটের দরুন সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের মোট ব্যয় ৪৮০০ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ৪৫০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য ৪৫০০ কোটি

টাকার পরিবর্তে ৪৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়। রদবদল ও ব্যয়হ্রাসের ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট জাতীয় আয় অনুমিত শতকরা ২৫ ভাগের পরিবর্তে শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার দশ বৎসরে (১৯৫১-১৯৬১ সাল) মোট জাতীয় আয় শতকরা ৪২ ভাগ বৃদ্ধি পাইলেও জনসংখ্যার অভাবনীয় বৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয় শতকরা ১৬ ভাগের অধিক বৃদ্ধি পায় নাই।*

দশ বৎসরে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি

প্রথম পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের অনুমিত উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এ-বিষয়ে লক্ষ্যে পৌছানো যায় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৮·৫ কোটি টন; কিন্তু পরিকল্পনার শেষে উৎপাদন পৌছায় ৭·৬ কোটি টনে।** অনুরূপভাবে ইস্পাত-পিণ্ডের ক্ষেত্রে উৎপাদনক্ষমতা (production capacity) অনুমানমত ৪৫ লক্ষ টনে পৌছিলেও প্রকৃত উৎপাদন ৩৫ লক্ষ টনের অধিক হয় নাই। কয়লার উৎপাদনও (production) উৎপাদন-লক্ষ্য (target) অপেক্ষা ৫৪ লক্ষ টন কম হইয়া মোট ৫·৪৬ কোটি টনে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার আংশিক অসফলতা

এইভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন উৎপাদন-লক্ষ্যে পৌছানো না গেলেও আশা করা হইয়াছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনার কিছুদিনের মধ্যেই এই সকল লক্ষ্য অতিক্রম করা সম্ভব হইবে।

নিয়োগের (employment) লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য অনুরূপ আশা পোষণ করিতে পারে নাই। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্য ছিল ১ কোটি লোকের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; পরে উহাকে কমাইয়া ৮০ লক্ষে আনা হয়। এই ৮০ লক্ষ লোকের জন্যই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা মোটেই পর্যাপ্ত নহে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে পরিকল্পনার শেষে ৯০ লক্ষ লোক বেকার থাকিয়া যায়।

পরিকল্পনা কমিশন সুস্পষ্টভাবে স্বীকার না করিলেও দ্রব্যমূল্যরোধে অক্ষমতা হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনার অসফলতার আর একটি দিক। সমগ্র প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে দ্রব্যমূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাত হইতেই উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিকল্পনাধীন ৫ বৎসরে পাইকারী সূচকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ৩০ ভাগ এবং শ্রমিকদের জীবনযাত্রার সূচকসংখ্যা (working class cost-of-living index) বৃদ্ধি পায় প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ। ইহার ফলে পরিকল্পনা কার্যকরকরণে অসুবিধা ত হয়ই, উপরন্তু শিল্প-বিবাদ, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট ইত্যাদি নানারূপ সামাজিক

* ইহা ১৯৬০-৬১ সালের দামের ভিত্তিতে হিসাব; ১৯৪৮-৪৯ সালের দামের ভিত্তিতে হিসাব করিলে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির পরিমাণ হইবে যথাক্রমে শতকরা ৩৫ ভাগ ও ১৮ ভাগ।

** তৃতীয় পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবার পর চূড়ান্ত হিসাবে কিন্তু দেখা গিয়াছিল যে, ১৯৬০-৬১ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হইয়াছিল ৭·৯৩ কোটি টন।

নিম্নে বিভিন্ন উৎপাদন-ক্ষেত্রে উৎপাদনবৃদ্ধির তালিকা দেওয়া হইল :

	১৯৫০-৫১	১৯৬০-৬১
ক। কৃষি		
খাদ্যশস্য	৫২২ লক্ষ টন	৭৬০ লক্ষ টন
তৈলবীজ	৫১ " "	৭১ " "
ইক্ষুগুড়	৫৬ " "	৮০ " "
তুলা	২৯ " গাঁইট	৫১ " গাঁইট
পাট	৩৩ " "	৪৪ " "
সেচ-সমন্বিত জমি	৫১৫ " একর	৭০০ " একর
নাইট্রোজেন সার ব্যবহার	৫৫ হাজার টন	২৩০ হাজার টন
খ। সমাজোন্নয়ন ও সমবায়		
কত সংখ্যক গ্রামে সম্প্রসারিত		৩৭০,০০০
প্রাথমিক সমবায় সমিতিসংখ্যা	১০৫,০০০	২১০,০০০
গ। শিল্প ও খনিজ		
ইস্পাত-পিণ্ড	১০ লক্ষ টন	৩৫ লক্ষ টন
কাগজ	১·১৪ " "	৩ ৫ " "
কয়লা	৩২৩ " "	৫৪৬ " "
মিলবস্ত্র	৩৭২ কোটি গজ	৫১৩ কোটি গজ
সিমেণ্ট	২৭ লক্ষ টন	৮৫ লক্ষ টন
চিনি	১১ " "	৩০ " "
ঘ। শক্তি		
উৎপাদনক্ষমতা	২৩ লক্ষ কিঃ ওঃ	৫৭ লক্ষ কিঃ ওঃ
কত সংখ্যক গ্রাম ও নগরে যোগান দেওয়া হইবে	৩৬৮৭	২৩,০০০
ঙ। পরিবহণ ও সংসরণ		
রেলপথের মালপত্র বহনের ক্ষমতা	৯১৫ লক্ষ টন	১৫৪০ লক্ষ টন
বাণিজ্যিক যানের সংখ্যা	১১৬,০০০	২১০,০০০
উঁচু রাস্তার পরিমাণ	৯৭,৫০০ মাইল	১৪৪,০০০ মাইল
চ। সমাজসেবা		
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্রসংখ্যা	১০,০০০	৩৯,৪০০
কৃষি-বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা	১৫০০	৫৮০০
শিক্ষিত ডাক্তারের সংখ্যা	৫৬,০০০	৭০,০০০

বিক্ষোভও দেখা দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণও জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত তাল রাখিতে পারে নাই। একথা অবশ্য পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উপরি-বর্ণিত আংশিক অসফলতা সত্ত্বেও প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা মিলাইয়া সম্প্রসারণের গতি সত্যই প্রশংসনীয়। এই দশ বৎসরে সামগ্রিক কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪১ ভাগ, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪৬ ভাগ। ইহা ছাড়া সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়। সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণবৃদ্ধি ঘটে ২ কোটি একরের কাছাকাছি এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে ৫৭ লক্ষ কিলোওয়াটে গিয়া দাঁড়ায়।

তবে দশ বৎসরের সম্প্রসারণ সত্যই প্রশংসনীয়

পরিবহণ ও সংসরণের ক্ষেত্রে উঁচু রাস্তার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ৫৬ হাজার মাইল এবং বাণিজ্যিক খালের সংখ্যা হয় প্রায় দ্বিগুণ। ১২০০ মাইলের মত নূতন রেলপথ নির্মিত হয়, ১০০০ মাইল রেলপথে দুইটি করিয়া লাইন পাতা হয় এবং ৮৮০ মাইল রেলপথের বৈদ্যুতিকরণ সমাপ্ত হয়। ইহাদের ফলে রেলপথ-সমূহের মালপত্র বহনের ক্ষমতা শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

সমাজসেবার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা বহুগুণ প্রসারলাভ করে। বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসা-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটে। গত দশ বৎসরে লোকের গড় জীবনকাল ১০ বৎসরের মত বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (The Third Five Year Plan) :

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যভাগ (১৯৫৮ সালের শেষের দিক) হইতেই তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নকার্য শুরু হয় এবং বিবেচনা-সাপেক্ষ খসড়াটি প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে। এই খসড়ার ভিত্তিতে দীর্ঘ এক বৎসর আলাপ-আলোচনা চলিবার পর চূড়ান্ত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসে।

প্রস্তাবনা : তৃতীয় পরিকল্পনার প্রস্তাবনায় পরিকল্পিত উন্নয়ন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য (objectives of planned development) বর্ণনা করা হইয়াছে। ভারতীয় জনগণকে কাম্য জীবনযাত্রার সুযোগসুবিধা প্রদান করাই হইল পরিকল্পিত উন্নয়ন-ব্যবস্থার মৌলিক উদ্দেশ্য।

পরিকল্পিত উন্নয়ন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

ভারতের ৪০ কোটি* লোকের জন্য কাম্য জীবনযাত্রার সুযোগসুবিধা প্রদান করা মোটেই সহজ কার্য নহে, এবং এই লক্ষ্যে পৌছিতে স্বতই দীর্ঘ সময় লাগিবে। তবুও এই লক্ষ্যাভিমুখে চলা এবং এই উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

* পরিকল্পনা প্রণয়নকালে লোকসংখ্যা ৪০ কোটি বলিয়াই অনুমান করা হইয়াছিল।

অতি সামান্য উপকরণ ও তদপেক্ষা সামান্য তথ্য লইয়া প্রথম পরিকল্পনা এই লক্ষ্যের সম্মুখীন হয়। উহার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশবিভাগের দরুন অর্থ-ব্যবস্থায় যে অসমতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করা এবং উন্নয়নমূলক কর্মপদ্ধতির সূচনা করিয়া দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ভিত্তি প্রস্তুত করা। এই উদ্দেশ্যে কৃষি, সেচ ও সমাজোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিল্পের গোড়াপত্তন করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনার প্রকৃতি

প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হয় এবং ফলে, জনসাধারণ পরিকল্পনায় বিশ্বাসী হইয়া উঠে। সরকারও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

এই সফলতা, অভিজ্ঞতা ও ব্যাপকতর তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয় দ্বিগুণ আকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। ইহাতে উৎপাদনবৃদ্ধি ছাড়াও কর্মসংস্থান, মূল ও বুনিয়াদী শিল্প গঠন, আর্থিক বৈষম্যহ্রাস প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মোটকথা, সম্প্রসারণের (growth) গতিবৃদ্ধি ছাড়াও ইহা সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রকৃতি

তৃতীয় পরিকল্পনাকে দ্বিতীয় পরিকল্পনারই ব্যাপকতর রূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে সম্প্রসারণের আরও গতিবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইবে। উপরন্তু, সম্প্রসারণ যাহাতে আত্ম-নির্ভরশীল (self-sustaining) হইয়া উঠে সে-দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রকৃতি

তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (Objectives of the Third Five Year Plan) : দশ বৎসরের উন্নয়ন প্রচেষ্টার ভিত্তিতে রচিত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের (self-sustaining growth) লক্ষ্যাভিমুখে প্রসারিত। বিগত ১০ বৎসরে যে-পরিমাণ উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে, তৃতীয় পরিকল্পনা তাহা ৫ বৎসরেই মোটামুটি সম্ভব করিতে চায়। যদি ইহা সম্ভব হয় তবেই দেশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সার্থকতায় রূপায়িত হইবে।

ইহা অবশ্য অতি সহজ কার্য নহে। ইহা সম্ভব করিতে হইলে আমাদের শক্তি ও সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে, আমাদিগকে অতিরিক্ত করভার বহন করিতে হইবে। তবুও ক্ষুদ্রতর পরিকল্পনার কথা চিন্তা করা যায় না, কারণ জনসাধারণকে জীবনযাত্রার ন্যূনতম মানের জন্য আর অপেক্ষা করিতে বলা চলে না। এই বৃহত্তর তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচটি মুখ্য উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হইয়াছে :

পাঁচটি মুখ্য উদ্দেশ্য

(১) পরিকল্পনাধীন সময়ে বাৎসরিক ৫% বা তাহার কিছু অধিক হারে (প্রায় ৬% হারে) জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিসাধন করা এবং পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহে ঐ হার যাহাতে বজায় থাকে সেই পরিমাণ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা ;

(২) খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা এবং শিল্পবাণিজ্যের প্রয়োজনমত বাণিজ্যিক শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ;

(৩) যাহাতে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিল্প-যন্ত্রপাতি দেশের অভ্যন্তরেই নির্মিত হয় তাহার জন্য লৌহ ও ইস্পাত, শিল্প-যন্ত্রপাতি, শক্তি ও জ্বালানির উৎপাদন প্রয়োজনীয় পরিমাণে সম্প্রসারিত করা ;

(৪) যথাসম্ভব দেশের জনশক্তির (manpower resources) সদ্ব্যবহার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগসুবিধা (employment opportunities) বৃদ্ধিসাধন করা ;

(৫) আর্থিক বৈষম্য বেশ কিছুটা দূর করিয়া সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজব্যবস্থার পথে আরও একপদ অগ্রসর হওয়া।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics) : (১) উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার জন্য সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের ব্যয় ৮০০০ কোটি টাকার অধিক এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের ব্যয় ৪১০০ কোটি টাকা* হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। সুতরাং মোট প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পরিমাণ হইল ১২,১০০ কোটি টাকার অধিক। কিন্তু বর্তমানে বরাদ্দ করা হইয়াছে ১১,৬০০ কোটি টাকা। অতএব, পরিকল্পনার মোট ব্যয় এবং ব্যয়বরাদ্দ—এই দুই-এর মধ্যে ৫০০ কোটি টাকার ফাঁক (gap) রাখা হইয়াছে। এইরূপ ফাঁক রাখিবার কারণ হইল, পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ১১,৬০০ কোটি টাকার অধিক অর্থসংস্থানের আশা করা যায় নাই। উপরি-উক্ত ৫০০ কোটি টাকার যে-ফাঁক তাহা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রেরই ফাঁক। অতএব, সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের কার্যক্রমের ব্যয় ৮০০০ কোটি টাকার উপর, কিন্তু বরাদ্দ করা হইয়াছে ৭৫০০ কোটি টাকা।

(২) তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হইল আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণ (self sustaining growth)। এইজন্য বলা হইয়াছে যে, খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে হইবে, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি দেশেই উৎপাদন করিতে হইবে, ইত্যাদি। এই আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণ-ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন হইল কৃষিকে অগ্রাধিকার (top priority) প্রদান করা এবং প্রয়োজনীয় শিল্প, শক্তি, পরিবহণ প্রভৃতির সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা। কৃষি যদি জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য যোগান দিতে না পারে তাহা হইলে আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণ

* সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র হইতে যে ২০০ কোটি টাকা বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে হস্তান্তরিত হইবে তাহা বাদ দিয়া ৪১০০ কোটি টাকা হিসাব করা হইয়াছে।

ঘটিতে পারে না। আবার প্রয়োজনীয় শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে কৃষির উন্নয়নও সাধিত হইতে পারে না। কারণ, শিল্পই কৃষি-যন্ত্রপাতি যোগান দেয় এবং কাঁচামালের চাহিদা সৃষ্টি করে। উপরন্তু, শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমেই জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানের সম্যক সম্প্রসারণ ও শিল্প-যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা সম্ভব। অতএব, শিল্পোন্নয়নের প্রতি পর্যাপ্ত দৃষ্টি দিতে হইবে। সংগে সংগে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ ও পরিবহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) জনসম্পদের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও জনসংখ্যা যে-হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে জনসংখ্যাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হইবে না। এইজন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে অনুমান করা হইয়াছে যে, ১৯৬৬ সালে জনসংখ্যা ৪৯ কোটির উপর দাঁড়াইবে। ইহা যেন আর বেশী বৃদ্ধি না পায় তাহার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

(৪) সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-গঠনের উদ্দেশ্যে গতিশীল করের বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র শিল্প সংগঠন, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি চিরাচরিত ব্যবস্থা ছাড়াও সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন (institutional changes) সাধন করা হইবে এবং গ্রামোন্নয়নের আংশিক দায়িত্ব পঞ্চায়েত ও সমবায় সমিতির উপর ন্যস্ত হইবে।

(৫) সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-গঠনের আর একটি উপাদান হইল নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন। অর্থাৎ, গ্রামবাসীরা যাহাতে নগরবাসীদের মতই উন্নততর জীবন উপভোগ করিতে পারে তাহা দেখা। এই উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে ন্যূনতম সমাজসেবার (minimum social services) ব্যবস্থা করা হইবে। ইহাদের মধ্যে আছে পানীয় জল, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতি। মোটামুটিভাবে কোন গ্রামই ইহাদের সুযোগসুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে না। ৬-১১ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে তাহা হইতেও গ্রামবাসীরা উপকৃত হইবে। এইভাবে শিক্ষার ভিত্তি প্রস্তুত হইলে সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় ১৪ বৎসর বয়স্ক পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

(৬) তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও সমতা আনয়নের প্রচেষ্টা করা হইবে। যে-সকল অঞ্চল অপেক্ষাকৃত অনুন্নত তাহাদের উন্নয়নের অধিক প্রচেষ্টা করা হইবে।

(৭) দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে বিশেষ ব্যাহত করিয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও যাহাতে এইরূপ না ঘটে তাহার জন্য দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণের (price stabilisation) ব্যবস্থা করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে বাজেট-ঘাটতি

যথাসম্ভব পরিহার করা ছাড়াও ঋণ-সৃজনও (credit creation) নিয়ন্ত্রিত করা হইবে।

(৮) চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে—অর্থাৎ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে কি পরিমাণ উৎপাদন ও উন্নয়ন আশা করা যায় তাহার মোটামুটি হিসাবও তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপ করিবার কারণ হইল যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বিতীয় দশকের প্রথম অধ্যায় হিসাবেই দেখা হইয়াছে, একটি পৃথক পরিকল্পনা হিসাবে নয়।

ব্যয়বরাদ্দ ও ব্যয়বণ্টন (Financial Provisions and Distribution of Outlay) : পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রমের ব্যয় ও ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে ৫০০ কোটি টাকার ফাঁক রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ, ৮০০০ কোটি টাকার উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হইলেও বর্তমানে বরাদ্দ করা হইয়াছে ৭৫০০ কোটি টাকা। এই ৭৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ৬৩০০ কোটি টাকা হইল বিনিয়োগ-ব্যয় (investment expenditure) এবং বাকী ১২০০ কোটি টাকা হইল চলতি প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা, বিভিন্ন খাতে অর্থ-সাহায্য ইত্যাদির দরুন চলতি ব্যয় (current outlay)। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৭৫০০ কোটি টাকা ব্যয় মোটামুটি নিম্নলিখিতভাবে বণ্টিত হইয়াছে :

উন্নয়ন ক্ষেত্র	ব্যয়ের পরিমাণ	মোটামুটি শতকরা ভাগ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	১০৬৮ কোটি টাকা	১৪
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	১৬৬২ " "	২২
৩। মূল ও বৃহদায়তন শিল্প	১০৪২ " "	১৪
৪। গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	২৬৪ " "	৪
৫। খনিজ ও তৈল	৪৭৮ " "	৬
৬। পরিবহণ ও সংসরণ	১৪৮৬ " "	২০
৭। সমাজসেবা	১৩০০ " "	১৭
৮। অন্যান্য	২০০ " "	৩
মোট	৭৫০০ কোটি টাকা	১০০

সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের এই ৭৫০০ কোটি টাকা হইতে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ২০০ কোটি টাকা হস্তান্তরিত হইবে। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে নিজস্ব সংগতি হইতে ৪১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ফলে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে (৪১০০+২০০=)৪৩০০ কোটি টাকা। এই ব্যয়ের সমস্তটাই

প্রথম পরিকল্পনা
কৃষি ও
সমাজোন্নয়ন
সেচ ও
বৈদ্যুতিক শক্তি
পরিবহণ ও
সংসরণ
সমাজসেবা
ও অন্যান্য
ক
খ
গ
ঙ
চ
দ্বিতীয় পরিকল্পনা
কৃষি ও
সমাজোন্নয়ন
সেচ ও
বৈদ্যুতিক শক্তি
গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প
বৃহদায়তন
শিল্প ও খনিজ
পরিবহণ ও
সংসরণ
সমাজসেবা
ও অন্যান্য
ক
খ
গ
ঘ
ঙ
চ
তৃতীয় পরিকল্পনা
কৃষি ও
সমাজোন্নয়ন
সেচ ও
বৈদ্যুতিক শক্তি
গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প
বৃহদায়তন
শিল্প ও খনিজ
পরিবহণ ও
সংসরণ
সমাজসেবা
ও অন্যান্য
২০
ক
খ
গ
ঘ
ঙ
চ
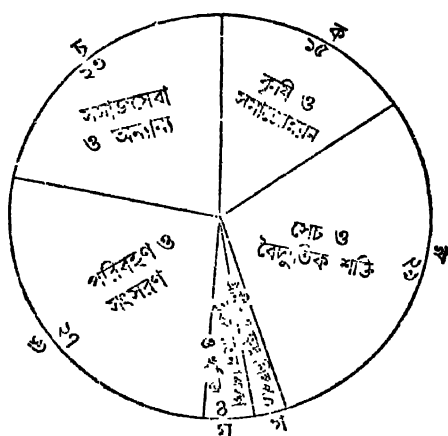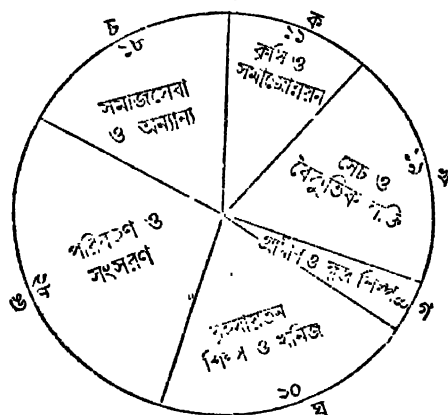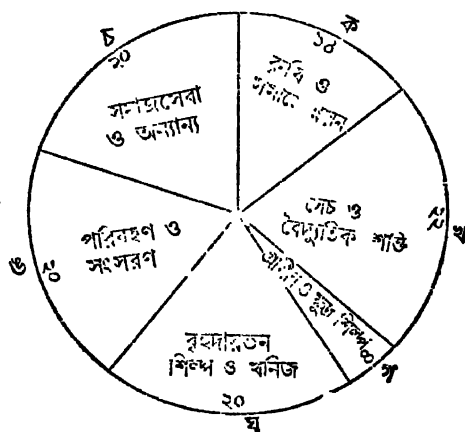
হইল বিনিয়োগ-ব্যয় (investment expenditure)। নিম্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ইহার প্রস্তাবিত বণ্টন দেখানো হইল :

বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের ব্যয়বণ্টন

১।	কৃষি ও সেচ	৮৫০ কোটি টাকা
২।	বৈদ্যুতিক শক্তি	৫০ " "
৩।	পরিবহণ	২৫০ " "
৪।	গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	৩২৫ " "
৫।	বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ	১১০০ " "
৬।	গৃহনির্মাণ ইত্যাদি	১১২৫ " "
৭।	অন্যান্য	৬০০ " "
		মোট ৪৩০০ কোটি টাকা

তৃতীয় পরিকল্পনার সহিত প্রথম দুই পরিকল্পনার তুলনা (Comparison of the Third Plan with the First Two Plans) : তৃতীয় পরিকল্পনার প্রস্তাবনায় পরিকল্পনা তিনটির যে প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহা হইতেই উহাদের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। প্রথম পরিকল্পনা পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার সূত্রপাত মাত্র এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা যথাক্রমে হইল উহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তৃতীয় পরিকল্পনা আকারে বৃহত্তর ও প্রথম পরিকল্পনা ক্ষুদ্রতর এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনা উহাদের মধ্যস্থল অধিকার করে। পরিকল্পনা তিনটির তুলনামূলক আকার সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য নিম্নের ছকটি দেওয়া হইল :

১। পরিকল্পনা তিনটির তুলনামূলক আকার

(হিসাব কোটি টাকায়)

উন্নয়ন ক্ষেত্র	প্রথম পরিকল্পনার ব্যয়	শতকরা ভাগ	দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয়	শতকরা ভাগ	তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়বরাদ্দ	শতকরা ভাগ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	২৯১	১৫	৫৩০	১১	১০৬৮	১৪
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৫৭০	২৯	৮৬৫	১৯	১৬৬২	২২
৩। গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	৪৩	২	১৭৫	৪	২৬৪	৪
৪। বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ	৭৪	৪	৯০০	২০	১৫২০	২০
৫। পরিবহণ ও সংসরণ	৫২৩	২৭	১৩০০	২৮	১৪৮৬	২০
৬। সমাজসেবা ও অন্যান্য	৪৫৯	২৩	৮৩০	১৮	১৫০০	২০
মোট	১৯৬০	১০০	৪৬০০	১০০	৭৫০০	১০০

দ্বিতীয়ত, প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা হইতে তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যাপকতর। প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল খাদ্যাভাব, কাঁচামালের ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করিয়া উন্নয়নমূলক অর্থ-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করা। এই উদ্দেশ্যে ঐ পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদনকে

অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বা বৈশিষ্ট্য ছিল চতুর্বিধ: (১) উন্নয়নের দ্রুততর গতি, (২) শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি, (৩) নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ, এবং (৪) সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত। প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হওয়ার ফলেই এইরূপ বহুমুখী উদ্দেশ্য লইয়া বৃহত্তর দ্বিতীয় পরিকল্পনার পথে যাত্রা করা সম্ভব হয়। উপরন্তু, উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষির সুসংগঠনের পর উহার দ্বিতীয় উপাদান বা সুষম (balanced) শিল্পোন্নয়নের দিকে স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টি দিতে হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে ইহাই করা হইয়াছিল; শিল্পখাতেই সর্বাধিক ব্যয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

২। তুলনামূলক লক্ষ্য

তৃতীয় পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য পাঁচটি: (১) উন্নয়নের আরও দ্রুততর গতি, (২) খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ ও কৃষিজ পণ্যের বিশেষ উৎপাদনবৃদ্ধি, (৩) দশ বৎসরের মধ্যে শিল্প-যন্ত্রপাতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য মূল শিল্প ও শক্তির প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ, (৪) জনশক্তির যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার ও নিয়োগের সম্প্রসারণ, এবং (৫) আর্থিক বৈষম্য বেশ কিছুটা দূর করিয়া সমাজতন্ত্রের পথে আরও একপদ অগ্রসর হওয়া। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রথম পরিকল্পনা হইতে তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যের প্রভূত পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা হইতে তৃতীয় পরিকল্পনার মৌলিক পার্থক্য হইল মোটামুটি দুইটি বিষয়ে—যথা, (ক) সম্প্রসারণের গতিবৃদ্ধি, এবং (খ) সম্প্রসারণের আত্মনির্ভরশীলতা। পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসরে যে-পরিমাণ উন্নয়ন সাধিত হইয়াছিল, তৃতীয় পরিকল্পনা সম্প্রসারণের গতিবৃদ্ধি দ্বারা তাহা পাঁচ বৎসরেই সম্ভব করিতে চায়। ইহার ফলে জনসাধারণের ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানে পৌছানো যাইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশনের ধারণা।

তৃতীয় পরিকল্পনার দুইটি বিশেষ লক্ষ্য

তৃতীয়ত, আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় পুনরায় কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে এবং শিল্পোন্নয়নের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। আনুষংগিক ব্যবস্থা বলিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি ও পরিবহণকেও উপেক্ষা করা হয় নাই।

৩। তুলনামূলক গুরুত্ব

চতুর্থত, জনসংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, সমাজসেবা সম্প্রসারণ, দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণ প্রভৃতি বিষয়ে তৃতীয় পরিকল্পনা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে অনুসরণ করিলেও এই সকল দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে আরও অধিক।

৪। তৃতীয় পরিকল্পনার কয়েকটি বিষয়ের উপর অধিক দৃষ্টি

পঞ্চমত, তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট ব্যয় এবং মোট ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে যে ফাঁক রাখা হইয়াছে তাহা পূর্ববর্তী দুই পরিকল্পনার কোনটিতে করা হয় নাই।

৫। তৃতীয় পরিকল্পনার আরও দু'একটি বৈশিষ্ট্য

পরিশেষে, তৃতীয় পরিকল্পনাকে যেরূপ পরবর্তী দশ বৎসরের পরিকল্পনার অধ্যায় হিসাবে দেখা হইয়াছে পূর্ববর্তী দুই পরিকল্পনাকে সেভাবে দেখা হয় নাই।

তৃতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়নের গতি ও উৎপাদনের লক্ষ্য : তৃতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়নের গতি সম্বন্ধে আশা ও উৎপাদনের লক্ষ্য হইল নিম্নলিখিত রূপ :

(১) সমগ্র পরিকল্পনাধীন সময়ে বাৎসরিক শতকরা ৫ ভাগ বা তাহার কিছু অধিক হারে (প্রায় ৬% হারে) জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটিবে। ফলে পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াইবে শতকরা ৩০ ভাগ এবং মাথাপিছু আয়ের শতকরা ১৭ ভাগ।

(২) খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৩ কোটি টনের মত বৃদ্ধি পাইয়া ১০ কোটি টনে পরিণত হইবে। ফলে উৎপাদনবৃদ্ধির হার দাঁড়াইবে শতকরা ৩২ ভাগ।

(৩) অন্যান্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে শতকরা ৩১ ভাগ।

(৪) ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে দেশের সমগ্র গ্রামাঞ্চল সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে আসিবে।

(৫) সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ ৭ কোটি একর হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৯ কোটি একরে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫৭ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটি ২৭ লক্ষ কিলোওয়াটে পৌছিবে।

(৬) শিল্পক্ষেত্রে ইস্পাত-পিণ্ডের উৎপাদন ৩৫ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৯২ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে; মিলের কাপড়ের উৎপাদন ৫০০ কোটি গজ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া হইবে ৫৮০ কোটি গজ এবং সিমেণ্ট ও চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৮৫ লক্ষ টন হইতে ১.৩ কোটি টন এবং ৩০ লক্ষ টন হইতে ৩৫ লক্ষ টনে পরিণত হইবে। কাগজের উৎপাদন দ্বিগুণের মত হইবে এবং পেট্রো-লিয়ামের উৎপাদন প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। নির্মিত মোটর-গাড়ীর সংখ্যা ৫০ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া এক লক্ষে দাঁড়াইবে। কয়লার উৎপাদন ৫.৪৬ কোটি টন হইতে বাড়িয়া হইবে ৯.৭ কোটি টন।

(৭) পরিবহণ ও সংসরণের ক্ষেত্রে রেলপথের মালবহনের ক্ষমতা ১৫.৪ কোটি টন হইতে বাড়িয়া ২৪.৫ কোটি টনে পৌছিবে। ২৪০০ কিলোমিটার নূতন রেলপথ নির্মিত হইবে। পথঘাটের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে এবং জাহাজী শক্তির পরিমাণ ২ লক্ষ টনের মত বৃদ্ধি পাইবে।

(৮) সমাজসেবার ক্ষেত্রে ৬-১১ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন ও অন্যান্য ব্যবস্থার ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৪৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ছাড়া কারিগরি শিক্ষা বিশেষ সম্প্রসারিত হইবে এবং চিকিৎসা, গৃহনির্মাণ প্রভৃতির অধিকতর সুব্যবস্থা করা হইবে। পরিকল্পনায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও ব্যাপকতর আকার ধারণ করিবে।

(৯) ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে।

(১০) ব্যক্তিগত ভোগের ক্ষেত্রে মাথাপিছু বস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ বাৎসরিক

১৫·৫ গজ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৭·২ গজে দাঁড়াইবে এবং খাদ্যের ক্যালোরি-মূল্য ২১০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৩০০তে পৌছিবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যকালীন হিসাবনিকাশ (Mid-term Appraisal of the Third Plan): ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে প্রত্যাশিত অগ্রগতির একটি বিবরণী প্রকাশ করা হয়। বিবরণীটি মধ্যকালীন হিসাবনিকাশ (Mid-term appraisal) নামে অভিহিত। এই বিবরণী অনুসারে প্রথম তিন বৎসরে (১৯৬১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৬৪ সালের মার্চ পর্যন্ত) মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৪২০০ কোটি টাকা বা পাঁচ বৎসরের মোট ব্যয়ের শতকরা ৫৬ ভাগ হইবার কথা। বাকী ৪৪ ভাগ ব্যয় পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরের মধ্যে মোটামুটি সমবণ্টিত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

ব্যয়

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে মোট শিল্পজ দ্রব্যের উৎপাদন প্রায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত, এ্যালুমিনিয়াম, খনিজ তৈল, সিমেণ্ট ও রসায়ন শিল্পের উৎপাদনবৃদ্ধিই ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের মধ্যে ইস্পাত-পিণ্ডের উৎপাদন ৩৩ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৫৪ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। তৃতীয় বৎসরের শেষে উহা ৫৭ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে আশা করা হইয়াছে। এই তিন বৎসরের মধ্যে সিমেণ্টের উৎপাদন ৭৮ লক্ষ টন হইতে ৯৩ লক্ষ টনে এবং কয়লার উৎপাদন ৫·৫৫ কোটি মেট্রিক টন হইতে প্রায় ৭ কোটি মেট্রিক টনে পরিণত হইবে, ধরা হইয়াছে। তুলাবস্ত্র ও পাটজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন-বৃদ্ধি অনুমান করা হইয়াছে যথাক্রমে ১৫ কোটি গজ ও ১·৪ কোটি গাঁইটের মত।*

শিল্পজ উৎপাদনবৃদ্ধি

এইভাবে প্রকৃত উৎপাদনবৃদ্ধি ছাড়াও তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং যন্ত্রপাতি-নির্মাণ শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা (installed capacity) বিশেষ সম্প্রসারিত হয়, নাংগল সার তৈয়ারির কারখানায় উৎপাদন সুরু হয়, দুইটি নূতন কয়লা ধৌতকরণ কারখানা স্থাপিত হয় এবং নূনমাটির তৈল শোধনাগারে (oil refinery) কাজ সুরু হয়।

পরিবহণ ও সংসরণের ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই খাতে বরাদ্দ শতকরা ৭০ ভাগের অধিক প্রথম তিন বৎসরে ব্যয়ের জন্য ধার্য হয়। রেলপথের ক্ষেত্রে প্রথম দুই বৎসরে বাৎসরিক ওয়াগন নির্মাণের সংখ্যা ১৯ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৫ হাজারের কাছাকাছি দাঁড়ায়, ১৪০৫ কিলোমিটার রেলপথে দুইটি করিয়া

পরিবহণ ও সংসরণ

* এই পৃষ্ঠার শিল্পজ উৎপাদনের হিসাবের সহিত পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হিসাবের কিছুটা অসংগতি দেখা যাইবে। কারণ, পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার হিসাব হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উৎপাদনের প্রাথমিক হিসাব (preliminary estimates) এবং এই পৃষ্ঠার হিসাব হইল চূড়ান্ত হিসাব (final estimates)।

লাইন পাতা হয় এবং ৮৬০ কিলোমিটার রেলপথের বৈদ্যুতিকরণ সমাপ্ত হয়। পরিকল্পনার এই তিন বৎসরে রাজপথ-উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করা হয় ২২০ কোটি টাকা। চৈনিক আক্রমণের দরুন জরুরী অবস্থায় পশ্চিমবংগ, বিহার ও আসামে রাজপথ-উন্নয়নের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

বৈদ্যুতিক শক্তি

বিবরণীটি অনুসারে ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ৫৬ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭৮ লক্ষ কিলোওয়াটের কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইবে এবং ইহার ফলে মোট ৩২০০০-এর মত গ্রাম ও সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। পরিকল্পনার বাকী ২ বৎসরে আরও ১১,০০০ গ্রাম ও সহর বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের সুযোগ পাইবে।

সেচ-ব্যবস্থা

ঐ প্রথম তিন বৎসরে সকল প্রকার সেচ-ব্যবস্থার দ্বারা সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ধরা হইয়াছে ১'১৪ কোটি একরে। ইহার মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারি সেচ-ব্যবস্থার অবদান হইবে ৪৫ লক্ষ একরের মত।

খাদ্যোৎপাদন

আবহাওয়ার প্রতিকূলতার দরুন প্রথম দুই বৎসরে কৃষিজ উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৬৩-৬৪ সালে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজ উৎপাদনের নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া না গেলেও মনে হয় পূর্ববর্তী বৎসরের (১৯৬২-৬৩ সাল) তুলনায় উভয়ই কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে।

সমাজসেবা

শিক্ষার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার বহু পরিমাণ বৃদ্ধি ছাড়াও জাতীয় বৃত্তি (national scholarships), কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতির অভূতপূর্ব প্রসার দেখা যায়।

কর্মসংস্থান

পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে ৫০ লক্ষের মত নূতন কর্মপ্রার্থীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে বলিয়া বিবরণীটিতে ঘোষিত হয়। এই কর্মসংস্থানের অনেকটা সম্ভব হয় চৈনিক আক্রমণজনিত জরুরী অবস্থার দরুন। পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই (১৯৬১-৬২ সাল) গ্রামীণ অর্ধ-বেকারত্বের বিরুদ্ধে দুইটি নূতন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। প্রথম ব্যবস্থাটি অনুসারে উন্নয়ন ব্লকসমূহে ব্যাপক গ্রামীণ নির্মাণকার্য (rural works) সুরু হয়, এবং দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি অনুসারে গ্রামীণ শিল্পসমূহের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

জাতীয় আয়

এইভাবে শিল্প, কৃষি, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি সকলের সম্প্রসারণ ঘটিলেও জাতীয় আয়ের কিন্তু অনুমিত বৃদ্ধি ঘটে নাই। প্রাথমিক হিসাব অনুসারে তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটে মাত্র শতকরা ২'১ ভাগ। তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল শতকরা ৭'১ ভাগ।

সংক্ষিপ্তসার

আধুনিক যুগ পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার যুগ। অপরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যই মানুষ পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকিয়াছে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রধানত দুই প্রকারের—(ক) সংরক্ষণ পরিকল্পনা, এবং (খ) উন্নয়ন পরিকল্পনা। উন্নত দেশের পরিকল্পনা প্রথম এবং ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। পরিকল্পনা আবার পূর্ণাংগ বা আংশিক হইতে পারে। আংশিক পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বলে।

অনগ্রসর কৃষি স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন সমস্যার কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া থাকে বলিয়া উন্নয়নকার্য কৃষি হইতে সুরু করিতে হয়। প্রথমে কৃষিকে সুসংগঠিত করিয়া পরে শিল্পোন্নয়নে মনোযোগ দিতে হইবে। সংগে সংগে অবশ্য পরিবহণের সুব্যবস্থা, সুদৃঢ় মুদ্রা-ব্যবস্থা, ন্যায্য কর-পদ্ধতি প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার উপাদান : বলা যাইতে পারে, উন্নয়ন পরিকল্পনার উপাদান প্রধানত তিনটি—

(ক) কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য কৃষির সুসংগঠন ;

(খ) সুষম (balanced) শিল্পোন্নয়ন ;

(গ) পরিবহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান প্রভৃতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্যের সম্প্রসারণ।

(ক) কৃষির সুসংগঠন : ইহার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে—যথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ জোতের একত্রিকরণ, ভূমিস্বত্ব-ব্যবস্থার সংস্কার, ঋণ-ব্যবস্থা ও বিক্রয়-ব্যবস্থার সংগঠন ইত্যাদি। ইহা ছাড়া কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে হইবে।

(খ) সুষম শিল্পোন্নয়ন : ইহার জন্য মুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প এবং যন্ত্রশিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে হইবে। সকল প্রকার যন্ত্রচালিত শিল্প যাহাতে গড়িয়া উঠে সে-দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে।

(গ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবাকার্যের সম্প্রসারণ : এই সকল সেবাকার্যকে সামাজিক মূলধনও বলা হয়। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বাসস্থান ব্যবস্থা প্রভৃতি।

ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা : ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা। ১৯৫১-৫২ সাল হইতে ইহার যুগ সুরু হইয়াছে। বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য শেষ হইয়া তৃতীয় পরিকল্পনার সময় চলিতেছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ২৩৫৬ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়। তন্মধ্যে ১৯৬০ কোটি টাকা ব্যয়িত হয় ; ইহাতে কৃষি, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে ব্যাপকতর। প্রথমে অবশ্য যে-আকারে এই পরিকল্পনা প্রস্তুত হয় তাহার কিছু রদবদল করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল চারিটি : ১। উন্নয়নের দ্রুততর গতি, ২। শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি, ৩। নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ, এবং ৪। সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত।

মূল পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৪৮০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ২৪০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়।

এই পরিকল্পনার নানাভাবে সমালোচনা করা হইয়াছিল—১। ইহা ছিল উচ্চাকাংক্ষা দোষে দুষ্ট ; ২। কৃষি হইতে গুরুত্ব সরাইয়া লইয়া শিল্পে আরোপ করা ভুল হইয়াছিল ; ৩। অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এই শেষোক্ত ত্রুটির জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যকর করিবার বিশেষ অসুবিধা দেখা দেওয়ায় পরিকল্পনাকে ক এবং খ এই দুই অংশে বিভক্ত করা হয়। ক-অংশের জন্য ব্যয়বরাদ্দ হয় ৪৫০০ কোটি টাকা। এই ৪৫০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত যদি কিছু সংগৃহীত হয় তবেই খ-অংশে হাত দেওয়া হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রথমে অনুমান করা হইয়াছিল যে, মোট ৪৫০০ কোটি টাকাই ব্যয় করা সম্ভব হইবে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৪৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের বিনিয়োগ আবার প্রাথমিক অনুমানকে (২৪০০ কোটি টাকা) ছাড়াইয়া ৩১০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

দশ বৎসরের পরিকল্পনার হিসাবনিকাশ: প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার দশ বৎসরে অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি কি পরিমাণ উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে তাহার একটি প্রাথমিক হিসাব তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রদত্ত হইয়াছে। এই দশ বৎসরে মোট বিনিয়োগ ১০,১১০ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ১১,৪৬০ কোটি টাকা হইয়াছিল বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে মোট জাতীয় আয় শতকরা ৪২ ভাগ এবং মাথাপিছু আয় শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এইরূপ হিসাব করা হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের অনুমিত বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এ-বিষয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় নাই। লৌহ ও কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যেও পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই। তবে আশা করা যাইতেছে যে তৃতীয় পরিকল্পনার কিছুদিনের মধ্যেই সকল লক্ষ্য অতিক্রম করা সম্ভব হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নিয়োগের অবস্থা ক্রমশই মন্দের দিকে যায়। ফলে তৃতীয় পরিকল্পনায় নিয়োগের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিও রোধ করিতে পারা যায় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনায় এ-বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে।

এইরূপ আংশিক অসফলতা সত্ত্বেও প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সম্প্রসারণের গতি সত্যই প্রশংসনীয়। আশা করা হইয়াছে, এই দশ বৎসরে কৃষিজ উৎপাদন শতকরা ৪১ ভাগ এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন শতকরা ৪৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়, সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও অর্থ-ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা: চূড়ান্ত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসে। প্রস্তাবনায় তৃতীয় পরিকল্পনাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত হইত না।

উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য: তৃতীয় পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য পাঁচটি—১। বাৎসরিক ৫ ভাগ বা তাহার কিছু অধিক হারে (প্রায় ৬% হারে) জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিসাধন করা, ২। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা এবং বাণিজ্যিক শস্যেরও পর্যাপ্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করা, ৩। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেশের অভ্যন্তরেই উৎপাদন করা, ৪। জনশক্তির সদ্ব্যবহার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগসুবিধার বৃদ্ধিসাধন করা, ৫। সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থার পথে আরও একপদ অগ্রসর হওয়া। বৈশিষ্ট্য—১। তৃতীয় পরিকল্পনা আকারে স্বাভাবিকভাবেই বৃহত্তর হইয়াছে; ২। ইহাতে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট ব্যয় ও ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে ৫০০ কোটি টাকার উপর ফাঁক রাখা হইয়াছে; ৩। ইহাতে আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের জন্য কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে; ৪। ইহাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হইবে; ৫। সামাজিক গঠনের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসাধন করা হইবে; ৬। নগর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্য এবং আঞ্চলিক সমতা আনয়নের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইবে; ৭। দ্রব্যমূল্য স্থিতিকরণের ব্যবস্থাও করা হইবে; ৮। এই পরিকল্পনায় চতুর্থ পরিকল্পনার উৎপাদন ও উন্নয়ন লক্ষ্যও মোটামুটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

পরিকল্পনায় মোট ১১,৬০০ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সরকারী খাতে বরাদ্দের পরিমাণ হইল ৭৫০০ কোটি টাকা। উক্ত ৭৫০০ কোটি টাকার মধ্যে বিনিয়োগ-ব্যয়ের পরিমাণ ৬৩০০ কোটি টাকা; বাকী ১২০০ কোটি টাকা চলতি ব্যয়ের জন্য। এইরূপ বিনিয়োগের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সকল উন্নয়ন সংঘটিত হইবে তাহাও অনুমান করা হইয়াছে।

পরিকল্পনা তিনটির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা: মোটামুটি পাঁচটি দিক হইতে তৃতীয় পরিকল্পনা ও প্রথম দুই পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় পরিকল্পনা (১) আকারে বৃহত্তম: (২) ইহাতে

সম্প্রসারণের গতিবৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরশীলতার উপর দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে ; (৩) কৃষি অগ্রাধিকার হইলেও শিল্প উপেক্ষিত হয় নাই ; (৪) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সমাজসেবা ইত্যাদির উপর সম্যক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে ; (৫) এই পরিকল্পনাকে পরবর্তী ১০ বৎসরের পরিকল্পনার অধ্যায় হিসাবেই দেখা হইয়াছে।

মধ্যকালীন হিসাবনিকাশ : তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে প্রত্যাশিত অগ্রগতির একটি বিবরণী প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা 'মধ্যকালীন হিসাবনিকাশ' নামে অভিহিত। ইহা হইতে দেখা যায় যে শিল্প ও সমাজসেবার সম্প্রসারণ উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটিলেও কৃষিজ উৎপাদন বা জাতীয় আয় আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই।

প্রশ্নোত্তর

1. What is Development Planning ? Indicate the role of the Government in it.

উন্নয়ন পরিকল্পনা কাহাকে বলে ? এই পরিকল্পনায় সরকারের ভূমিকা কি হইবে ব্যাখ্যা কর।

[ইংগিত : পরিকল্পনা-প্রবণতা একরূপ বিশ্বজনীন হইলেও বিভিন্ন দেশের পরিকল্পনার রূপের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। উন্নত দেশসমূহের পরিকল্পনা হইল সংরক্ষণ পরিকল্পনা এবং স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনা হইল উন্নয়ন পরিকল্পনা। ভারতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উন্নয়ন পরিকল্পনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।....এবং (২৩৬-২৩৭ পৃষ্ঠা)]

2. Give in brief the aims and objectives of India's Five Year Plans. (P. U. 1961)

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহের উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[২৪০-২৪১, ২৪২-২৪৪, ২৫১-২৫৩ এবং ২৫৭-২৫৮ পৃষ্ঠা]

3. Give in brief the achievements and failures of the First and Second Plans. (B. U. 1961)

সংক্ষেপে প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার হিসাবনিকাশ প্রদান কর। [২৪৮-২৫১ পৃষ্ঠা]

4. What do you understand by economic planning ? Indicate the progress of the Indian Economy under the first two Five Year Plans.

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝ ? প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে ভারতের অর্থব্যবস্থা কতটা উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহা দেখাও। [২৩৫-২৩৬ এবং ২৪৮-২৫১ পৃষ্ঠা]

5. Give a brief outline of the Third Five Year plan. (En. 1962)

সংক্ষেপে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিচয় দাও। [২৫১-২৫৫ এবং ২৫৭ পৃষ্ঠা]

6. Describe the main features of our Third Five Year Plan. In what respects, if any, does the plan differ from the two previous Plans ?

ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। এই তৃতীয় পরিকল্পনা পূর্ববর্তী পরিকল্পনা দুইটি হইতে কোন দিক দিয়া পৃথক কি না তাহা দেখাও।

[২৫৩-২৫৫ এবং ২৫৭-২৫৮ পৃষ্ঠা]

7. Describe the objects of the India's Third Five Year Plan. (P. U. 1963)

ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি বর্ণনা কর। [২৫১-২৫৩ এবং ২৫৮ পৃষ্ঠা]

8. Briefly describe the progress of our economy during the first three years of the Third Plan.

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে আমাদের অর্থ-ব্যবস্থার কতদূর উন্নয়ন হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [২৬০-২৬১ পৃষ্ঠা]

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন পরিকল্পনায় কৃষি, সমবায় ও শিল্পের উন্নয়ন

(Development of Agriculture, Cooperation and Industries under the Plans)

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি, সমবায় ও শিল্পের ক্ষেত্রে অবলম্বিত উন্নয়ন-ব্যবস্থার বিশদ বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল :

(ক) কৃষির উন্নয়ন (Development of Agriculture) : প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপের বিভিন্ন কারণ ছিল। প্রথমত, স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি হইতেই উন্নয়নকার্য শুরু করিতে হয়।

কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ ও ইহার কারণ

দ্বিতীয়ত, প্রথম পরিকল্পনা যখন প্রবর্তন করা হয় তখন দেশে ছিল দারুণ খাদ্যাভাব। সুতরাং খাদ্য-সমস্যার আশু সমাধান করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। দেশের লোককে অভুক্ত অবস্থায় বা অর্ধাহারে রাখিয়া কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাকে যে সফল করা যায় না ইহা উপলব্ধি করিয়াই কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। তৃতীয়ত, পাকিস্তান সৃষ্ট হওয়ার ফলে ভারতে পাট ও তুলার উৎপাদন বিশেষ কমিয়া গিয়াছিল। ইহাতে কাপড়ের কল ও পাটকলগুলি কাঁচামালের অভাবে আংশিকভাবে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সুতরাং কৃষির উন্নয়নের দ্বারা তুলা ও পাটের উৎপাদনবৃদ্ধিরও প্রয়োজন ছিল।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির বিশেষ অগ্রগতি সম্ভব হয়। ঐ সময়ের মধ্যে মোট কৃষিজ উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগের উপর বৃদ্ধি পায় ; খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির হার আবার উহাকে ছাড়াইয়া যায়। ১৯৫০-৫১ সালে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ছিল ৫·২২ কোটি টন ; ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা ৬·৫৮ কোটি টনে দাঁড়ায়।

এইরূপ কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির দরুন দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথমে কৃষির পর্যাপ্ত উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে এবং খাদ্য-সমস্যার একরূপ সমাধান হইয়াছে মনে করিয়া কৃষির উপর হইতে গুরুত্ব সরাইয়া লওয়া হয়। পরে আবার খাদ্যসংকট হেতু উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্যের কিছু কিছু পরিবর্তনসাধন করা হয়। প্রথমে স্থির হইয়াছিল ১৯৫৫-৫৬ সালে যতটা উৎপাদন হইয়াছিল তাহার তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১৫ ও ২১ ভাগ অধিক খাদ্যশস্য ও মোট কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হইবে। পরে ঠিক করা হয় যে খাদ্যশস্যের ২৫ শতাংশ ও মোট কৃষিজ পণ্যের ২৮ শতাংশ উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে হইবে।

এই লক্ষ্যে কিন্তু পৌঁছানো যায় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৮·৫ কোটি টন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উৎপন্ন হইয়াছিল ৭·৯ কোটি টন। অন্যান্য শস্যের ক্ষেত্রেও উৎপাদন লক্ষ্য অপেক্ষা মোটামুটি কম হইয়াছিল।

আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের (self-sustaining growth) উদ্দেশ্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় আবার কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের শতকরা ৩২ ভাগ এবং অন্যান্য শস্যের শতকরা ৩১ ভাগ উৎপাদন-বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।

এই তিন পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের জন্য যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ও হইতেছে তাহার মধ্যে জলসেচ, উন্নত ধরনের বীজ ও সার প্রয়োগ, জাপানী প্রথায় ধান চাষ, ট্রাক্টর প্রভৃতি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, সমবায়-ব্যবস্থার প্রসার এবং সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা—এই কয়টিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা সমাজোন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কৃষি-সম্প্রসারণের (agricultural extension)—অর্থাৎ, উন্নততর পদ্ধতিতে কৃষিকার্য সম্পর্কিত জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কৃষির উন্নয়নের পদ্ধতি

(খ) জলসেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি (Irrigation and Power): কৃষির উন্নয়নের জন্য জলসেচ-ব্যবস্থা অপরিহার্য। এই কারণেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জলসেচ-ব্যবস্থার প্রতি সমধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাতেও এই গুরুত্ব হ্রাস করা হয় নাই।

ভারতে চারি প্রকারের সেচ-ব্যবস্থা দেখা যায়—যথা, কূপ, নলকূপ, পুষ্করিণী এবং খাল। কূপ, নলকূপ এবং পুষ্করিণীর সাহায্যে যে সেচকার্য করা হয় তাহাকে ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা (minor irrigation works) বলে। খাল হইতে সেচ-ব্যবস্থা মাঝারি ধরনের (medium) বা বৃহৎ (major) হইতে পারে।

বিভিন্ন প্রকারের সেচ-ব্যবস্থা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে-সকল বৃহৎ সেচ-ব্যবস্থার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্পন্ন করা হয় তাহাদের অনেকগুলিই হইল বহু-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট (multipurpose)। অর্থাৎ, এগুলি হইতে সেচের ব্যবস্থা ছাড়াও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যানিরোধ, নৌ-চলাচলের জন্য খাল খনন প্রভৃতি করা যায়। নদীর উপত্যকায় বাঁধ বাঁধিয়াই এরূপ করা হয় বলিয়া এই ব্যবস্থাকে বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা (multipurpose river valley projects) বলা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ব হইতেই ভাকরা-নাংগল, দামোদর প্রভৃতি কতকগুলি নদী-উপত্যকার কার্য সুরু করা হইয়াছিল। এগুলিকে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহাদের সহিত আবার চম্বল, কোশী, রাইহান্দ, কয়না ও কৃষ্ণা—এই পাঁচটি নূতন বহুমুখী এবং কাকড়াপাড়া সেচ-পরিকল্পনা যোগ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে আবার যুক্ত হয় রাজস্থান খাল পরিকল্পনা (Rajasthan

বিভিন্ন বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা

Canal Project) এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ছোটখাট পরিকল্পনা। নিম্নে প্রধান প্রধান নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।*

ভাকরা-নাংগল পরিকল্পনা (Bhakra-Nangal Project): ইহা পাঞ্জাবে অবস্থিত। শেষ পর্যন্ত ইহা হইতে পাঞ্জাব ও রাজস্থানে ৩৬ লক্ষ একর জমি সেচ-সমন্বিত হইবে এবং প্রায় ৮ লক্ষ কিলোওয়াটের মত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে।

দামোদর পরিকল্পনা (Damodar Valley Project): খেয়ালী দামোদর এবং উহার উপনদীগুলিতে বাঁধ বাঁধিয়া বিহার ও পশ্চিমবংগের একাংশে বন্যা-নিরোধ, জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন হইল ইহার উদ্দেশ্য। শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা হইতে ১১'৫ লক্ষ একরের মত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ও ২'৫ লক্ষ কিলোওয়াটের মত জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে।

মহানদী পরিকল্পনা (Mahanadi Valley Project): মহানদী উপত্যকায় হীরাকুঁদ, টিকারাপাড়া এবং নারাজ এই তিনটি স্থানে বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে হীরাকুঁদ বাঁধের কাজ প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়েই মোটামুটি শেষ হয়। হীরাকুঁদ হইতে শেষ পর্যন্ত ৬'৭২ লক্ষ একর জমিতে সেচ এবং ১'২৩ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য বাঁধ হইতে ১৮'৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ১'৫ লক্ষ কিলোওয়াটের মত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

চম্বল পরিকল্পনা (Chambal Project): ইহা রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। প্রথম পরিকল্পনায় ইহার কার্য সুরু করা হয়। ইহাতে ১১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং ৮০-৯০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হইবে।

কুশী পরিকল্পনা (Kosi Project): কুশী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য উত্তর বিহারে বন্যানিরোধ। ইহা হইতে অবশ্য ১৪ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থাও হইবে।

রাইহান্দ বাঁধ পরিকল্পনা (Rihand Dam Project): ইহা উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জিলায় অবস্থিত। শেষ পর্যন্ত ইহা হইতে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে ২'৫ লক্ষ কিলোওয়াটের মত বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ১৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হইবে।

কয়না পরিকল্পনা (Koyna Project): ইহা বর্তমানে মহারাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থিত। এই পরিকল্পনার বিদ্যুৎ উৎপাদনশক্তি প্রায় ২'৪ লক্ষ কিলো-ওয়াটের মত।

কৃষ্ণা পরিকল্পনা (Krishna Project): দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা নদীর উপরে নাগার্জুনসাগর নামক স্থানে বাঁধ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা প্রধানত সেচ-পরিকল্পনা। ইহা হইতে অন্ধ্র রাজ্যে শেষ পর্যন্ত ২০ লক্ষ একরের মত জমিতে জলসেচ করা হইবে।

* বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচকার্যের পরিবর্তিত হিসাব দেওয়া হইল।

কাকড়াপাড়া পরিকল্পনা (Kakrapara Project): ইহা প্রধানত সেচ-পরিকল্পনা। পরিকল্পনাটি বর্তমান গুজরাট রাজ্যের সুরাটে অবস্থিত। ইহা হইতে ৬.৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রাজস্থান খাল পরিকল্পনা (Rajasthan Canal Project): এই পরিকল্পনা অনুমোদিত হয় ১৯৫৭ সালে। ইহাতে শেষ পর্যন্ত ৪২৫ মাইল দীর্ঘ খাল দ্বারা শতদ্রু, বিপাশা ও ইরাবতীর জল পাঞ্জাব ও রাজস্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করা হইবে। ফলে রাজস্থানের মরুসদৃশ বিকানীর, জলশল্মীর, শ্রীগংগানগর জিলাসমূহ শস্যশ্যামল হইয়া উঠিবে। ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে রাজস্থান খাল পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধনকার্য করা হয়।

আর একটি বৃহৎ সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন পরিকল্পনা হইল গ্যাণ্ডক পরিকল্পনা (Gandak Project)। ইহা ভারত ও নেপাল সরকারের মধ্যে চুক্তি অনুসারে নেপাল সরকার, উত্তরপ্রদেশ সরকার ও বিহার সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত হইতেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সকল রকমের সেচ-ব্যবস্থা হইতে ২ কোটি একরের মত জমি সেচ-সমন্বিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও ২ কোটি একর জমিকে সেচের অধীনে আনিবার আশা করা হইয়াছে। ইহা সম্ভব হইলে সেচ-সমন্বিত জমির পরিমাণ ৭ কোটি একর হইতে ৯ কোটি একরে পৌঁছিবে।

(গ) সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Projects): বর্তমানে গ্রামীণ ভারতের সর্বাংগীণ সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা করা হইতেছে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে। এই পরিকল্পনাকে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাও বলা হয়। ইহার মূল বৈশিষ্ট্য হইল দুইটি—(ক) গ্রামবাসিগণকে তাহাদের নিজেদের সাহায্য করিতে সহায়তা করা, এবং (খ) গ্রামাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নতিসাধন করা।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার সূত্রপাত দেখিতে পাওয়া যায় ১৯৪৬ সালে। ঐ বৎসর উত্তরপ্রদেশের (তৎকালীন সংযুক্তপ্রদেশ) গোরক্ষপুর, এটওয়া ও সেবাগ্রামে এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের কতিপয় স্থানে ব্যাপকভাবে গ্রামোন্নয়নের ব্যবস্থা লইয়া পরীক্ষা সুরু করা হয়। পরীক্ষার সফলতায় উৎসাহিত হইয়া পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংগীভূত করিয়া ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে ইহার প্রবর্তন করে। ক্রমে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার পরিধি প্রসারিত হইতে থাকিলে ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রি-দপ্তরের সৃষ্টি করে। এই মন্ত্রিদপ্তর সমাজোন্নয়ন মন্ত্রি-পরিষদ (Ministry of

সূত্রপাত

Community Development) নামে অভিহিত হয়। পরে সমবায়ও এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইহা সমাজোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রিদপ্তর (Ministry of Community Development and Cooperation) নামে পরিচিত হয়।

সংগঠন

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার দায়িত্ব হইল রাজ্য সরকারের। ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে 'রাজ্য উন্নয়ন কমিটি' (State Development Committee) রহিয়াছে। রাজ্যের মধ্যে জিলাগুলিতে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকর করিবার জন্য রহিয়াছে 'জিলা পরিষদ' (Zila Parishads)। ইহার পরের স্তরে আছে 'ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি' (Block Panchayat Samitis)। সর্বশেষে গ্রামীণ স্তরে রহিয়াছে পঞ্চায়েত সমিতি

পঞ্চায়েত সমিতির উপর পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার মূল দায়িত্ব ন্যস্ত

(Panchayat Samitis) বর্তমানে এই পঞ্চায়েত সমিতির উপরই উন্নয়ন পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার মূল দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং সাধারণত ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি, জিলা পরিষদ প্রভৃতি উর্ধ্বতন সংস্থা সমন্বয়সাধন ও তদারক করিয়া, উপদেশ দিয়া এবং সাহায্য বণ্টন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে। গ্রাম-পঞ্চায়েত সমিতি মহিলা মহল, গ্রামীণ শিক্ষক, সমবায় সমিতি প্রভৃতির সহযোগে কার্য করে। এই পর্যায়ে গ্রামসেবকের ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোটামুটি প্রত্যেক ১০টি গ্রামের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন করিয়া গ্রামসেবক আছে। তাহার কার্য হইল দ্বারে দ্বারে গ্রামোন্নয়নের বার্তা বহন করিয়া বেড়ানো এবং গ্রামবাসিগণকে পরস্পরের সহযোগিতায় কার্য করিতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা। এই গ্রামসেবকের উপর সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য বিশেষ মাত্রায় নির্ভরশীল।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য হইল গ্রামীণ জীবনের সর্বাংগীণ উন্নয়ন। এই সর্বাংগীণ উন্নয়ন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল: (১) কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি, (২) গ্রামাঞ্চলের পথঘাটের উন্নতি-

উদ্দেশ্য

সাধন ও পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রসার, (৩) বেকার ও অর্ধ-নিয়োগ (underemployment) সমস্যার সমাধান, (৪) প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, (৫) জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, (৬) আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা, (৭) বাসস্থানের সুব্যবস্থা, এবং (৮) কুটির শিল্পের উন্নয়ন। এই বিষয়গুলির মধ্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিজ উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কারণ, কৃষির উন্নয়নের সমস্যার প্রশ্ন সমাধান করিতে পারিলেই অন্যান্য সমস্যা সহজ হইয়া দাঁড়াইবে। এই কারণে গ্রামীণ উৎপাদন পরিকল্পনার (village production plan) মাধ্যমে কৃষকদের উৎসাহিত করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। এই পরিকল্পনার কর্মসূচীর দুইটি প্রধান বিষয় হইল: (১) ঋণ সার বীজ

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সংগঠন

কেন্দ্রীয় সরকার

সমাজোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রিদপ্তর

↓

রাজ্য সরকার

রাজ্য উন্নয়ন কমিটি

মুখ্যমন্ত্রী, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক দপ্তরের মন্ত্রিগণ ও উন্নয়ন কমিশনার লইয়া গঠিত

↓

জিলা

জিলা পরিষদ

ব্লক পঞ্চায়েত সমিতিগুলির সভাপতিগণ এবং জিলা হইতে প্রেরিত পার্লামেন্ট ও রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ লইয়া গঠিত

↓

ব্লক

ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি

গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভাপতিগণ এবং অনুন্নত ও তপশীলভুক্ত শ্রেণী প্রভৃতির প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত

ব্লক পঞ্চায়েতের কার্যভার ব্লক উন্নয়ন কর্মচারী ও ৮জন সম্প্রসারণ কর্মচারীর উপর ন্যস্ত

↓

গ্রাম

পঞ্চায়েত

গ্রামসেবক

প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা করা ; (১) কৃষিক্ষেত্রে সেচের জলের ব্যবস্থার জন্য খননকার্য, বাঁধ দেওয়া, গ্রামের পুষ্করিণী সংরক্ষণ, প্রভৃতি।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার মূল দায়িত্ব গ্রামীণ পঞ্চায়েত সমিতির উপর ন্যস্ত হইলেও কর্মসূচী প্রণীত হয় ব্লকের ভিত্তিতে। এক একটি ব্লক ৬০-৭০ হাজার লোক ও ১৫০-২০০ বর্গমাইল আয়তন-সমন্বিত মোটামুটি ১০০ গ্রাম লইয়া গঠিত হয়। ব্লকের অন্তর্ভুক্ত গ্রামীণ পঞ্চায়েতগুলি কর্মসূচীকে ঠিকমত রূপ দিতেছে কি না, ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি তাহার তদারক করে। অতএব, ব্লকই উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন এবং শেষ পর্যন্ত উহাকে সফল করিবার জন্য দায়ী। এইরূপ প্রত্যেক ব্লকের পরিকল্পনা লইয়া জিলার পরিকল্পনা এবং সকল জিলার পরিকল্পনা লইয়া রাজ্যের সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যক্রম প্রস্তুত হয়।

দুইটি বর্তমান বৈশিষ্ট্য :

১। উন্নয়ন কর্মসূচীর একক হইল ব্লক
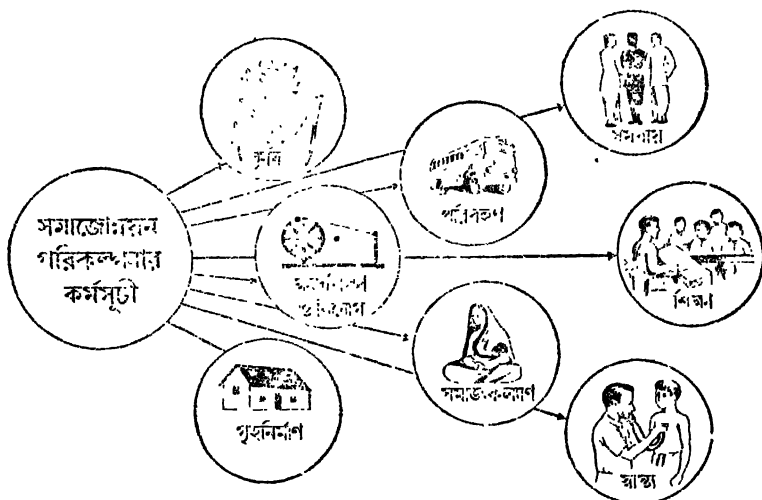
এখানে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল গ্রামীণ পঞ্চায়েত সমিতি, ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি এবং জিলা পরিষদ—এই তিনটি সংস্থাই জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। অতএব, বর্তমানে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপদানের ভার জনসাধারণের সংগঠনসমূহের (people's organisations) হস্তেই ন্যস্ত। এই ব্যবস্থাকে 'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ' (democratic decentralisation) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের জন্যই পঞ্চায়েত-গুলিকে নূতনভাবে গড়িয়া পঞ্চায়েতী রাজের (Panchayati Raj) প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

২। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ ও পঞ্চায়েতী রাজ

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে গ্রামোন্নয়নের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। ব্রিটিশ আমলেও কিছু কিছু গ্রামোন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে নাই। ইহার কারণ হইল, কখনই সামগ্রিকভাবে গ্রামোন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হয় নাই; মাত্র বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামীণ জীবনের ত্রুটিসমূহ দূর করার চেষ্টা করা হইয়াছে। কখনও বা কৃষির উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে; কখনও বা কিছু পথঘাট নির্মাণ করা হইয়াছে; কখনও বা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে; কখনও বা শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনা করা হইয়াছে; ইত্যাদি। এই সকল প্রচেষ্টার মধ্যে সামঞ্জস্য বা সংহতি কোনকালেই ছিল না। ফলে ভারতের গ্রামীণ জীবন সংহতভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত, পূর্বে সকল প্রচেষ্টাই করা হইয়াছে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমে। তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দপ্তরখানায় বসিয়া আদেশ প্রদান করিয়াছেন, বড় জোর তাঁবু ফেলিয়া পুলিস লোকজন লইয়া সমারোহের সহিত গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা কখনও গ্রামবাসিগণকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করেন নাই, গ্রামবাসীদিগকে কাছেও ডাকেন নাই। ইহার ফলে গ্রামবাসিগণ একরূপ ধরিয়া লইয়াছিল যে গ্রামোন্নয়ন সরকারের কর্তব্য।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার স্বরূপ

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা এই দৃষ্টিভংগিরই পরিবর্তনসাধন করিতে চায়। মাত্র সরকারী প্রচেষ্টার দ্বারা যে গ্রামোন্নয়ন কার্য সম্যকভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না, ইহাই সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং প্রয়োজন হইল গ্রামবাসীদের সমধিক সহযোগিতা। তাহারা সরকার হইতে অর্থ-সাহায্য পাইবে, উপদেশ পাইবে সত্য; কিন্তু তাহাদিগকে নিজস্ব প্রচেষ্টা দ্বারা সুন্দর গ্রাম-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৫৯ সালের পর্যবেক্ষণ দলের (Study Team) সুপারিশ অনুযায়ী 'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ' ও 'পঞ্চায়েতী রাজ' প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। দ্বিতীয়ত, বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামীণ জীবনের এদিক-ওদিকের উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা করিলে তাহা বিফল হইতে বাধ্য, কারণ গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন দিক পরস্পরের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। সুতরাং সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা দ্বারা একই সংগে গ্রামীণ জীবনের সকল সমস্যাকে আক্রমণ করিতে হইবে। কৃষির উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শিক্ষাবিস্তার, বাসস্থানের সুব্যবস্থা, পথঘাট নির্মাণ—কোন কিছুকেই বাদ দিলে চলিবে না। পরিশেষে, গ্রামবাসীদের গ্রামোন্নয়ন কার্যে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিবে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নহে—সাধারণ গ্রামসেবক। এই গ্রামসেবক গ্রামে গ্রামে সকলের সহিত মিশিয়া তাহাদের আপন করিয়া লইবে, তাহাদিগকে কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবে, তাহাদের জন্য নব জীবনের বার্তা বহন করিয়া আনিবে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য

গ্রামসেবক ও তাহার ভূমিকা

যে, এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই গান্ধীজি গ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার উপদেশ দিয়াছিলেন এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে নূতনভাবে পল্লী-উন্নয়নের কাজ সুরু করিয়াছিলেন।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত সম্পর্কিত আর একটি বিষয় হইল জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (National Extension Service)। ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস অবধি কোন সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রে কাজ সুরু করিবার পর উহাকে তিন বৎসর যাবৎ জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাধীনে রাখা হইত। অর্থাৎ, ঐ সময় ধরিয়া গ্রামসেবকের মাধ্যমে ও অন্যান্যভাবে উৎসাহ, পরামর্শ প্রভৃতি দ্বারা উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইত। এইভাবে উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে পর ঐ সম্প্রসারণ সেবাকেন্দ্রকে পুরাপুরি সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা-কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হইত। অতএব, ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসের পূর্ব পর্যন্ত সমাজোন্নয়নের দুইটি পর্যায় ছিল—যথা, সম্প্রসারণ সেবার অপেক্ষাকৃত অগভীর উন্নয়ন পর্যায় (less intensive phase of development), এবং সমাজোন্নয়নের গভীর বা আত্যন্তিক উন্নয়ন পর্যায় (intensive phase of development)।

সমাজোন্নয়নে ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা

উক্ত তারিখ হইতে সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সেবার পার্থক্য দূর করা হইয়াছে। বর্তমানে সমাজোন্নয়ন ব্লক খুলিবার পূর্বে এক বৎসর ধরিয়া সংশ্লিষ্ট ব্লককে প্রাক্-উন্নয়ন পর্যায়ে (pre extension phase) রাখা হয়। এই অবস্থায় কৃষির উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি সাধারণ বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীরা উৎসাহ দেখাইলে ঐ ব্লককে সরাসরি সমাজোন্নয়ন কেন্দ্রে পরিণত করা হয়।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অপসারণ

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ সুরু হয় ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসের ২রা তারিখে। ১০½ বৎসর পরে—অর্থাৎ, ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে প্রায় ৩৩ কোটি জনসংখ্যা বা গ্রামবাসীদের শতকরা ৯৯ ভাগ এবং ৫.৫৫ লক্ষ গ্রাম সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাধীনে আসে। ঐ সময় ব্লকের সংখ্যা ছিল ৫১৪৯টি।*

সমাজোন্নয়নের প্রসার

মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ভারতের সমগ্র গ্রামবাসীকে পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যেই সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে আনয়ন করা। পরে ঐ লক্ষ্যকে পিছাইয়া ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে লইয়া যাওয়া হয়। এই লক্ষ্য যে সাধিত হইয়াছে উপরের আলোচনা হইতে তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং, তৃতীয় পরিকল্পনার ঠিক মাঝামাঝি সময়ে বা সুরু হইতে ঠিক ১১ বৎসর পরে ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চল সমাজোন্নয়নভুক্ত হয়।

* Report of the Ministry of Community Development and Cooperation for 1962-63

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মূল্যায়ন (Evaluation of the Community Projects): ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত, কৃষিপ্রধান দেশে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সম্ভাবনা অপরিমেয় বলিলেও চলে। কিন্তু দেখা যায় যে, ভারতের সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা-কেন্দ্রগুলি বিশেষ সফল হইতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ হইল পরিচালনাগত ত্রুটি। এই ত্রুটি দূর করা আশু প্রয়োজন। নচেৎ, এই অভূতপূর্ব ও সম্ভাবনাপূর্ণ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বিফল হইবে। বর্তমানে পুনর্গঠনের দ্বারা এই সকল ত্রুটি দূরিকরণের প্রচেষ্টাই চলিতেছে। ইহার উপর তৃতীয় পরিকল্পনায় যে একপ্রকার ব্লকগুলিকেই কেন্দ্র করিয়া রাজ্যগুলি উন্নয়নকার্যে অগ্রসর হইতেছে, ইহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

(ঘ) সমবায়ের উন্নয়ন (Development of Cooperation): ব্যবসায় সংগঠনের রূপ হিসাবে সমবায়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, ভারতের ন্যায় দেশে কৃষির ক্ষেত্রে সমবায়কে অপরিহার্য বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। কৃষি ছাড়া ক্ষুদ্র শিল্পেও সমবায়-ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর; এমনকি মাঝারি ধরনের শিল্পগুলিও সমবায়ের ভিত্তিতে সার্থকভাবে গঠিত হইতে পারে। ইহা ছাড়া ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়, মধ্যবিত্তদের ঋণ-ব্যবস্থা প্রভৃতিতে সমবায়ের সক্রিয় ভূমিকা রহিয়াছে।*

সমবায়ের উপযোগিতা

ভারতে সমবায় আন্দোলন সুরু হয় অর্ধ-শতাব্দীরও পূর্বে—১৯০৪ সালে। তখন উদ্দেশ্য ছিল ইহার মাধ্যমে দরিদ্র কৃষকদের অবস্থার উন্নতিসাধন। তারপর কৃষক ছাড়াও ক্ষুদ্র কারিগর ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের এই আন্দোলনের মধ্যে লইয়া আসা হয়। কিন্তু অর্ধ-শতাব্দী পরেও ভারতে সমবায় আন্দোলন তেমন সফল হয় নাই। কৃষি-ঋণদান সমিতি সংখ্যায় বহু হইলেও তাহারা মোট কৃষি ঋণের মাত্র শতকরা ৩ ভাগ যোগান দেয়। সমবায় সমিতির সুদের হারও অত্যধিক। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র চাষীদের পক্ষে সমবায় সমিতি হইতে ঋণ পাওয়া একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহ ব্যাপারেও ভারতের সমবায় সমিতিগুলি বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য সম্পাদন বা ক্ষুদ্র শিল্পসংগঠন কোনটাই উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয় নাই। মোটকথা, ভারতের সমবায় আন্দোলন উন্নততর কৃষিকার্য, উন্নততর ব্যবসায় এবং উন্নততর জীবনযাত্রা (better farming, better business and better living) সমবায়ের এই তিনটি লক্ষ্যের একটিকেও সার্থক করিয়া তুলিতে পারে নাই।

ভারতে সমবায়ের অসফলতা

এই অসফলতার মূলে আছে সমবায়ের নীতি ও আদর্শের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার অভাব এবং ইহাদের কার্যকর করিয়া তুলিবার অক্ষমতা। দেখা যায় যে এ-দেশে অধিকাংশ সমবায় সমিতিতেই 'প্রত্যেকে সকলের জন্য' কর্ম করে না; বরং অধিকাংশই

অসফলতার কারণ

---

* ৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।

নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য কার্য করে। ফলে নিজেদের আত্মীয়স্বজনের প্রতি পক্ষপাত, ঝগড়া-বিবাদ, মিথ্যা হিসাব প্রদর্শন প্রভৃতি সমবায় সমিতির বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, সমবায় সংগঠন সুপরিচালিত করিবার জন্য যে শিক্ষা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয় আমাদের দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার অভাব রহিয়াছে।

ইহার উপর অবশ্য মহাজনদের প্রতিযোগিতার জন্য সমবায় সমিতির কার্য ব্যাহত হইয়াছে। ফলে সবিশেষ সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভারতে সমবায় সংগঠন বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই।

ভারতে সমবায়ের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

কিন্তু আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, মাঝারি ধরনের শিল্প প্রভৃতি উন্নয়ন যে প্রধানত সমবায়ের মাধ্যমেই করিতে হইবে তাহা উপলব্ধি করিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায়ের পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে গ্রামীণ ঋণ জরিপ কমিটি (Rural Credit Survey Committee) নামে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। কমিটি গ্রামীণ ঋণ-ব্যবস্থার একটি পূর্ণাংগ পরিকল্পনা (Integrated Scheme of Rural Credit) প্রস্তুত করে।

প্রথম পরিকল্পনায় সমবায়ের পুনর্গঠন

পরিকল্পনার মূল বিষয় হইল এইরূপ: (ক) সকল প্রকার সমবায় সমিতিতে রাষ্ট্রকে অংশীদার হইতে হইবে; (খ) সমবায়িক ঋণদান, বিক্রয়করণ প্রভৃতি কার্যের মধ্যে সংহতিসাধন করিতে হইবে; (গ) প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিকে সুসংগঠিত করিতে হইবে; (ঘ) বহুসংখ্যক পণ্য সংরক্ষণাগার (warehouses) স্থাপন করিতে হইবে; এবং (ঙ) সমবায়িক কর্মীদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও কমিটি সুপারিশ করে যে ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনিয়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উহার শাখাসমূহের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে সহায়তা করিতে হইবে।

সুপারিশ অনুসারে কার্য করা হয়। রাষ্ট্র যাহাতে বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতির অংশীদার হইতে পারে তাহার জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে একটি তহবিল (Fund) গঠন করা হয়, এবং আর একটি তহবিল গঠন করা হয় বিভিন্ন স্থানে পণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপনের জন্য। ইম্পিরিয়াল ব্যাংককে রাষ্ট্রের মালিকানায় আনা হয়। সমবায়িক কর্মীদের শিক্ষার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে সমবায়িক শিক্ষার কেন্দ্রীয় কমিটি (Central Committee for Cooperative Training) গঠন করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায়ের সম্প্রসারণ

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায়ের আরও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়। ঠিক হয় যে, (ক) প্রত্যেক গ্রামীণ পরিবারকে অন্তত একটি সমবায় সমিতির সদস্যপদভুক্ত করিতে হইবে; (খ) প্রত্যেক গ্রামীণ পরিবারকে ঋণগ্রহণযোগ্য (creditworthy) করিয়া তুলিতে হইবে;

(গ) প্রাথমিক কৃষি সমিতির সদস্যসংখ্যা ৬১ লক্ষ হইতে ১ কোটি ৫ লক্ষে লইয়া যাইতে হইবে; (ঘ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, গৃহনির্মাণ, পরিবহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায়ের প্রসার করিতে হইবে। এইভাবে সমবায়ের মাধ্যমেই পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থার এক বৃহৎ ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষের দিক হইতে আবার সমবায় প্রথায় কৃষিকার্যের (cooperative farming) উপর জোর দেওয়া হয়। ঠিক হয় যে সমবায় প্রথায় কৃষিকার্যের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে অসংখ্য সেবা সমবায় সমিতি (service cooperatives) গঠন করা হইবে। এই সমিতিগুলি কৃষককে ঋণদান ছাড়াও কৃষি-যন্ত্রপাতি বীজ সার প্রভৃতি সরবরাহ করিবে; প্রয়োজনমত জলসেচ ও জমি উন্নয়নে সহায়তা করিবে; কৃষকের যে-গৃহশিল্প তাহার উন্নয়নেরও ব্যবস্থা করিবে। মোটকথা, সেবা সমবায় সমিতিগুলি কৃষি-শিল্পের (ag icultural industry) সর্বপ্রকার সেবা করিতে থাকে। ঠিক হইয়াছিল সেবা সমবায় সমিতিগুলির কার্য বেশ কিছু দূর অগ্রসর হইলে তখন সমবায় প্রথায় কৃষিকার্যের পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য ও সেবা সমবায় সমিতি

সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য ছাড়া শিল্পক্ষেত্রেও সমবায়ের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা চলিতেছে। বিভিন্ন স্থানে শিল্প সমবায় সমিতি (Industrial Cooperatives) গঠন করায় উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করা হইতেছে।

শিল্প-সমবায়

এই সম্প্রসারণের ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সেবা সমবায় সমিতির সংখ্যা ২.৫ লক্ষে এবং উহাদের সদস্যসংখ্যা ৮ কোটিতে পৌঁছিবে আশা করা হইয়াছে। ইহার ফলে ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চল এবং গ্রামবাসীদের শতকরা ৫২ ভাগ সমবায়ের সংস্পর্শে আসিবে। এখানে আবার উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায়কে গ্রামোন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। সুতরাং গ্রামীণ পুনর্গঠনে সমবায়ের গুরুত্ব লইয়া বিতর্কের অবকাশ নাই। শিল্পক্ষেত্রেও সমবায়কে এক বিশেষ ভূমিকা প্রদান করা হইয়াছে। কারণ, আমাদের লক্ষ্য হইল সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা (socialist pattern of society) গঠন করা; সমবায়ের পথ ধরিয়াই এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের পথে বিশেষভাবে অগ্রসর হইতে হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায়

(ঙ) শিল্পোন্নয়ন (Industrial Development): শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। প্রথম পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের শতকরা ৪ ভাগ করা হইয়াছিল শিল্প ও খনিজ খাতে; কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঐ খাতে ব্যয় করা হইয়াছিল শতকরা ২০ ভাগ।

পরিমাণের দিক দিয়া প্রথম পরিকল্পনায় বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ খাতে ৭৪ কোটি টাকা ব্যয় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৯০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।* প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিজ উৎপাদনের লক্ষ্য সফল হওয়াতেই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব হয়। এ-সম্পর্কে পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছিল যে, খাদ্য-সংকট, কাঁচামালের যোগান এবং মুদ্রাস্ফীতি কতকটা আয়ত্তের মধ্যে আসার ফলে শিল্পপ্রসারের পথে অগ্রসর হওয়া সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উপরন্তু, স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি অনুসারে কৃষিকে সুসংগঠিত করিয়া তবেই দ্রুষম শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় দ্বিতীয় পরিকল্পনায়

দেশের শিল্পোন্নয়নে স্বাধীন ভারতের সরকার ঠিক কি ভূমিকা গ্রহণ করিবে তাহার প্রথম ব্যাখ্যা করা হয় ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণায়। তখন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হইলেও বলা হইয়াছিল যে ভবিষ্যতে (১) অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন, (২) আণবিক শক্তির গবেষণা ও নিয়ন্ত্রণ, এবং (৩) রেলপথ—এই তিনটি বিষয় সম্পূর্ণ সরকারী এলাকায় থাকিবে। ইহা ছাড়া কয়লাখনি, লৌহ ও ইস্পাত, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও বেতারের যন্ত্রপাতি, বিমানপোত ও জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন একমাত্র সরকারই করিবে। বাকী সমস্ত শিল্পবাণিজ্য বেসরকারী উদ্যোগে থাকিবে।

পুরাতন শিল্পনীতি

এই শিল্পনীতি অনুসারেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির পরিবর্তে এক নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়।

নূতন শিল্পনীতি

এই নূতন শিল্পনীতি অনুসারে সমস্ত শিল্পকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে আছে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, আণবিক শক্তি, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা ও খনিজ তৈল, রেলপথ ও বিমানপথ, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি ১৭টি মূল শিল্প বা সেবামূলক কার্য। এগুলির উন্নয়নের ভার সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের হস্তেই থাকিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে ১২টি শিল্প—যথা, যন্ত্রপাতি, রসায়ন, কয়লা ও তৈল ছাড়া অন্যান্য খনিজ পদার্থ, মোটর চলাচল ইত্যাদি। এগুলি বর্তমানে বেসরকারী মালিকানায় থাকিলেও ক্রমশ ইহাদিগকে রাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করা হইবে। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত বা অবশিষ্ট শিল্পগুলিকে বেসরকারী মালিকানাতেই রাখা হইবে। তবে এগুলি সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

* ২৪৭ পৃষ্ঠা দেখ।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে নূতন শিল্পনীতিতে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী ভূমিকাকে ব্যাপকতর করিয়া তোলা হইয়াছে। সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের নীতি অনুসারেই এরূপ করা হইয়াছে।

নূতন শিল্পনীতি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিফলন

পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল শিল্পবাণিজ্যই সরকারী মালিকানা ও পরিচালনায় থাকে। শিল্পবাণিজ্যের কিছু সরকারী ও কিছু বেসরকারী পরিচালনায় থাকিলে উহাকে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা (Mixed Economy) বলা হয়। প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থাই ছিল আদর্শ।* এখনও ভারতের অর্থ-ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা বলিয়াই অভিহিত করিতে হইবে, কিন্তু উহা আর এখন আদর্শ নহে। আদর্শ বা লক্ষ্য হইল সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন। এইজন্য ১৯৫৬ সালে শিল্পনীতি ঘোষণার দ্বারা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা হইয়াছে। এইভাবে ভবিষ্যতে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে ধীরে ধীরে আরও সম্প্রসারিত করিয়া শিল্পবাণিজ্যের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সরকারী মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। তখন পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া উঠিবে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে পুরাপুরি সমাজতন্ত্র গ্রহণ করিবার প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা হইতে সমাজতন্ত্রের পথে গতি

প্রথম পরিকল্পনায় শিল্প ও খনিজ খাতে বরাদ্দ ছিল ১৭৯ কোটি টাকা বা মোট ব্যয়ের শতকরা ৭·৬ ভাগ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঐ খাতে ব্যয় করা হয় মোট ৭৪ কোটি টাকা বা মোট পরিকল্পনার ব্যয়ের মাত্র শতকরা ৪ ভাগ।

প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন

মূল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্প ও খনিজ খাতে ৮৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে ২০০ কোটি টাকা ছিল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য। বাকী ৬৯০ কোটি টাকার প্রায় সমস্তটাই লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, সার, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূল শিল্প ও বিভিন্ন মধ্যায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ খাতে ব্যয় হইয়াছিল ৯০০ কোটি টাকা এবং ইহার উপর ক্ষুদ্রায়তন ও গ্রামীণ শিল্পের জন্য ব্যয় হইয়াছিল ১৭৫ কোটি টাকার মত। শুধু বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের (investment) কথা ধরিলে (খনিজ ক্ষেত্রের ব্যয় এবং চলতি ব্যয় বাদ দিয়া) দেখা যায় যে উহার পরিমাণ ছিল ৭৭০ কোটি টাকা, যদিও মূল পরিকল্পনায় ৫৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। অতএব, দ্বিতীয় পরিকল্পনায়

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন

* ২৬১-২৪২ পৃষ্ঠা দেখ।

শিল্পক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ মূল পরিকল্পনার অনুমান অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল।

সরকারী উদ্যোগে যে-সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান এ-পর্যন্ত স্থাপন করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে উড়িষ্যার রুরকেল্লা, মধ্যপ্রদেশের ভিলাই এবং পশ্চিমবংগের দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা তিনটিই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। শেষ পর্যন্ত এই তিনটি কারখানার মোট উৎপাদনক্ষমতা হইবে বাৎসরিক প্রায় ৬০ লক্ষ টন।* ইহা ছাড়া মহীশূরের সরকারী ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। সরকারী উদ্যোগে তৃতীয় পরিকল্পনায় বোকারোতে বৈদেশিক সহযোগিতায় আরও একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব আছে। তারপর আছে সিন্ধ্রি, নাংগল, রুরকেল্লা ও নিভেলির সার তৈয়ারির কারখানা। বিশাখাপত্তনমে জাহাজ তৈয়ারির কারখানাও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রভুক্ত। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও একটি জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপন করা হইবে। চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন তৈয়ারির কারখানা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রভুক্ত আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান। ইহার উৎপাদন এরূপ বাড়িয়া গিয়াছে যে বর্তমানে ভারত রেল-ইঞ্জিন নির্মাণে একপ্রকার স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে, এমনকি ভারত রেল-ইঞ্জিন রপ্তানি করার অবস্থাতেও পৌঁছিয়াছে। বর্তমানে এই কারখানায় বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনও নির্মিত হইতেছে।

অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে পেরাম্বুরের রেলকোচ নির্মাণের কারখানা, টেলিফোনের যন্ত্রপাতির কারখানা, টেলিফোনের তারের কারখানা, বিমান নির্মাণের কারখানা, সাধারণ যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, গৃহনির্মাণের উপকরণের কারখানা, কয়েকটি পেনিসিলিন ও ডি. ডি. টি. কারখানা, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা, সংবাদপত্র মুদ্রণ-কাগজের কারখানা, বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কারখানা, চশমার কাচের কারখানা, সিমেন্টের কারখানা, তৈল শোধনাগার ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত বোকারোর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং দ্বিতীয় জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছাড়া অনেক যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ভারী বৈদ্যুতিক দ্রব্য নির্মাণ শিল্প, মূল রসায়ন শিল্প, ঔষধ-পত্রাদি উৎপাদন শিল্প প্রভৃতি স্থাপন করা হইবে এবং পেট্রল পরিশোধনের (oil refining) ব্যাপকতর ব্যবস্থা করা হইবে। এই পরিকল্পনায় বৃহদায়তন শিল্প ও খনিজ উন্নয়নের যে-কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার অনুমিত ব্যয় হইল প্রায় ১৯০০ কোটি টাকা; কিন্তু পরিকল্পনায় বর্তমানে বরাদ্দ করা হইয়াছে ১৫২০ কোটি টাকা। সুতরাং আশংকা হয় যে পরিকল্পনাধীন সময়ে কার্যক্রমকে পুরাপুরি অনুসরণ করা সম্ভব

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন

* প্রথমে মোট উৎপাদনক্ষমতা ৩০ লক্ষ টন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল; বর্তমানে কারখানা তিনটির সম্প্রসারণের ব্যবস্থা দ্বারা উৎপাদনক্ষমতা উপরি-উক্তভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

হইবে না। তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের কার্যক্রম প্রস্তুত করা হইয়াছে আগামী ১৫ বৎসরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত কার্যক্রম তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে শেষ না করিলেও বিশেষ অসুবিধা হইবে না। এই পরিকল্পনায় বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে আরও ১১০০ কোটি টাকা বিনিয়োজিত হইবে আশা করা হইয়াছে।

(চ) কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন (Development of Cottage and Small-scale Industries): কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সহিত বৃহৎ ও মধ্যায়তন শিল্পের সমন্বয় আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় শিল্পোন্নয়নের অন্যতম ঘোষিত নীতি। অর্থাৎ, বৃহদায়তন শিল্পের উন্নয়নই আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নহে; যাহাতে বৃহৎ ও মধ্যায়তন শিল্পের সংগে সংগে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিও কাম্যভাবে সম্প্রসারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করাও আমাদের উদ্দেশ্য।

ভারতের কুটির শিল্পসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) গ্রামীণ, এবং (খ) পৌর। গ্রামীণ কুটির শিল্পের মধ্যে সুতাকাটা ও বয়ন, মক্ষিকা পালন, ঝুড়ি তৈয়ারি, দড়ি তৈয়ারি, বেতের কার্য প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে অবশ্য সুতাকাটা ও বয়ন শিল্পই অধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতের কুটির শিল্প

পৌর কুটির শিল্পের উদাহরণ হিসাবে হাতীর দাঁত ও কাঠ খোদাই-এর কাজ, সূচী শিল্প, খেলনা নির্মাণ, জরির কাজ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সকল দেশের শিল্প-ব্যবস্থাতেই কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের এক নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দেশেও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার কারণ হইল, অনেক ক্ষেত্রে বৃহদায়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তনে উৎপাদনই সুবিধাজনক। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে অন্যান্য দিক দিয়াও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, নিয়োগের সংস্থা হিসাবে এই সকল শিল্পের গুরুত্ব অতুলনীয় বলিলেও চলে। ভারতে শুধু কুটির শিল্পসমূহে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ২ কোটির মত এবং মাত্র হস্তচালিত তাঁতশিল্পে নিযুক্ত আছে ৫০ লক্ষ লোক, যাহা বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যার সমান। ইহার সহিত ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ধরিলে নিয়োগের পরিমাণ যে বহুগুণ অধিক হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান:

১। নিয়োগের সংস্থা হিসাবে এই সকল শিল্পের গুরুত্ব অতুলনীয়

আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীনে বেকারের সংখ্যা যখন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তখন কর্মসংস্থানের জন্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা

অপরিহার্য। তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ২·৬ কোটির মত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৯০ লক্ষের নিয়োগের ব্যবস্থা মাত্র কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতেই হইতে পারে। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের মত সামান্য মূলধন নিয়োগ করিয়া কর্মসংস্থানের ব্যাপক ব্যবস্থা করা বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রে কখনই সম্ভব নয়।

২। ইহাদের মাধ্যমে ছদ্ম বেকারত্বের পরিমাণ হ্রাস সম্ভব

দ্বিতীয়ত, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ছদ্ম বেকারের পরিমাণও কমানো যাইতে পারে। ইহাতে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমিবে এবং কৃষকের জীবনযাত্রার মান আরও বৃদ্ধি পাইবে। উপরন্তু, কোন বৎসর ফসল না হইলে কৃষককে অনাহারে মরিতে হইবে না।

৩। বর্তমানে মূলধনের অসংগতির জন্য এই সকল শিল্পের সম্প্রসারণ প্রয়োজন

তৃতীয়ত, মূলধনের অপ্রাচুর্যের জন্যও আমাদিগকে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সকল প্রকার বৃহদায়তন শিল্পগঠনের জন্য যে-পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন তাহা বর্তমানে আমাদের নাই। সুতরাং সামান্য সামান্য মূলধন নিয়োগ করিয়া ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে সংগঠিত করিতে হইবে এবং বেশীর ভাগ মূলধন মূল শিল্প (basic industries) গঠনে নিয়োজিত করিতে হইবে।

৪। ইহাদের দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধান অনেকাংশে সম্ভব

চতুর্থত, এইভাবে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিলে মুদ্রাস্ফীতিও বিশেষ প্রবল হইতে পারিবে না। আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বর্তমান পর্যায়ে ইহাও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৫। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক

পঞ্চমত, অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক। বৃহদায়তন কারখানায় উৎপন্ন হইতেছে এইরূপ দ্রব্যের অংশবিশেষ ক্ষুদ্র শিল্পে প্রস্তুত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাইসাইকেলের অংশ ক্ষুদ্র শিল্পে নির্মিত হইতে পারে। এ-বিষয়ে জাপান বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। পরিশেষে, শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, দেশের বাহিরেও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের বিরাট বাজার রহিয়াছে। সুতরাং এই সকল শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বহু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

এই সকল শিল্পের সম্প্রসারণের পথে প্রতিবন্ধকসমূহ

ভারতের অর্থ-ব্যবস্থায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের স্থান এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও ইহাদের সম্প্রসারণের পথে কয়েকটি বিশেষ প্রতিবন্ধক বা অসুবিধা রহিয়াছে—যথা, (১) কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধা, (২) মূলধনের অভাব, (৩) অনুন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ও কলাকৌশল, (৪) বিক্রয়করণের অসুবিধা, এবং (৫) বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা।

(১) কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধা: কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে কাঁচামাল সংগ্রহে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ফড়িয়া, ব্যাপারী প্রভৃতি মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের (middlemen) জন্য। ইহারা বেশ কিছু করিয়া মুনাফা করে বলিয়া কাঁচামালের দামও বাড়িয়া যায়। ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের দামও বৃদ্ধি পায়। ইহা ছাড়া কাঁচামাল সংগ্রহ সম্বন্ধে অনেক সময় কোন নিশ্চয়তা থাকে না। ফলে অনেক সময় উৎপাদনও বন্ধ রাখিতে হয়।

(২) মূলধনের অভাব: ভারতীয় কৃষকদের মত কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগরগণও দরিদ্র। সম্বলহীন বলিয়া তাহাদিগকেও যখন তখন মহাজনের নিকট হইতে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। অনেক সময় আবার তাহাদিগকে মহাজনের নিকট হইতে স্বল্প দামে মাল বিক্রয় করিবার সর্তেও ঋণ করিতে দেখা যায়। ইহার মধ্যে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগর ও মালিকরা তাহাদের প্রাপ্য লাভ হইতে বঞ্চিত হয়।

(৩) অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি ও কলাকৌশল: এখনও অনেক ক্ষেত্রে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগরগণ অনুন্নত প্রাচীন পন্থাকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। আধুনিক পদ্ধতি বা যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রসারলাভ করে নাই। চাহিদা সম্প্রসারণের জন্য আধুনিক রুচি ও ফ্যাসান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না। ফলে উন্নয়নের সম্ভাবনা সত্ত্বেও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলি মৃতপ্রায় অবস্থায় রহিয়াছে।

(৪) বিক্রয়করণের অসুবিধা: বিক্রয়ের অব্যবস্থা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের আর একটি প্রধান অসুবিধা। কাঁচামাল সংগ্রহের ন্যায় এ-ব্যবসায়ে ফড়িয়া, ব্যাপারী, মহাজন প্রভৃতি মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পীকে শোষণ করিতে থাকে। ইহা ছাড়া পণ্য সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে মালও অনেক সময় নষ্ট হয়।

(৫) বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা: অনেক ক্ষেত্রে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না। যেমন, অনেক প্রকার তাঁতবস্ত্রই মিলবস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় হটিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ইহা যে কুটির শিল্পের স্বাভাবিক দুর্বলতা তাহা নহে; অনেকাংশে ইহা বহুদিনের অবহেলার ফল।

এই অসুবিধাগুলি দূর করিয়াই যে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের সম্প্রসারণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এখন কিভাবে অসুবিধাগুলিকে দূর করা সম্ভব তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রতিবন্ধকগুলিকে কিভাবে দূর করা যায়

প্রথমত, কাঁচামাল সংগ্রহের অসুবিধা ও মূলধনের অভাব সমবায় সমিতির সাহায্যে অনেকাংশে দূর করা যাইতে পারে। বিক্রয়করণও সমবায় সমিতির

মাধ্যমে কাম্যভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। একই সমবায় সমিতি যদি কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পীকে কাঁচামাল ও মূলধন যোগাইয়া সাহায্য করে এবং তাহার পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, তবে শিল্পীর পক্ষে মহাজনের শরণাপন্ন হইবার বা ফড়িয়া, ব্যাপারী ইত্যাদির হাতে পড়িবার কোন দরকার হয় না।

আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি ব্যবহারের জন্যও মূলধনের প্রয়োজন। ইহা সমবায় সমিতির সামর্থ্যে না কুলাইলে সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করিতে হইবে। ইহা ছাড়া প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্বও সরকারকে লইতে হইবে।

যাহাতে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ দাঁড়াইতে সমর্থ হয় তাহার জন্য প্রয়োজন হইলে কিছুদিনের জন্য বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণকে বাঁধিয়া দিতে হইবে, বৃহদায়তন শিল্পের উপর কর বা সেস্ (cess) বসাইয়া সেই অর্থ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে ব্যয় করিতে হইবে।

পরিশেষে, সকল প্রকার কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা একপ্রকার নহে। যেমন, তাঁত শিল্পের সমস্যা রেশম শিল্পের সমস্যা হইতে পৃথক। সুতরাং বিভিন্ন বোর্ড গঠন করিয়া বিশেষ বিশেষ শিল্পের উন্নয়ন দায়িত্ব তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। সরকার এই সকল বোর্ডকে প্রয়োজনীয় সকল সাহায্যই করিয়া যাইবে।

অবলম্বিত উন্নয়ন ব্যবস্থাসমূহ

আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় এইভাবে কুটির ও ক্ষুদ্র ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে শিল্পসমূহের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবলম্বিত নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

১। কাঁচামাল যোগানের ব্যবস্থা, ২। সুলভ ঋণদানের ব্যবস্থা, ৩। উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতিসাধন এবং তজ্জন্য কারিগরি শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থা, ৪। বিক্রয়বাজারের সংগঠন, ৫। বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে উহাদিগকে রক্ষা করা, এবং ৬। বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য বিশেষ বিশেষ বোর্ড গঠন।

কাঁচামাল যোগানো এবং সুলভে ঋণ প্রদানের জন্য প্রধানত সমবায় সমিতিগুলির উপরই নির্ভর করা হইতেছে। ইহা ছাড়া ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank of India), রিজার্ভ ব্যাংক প্রভৃতির মাধ্যমেও ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতিসাধনের জন্য কারিগরি শিক্ষা-প্রসারের ব্যবস্থার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। বিক্রয়বাজারের সংগঠনের জন্য সমবায়িক বিক্রয়-সংগঠন (Cooperative sales organisation) ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। সরকারও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয়ের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিয়া

দেওয়া হয় এবং উহাদের উপর সেস্ বসাইয়া ঐ অর্থ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নকল্পে ব্যয় করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বস্ত্রশিল্পের উপর সেস্ বসাইয়া ঐ অর্থ তাঁতশিল্পের উন্নয়নে ব্যয় করা হইয়াছিল। বিশেষ বিশেষ শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে-সকল বোর্ড গঠন করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে তাঁতশিল্প বোর্ড, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ড, হস্তশিল্প বোর্ড, সিল্ক বোর্ড এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ডই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে প্রথম পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যয় হয় ৪৩ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২০০ কোটি টাকা; পরে উহাকে কমাইয়া ১৬০ কোটি টাকায় আনা হইলেও শেষ পর্যন্ত ব্যয় হয় ১৭৫ কোটি টাকার মত। তৃতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দের পরিমাণ হইল ২৬৪ কোটি টাকা। এই বরাদ্দবৃদ্ধির অন্যতম উদ্দেশ্য হইল কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা। অর্থাৎ, যাহাতে তাহারা আপনা হইতেই বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা।

সংক্ষিপ্তসার

(ক) কৃষির উন্নয়ন: প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উপর হইতে গুরুত্ব সরাইয়া লওয়া হইলেও তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকে আবার অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে। কৃষির উন্নয়নের জন্য জলসেচ, উন্নততর সার ও বীজ ব্যবহার, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, সমবায়-ব্যবস্থার প্রসার, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতির ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

(খ) জলসেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি: জলসেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তিকে কোন পরিকল্পনাতে উপেক্ষা করা হয় নাই। নদী পুষ্করিণী ইত্যাদি পুরাতন ব্যবস্থা ছাড়াও কতকগুলি বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা দ্বারা সেচ সম্প্রসারণের এবং বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(গ) সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা: বর্তমানে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের গ্রামাঞ্চলের সর্বাংগীণ উন্নতিসাধনের চেষ্টা করা হইতেছে। গ্রামবাসিগণকে তাহাদের নিজেদের সাহায্য করিতে সহায়তা করা এই পরিকল্পনার অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। গ্রামাঞ্চলের সর্বাংগীণ উন্নয়ন বলিতে বুঝায়—(১) কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি; (২) পথঘাট ও যানবাহনের উন্নতিসাধন; (৩) স্বাস্থ্যোন্নয়ন; (৪) প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার; (৫) বাসস্থানের সুব্যবস্থা; (৬) কুটির শিল্পের উন্নয়ন; ইত্যাদি।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলের সর্বাংগীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা করা হয় গ্রামবাসীদের সহযোগিতায়। এই বিষয়ে প্রেরণা যোগাইবার ভার হইল গ্রামসেবকের।

পূর্বে সমাজোন্নয়নের কার্য সুরু করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাধীনে রাখা হইত। ফলে সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ছিল আমাদের পল্লী-উন্নয়নের দুইটি পর্যায়। ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে এই পার্থক্য দূর করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চলকে সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার অধীনে আনয়ন করিবার লক্ষ্য স্থির ছিল। পরে এই লক্ষ্যসাধনের সময়কে ১৯৬৩ সালের মধ্যভাগ অবধি পিছাইয়া লইয়া যাওয়া হয়।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার অপরিমেয় সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পরিচালনাগত ত্রুটির জন্য ভারতে উহা বিশেষ সফল হয় নাই। তবে বর্তমানে পুনর্গঠনের কাষ চলিতেছে। এই পুনর্গঠনের কার্যে পঞ্চায়েতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

(ঘ) সমবায় উন্নয়ন: ভারতের ন্যায় দেশে সমবায়ের সম্ভাবনা অপরিমেয় হইলেও ভারতে নানা কারণে সমবায় আন্দোলন সফল হয় নাই। তাই বলিয়া হতাশ না হইয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায়ের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমবায়িক ঋণদান, সমবায়িক বিক্রয়-ব্যবস্থা প্রভৃতি ছাড়াও সমবায়িক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য, শিল্পোন্নয়ন প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। অংশত এইভাবেই আমাদের সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করা হইবে।

(ঙ) শিল্পোন্নয়ন: শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। এই পরিকল্পনার প্রাক্কালে নূতন শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। এই শিল্পনীতি অনুসারে কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের একচেটিয়া মালিকানা এবং আরও কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। ঘোষিত শিল্পনীতি অনুসারে সরকার নূতন নূতন শিল্প গঠন এবং পুরাতন শিল্পের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিতেছে।

(চ) কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন: আমাদের বর্তমান পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় নিয়োগের সংস্থা হিসাবে, ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহের মাধ্যম হিসাবে, মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবিধান হিসাবে এবং মূলধনের অনগতি ইত্যাদির জন্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ইহাদের সম্প্রসারণের পথে কয়েকটি বিশেষ বাধাও রহিয়াছে—যথা, কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধা, মূলধনের অপ্রাচুর্য, অনুন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি ও কারিগরি কৌশল, অসংগঠিত বিক্রয়বাজার এবং বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা। সুতরাং, এই বাধাগুলিকে অপসারণ করিয়াই সম্প্রসারণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় তাহাই করা হইয়াছে। কাঁচামাল যোগানের ব্যবস্থা, সুলভ ঋণদানের ব্যবস্থা, উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতিসাধন এবং তজ্জন্য কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা, বিক্রয়বাজারের সংগঠন এবং বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে সংরক্ষণ—এই কয়টি ব্যবস্থা ছাড়াও বিভিন্ন বোর্ড স্থাপন করিয়া বিশেষ বিশেষ শিল্পের উন্নয়নভার উহাদিগের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. Describe the measures that have been adopted for the development of agriculture in our Five Year Plans.

আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহে কৃষির উন্নয়নের জন্য যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা বর্ণনা কর। [২৬৬-২৬৭, ২৬৮-২৭৩ পৃষ্ঠা]

2. Indicate the progress of agriculture during the First and Second Five Year Plans of India. (P. U. 1964)

ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের বিবরণ দাও। [২৬৫-২৬৬ পৃষ্ঠা]

3. Give a brief account of the Community Development Project in India. (En. 1962)

ভারতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [২৬৮-২৭৩ পৃষ্ঠা]

4. Discuss the achievements and the defects of the Cooperative Movement in India. (C. U. 1963)

ভারতে সমবায় আন্দোলনের সফলতা ও ত্রুটির আলোচনা কর। [২৭৪-২৭৬ পৃষ্ঠা]

5. Discuss the present state of Cooperative Movement in India. What do you think to be the future of the movement ?

ভারতে সমবায় আন্দোলনের বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা কর। সমবায় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা তাহা বিবৃত কর। [২৭৪-২৭৬ পৃষ্ঠা]

6. Give an idea of the programme of Industrial Development under our Five Year Plans.

আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহে শিল্পোন্নয়নের কার্যক্রমের একটি বিবরণ দাও। [২৭৬-২৮০ পৃষ্ঠা]

7. Write a note on the difficulties faced by small-scale industries in India. Indicate how the Government of India is assisting the development of these industries. (P. U. 1964)

ভারতের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলি যে যে অসুবিধার সম্মুখীন বিবৃত করিয়া সরকার এই সকল শিল্পের উন্নয়নের জন্য কিভাবে সহায়তা করিতেছে তাহার বর্ণনা কর। [২৮১-২৮৪ পৃষ্ঠা]

8. Name some of the more important Cottage Industries of India and say what steps have been taken for their development under the Five Year Plans. (En. 1963)

ভারতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্পের নাম কর এবং উহাদের উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-সমূহে যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা বর্ণনা কর। [২৮০ এবং ২৮৩-২৮৪ পৃষ্ঠা]

9. Write notes on :

(*a*) *Mixed Economy*, (*b*) Community Development, and (*c*) Industrial Policy of the Government of India.

টীকা লিখ : (ক) মিশ্র অর্থ-ব্যবস্থা, (খ) সমাজোন্নয়ন, এবং (গ) ভারত সরকারের শিল্পনীতি। [২৭৮ ; ২৬৮, ২৬৯, ১৭১ এবং ২৭৭-২৭৮ পৃষ্ঠা]

পৌরবিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

পৌরবিজ্ঞানের অর্থ ও বিষয়বস্তু

(Meaning and Subject Matter of Civics)

ভূমিকা : বর্তমানে আমরা সভ্য সমাজে বাস করিয়া সুশৃংখল জীবন যাপন করি। আহারের জন্য আমাদের প্রত্যেককে খাদ্য উৎপাদন করিতে হয় না, পরিধানের জন্য পোশাক তৈয়ারি করিতে হয় না। চালডাল, তরি-তরকারি, মাছমাংস, জামাকাপড় বাজার হইতে কিনিয়া লইলেই হইল। বর্তমানে দেশের এক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে অন্য অঞ্চল হইতে খাদ্য সরবরাহ করা হয়; সারা দেশ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইলে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করা হয়। ইহাতেও না কুলাইলে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দের (food control and rationing) ব্যবস্থা করা হয়।

আমাদের যাতায়াতের জন্য মোটরবাস রেলগাড়ি ট্রামগাড়ি প্রভৃতি যান-বাহন নিয়মিত চলিতেছে; আমাদের শিক্ষার জন্য স্কুলকলেজ খোলা আছে, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের ব্যবস্থা আছে। আবার চোর-ডাকাত প্রভৃতি দুষ্কৃতিকারীর হাত হইতে আমাদের রক্ষা করিবার জন্য পুলিস আদালত জেল প্রভৃতি আছে; দেশকে অন্য দেশের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সৈন্য-বাহিনী আছে; ইত্যাদি।

এই সকলের ফলে আমরা শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বাস করিয়া থাকি। কিন্তু চিরকালই এই অবস্থা ছিল না। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে দীর্ঘদিন ধরিয়া, অতি ধীরে ধীরে। এমন একদিন ছিল যখন মানুষ দলবদ্ধভাবে বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে ফলমূল আহরণ এবং মৎস্য ও পশুপক্ষী শিকার করিয়া জীবিকানির্বাহ করিত। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যাহা সংগৃহীত হইত প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য হইলেও দলের সকলে মিলিয়া তাহা সমভাবে ভোগ করিত। মানুষের যে-কোন সংঘবদ্ধ অবস্থাকেই সমাজ নামে অভিহিত করা যায় বলিয়া এই অবস্থাতেও মানুষ সমাজবদ্ধ ছিল বলা যায়; এবং সকলে সমান ভোগ করিত বলিয়া এই সমাজ ছিল সমভোগী সমাজ।

তারপর যত দিন যাইতে লাগিল মানুষ পশুপালন, কৃষিকার্য ও উৎপাদনের অন্যান্য কলাকৌশল শিখিল। ইহার ফলে আদিম সমাজগুলির মধ্যে দেখা দিল এক বিরাট পরিবর্তন। লোকে কৃষিকার্যের জন্য একস্থানে বসবাস করিতে বাধ্য হওয়ায় গ্রাম-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিল এবং কৃষি-জমি, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি নিজের বলিয়া মনে করিতে সুরু করায় ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির (private property) উদ্ভব হইল। সমভোগী সমাজ আর রহিল না। তখন এক জন-গোষ্ঠী আর এক জনগোষ্ঠীর পশু, শস্য ও অন্যান্য সম্পদ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা

করায় দেখা দিল যুদ্ধবিগ্রহ। গ্রামীণ সমাজের মধ্যেও জমিজমা ইত্যাদি লইয়া বিভিন্ন লোকের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হইতে লাগিল। সুতরাং তখন প্রয়োজন হইয়া পড়িল যুদ্ধ-পরিচালনা ও ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য একটি বিশেষ কর্তৃত্বের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুদ্ধনায়কগণ এই কর্তৃত্ব অধিকার করিয়া কায়েম হইয়া বসিলেন; এবং ক্রমে যুদ্ধনায়কগণ রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং তাঁহাদের অধীনে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল।

তারপর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে; সমাজ ও রাষ্ট্র বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। আজ মানুষ কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক; আবার সে শ্রমিক-সংঘ, সাহিত্য সভা, ফুটবল ক্লাব প্রভৃতির ন্যায় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনেরও সদস্য। তাহার সুখদুঃখ, আশাআকাংক্ষা, রাষ্ট্র ও সামাজিক সংগঠনসমূহের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্য হিসাবে মানুষের আচরণই আমাদের আলোচ্য বিষয়। যে-শাস্ত্র এই আলোচনা করে ইংরাজীতে তাহাকে 'সিভিক্স' (Civics) এবং বাংলায় 'পৌরবিজ্ঞান' বলা হয়।

পৌরবিজ্ঞান

অর্থ ও বিষয়বস্তু (Meaning and Subject Matter): ইংরাজী 'সিভিক্স' (Civics) শব্দটি দুইটি ল্যাটিন শব্দ হইতে আসিয়াছে—যথা, সিভিটাস্ (civitas) এবং সিভিস (civis)। সিভিটাস্ শব্দের অর্থ 'নগর-রাষ্ট্র' এবং সিভিস শব্দের অর্থ 'নাগরিক'। সুতরাং ইংরাজী শব্দগত অর্থে সিভিক্স বলিতে বুঝায় রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্কিত বিষয়সমূহের পর্যালোচনা।

নাগরিককে বাংলায় 'পুরবাসী' বলিয়া অভিহিত করা হয়। সুতরাং বাংলা শব্দগত অর্থে পৌরবিজ্ঞান হইল পুরবাসীর আচরণের শাস্ত্র বা বিজ্ঞান।

শাস্ত্র হিসাবে পৌরবিজ্ঞান অতি পুরাতন। প্রাচীন ভারত ও এসিয়ার অন্যান্য দেশ এই শাস্ত্রের বেশ কিছু চর্চা করিয়াছিল; তবে সুসম্বদ্ধভাবে ইহার আলোচনা করে প্রথমে প্রাচীন গ্রীস এবং পরে প্রাচীন রোম। এই গ্রীক ও রোমকদের শাস্ত্রই উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিলেও বর্তমান দিনে পৌর-বিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র পূর্বাপেক্ষা ব্যাপকতর হইয়াছে। ইহার কারণ, প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোমের নাগরিক-জীবন এবং বর্তমান দিনের নাগরিক-জীবনের মধ্যে হইল আকাশপাতাল তফাত।

পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র ব্যাপকতর হইয়াছে

গ্রীক ও রোমক যুগে পুরবাসী বা নাগরিকের জীবনের একটিমাত্র দিক ছিল। নাগরিক তখন ছিল মাত্র রাষ্ট্রেরই সভ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল রাষ্ট্র একটিমাত্র নগর লইয়াই গঠিত হইত এবং রাষ্ট্র (State) ও সমাজ (society) আজিকার দিনের মত পরস্পর হইতে পৃথক ছিল না, সম্পূর্ণ একই ছিল। ঐরূপ

পূর্বে ব্যক্তিকে একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে দেখা হইত

রাষ্ট্রকে 'নগর-রাষ্ট্র' (City State) বলা হয়। নগর-রাষ্ট্র ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন, ব্যবসাবাণিজ্য, শিক্ষা, আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি সকল কিছুরই ব্যবস্থা করিত—নাগরিকগণকে নিজেদের কিছু করিতে হইত না। সুতরাং তখন ব্যক্তিকে একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে দেখাই যথেষ্ট ছিল। এই কারণে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও কার্যাবলী, রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক হিসাবে ব্যক্তির আচরণ এবং রাষ্ট্র ও নাগরিক উভয়ের সহিত সম্পর্কিত সমস্যাসমূহের পর্যালোচনাই ছিল পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

কিন্তু আজিকার দিনের রাষ্ট্রগুলি প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স বা স্পার্টার ন্যায় ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র নয়, ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় বৃহৎ 'জাতীয় রাষ্ট্র' (Nation States)। এইরূপ জাতীয় রাষ্ট্র নাগরিকগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা কখনই করিতে পারে না। তাই নাগরিকগণকেই বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও আত্মবিকাশের জন্য একদিকে পৌরসভা ও গ্রাম-পঞ্চায়েতের ন্যায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং অপরদিকে শ্রমিক-সংঘ ও বণিক সমিতির ন্যায় অর্থনৈতিক সংস্থা, সাহিত্য সভা ও কলা পরিষদের ন্যায় সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতে হয়। সুতরাং পরিবর্তিত অবস্থায় পৌর-বিজ্ঞান এই সকল প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবেও মানুষের আচরণের পর্যালোচনা করে। উপরন্তু, বর্তমান যুগের নাগরিক বৃহত্তর মানব-সমাজের সভ্য হিসাবে বিশ্বের সমস্যা লইয়াও বিব্রত। ফলে ইহাদের আলোচনাও পৌরবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

কিন্তু বর্তমানে নাগরিককে বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের সভ্য হিসাবে দেখা হয়

পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি (Scope of the Study of Civics): উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, বর্তমানে পৌর-বিজ্ঞান চারিটি দিক হইতে নাগরিকের আচরণের পর্যালোচনা করে—যথা, (১) রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে, (২) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে, (৩) বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সদস্য হিসাবে, এবং (৪) বৃহত্তর মানবসমাজের সভ্য হিসাবে। পৌরবিজ্ঞানের পরিধি (scope) সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিবার জন্য নাগরিক-জীবনের এই সকল দিক সম্বন্ধে আরও কিছুটা আলোচনা করা হইতেছে।

প্রত্যেক নাগরিকই কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য—ইহাতে তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন নাই। যেমন, আমরা সকলেই ভারত-রাষ্ট্রের সভ্য, মার্কিনীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভ্য, ইত্যাদি। রাষ্ট্রই সুশৃংখল সমাজ-জীবন সম্ভব করিয়া নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ করিয়া তাহাকে আত্মবিকাশের সুযোগ প্রদান করে। সুতরাং রাষ্ট্রের সমস্যা হইল নাগরিকের প্রাথমিক সমস্যা, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য তাহার পক্ষে প্রাথমিক কর্তব্য। দেশ সুশাসিত হইলে তবেই নাগরিক ভালভাবে বাঁচিতে পারে—সে তাহার জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক,

১। রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে নাগরিক

মানসিক ও সাংস্কৃতিক দিকসমূহের বিকাশের সুযোগ পাইতে পারে। সুতরাং পৌরবিজ্ঞানে প্রথমেই রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে নাগরিকের আচরণের পর্যালোচনা করা হয়।

২। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে নাগরিক

নাগরিক-জীবনের উপর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাবও কম নহে। দেশ-ব্যাপী রেল-ধর্মঘট, ডাক-ধর্মঘট আমাদের বিশেষ বিব্রত করিয়া তুলে। পৌর-কর্মচারিগণের ধর্মঘটও আমাদের কম বিব্রত করে না। উপরন্তু, বর্তমান যুগে পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নাগরিকতার প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে কার্য করে। এই সকল স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যার সমাধান করিয়া নাগরিক এই শিক্ষালাভ করে যে, কিভাবে পরস্পরের সমবায়ে সাধারণ সমস্যার সমাধান করিতে হয়—সাধারণের কার্য সম্পাদন করিতে হয়। এইভাবে গড়িয়া উঠে দায়িত্ববোধ ও আত্মনির্ভর-শীলতা। তখন নাগরিক বৃহত্তর জাতীয় দায়িত্বপালনের উপযোগী হইয়া উঠে। এই কারণে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে আলোচনা নাগরিকের শাস্ত্র পৌর-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩। অন্যান্য সামাজিক সংস্থার সদস্য হিসাবে নাগরিক

তৃতীয়ত, বর্তমান দিনে নাগরিক সাহিত্য সভা, সংগীত একাডেমী, সেবা সমিতি, বণিক সমিতি, শ্রমিক-সংঘ, ধর্ম সংস্থা প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। রাষ্ট্র ও স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও ইহাদের মাধ্যমে নাগরিক তাহার জীবনকে বিকশিত করিতে সচেষ্ট হয়। সুতরাং এই সকল সংঘের সভ্য হিসাবে নাগরিকের আচরণের পর্যালোচনা না করিলে পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

৪। বৃহত্তর মানব-সমাজের সভ্য হিসাবে নাগরিক

পরিশেষে, নাগরিক-জীবনের উপর আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, গমনাগমনের সুযোগসুবিধা এবং আন্ত-র্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের ফলে কোন দেশই আজ অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিতে পারে না। ফলে পৃথিবীর কোন স্থানে যুদ্ধবিগ্রহ সুরু হইলে অন্যান্য দেশের লোকও চিন্তিত হইয়া পড়ে। তাহাদের ভয় হয়, এ-যুদ্ধ হয়ত ছড়াইয়া পড়িবে, এ-যুদ্ধ হইতেই হয়ত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হইবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে হয়ত সমগ্র পৃথিবীই ধ্বংস হইয়া যাইবে। আবার শুধু যুদ্ধবিগ্রহের ধ্বংসের কথাও নয়। বর্তমানে আমরা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি নানা দেশ হইতে সাহায্য পাইতেছি। যদি কোন কারণে এই সকল সাহায্য বন্ধ হয় তবে আমাদের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে; ফলে দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুছিয়া যাইবে উন্নততর জীবনযাত্রার চিত্র। তাই

আমরা মার্কিন সাহায্যদান লইয়া জল্পনাকল্পনা করি, পৃথিবীর যে-কোন স্থানে সংঘর্ষের সংবাদ আগ্রহ সহকারে পাঠ করি, বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্যের গতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করি। অনেক সময় আবার শুধু জল্পনাকল্পনা, আলাপ-আলোচনা করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না; যাহাতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সংকটাপন্ন না হইয়া উঠে—সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, প্রস্তাব গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে তাহার প্রচেষ্টাও করিয়া থাকি।

অতএব, নাগরিকের শাস্ত্র পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা শুধু রাষ্ট্র, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংঘের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। নাগরিককে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয় বলিয়া, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) ন্যায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সফলতার প্রচেষ্টা করিতে হয় বলিয়া পৌরবিজ্ঞান নাগরিক-জীবনের এই আন্তর্জাতিক দিকটির আলোচনাও করে।

নাগরিক-জীবনের সামাজিক দিক আর একভাবে আন্তর্জাতিকতার সহিত সম্পর্কিত। পূর্বে সাহিত্য সভা, সেবা সমিতি প্রভৃতি যে-সকল সামাজিক সংঘের উল্লেখ করা হইয়াছে অনেক সময় তাহাদের কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়; আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘ*, সেণ্ট জন এ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতির ন্যায় অনেক সময় আবার ইহারা সমগ্র বিশ্বেও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক শান্তি ও মৈত্রীর পথে পরস্পরের সহিত সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হয়। মার্কিন শ্রমিক ভারতীয় শ্রমিককে মিত্র বলিয়া মনে করে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ভারতীয় কর্মী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া সেবাকার্যে নিযুক্ত হন। কি করিয়া এই বন্ধনসূত্রকে দৃঢ়তর ও বিস্তৃততর করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে একই গোষ্ঠীভূত করা যায়—যুগ যুগ ধরিয়া দার্শনিকগণ এই স্বপ্নই দেখিয়া আসিতেছেন। কল্যাণকৃৎ শাস্ত্র হিসাবে এই 'এক পৃথিবী'র (one world) স্বপ্ন সফল করাও পৌরবিজ্ঞানের আদর্শ।

পৌরবিজ্ঞানের আদর্শ

পূর্বে অবশ্য পৌরবিজ্ঞানের এই আদর্শ ছিল না; ফলে উহার পরিধিও এত ব্যাপক ছিল না। তখন নগর-রাষ্ট্রের সভ্যের জন্য মাত্র 'সুন্দর নগরে'র (city beautiful) পথনির্দেশ করাই ছিল পৌরবিজ্ঞানের একমাত্র আদর্শ। কিন্তু আজ নাগরিকের পক্ষে 'নগর বা স্থানীয় জীবনকে সুন্দর করিতে হইবে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করিতে হইবে, সংঘজীবনকে সার্থক করিতে হইবে এবং মানবতা ও বিশ্বপ্রেমের প্রচার ও প্রয়াস করিয়া এক নূতন পৃথিবী গঠন করিতে হইবে বলিয়া পৌরবিজ্ঞানকেও সকল দিকেই পথনির্দেশ করিতে হইবে।

---

* International Labour Organisation, সংক্ষেপে ILO

ভারতীয় পৌর আদর্শ এবং বর্তমান যুগ (Indian Civic Ideals and the Present Age) : বলা হইয়াছে, প্রাচীন ভারতও পৌরবিজ্ঞান বা পুরবাসীর শাস্ত্রের বেশ কিছু চর্চা করিয়াছিল। ফলে, প্রাচীন ভারতেও পৌর আদর্শ পরিস্ফুটিত হইয়াছিল। গ্রীক ও রোমকদের পৌর আদর্শের লক্ষ্য ছিল নগরকে সুন্দর করিয়া তোলা, প্রাচীন ভারতে পৌর আদর্শের লক্ষ্য ছিল গ্রামকে সুন্দর করিয়া তোলা। ইহার কারণ, এই গ্রামই ছিল প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তি।

ভারতীয় পৌর আদর্শ : গ্রামকে সুন্দর করিয়া গঠন ও অরাজকতা পরিহার করা

প্রাচীন ভারতে পঞ্চায়েতের অধীনে পরিচালিত গ্রামসমূহ বহু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিত। এক রাজার রাজ্য অন্য এক রাজা কাড়িয়া লইলেও গ্রাম-ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিত না। গ্রামগুলি পুরাতন রাজার পরিবর্তে নূতন রাজাকে কর প্রদান করিয়া পূর্বের মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। স্বাভাবিকভাবেই গ্রামকে সুন্দর করিয়া তোলাই ছিল তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। অবশ্য মৎস্যন্যায় বা অরাজকতা ঘটিলে গ্রামের জীবন-যাত্রাতেও বিশৃংখলা দেখা দিত। সেইজন্য অরাজকতা পরিহার করাও ছিল প্রাচীন ভারতের নাগরিকজীবনের আদর্শ।

স্বাভাবিকভাবে ইহার তুলনাতেও বর্তমান দিনের নাগরিক-আদর্শ ব্যাপকতর

এই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের তুলনাতেও যে বর্তমান দিনের পৌর আদর্শ বহু পরিমাণ ব্যাপকতর হইয়াছে তাহা উপরের আলোচনা হইতে সহজেই অনুধাবন করা যাইবে। এখন আর গ্রামকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলা এবং অরাজকতা পরিহার করাই নাগরিক-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। ইহার উপর লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করিয়া গঠন করা, সংঘ-জীবনকে সার্থক করা এবং মানবতা ও বিশ্বপ্রেমের পথে এক নূতন পৃথিবী গঠন করা।

সংক্ষিপ্তসার

ভূমিকা : প্রথম অবস্থায় মানুষ পশুর মতই বন-বনান্তরে ঘুরিয়া ফলমূল আহরণ এবং পশুপক্ষী শিকার করিয়া জীবিকানির্বাহ করিত। কিন্তু পশুর মত কখনও সে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করে নাই ; আদিমতম যুগ হইতেই সে সংঘবদ্ধ। এই সংঘবদ্ধতার ক্রমবিকাশের ফলে উদ্ভব হইয়াছে বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার।

যে-শাস্ত্র রাষ্ট্র ও বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সংগঠনের সভ্য হিসাবে মানুষের আচরণ লইয়া আলোচনা করে তাহাকে পৌরবিজ্ঞান বলে।

অর্থ ও বিষয়বস্তু : শব্দগত অর্থে পৌরবিজ্ঞান বলিতে বুঝায় রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্কিত বিষয়সমূহের পর্যালোচনা। পূর্বে নাগরিককে একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে দেখাই ছিল যথেষ্ট—কারণ, রাষ্ট্র তখন ছিল নগর-রাষ্ট্র। কিন্তু বর্তমানে নাগরিককে একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে দেখিলে চলিবে না—তাহাকে

অন্যান্য নানাপ্রকার সংগঠনের সদস্য হিসাবেও দেখিতে হইবে। সুতরাং পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র বর্তমানে ব্যাপকতর হইয়াছে।

পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি: বর্তমান দিনের ব্যাপকতর পৌরবিজ্ঞান নাগরিককে চারিটি দিক হইতে দেখে—(১) রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে, (২) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে, (৩) বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সংগঠনের সদস্য হিসাবে, এবং (৪) বৃহত্তর মানবসমাজের সদস্য হিসাবে।

পৌরবিজ্ঞান কল্যাণকৃৎ শাস্ত্র। সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থা, সার্থক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, এবং শান্তি ও মৈত্রীর পথে এক নূতন পৃথিবী গড়িয়া তোলা ইহার আদর্শ।

ভারতীয় পৌর আদর্শ এবং বর্তমান যুগ: প্রাচীন ভারতে পৌর আদর্শ ছিল গ্রামকে সুন্দর করিয়া গঠন করা ও অরাজকতা পরিহার করা। গ্রীক ও রোমক পৌর আদর্শের মত এই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের তুলনায়ও বর্তমান নাগরিক-জীবনের লক্ষ্য বহু পরিমাণ ব্যাপকতর।

প্রশ্নোত্তর

1. What is Civics ? Discuss the subject matter and scope of Civics.

পৌরবিজ্ঞান বলিতে কি বুঝায়? পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা কর। [২-৫ পৃষ্ঠা]

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র

(State)

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা (Nature and Definition of the State): বর্তমানে নাগরিক-জীবনের কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আছে রাষ্ট্র। সুতরাং পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা বহুলাংশে রাষ্ট্র সম্বন্ধেই আলোচনা।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। তবুও বলা যায়, সমাজের কেন্দ্রীয় ও মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করাই ইহার লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য রাষ্ট্রকে এক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহাকে বলা হয় সার্বভৌম ক্ষমতা বা সার্বভৌমিকতা (sovereignty)।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও স্বরূপ

সার্বভৌমিকতাকে 'সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতা' (united power of the community) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ক্ষমতা অন্য কোন সামাজিক সংগঠনের নাই। সমাজের এই সম্মিলিত ক্ষমতা আইন প্রণয়ন ও আইন বলবৎ করিবার ক্ষমতা। আইন রাষ্ট্রের নিয়মাবলী মাত্র। অন্যান্য সংগঠনের নিয়মাবলী হইতে ইহার পার্থক্য এইখানে যে আইন মান্য করা প্রত্যেক ব্যক্তি ও সংঘের পক্ষে বাধ্যতামূলক; কিন্তু অন্যান্য সংগঠনের নিয়মাবলী পালন করা সভ্যদের পক্ষে

আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ও রাষ্ট্র

বাধ্যতামূলক নহে। আইন অমান্য করিলে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করিতে পারে; অন্য যে-কোন সংঘের নিয়মাবলী ভংগ করিলে সেই সংঘ অনুনয়-বিনয় করিতে পারে, সভ্যপদচ্যুত করিতে পারে—কিন্তু বলপ্রয়োগ করিতে পারে না। রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের এইখানেই পার্থক্য।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করিবার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্রপতি উইলসন্ (President Wilson) রাষ্ট্রের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন: "রাষ্ট্র হইল আইনানুসারে সংগঠিত, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী এক জনসমষ্টি।"* উইলসনের প্রায় প্রতিধ্বনি করিয়াই ব্লুণ্টস্‌লি (Bluntschli) বলিয়াছেন, কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজই রাষ্ট্র। এক্ষেত্রে 'রাষ্ট্রনৈতিকভাবে' শব্দটির অর্থ হইল 'আইনানুসারে'। আইনই রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল।

গার্ণার-প্রদত্ত সংজ্ঞা

উইলসন্ এবং ব্লুণ্টস্‌লি প্রদত্ত সংজ্ঞা দুইটি বিজ্ঞানসম্মত হইলেও রাষ্ট্রের অন্যান্য অসংখ্য সংজ্ঞার মতই কিছুটা অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। সুতরাং ইহাদের হইতে রাষ্ট্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় না। সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় অধ্যাপক গার্ণার-প্রদত্ত সংজ্ঞা হইতে। গার্ণারের সংজ্ঞা অবশ্য মৌলিক নয়; ইহা বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী-প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলির সমন্বয় মাত্র। গার্ণারের মতে, "রাষ্ট্র হইল বহুসংখ্যক ব্যক্তি লইয়া গঠিত এমন একটি জনসমাজ যাহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যাহা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত এবং যাহার একটি সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা আছে—যে শাসন-ব্যবস্থার প্রতি অধিবাসীদের অধিকাংশ স্বভাবতই আনুগত্য স্বীকার করে।"**

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the State):

এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিয়া রাষ্ট্রের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করা যাইতে পারে—যথা, (১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার, (৪) স্থায়িত্ব, এবং (৫) বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ-বিহীনতা বা সার্বভৌমিকতা। রাষ্ট্র-গঠনের এই পাঁচটি উপাদানই অপরিহার্য। রাষ্ট্র বলিতে শুধু জনসমাজ বা ভূখণ্ড বা শাসন-ব্যবস্থা বা স্থায়িত্ব বা সার্বভৌম শক্তি বুঝায় না। এই পাঁচটি উপাদান লইয়া গঠিত যে প্রতিষ্ঠান তাহাকেই 'রাষ্ট্র' আখ্যা দেওয়া

রাষ্ট্রের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য:
১। জনসমষ্টি,
২। ভূখণ্ড, ৩। সরকার,
৪। স্থায়িত্ব,
৫। সার্বভৌমিকতা

* "A state is a people organised for law within a definite territory."

** "A state is a community of persons, *more or less numerous*, permanently occupying a definite portion of a territory, independent of external control,...... and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience."

হয়। রাষ্ট্রের এই উপাদান বা লক্ষণগুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

জনসমষ্টি (Population): আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। মানুষের জন্যই সমাজ, মানুষের জন্যই রাষ্ট্র। মানুষকে বাদ দিয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কল্পনাও করা যায় না। জনমানবশূন্য মরুভূমিতে রাষ্ট্রের উদ্ভব কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং রাষ্ট্র-গঠনের জন্য প্রথম অপরিহার্য উপাদান হইল জনসমষ্টি।

জনসমষ্টির আয়তন

জনসমষ্টির সংখ্যা সম্বন্ধে কোন প্রচলিত নিয়ম নাই। প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ মনে করিতেন যে স্বল্প সংখ্যাই সুশাসনের পক্ষে প্রয়োজনীয়; কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিক উন্নতি প্রভৃতির ফলে বৃহৎ জনসংখ্যা সুশাসনের অন্তরায় হিসাবে পরিগণিত হয় না। পূর্বে দিল্লী হইতে বাংলাদেশ শাসন করাই কঠিন ছিল; আধুনিক যুগে ইংরাজদের পক্ষে সমগ্র পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশও শাসন করা কঠিন হয় নাই। প্রাচীন গ্রীকরা দশ হাজার জনসংখ্যাকেই সুশাসনের দিক হইতে কাম্য মনে করিতেন; বর্তমানে ঐ একই দিক দিয়াই ভারত তাহার প্রায় ৪৪ কোটির অধিক লোককে এবং চীনদেশ তাহার প্রায় ৭০-৭২ কোটি লোককে অকাম্য বিবেচনা করে না। তবে কোন্ জনসংখ্যা কাম্য তাহা নির্ধারণে একমাত্র সুশাসনকে মাপকাঠি করিলে চলিবে না; দেশের আর্থিক সম্পদ কি পরিমাণ জনসংখ্যার উপযোগী তাহাও দেখিতে হইবে।

নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Territory): সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। জনসমাজের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা নিজস্ব বাসভূমি না থাকিলে রাষ্ট্র গঠিত হয় না। ইতিহাসে যাযাবর জাতির মধ্যে সংগঠনের উদাহরণ পাওয়া যায়। এই সকল যাযাবর জনসমাজ নিয়ন্ত্রণ ও আইনের অধীন ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে মানবসমাজের এইরূপ অবস্থাকে 'রাষ্ট্র' আখ্যা দেওয়া হয় না। যাযাবর জনসমাজ যখনই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকে, তখনই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্র বলিয়া কোন-কিছুর কল্পনাও করা যায় না।

সার্বভৌম শক্তির এলাকা রাষ্ট্রের সীমা দ্বারা নির্দিষ্ট

রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সার্বভৌম শক্তির এলাকা যে কতদূর বিস্তৃত তাহা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড না থাকিলে নির্ধারণ করা যায় না। রাষ্ট্রের সীমা যতদূর বিস্তৃত, সার্বভৌম শক্তির এলাকাও ততদূর ব্যাপ্ত। রাষ্ট্রের সীমা বলিতে স্থল, জল ও বায়ুমণ্ডল বুঝায়। এইজন্য সার্বভৌম শক্তির এলাকা সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের, ভূখণ্ডের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের এবং ভূখণ্ডের উপকূলবর্তী সমুদ্রের কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া ধরা হয়।

রাষ্ট্রের জনসমষ্টির ন্যায় ভূখণ্ডের আয়তনেরও কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। প্রাচীন গ্রীকদের নিকট একটিমাত্র নগর ছিল রাষ্ট্রের পক্ষে পর্যাপ্ত; আবার রোমকদের নিকট সমগ্র পৃথিবীও যথেষ্ট ছিল না। রোমকদের মতই প্রাচীন ভারতের নৃপতিগণ সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে চাহিতেন। বর্তমান যুগে অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ ভূখণ্ড কোনটিও কাম্য বিবেচিত হয় না। ভূখণ্ড অতি ক্ষুদ্র হইলে স্বাধীনতা বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে; আবার অতি বৃহৎ হইলে সুশাসন ব্যাহত হয়। সুতরাং যে-পরিমাণ ভূখণ্ড সুশাসনের সহায়ক সেই পরিমাণ ভূখণ্ডই কাম্য।

ভূখণ্ডের আয়তন

শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার (Government): জনসমাজ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাষ্ট্র-গঠনের জন্য পরবর্তী যে-উপাদানের প্রয়োজন হয় তাহা হইল সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার। রাষ্ট্র একটি সংগঠন। যে-কোন সংগঠনের পরিচালনার ভার একদল ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্র পরিচালনার ভার যাহাদের উপর থাকে, সমষ্টিগতভাবে তাহারা সরকার বলিয়া পরিচিত। সরকার আইনকানুন প্রবর্তন করিয়া রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা করে, রাষ্ট্রের আদর্শকে রূপ দেয়। পরিচালক-মণ্ডলীর অভাবে যে-কোন সংগঠন যেরূপ ভাঙিয়া পড়ে, সরকার না থাকিলে রাষ্ট্রও তেমনি বিচ্ছিন্ন জনতায় পরিণত হয়। অতএব, সরকারই রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রকে বজায় রাখে আবার ইতিহাসের দিক দিয়া সরকারই রাষ্ট্রের গঠন সম্পূর্ণ করিয়াছে। যতদিন সরকার গঠিত হয় নাই ততদিন সমাজও রাষ্ট্রে পরিণত হয় নাই।

সরকারের স্বরূপ

স্থায়িত্ব (Permanence): স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জনসমাজ স্থায়ীভাবে সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থার অধীনে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করিলে, তবেই রাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। তাই বলিয়া ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী। কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ততদিনই বজায় থাকে, যতদিন ঐ রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী থাকে। অপর রাষ্ট্র কর্তৃক বিজিত হইলে বা অপর রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলে ঐ রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা হারায়। ফলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়।

রাষ্ট্র স্থায়ী; কিন্তু চিরস্থায়ী নাও হইতে পারে

সার্বভৌমিকতা (Sovereignty): পূর্বেই ইংগিত দেওয়া হইয়াছে যে সার্বভৌমিকতা বা চরম ক্ষমতা রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, এবং তত্ত্বগত সার্বভৌমিকতাই রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংগঠন হইতে পৃথক করে। ইহাও বলা হইয়াছে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া একমাত্র রাষ্ট্রই আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করিতে পারে।

সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক আছে—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। রাষ্ট্রাভ্যন্তরে শেষ কথাটি বলিবার, শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার, চূড়ান্ত আদেশ জারি

করিবার ক্ষমতাকেই আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বলা হয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এই ইচ্ছা ও আদেশের অনুবর্তী হইয়া চলিতে হয়। বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলিতে বুঝায় বহিঃশক্তির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বা স্বাধীনতা। সুতরাং সার্বভৌম রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ-ভাবে স্বাধীন হইবে।

সার্বভৌমিকতার দুইটি দিক—ক। আভ্যন্তরীণ, খ। বাহ্যিক

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারত একটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ঐ তারিখের পূর্বে ভারতবর্ষে জনসমাজ ছিল, সীমারেখা দ্বারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছিল, সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থাও ছিল; কিন্তু সার্বভৌম শক্তির অধিকারী না হওয়ায় ভারতবর্ষ পৃথক রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইত না। উক্ত তারিখে ভারতবাসীর হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইলে ভারত রাষ্ট্র পর্যায়ভুক্ত হয়।

ভারত-রাষ্ট্রের জন্ম

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা বা সরকার, স্থায়িত্ব এবং সার্বভৌমিকতা—এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকিবে। ইহাদের কোনটির অভাব হইলে সংগঠনকে 'রাষ্ট্র' বলিয়া অভিহিত করা যায় না। ভারত একটি রাষ্ট্র, কারণ ইহার উক্ত সকল বৈশিষ্ট্যই আছে; পশ্চিমবংগ, আসাম প্রভৃতি রাষ্ট্র নহে, কারণ ইহাদের সার্বভৌমিকতা নাই। ইহারা ভারতীয় রাজ্যসংঘ বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এক-একটি অংশ মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলি (Units) কখনই রাষ্ট্র নহে। বাংলায় তাহাদের 'রাজ্য' বা 'প্রদেশ' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।*

পশ্চিমবংগ, আসাম প্রভৃতি রাষ্ট্র নহে

যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলি রাষ্ট্র না হইলেও কোন রাষ্ট্র-সমবায়ের (Confederation) সদস্যগণ রাষ্ট্র বলিয়াই পরিগণিত। যেমন, কমনওয়েলথ্ একটি রাষ্ট্র-সমবায়; যুক্তরাজ্য (U.K.) বা ইংল্যাণ্ড অষ্ট্রেলিয়া কানাডা ভারত পাকিস্তান সিংহল প্রভৃতি ইহার সদস্য। এই প্রত্যেকটি দেশই এক-একটি রাষ্ট্র। অনুরূপভাবে, ভারত পাকিস্তান সিংহল ব্রহ্মদেশ নেপাল প্রভৃতি রাষ্ট্র যদি কোন রাষ্ট্র-সমবায় গড়িয়া তুলে তবে উহারা রাষ্ট্রই থাকিবে; উহাদের রাষ্ট্রমর্যাদা কোনমতে ক্ষুণ্ণ হইবে না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, রাষ্ট্র-বিচারের মাপকাঠি কি? আধুনিক লেখকগণের মতে, ইহা হইল অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। অন্তত কয়েকটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতিলাভ না করিলে কোন দেশই রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হয় না।

রাষ্ট্র-বিচারের মাপকাঠি

---

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলিকে (Units) 'রাজ্য' (States) বলা হয়; কানাডায় ইহারা 'প্রদেশ' (Provinces) বলিয়া অভিহিত। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ইহাদের 'প্রদেশ' আখ্যাই দেওয়া হইয়াছিল।

রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government) : রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সরকারের মাধ্যমে। সেইজন্য সাধারণ লোকে রাষ্ট্র বলিতে সরকারকেই জানে; তাহারা রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না। প্রাচীনকালেও অনেক সময় 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' শব্দ দুইটির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হইত না। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই বলিয়াছিলেন, "আমিই রাষ্ট্র"। ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজাদেরও দুই-একজন অনুরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। এইভাবে 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' শব্দ দুইটি একই অর্থে ব্যবহৃত হইলেও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করিবার প্রয়োজন আছে।

রাষ্ট্র ও সরকার এক নহে

রাষ্ট্র হইল নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী, বহিঃশাসন হইতে মুক্ত, সুসংগঠিত জনসমাজ। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য সুশৃংখল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রের এই কার্য সম্পাদিত হয় সরকারের মাধ্যমে। সুতরাং সরকার রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসাধন করিবার যন্ত্র মাত্র; সরকারই রাষ্ট্র নহে।

অধ্যাপক গার্ণার কয়েকটি উপমার সাহায্যে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে এই পার্থক্যটি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। তাহার মধ্যে একটি উপমায় তিনি রাষ্ট্রকে প্রাণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রাণীর মস্তিষ্কটাই যেমন প্রাণী নহে, তেমনি সরকারও রাষ্ট্র নহে। তবুও মস্তিষ্কের নির্দেশে প্রাণীটি যেমন চলাফেরা করে, তেমনি সরকারের নির্দেশেই রাষ্ট্রের কার্য পরিচালিত হয়। সুতরাং সরকার রাষ্ট্রের মস্তিষ্কস্বরূপ।

সরকার রাষ্ট্রের মস্তিষ্কস্বরূপ

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্ট্র কয়েকটি উপাদান লইয়া গঠিত হয়। সরকার ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হয় না সত্য, কিন্তু সরকার রাষ্ট্র-গঠনের পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র উপাদান নহে—অন্যতম উপাদান মাত্র। রাষ্ট্র-গঠনের জন্য সরকার ছাড়া আরও চারিটি উপাদান—যথা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমাজ, সার্বভৌমিকতা ও স্থায়িত্ব প্রয়োজন। সুতরাং সরকার রাষ্ট্রের অংশ মাত্র। অংশকে সমগ্র বলিয়া মনে করিলে যেরূপ ভুল হয়, সরকারকে রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিলে সেইরূপই ভুল হইবে।

সরকার রাষ্ট্রের অংশ মাত্র

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের সভ্যসংখ্যা সরকারের সভ্যসংখ্যা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। রাষ্ট্র গঠিত হয় দেশের সমগ্র জনসাধারণকে লইয়া, কিন্তু সরকার গঠিত হয় মাত্র শাসনকার্য পরিচালকগণকে লইয়া। 'শাসনকার্য পরিচালকগণ' বলিতে যাঁহারা আইন প্রণয়ন, শাসন-ব্যবস্থা ও বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনা করেন মাত্র তাঁহাদিগকে বুঝায়। তাঁহাদের সংখ্যা দেশের সমগ্র জনসাধারণের শতাংশের একাংশও নয়।

চতুর্থত, স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সরকার কিন্তু চিরপরিবর্তনশীল। সরকারের পরিবর্তনের অর্থ শাসকগণের পরিবর্তন। শাসকগণের পরিবর্তনে

রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয় না। রাশিয়ার জারের, জার্মেনীর কাইজারের পতন হইয়াছিল; কিন্তু রাশিয়া বা জার্মান রাষ্ট্রের পতন হয় নাই। মিশরের রাজা ফারুকের হাত হইতে শাসনভার সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তে আসিয়াছিল; কিন্তু ইহাতে মিশরীয় রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানেও সামরিক কর্তৃপক্ষ শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইহাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাই। আবার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলীয় সরকার থাকায় আজ এই দল সরকার গঠন করিতেছে, কাল অপর দল সরকার গঠন করিতেছে। সরকারের এই ভাঙাগড়ার মধ্যে রাষ্ট্র কিন্তু ভাঙিতেছে না বা নূতন করিয়া গড়িতেছে না। স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরকারের পরিবর্তনশীলতার মধ্যে রাষ্ট্র সাধারণত অপরিবর্তিত অবস্থাতেই থাকে।

রাষ্ট্র স্থায়ী, কিন্তু সরকার পরিবর্তনশীল

পঞ্চমত, সকল রাষ্ট্র একই ধরনের—অর্থাৎ, সকল রাষ্ট্রই জনসমাজ, ভূখণ্ড প্রভৃতি উপাদানের দ্বারা গঠিত। সরকার কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হয়—অর্থাৎ, সকল সরকারে একই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। শাসনক্ষমতা একজনের হস্তে থাকিতে পারে, কয়েকজনের হস্তে থাকিতে পারে, আবার সমগ্র জনসাধারণের হস্তে থাকিতে পারে। আর একদিক দিয়া দেখিলে শাসনক্ষমতা ইংলণ্ডের ন্যায় একই সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকিতে পারে, আবার ভারতের ন্যায় সমগ্র দেশের সরকার ও দেশের অংশসমূহের সরকারগুলির মধ্যে বণ্টিতও হইতে পারে। ইহার ফলে আমরা একনায়কতন্ত্র (Dictatorship), গণতন্ত্র (Democracy), যুক্তরাষ্ট্র (Federation), এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Unitary Government) প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সরকারের সাক্ষাৎ পাই।

রাষ্ট্র একই ধরনের কিন্তু সরকার বিভিন্ন ধরনের হয়

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান (State and other Associations): সমাজের আলোচনা প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, বর্তমান সমাজের ধারণা জাতির (Nation) পরিপ্রেক্ষিতে করিয়া বলা হয় জাতীয় সমাজ—যেমন, ভারতীয় সমাজ, মার্কিন সমাজ ইত্যাদি। ইহাও বলা হইয়াছে, এই সকল জাতীয় সমাজের অভ্যন্তরে দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকে: (ক) রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্র, এবং (খ) অন্যান্য সংঘ—যথা, ধর্ম সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন, বণিক সমিতি, সাহিত্য সভা, কলা পরিষদ ইত্যাদি। রাষ্ট্রের ন্যায় এই সকল সংঘও মানুষের সামাজিক প্রকৃতির ফল। বর্তমান যুগে একমাত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমেই মানুষ তাহার জীবনের সকল দিক পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে পারে না বলিয়াই এই সকল সংঘের উদ্ভব হয়। বস্তুত, আধুনিক জীবনের ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে মানুষ এই সকল সংঘের সহিত নিজেকে বিশেষভাবে জড়াইয়া ফেলে।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ মানুষের সামাজিক প্রকৃতির ফল

এইভাবে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ— উভয়ই মানুষের সামাজিক প্রকৃতির ফল হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও রহিয়াছে যথেষ্ট।

প্রথমত, রাষ্ট্রের সভ্যপদ মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না; অন্যান্য সংঘের সভ্যপদ কিন্তু মানুষের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। রাষ্ট্রের সভ্যপদ সাধারণত মানুষের জন্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়; অপরদিকে সংঘের সভ্যপদ নির্ভর করে ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর। আবশ্যিকভাবে আমি ভারত-রাষ্ট্রের সভ্য; কিন্তু ফুটবল ক্লাব, সাহিত্য সভা প্রভৃতির সভ্য না হইলেও আমার চলে। উপরন্তু, কোন ব্যক্তি একসংগে একাধিক রাষ্ট্রের সভ্য হইতে পারে না; কিন্তু সে একাধিক সংঘের সভ্য হইতে পারে।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য:
১। রাষ্ট্রের সভ্যপদ আবশ্যিক; অন্যান্য সংঘের সভ্যপদ স্বেচ্ছাধীন

২। রাষ্ট্র ও সংঘের উদ্ভব-পদ্ধতি এক নহে

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে দীর্ঘ ক্রমবিকাশের ফলে; কিন্তু অন্যান্য সংঘ মানুষ স্বেচ্ছায় গঠন করিয়াছে।

৩। সংগঠনও পৃথক

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংঘের মধ্যে সংগঠনগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকে। এই ভূখণ্ডের বাহিরে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইতে পারে না; ইহার বাহির হইতে উহা সভ্য সংগ্রহও করিতে পারে না। অন্যান্য সংঘের কার্যক্ষেত্র কিন্তু এইরূপ সীমানির্দিষ্ট নহে অথবা তাহাদের সভ্যগ্রহণের বেলাতেও এরূপ কোন বাধা নাই। ভারত-রাষ্ট্র পাকিস্তানে গিয়া রেলপথ পাতিতে পারে না বা ঐ দেশ হইতে সভ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের ন্যায় সামাজিক প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান, ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—যে-কোন দেশেই শাখা খুলিতে বা যে-কোন দেশ হইতেই সভ্য সংগ্রহ করিতে পারে।

৪। উদ্দেশ্যও বিভিন্ন

চতুর্থত, উদ্দেশ্যের দিক দিয়াও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। অন্যান্য সংঘের সাধারণত দুই-একটি করিয়া উদ্দেশ্য থাকে। ফলে ইহাদের কার্যাবলীও সংখ্যায় পরিমিত। যেমন, ক্রীড়াসংঘের উদ্দেশ্য হইল ক্রীড়ার ব্যবস্থা করা, সেবাসংঘের সেবা করা ইত্যাদি। সুতরাং ক্রীড়াসংঘের কার্য ক্রীড়া-ব্যবস্থায় এবং সেবাসংঘের কার্য সেবাতেই সমাপ্ত হইয়া যায়। ক্রীড়াসংঘ সেবার ব্যাপারে বা সেবাসংঘ খেলাধূলার ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামায় না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কিন্তু আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তনের মাধ্যমে সমাজের সর্বাংগীণ কল্যাণসাধন করা। এই কারণে রাষ্ট্র মাত্র দু'একটি কার্য সম্পাদন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সমাজের কল্যাণের জন্য যখন যাহা প্রয়োজন তখন তাহাই উহাকে করিতে হয়। ফলে আধুনিক যুগে রাষ্ট্র কর্মমুখর হইয়া উঠিয়াছে—পূর্বে যে-সকল কার্য ব্যক্তি স্বয়ং সম্পাদন করিত বর্তমানে তাহার অধিকাংশই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রভুক্ত হইয়াছে। রাষ্ট্র বর্তমানে মোটরবাস চালায়, খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করে, কলকারখানা স্থাপন করে, জলসেচ বিদ্যুৎ-উৎপাদন প্রভৃতির ব্যবস্থা করে, ইত্যাদি। অন্যভাবে বলিতে গেলে,

অন্যান্য সংঘের উদ্দেশ্য বিশেষ বলিয়া উহাদের কার্যক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ; রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধারণ বলিয়া উহার কার্যক্ষেত্রও সীমাহীন।

পঞ্চমত, রাষ্ট্র সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী; কিন্তু অন্যান্য সংঘ দীর্ঘস্থায়ী নাও হইতে পারে। অন্যান্য সংঘের উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই উহাদের বিলুপ্তি ঘটিতে পারে। যেমন, দুর্ভিক্ষত্রাণের কার্য শেষ হইলেই দুর্ভিক্ষত্রাণ সমিতি বিলুপ্ত হইতে পারে। এইরূপে প্রত্যেক জাতীয় সমাজে কত সংঘই না লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, নূতন নূতন কত সংঘেরই না উদ্ভব ঘটিতেছে। সমাজজীবনে বিভিন্ন সংঘের এইরূপ উদ্ভব ও বিলুপ্তির মধ্যে রাষ্ট্র নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকে।

৫। স্থায়িত্বও এক প্রকার নহে

পরিশেষে, রাষ্ট্র ও সংঘের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল ক্ষমতাগত। একমাত্র রাষ্ট্রই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া আইন মান্য করা বাধ্যতামূলক। আইন মান্য না করিলে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করিতে পারে। অন্যান্য সংঘের নিয়মকানুন মান্য করা সম্পূর্ণভাবে সভ্যদের স্বেচ্ছাধীন। কোন সভ্য নিয়মকানুন ভংগ করিলে সংশ্লিষ্ট সংঘ তাহাকে উপরোধ-অনুরোধ করিতে পারে, সংঘ হইতে বিতাড়িত করিতে পারে, কিন্তু তাহার উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারে না। অর্থাৎ, নিয়মকানুন মান্য করিতে বাধ্য করিতে পারে না।

৬। কিন্তু প্রধান পার্থক্য ক্ষমতাগত

এই সার্বভৌম বা সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতার জন্যই আবার প্রত্যেক সংঘকে রাষ্ট্রের ইচ্ছা, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতে হয়। না মানিলে রাষ্ট্র ঐ সংঘের বিলোপসাধন করিতে পারে। ইহার স্থলে নূতন সংঘের সৃষ্টিও করিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংঘের সৃষ্টিকর্তা, নিয়ামক ও বিলুপ্তকারী হিসাবে দেখা যায়।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সুশৃংখল সমাজজীবন গঠন করা। এই কারণে ইহাকে সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতা বা সার্বভৌমিকতা প্রদান করা হইয়াছে। সার্বভৌম ক্ষমতা আইন প্রণয়ন ও বলবৎকরণের ক্ষমতা মাত্র।

রাষ্ট্রের বহু সংজ্ঞা আছে। ইহাদের মধ্যে গার্ণার-প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়—(১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সরকার, (৪) স্থায়িত্ব, এবং (৫) সার্বভৌমিকতা। এই পাঁচটি উপাদানের সমবায়েই রাষ্ট্র গঠিত হয়; ইহাদের কোন একটির অভাব থাকিলে সংগঠন রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হয় না।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্বে সার্বভৌমিকতা না থাকার জন্য ভারতবর্ষ রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইত না। ঐ তারিখে সার্বভৌমিকতা ভারতবাসীর নিকট হস্তান্তরিত হইলে ভারত রাষ্ট্র পদবাচ্য হয়।

পশ্চিমবংগ, আসাম প্রভৃতি রাষ্ট্র নহে; ইহারা 'ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে'র এক-একটি অংশ মাত্র।

রাষ্ট্র-বিচারের মাপকাঠি হইল অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি।

রাষ্ট্র ও সরকার অভিন্ন নহে। সরকার রাষ্ট্রের অংশমাত্র; সরকার রাষ্ট্রের মস্তিষ্কস্বরূপ।

রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। তবে অন্যান্য সংঘের সহিত ইহার সংগঠন, উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতাগত পার্থক্য রহিয়াছে। সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্র অন্যান্য সংঘের নিয়ন্ত্রণ, সৃষ্টি ও বিলোপসাধন করিতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

1. What is a State ? What are its chief characteristics ?

রাষ্ট্র কাহাকে বলে ? রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি ? [৭-১১ পৃষ্ঠা]

2. Explain the characteristics of the 'State'. How would you distinguish the State from the Government ? (P. U. 1962)

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর। কিভাবে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিবে ?

[৮-১১ এবং ১২-১৩ পৃষ্ঠা]

3. Define the term 'State'. Are the following States ?—(a) West Bengal, (b) Canada, and (c) Nepal. Give reasons for your answer. (P. U. 1964)

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। নিম্নলিখিতগুলি কি রাষ্ট্র ?—(ক) পশ্চিমবংগ, (খ) কানাডা, এবং (গ) নেপাল। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

[ইংগিত : নেপাল একটি স্বাধীন দেশ : সুতরাং ইহা রাষ্ট্র। রাষ্ট্র হিসাবেই ইহা সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জের সদস্যপদভুক্ত......এবং ৭-৯, ১১ পৃষ্ঠা]

4. What do you understand by 'Sovereignty' ? Why is it regarded as the most essential characteristic of the State ?

'সার্বভৌমিকতা' বলিতে কি বুঝ ? উহাকে রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করা হয় কেন ?
[৭-৮ এবং ১০-১১ পৃষ্ঠা]

5. Explain the points of difference between the State and other associations. (En. 1964)

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। [১৪-১৫ পৃষ্ঠা]

6. Are the following States ?—
(a) The State of West Bengal, (b) A Football Club. Give reasons for your answer.

নিম্নলিখিতগুলি কি রাষ্ট্র ?—(ক) পশ্চিমবংগ রাজ্য, (খ) কোন ফুটবল ক্লাব। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

[ইংগিত : ফুটবল ক্লাব অন্যতম সংঘ, রাষ্ট্র নহে।......(১১ এবং ১৩-১৫ পৃষ্ঠা)]

7. What do you mean by the term State ? Are the following States ?—
(a) The State of West Bengal, (b) A College Union, (c) The United Nations. (En. 1962)

রাষ্ট্র বলিতে কি বুঝ ? নিম্নলিখিতগুলি কি রাষ্ট্র ?—(ক) পশ্চিমবংগ রাজ্য, (খ) কোন কলেজের ছাত্রসংসদ, (গ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ।

[ইংগিত : ছাত্রসংসদ অন্যতম সংঘ, রাষ্ট্র নহে ; এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একটি রাষ্ট্র-সমবায়। ইহার সার্বভৌমিকতা নাই। সুতরাং ইহাও রাষ্ট্র নহে।...(৭-৮, ১১, ১৩-১৫ পৃষ্ঠা)]

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

(Origin of the State)

মানুষের স্বাভাবিক সংঘবদ্ধতাই সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ। উদ্ভবের পর বহুদিন পর্যন্ত এই দুই সংগঠন মানুষের কোন প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেই ক্রমবিকশিত হইতেছিল। তারপর এমন এক অবস্থা আসিল যখন মানুষ ইহাদের উপযোগিতা ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল

এবং ইহাদিগকে পরিকল্পিত পথে পরিচালিত করিতে সচেষ্ট হইল। ইহার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু মতবাদের সৃষ্টি হইল। এইভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সৃষ্ট মতবাদগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(ক) বৈজ্ঞানিক মতবাদ, এবং (খ) কল্পনাপ্রসূত মতবাদ।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই প্রকার মতবাদ

মানুষের সংঘবদ্ধতার ফলেই যে সমাজ ক্রমবিকশিত হইয়া একদিন রাষ্ট্রের উদ্ভব সূচিত করিয়াছে, রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে ইহাই হইল বৈজ্ঞানিক মতবাদ। আধুনিক কালে নানা বিদ্যার চর্চার ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির এইরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘন তমসাবৃত ছিল। তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতেন। ফলে কল্পনাপ্রসূত মতবাদসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলি অবশ্য মূল্যহীন নহে। উহাদের মধ্যে কিছু কিছু সত্য নিহিত আছে। এই কারণে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিবার জন্য উহাদেরও আলোচনা করা প্রয়োজন। উপরন্তু, যতক্ষণ না প্রচলিত সকল মতবাদ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয় ততক্ষণ কোন্‌টি সঠিক মতবাদ তাহা বুঝা যায় না। এই দিক দিয়াও রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির পর্যালোচনার সার্থকতা রহিয়াছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (Theories of the Origin of the State): রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির মধ্যে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদই প্রধান। অপরদিকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদে। এখন প্রথমে কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির আলোচনা করিয়া পরে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিবৃত করা হইতেছে।

ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ (Theory of Divine Origin): রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির মধ্যে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই মতবাদের মূল বিষয়ের বর্ণনা এইভাবে করা যায়: রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত। ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁহার প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। রাজাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সুতরাং রাজার আদেশ অমান্য করার অর্থ ঈশ্বরের ইচ্ছা অমান্য করা। অর্থাৎ, রাজদ্রোহিতার অর্থ ধর্মদ্রোহিতা। ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া রাজা একমাত্র ঈশ্বরের নিকটই দায়িত্বশীল; আর কাহারও নিকট তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। তিনি প্রজাদের মতামত ও প্রচলিত আইনকানুনের ঊর্ধ্বে।

এই মতবাদের মূল বক্তব্য

অনেক সময় নৃপতিবিহীন রাষ্ট্রেও ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। এইরূপ রাষ্ট্র ধর্মশাস্ত্রের নীতি অনুসারে শাসিত হয়; এবং রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হইলেও তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্রগুলি ধর্মীয় রাষ্ট্র (Theocratic States) নামে অভিহিত। এইরূপ ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ইহাতে প্রাচীন ভারতীয়গণ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। এইজন্য বিভিন্ন রাজবংশের নাম ছিল সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ ইত্যাদি। ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসাবে ব্রাহ্মণ তখন রাজার মাথায় মুকুট পরাইয়া দিতেন। এখনও অনেক জাপানী তাহাদের রাজবংশকে সূর্য হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করে। ইউরোপে মোটামুটিভাবে ষোড়শ শতাব্দী অবধি ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদই ছিল সর্বপ্রধান মতবাদ। তাহার পর হইতে সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রচার, গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণার প্রসার প্রভৃতির ফলে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের প্রভাব ক্রমশ কমিয়া আসিতে থাকে; এবং কিছুদিনের মধ্যেই ইহা একরূপ ঐতিহাসিক মতবাদে পরিণত হয়।

ধর্মীয় রাষ্ট্র

সমালোচনা: বর্তমানে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদে বিশ্বাস শিক্ষিত লোক সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছে বলা চলে। রাষ্ট্রকে ঈশ্বর-সৃষ্ট মনে করিলে আইন-কানুনকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখিতে হয়। ইহার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন করা। বুদ্ধি দিয়া, যুক্তি দিয়া বিচার করিলে স্বেচ্ছাচারিতাকে কোনমতেই সমর্থন করিতে পারা যায় না।

১। ইহা অযৌক্তিক

দ্বিতীয়ত, রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লইলেও অত্যাচারী রাজাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিতে মন চায় না। ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি এত নির্দয় হইতে পারেন না যে তিনি নির্মম অত্যাচারীকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিবেন; তৈমুর লং, নাদির শা প্রভৃতি নৃপতিকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা অসম্ভব।

২। ইহা অত্যাচার সমর্থন করে

তৃতীয়ত, ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ রাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন শাসন-ব্যবস্থায় ঈশ্বরের প্রতিনিধির সন্ধান দিতে পারে না। ভারতের ন্যায় প্রজাতন্ত্রে ঈশ্বরের প্রতিনিধি কে? এ-প্রশ্নের উত্তর এই মতবাদে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা অসম্পূর্ণ মতবাদ।

৩। ইহা অসম্পূর্ণ মতবাদ

এই সকল কারণে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ বর্তমানে পরিত্যক্ত হইলেও ইতিহাসের দিক দিয়া ইহার কিছুটা মূল্য আছে। মানুষ যখন বর্বর ও বিশৃংখল জীবনযাপন করিত, যখন ধর্ম ছাড়া আর কিছুই মানিত না, তখন রাজা ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি এইরূপ ধারণা প্রচার করিয়া আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। রাজাও অনেক সময়

ঐতিহাসিক মূল্য

বিশ্বাস করিতেন যে তিনি ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি। ফলে প্রকৃতই প্রজাপালন করিতে চেষ্টা করিতেন। এই দুই-এর ফলে সুশৃংখল সমাজজীবনের প্রতিষ্ঠা বা রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল।

বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force): এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে মাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা। মতবাদের সমর্থকদের মতে, মানুষ যে শুধু সামাজিক জীব তাহা নহে, কলহপ্রিয় জীবও বটে। ক্ষমতালিপ্সা মানুষের অন্যতম প্রবৃত্তি। কলহপ্রীতি ও ক্ষমতালিপ্সার জন্য সে আদিমকাল হইতেই বলপ্রয়োগ করিয়া আসিতেছে। বলপ্রয়োগ দ্বারা প্রথমে বলবান ব্যক্তি বা বলশালী জনগোষ্ঠী (clan) কতিপয় দুর্বল ব্যক্তি বা কোন দুর্বল গোষ্ঠীকে বশীভূত করিয়া তাহার বা তাহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিল। এইরূপে উপজাতির (tribe) উদ্ভব হইল। তারপর বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে বাধিল সংঘর্ষ। সংঘর্ষের ফলে বিজয়ী উপজাতি বিজিত উপজাতির উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিল। বিজয়ী উপজাতির দলপতি নরপতি বলিয়া স্বীকৃত হইল। এইভাবে উদ্ভব হইল রাষ্ট্রের।

মতবাদের সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের উৎপত্তির এই বলপ্রয়োগ মতবাদকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ডাঃ লীকক (Dr. Stephen Leacock)। তিনি বলেন, "ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সন্ধান করিতে হইবে মানুষের দ্বারা মানুষের উপর আক্রমণ ও তাহাদিগকে অধীনতায় আনয়ন করার মধ্যে, স্বার্থান্ধ বলবানের প্রভুত্বলিপ্সার মধ্যে।"

সমালোচনা: রাষ্ট্রের উদ্ভবে যে পাশবিক বলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। তরবারি দ্বারাই পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এ-মত স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায় না যে, একমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রের উদ্ভবে যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, ধর্মের বন্ধন, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি প্রভৃতি শক্তি কার্য করিয়াছে। কোন দলপতি গোষ্ঠী বা উপজাতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিত না, যদি না গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিগণের অধিকাংশ তাহার আনুগত্য স্বীকার করিত। এই প্রসংগে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে। উক্তিটি হইল, "প্রজার শক্তিতেই রাজা শক্তিমান, নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত।" কতকটা স্বাভাবিক সংবদ্ধতার প্রেরণায়, কতকটা ধর্মভয়ে, কতকটা উপযোগিতার জন্য এবং কতকটা বলপ্রয়োগে বশীভূত হইয়াই মানুষ রাজনেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিল—একমাত্র বলপ্রয়োগের কারণে করে নাই। সুতরাং বলপ্রয়োগকে রাষ্ট্রের উদ্ভবের একমাত্র কারণ বলিয়া বর্ণনা করিলে ভুল হইবে; ইহা অন্যতম কারণ মাত্র।

এই মতবাদে কিছুটা সত্য নিহিত আছে

কিন্তু বলপ্রয়োগই রাষ্ট্রের উদ্ভবের একমাত্র কারণ নয়

পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal and Matriarchal Theories): পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে পরিবার সম্প্রসারিত হইয়াই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। এই দুই মতবাদ কিন্তু অনেকাংশে পরস্পরবিরোধী। পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে আদিম সমাজে পিতাই ছিলেন গৃহস্বামী এবং পিতার দিক হইতে বংশ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি নির্ণীত হইত। মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে বংশ, উত্তরাধিকার নির্ধারিত হইত মাতার দিক হইতে, পিতার দিক হইতে নহে।

এই দুই মতবাদ অনুসারে পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থকগণ বলেন, আদিম যুগের সমাজ ছিল কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি। পরিবারের উপর প্রাচীনতম পুরুষ সভ্য বা গৃহস্বামীর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। এক পরিবার যখন কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত হইল তখন এই সকল পরিবারের উপর আদি পরিবারের গৃহস্বামীর কর্তৃত্ব বজায় রহিল। এইভাবে উপজাতির (tribe) উদ্ভব হইল। উপজাতির মধ্যে কেহ কেহ বিভিন্ন স্থানে গিয়া বসবাস করিতে লাগিল; এবং ফলে একটির স্থলে কয়েকটি উপজাতির সৃষ্টি হইল। আত্মীয়তাবোধ এই উপজাতিগুলির মধ্যে সংহতি বজায় রাখিল, তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিয়া কার্য করিতে লাগিল এবং ক্রমে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিল।

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ

দুই দিক দিয়া পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথম সমালোচনা অনুসারে সমাজ প্রথমে মাতৃতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংঘটিত হইয়াছিল এবং পরে আসিয়াছিল পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। অর্থাৎ, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পূর্ববর্তী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচকগণ বলেন, সমাজ-সংগঠনের আদিমতম রূপ গোষ্ঠী (clan), পরিবার নহে। পারিবারিক জীবন সুরু হইয়াছিল বহু পরে—সামাজিক জীবন ক্রমবিকাশের পথে বহুদূর অগ্রসর হইলে।

উপসংহারে বলিতে পারা যায় যে, রাষ্ট্রের উদ্ভব বিশেষ জটিলতায় আবৃত; পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের মত অত সরলভাবে ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে প্রাচীনকালে পরিবারের উপর কর্তৃত্ব ছিল মাতার, পিতার নহে। ক্রমে এই কর্তৃত্ব সমগ্র উপজাতির (tribe) উপর পরিব্যাপ্ত হইল। এইভাবে প্রবীণতমা গৃহকর্ত্রী জননেত্রী হইয়া বসিলেন এবং রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটিল।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পূর্ববর্তী আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ইহা স্বীকার করেন। কিন্তু শারীরিক ক্ষমতায় নারী পুরুষ অপেক্ষা ন্যূন। সুতরাং স্ত্রীলোক যে সর্বস্থানেই এবং বহুদিন ধরিয়া পুরুষের উপর প্রভুত্ব করিয়াছে—এইরূপ মতবাদ অযৌক্তিক। প্রথমে সমাজ মাতৃতান্ত্রিক থাকিলেও কিছুদিন পরেই নারীর প্রভুত্বের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল পুরুষের কর্তৃত্ব।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, যেখানেই নারীর তত্ত্বগত প্রভুত্ব ছিল, সেখানেই নারীর হইয়া কর্তৃত্ব পরিচালনা করিত ঐ নারীর পিতা ভ্রাতা বা আর কেহ। উপরন্তু, পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের মতই মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ একমাত্র পরিবার সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করে। সুতরাং প্রথমোক্ত মতবাদের মতই ইহা রাষ্ট্রের উদ্ভবের আংশিক বা অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা মাত্র। আত্মীয়তাবোধ বা পরিবারের সম্প্রসারণ ছাড়াও যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি প্রভৃতি নানা কারণে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই দুই মতবাদ রাষ্ট্রের উদ্ভবের আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র

সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory): রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই কল্পনাপ্রসূত মতবাদ অনুসারে আদিম মানুষের মধ্যে চুক্তির ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে।

সংক্ষেপে এই মতবাদকে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে: রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ 'প্রাকৃতিক অবস্থা'র ('State of Nature') মধ্যে বাস করিত। কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, এই অবস্থায় সমাজও সংগঠিত হয় নাই; আবার কয়েকজনের মতে তখন সমাজ সংগঠিত হইয়াছিল, কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে নাই। 'প্রাকৃতিক অবস্থা'য় সমাজ সংগঠিত হউক আর না-হউক রাষ্ট্রের উদ্ভব না-হওয়ায় তখন মানুষের দ্বারা প্রণীত কোন আইনকানুন ছিল না। মানুষ তখন যথেচ্ছভাবে বিচরণ এবং যথেচ্ছভাবে জীবনযাপন করিত। এই যথেচ্ছাচারিতার উপর কোন বাধা ছিল না। অনেকে কিন্তু বলেন যে একমাত্র বাধা ছিল কতকগুলি 'ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি' (Natural Laws)। এই সকল 'স্বাভাবিক নীতি'র ফলে মানুষের হিংসা, হত্যা করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিগুলি দমিত থাকিত। এই অবস্থায় বেশীদিন বাস করা সম্ভব না হওয়ায় আদিম মানুষ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্রের পত্তন করিল। রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে স্বাভাবিক নীতির স্থানাধিকার করিল মানুষের দ্বারা প্রণীত আইনকানুন।

মতবাদের সংক্ষিপ্তসার

আদিম মানুষের মধ্যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে—এই মতবাদ অতি প্রাচীন। প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রনৈতিক সাহিত্যে এবং আমাদের দেশে মহাভারত, বৌদ্ধ গ্রন্থ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই মতবাদকে পরিস্ফুটিত করিয়া ইহার বর্তমান রূপদান করিয়াছেন তিনজন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। ইঁহারা হইলেন সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ চিন্তাবীর হবস্ ও লক্ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক রুশো।

ইহা অতি প্রাচীন মতবাদ

হবস্ (Hobbes): হবসের মতে, প্রাকৃতিক অবস্থায় কোনরূপ সমাজজীবনের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই কারণে এই অবস্থা ছিল অতি ভয়াবহ। আদিম মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহের কোন বিরাম ছিল না। কোনরূপ আইন-

কানুনের বাধা ছিল না* বলিয়া মানুষ তখন অসৎ উপায়ে ও নির্মমভাবে স্বার্থসাধনের চেষ্টা করিত। ফলে প্রত্যেকেই ছিল প্রত্যেকের শত্রু এবং প্রত্যেকেই ছিল প্রতিবেশীর ভয়ে ভীত; সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ প্রতিবেশীকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। প্রতিবেশীকে এড়াইবার একমাত্র উপায় ছিল নিঃসংগ জীবনযাপন করা। আদিম মানুষ তাহাই করিতে লাগিল। ফলে জীবন হইয়া উঠিল নিঃসংগ, অসহায়, ঘৃণ্য, পাশবিক এবং অনিশ্চিত (Life became solitary, poor, nasty, brutish and short)।

সমাজের উদ্ভবের পূর্বে মানুষের জীবন ছিল দুর্বিসহ

তারপর মানুষ এই দুর্বিষহ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের উপায় খুঁজিতে লাগিল। মুক্তি আসিল সমাজ-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া। আদিম মনুষ্যগণ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া সমস্ত ক্ষমতা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদের (assembly of men) হস্তে তুলিয়া দিল। এইভাবে চুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংসদ হইলেন সার্বভৌম (sovereign)। সার্বভৌম শক্তির উদ্ভবের ফলে প্রাকৃতিক অবস্থার অবসান ঘটিল, বিরোধ সংযত হইল এবং প্রতিষ্ঠিত হইল সুশৃংখল সমাজজীবন বা রাষ্ট্র।

দুঃসহ জীবন হইতে মানুষ মুক্তিলাভ করিল সমাজ-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া

লক্ (Locke) : লক্ যে প্রাকৃতিক অবস্থার চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা হবস্-কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থার মত ভয়াবহ নহে। হবসের ধারণার বিরোধিতা করিয়া লক্ বলেন যে প্রাকৃতিক অবস্থায় একপ্রকার সমাজজীবন গঠিত হইয়াছিল। এইজন্য প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল শান্তি,শুভেচ্ছা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার রাজ্য। এই অবস্থায় মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত 'ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি' দ্বারা।

তবুও প্রাকৃতিক অবস্থার অনেক ত্রুটি ছিল। প্রথমত, কোন্‌টি ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি এবং কোন্‌টি নয়—সে-সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। দ্বিতীয়ত, এই সকল নীতির ব্যাখ্যার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তৃতীয়ত, আইন ভংগ করিলে যেরূপ শাস্তি প্রদান করা হয়, এই সকল নীতি ভংগ করিলে সেরূপ কোন শাস্তিপ্রদানের বন্দোবস্ত ছিল না।

রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে সমাজজীবন ছিল অসম্পূর্ণ

এই সকল অসম্পূর্ণতার জন্য প্রাকৃতিক অবস্থায় জীবনযাপন নিরাপদ হইতে পারে নাই। এই নিরাপত্তার জন্যই মানুষ চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রের। এই চুক্তি হইয়াছিল সম্প্রদায়ের সকলের সহিত প্রধান বা রাজা বলিয়া নির্বাচিত ব্যক্তির সংগে।

এইজন্য মানুষ চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রের পত্তন করিয়াছিল

রুশো (Rousseau) : লক্ হইতে আরও এক স্তর ঊর্ধ্বে উঠিয়া রুশো বলিয়াছেন যে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল একরূপ মর্ত্যের স্বর্গ।

* হবস্ প্রাকৃতিক অবস্থায় 'ন্যায়বোধের স্বাভাবিক নীতি'র অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই।

এই অবস্থায় সমাজ সম্পূর্ণ সাম্যবাদী ছিল এবং মানুষ সুন্দর সহজ সুখী ও সরল জীবনযাপন করিত। কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এই আদিম সরলতা ও সুখ ক্রমশ অন্তর্হিত হইতে লাগিল; এবং মানুষ নিজের এবং অপরের দ্রব্যের মধ্যে প্রভেদ করিতে শিখিল। তখন প্রাকৃতিক অবস্থা প্রকৃতপক্ষেই হবস্-কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি হইয়া দাঁড়াইল। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সংঘর্ষ, নরহত্যা, যুদ্ধবিগ্রহ প্রাকৃতিক অবস্থার বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়ায় মানুষ ইহা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। এখানেও মুক্তি আসিল চুক্তির মধ্য দিয়া, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া।

১। প্রথমে গোষ্ঠীজীবন ছিল সুন্দর

কিন্তু পরে ইহা অবাধ হওয়ায় মানুষ রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল

হবস্ ও লকের মত রুশোর কল্পিত চুক্তিতে কিন্তু রাজার স্থান নাই। আদিম মনুষ্যগণ চুক্তি দ্বারা ক্ষমতা কোন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে সমর্পণ করে নাই, ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছিল চুক্তি দ্বারা সৃষ্ট সমাজকে যাহাকে রুশো 'সাধারণের ইচ্ছা' (General Will) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

রুশোর মতবাদে রাজার স্থান নাই

সমালোচনা : সামাজিক চুক্তি মতবাদ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাজগতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর হইতেই বিভিন্ন দিকে সমালোচিত হইয়া ইহার প্রভাব কমিয়া আসিতে থাকে।

এই মতবাদের প্রধান বিরুদ্ধ সমালোচনা হইল যে ইহা অনৈতিহাসিক। কোন দেশের ইতিহাসেই এইরূপ নজির নাই যে মানুষ চুক্তি দ্বারা একটি রাষ্ট্রও গঠন করিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ ইতিহাস-বিরোধী।

১। ইহা অনৈতিহাসিক

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদ ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। চুক্তি বলিতে বুঝায় আইনানুমোদিত বুঝাপড়া। অর্থাৎ, আইনসংগতভাবে পরস্পরের মধ্যে যে অংগীকার করা হয় তাহাকেই চুক্তি বলে। সুতরাং চুক্তির পূর্বে প্রয়োজন হইল আইন প্রণয়নের। সামাজিক চুক্তি মতবাদে কিন্তু কল্পনা করা হইয়াছে যে রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বেই, আইন প্রণয়নের পূর্বেই মানুষ চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল। এইরূপ ধারণা যুক্তির দ্বারা কখনই সমর্থিত হইতে পারে না।

২। ইহা ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক অবস্থায় আদিম মনুষ্যগণ রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল বলিয়া যে কল্পনা করা হইয়াছে তাহাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। লোকে রাষ্ট্রের উপযোগিতা বুঝিতে পারে, ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার (political consciousness) উন্মেষ হইলে। আদিম মনুষ্যগণ রাষ্ট্র কাহাকে বলে তাহা জানিত না; সংগঠন সম্বন্ধেও

৩। আরও একটি কারণে ইহা অযৌক্তিক

তাহাদের কোন ধারণা ছিল না। এই অবস্থায় তাহারা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিল কিরূপে? কি করিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল যে রাষ্ট্র গঠিত হইলেই তাহাদের প্রাকৃতিক অবস্থার দুঃখদুর্দশার অবসান ঘটিবে? এই প্রশ্নের উত্তর সামাজিক চুক্তি মতবাদে পাওয়া যায় না।

৪। ইহা বিপজ্জনক মতবাদ

চতুর্থত, অনেকের মতে এই মতবাদ বিশেষ বিপজ্জনক—ইহা রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার ঘোরতর পরিপন্থী। শাসক ও শাসিতের মধ্যে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে এই ধারণা প্রচার করা হয় বলিয়া জনসাধারণ সকল সময়ই সরকারের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়ায়। ফলে দেখা দেয় গণ-অভ্যুত্থান বা বিপ্লব। বস্তুত, অষ্টাদশ শতাব্দীর দুইটি প্রধান বিপ্লব—ফরাসী বিপ্লব এবং আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল সামাজিক চুক্তি মতবাদ হইতে।

ঐতিহাসিক মূল্য

উপরি-উক্ত ত্রুটির জন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বর্তমানে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। অন্যতম রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণার পরিস্ফুটনে এই মতবাদ বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

এই মতবাদ গণতন্ত্রের বিকাশে সহায়তা করিয়াছে

সামাজিক চুক্তি মতবাদের পূর্বে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদই ছিল প্রচলিত মতবাদ। ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ অনুসারে রাজার ক্ষমতা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত; সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুসারে ক্ষমতা কিন্তু জনসাধারণ বা শাসিতের নিকট হইতে চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত। এইভাবে শাসিতকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস বলিয়া বর্ণনা করিয়া গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করা হইয়াছে—ঈশ্বরের আদেশের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে জনমতের প্রাধান্য।

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (Historical or Evolutionary Theory): দেখা গেল যে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ—কোনটিই গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ কোনটিই যথেষ্ট নহে। এ-সম্বন্ধে গার্ণার সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, "রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে, পাশবিক শক্তিরও ফল নহে, প্রস্তাব বা চুক্তির দ্বারাও সৃষ্ট হয় নাই। শুধু পরিবারের সম্প্রসারণ বলিয়াও ইহাকে গ্রহণ করা যায় না।" তবে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা যাইবে কিভাবে? রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য মতবাদ কি? রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদে। এই মতবাদ মানুষের অলস কল্পনামাত্র নহে; ইহা ঐতিহাসিক

রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রকৃত ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক মতবাদে পাওয়া যায়

অনুসন্ধানের ফল। এই মতবাদ অনুসারে মানবসমাজ দীর্ঘদিন ধরিয়া বিবর্তিত হইয়া বর্তমানের জটিল রূপ গ্রহণ করিয়াছে—হঠাৎ একদিন ঈশ্বরের খেয়াল বা মানুষের প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্ট হয় নাই। এ-সম্বন্ধে বার্জেসের (Burgess) উক্তি হইল, "রাষ্ট্র মানবসমাজের বিরতিবিহীন ক্রমবিকাশের ফল।"*

কবে এবং কিভাবে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা সঠিক-ভাবে নির্ধারণ করা যায় না। তবে একথা ঠিক যে মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব অতি আদিমকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে; এবং ধীরে ধীরে এই সামাজিক কর্তৃত্ব রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহাও বলা যায় যে অন্তত কয়েকটি শক্তি এই রূপান্তরকার্যে—অর্থাৎ রাষ্ট্র-গঠনে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। শক্তিগুলি হইল রক্তের সম্বন্ধ বা আত্মীয়তাবোধ, ধর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা। এখন ইহাদের সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহাদের আলোচনা পৃথক পৃথক ভাবে করা হইলেও ইহারা পৃথক পৃথক ভাবে কার্য করে নাই। রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পরিমাণে পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত থাকিয়া ইহারা সকলেই একসংগে কার্য করিয়াছে। তবে কোনটি কোন্ সময় কিভাবে এবং কতটা পরিমাণে কার্যকর হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

রাষ্ট্রের সূত্রপাত ভমসাচ্ছন্ন

কি কি শক্তি দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে

১। রক্তের সম্বন্ধ (Kinship): রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাস সুরু করিতে পারা যায় সমাজে পারিবারিক জীবনের সূত্রপাতের পর হইতে। পারিবারিক জীবনের পূর্বে মানুষ যখন সাম্যবাদী সমাজজীবন যাপন করিত তখন তাহারা 'আনুগত্যের শিক্ষা' লাভ করে নাই। অথচ আনুগত্যই প্রকৃত সংঘবদ্ধ জীবনের মূলসূত্র। মানুষের আনুগত্য প্রথম প্রকাশ পায় পারিবারিক জীবনে। পরিবারের প্রতি স্নেহমমতা প্রদর্শনের সংগে সংগে তাহারা গৃহকর্তার আদেশও পালন করিতে শিখে। এইভাবে আনুগত্যের ভিত্তিতে নূতন সংঘবদ্ধ জীবনের সূত্রপাত হয়।

মানুষ পরিবারের মধ্যেই প্রথম আনুগত্যের শিক্ষা লাভ করে

পরিবারের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যখন একই পরিবার বহু পরিবারে বিভক্ত হইয়া গেল, তখন আর গৃহকর্তার পক্ষে সকল পরিবারের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা সম্ভব হইল না। এই অবস্থাতে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে সংহতি বজায় রাখিল আত্মীয়তাবোধ। বিভিন্ন পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ একই পূর্বপুরুষের বংশধর হইয়া নিজেদের পরিচয় দিত বলিয়া তাহারা পরস্পরের সহিত ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ রহিল। এইভাবে

গোষ্ঠীজীবনে আত্মীয়তাবোধ সংহতি বজায় রাখিয়াছিল

* "The State is the product of continuous development of human society."

এক নূতন গোষ্ঠীজীবনের* (a new clan life) উদ্ভব হইল। এইরূপ গোষ্ঠীর উপর সামগ্রিকভাবে কর্তৃত্ব করিতেন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবীণতম ব্যক্তি বা গোষ্ঠীপ্রধান। সকলে তাঁহার আদেশ পালন করিয়া চলিত।

২। ধর্ম (Religion): রক্তের সম্বন্ধ বা আত্মীয়তাবোধের সমসাময়িক আর একটি শক্তি যাহা প্রাচীন সমাজের সংহতি বজায় রাখিয়াছিল তাহা হইল ধর্ম। গোষ্ঠীর সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আত্মীয়তাবোধ যখন ক্ষীণ হইয়া পড়িল তখন ধর্ম না থাকিলে গোষ্ঠীজীবন যে ধ্বংস হইত সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

ধর্ম সমাজকে ভাঙন হইতে বাঁচাইয়াছিল

ধর্ম বলিতে তখনকার দিনের লোক বুঝিত প্রকৃতি-পূজা এবং পূর্বপুরুষদের পূজা। আদিম মানুষ ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, ঋতু-পরিবর্তন, জীব ও উদ্ভিদের মৃত্যু প্রভৃতি স্বাভাবিক ঘটনাকে দেবতার কোপ বলিয়া মনে করিত; এবং ইহাদের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বজ্রের দেবতা, ঋতুর দেবতা, সংহারের দেবতা প্রভৃতির পূজা করিত। অপরদিকে তাহারা আবার বিশ্বাস করিত যে যত রোগশোক দুঃখদুর্দশা তাহা পূর্বপুরুষদেরই অভিশাপের ফল। সুতরাং পূর্ব-পুরুষদের সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যও তাহারা তাঁহাদের পূজা করিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল পূজাপার্বণ সম্পাদিত হইত গোষ্ঠীপতির অধীনে। তখন লোকের বিশ্বাস ছিল যে মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মা প্রবীণদের মাধ্যমেই পৃথিবীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে, এবং বজ্র ঋতু সংহার প্রভৃতির দেবতাগণকে কিভাবে সন্তুষ্ট করিতে হয় তাহা একমাত্র প্রবীণরাই জানেন। গোষ্ঠীপতিই ছিলেন প্রবীণতম ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহাকে অমান্য করার অর্থ পূর্বপুরুষদের আত্মা ও অসংখ্য দেবদেবীর অভিশাপ কুড়ানো। এইভাবে গোষ্ঠীপতি সমাজের প্রধান পুরোহিত হিসাবে স্বীকৃত হইয়া ধর্মাচরণ পরিচালনা করিতে লাগিলেন; সংগে সংগে আবার সমাজকে শাসনও করিতে লাগিলেন। সকল সময়ই যে গোষ্ঠীপতি সমাজ শাসন করিতেন তাহা নহে। অনেক ক্ষেত্রে লোকে গোষ্ঠী-পতি অপেক্ষা যাদুকরদেরই বশ্যতা স্বীকার করিত, কারণ যাদুকররা নানারূপ যাদুশক্তির সাহায্যে লোককে ভীত করিতে সমর্থ হইত; যাহা হউক, ক্রমে সমাজের উপর গোষ্ঠীপতি বা যাদুকরদের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

৩। যুদ্ধবিগ্রহ (War): যুদ্ধবিগ্রহ রাষ্ট্রের উদ্ভবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ণ খাদ্যাহরণের যুগ হইতে মানুষ যখন পশুচারণ যুগে গিয়া পড়িল তখন হইতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকিত। পরবর্তী—অর্থাৎ, কৃষিকর্মের যুগে এই সংঘর্ষের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইল। সুবিধা পাইলেই এক দল অপর এক দলের উপর আক্রমণ করিয়া উহার কৃষি-জমি, ফসল, গৃহপালিত পশু

রাষ্ট্র-গঠনে যুদ্ধবিগ্রহের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ

* নূতন গোষ্ঠীজীবন বলা হইতেছে, কারণ আদিমতম যুগে যখন পরিবারের উদ্ভব হয় নাই তখনও মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বাস করিত। এই অবস্থাকে 'পুরাতন গোষ্ঠীজীবন' বলা হয়।

প্রভৃতি কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিত। অনেক সময় আবার যাহারা পরাজিত হইত তাহাদের বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া ক্রীতদাসেও পরিণত করিত। ফলে জনগোষ্ঠীকে সর্বদাই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত। আত্মরক্ষা করিতে করিতে তাহারা একদিন আক্রমণ করিতেও শিখিল, এবং ফলে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়া দাঁড়াইল সমাজজীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধবিগ্রহ সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়ায় যুদ্ধনায়কের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। যুদ্ধের সময় নেতৃত্ব করা ছাড়াও তিনি শান্তির সময়ে আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার তিনি সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিতের কার্যও করিতেন। এইরূপে যুদ্ধনায়ক সমাজের সর্বক্ষমতার অধিকারী হইয়া একদিন রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।

৪। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি (Private Property): ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভব মানুষকে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভবের পূর্বে আইনকানুনের কোন প্রয়োজন ছিল না। তখন সমাজ ছিল পূর্ণ সাম্যবাদী। অপহৃত খাদ্য সকলে মিলিয়া সমভাবে ভোগ করিত; শিশু ছিল জনগোষ্ঠীর সকলের শিশু। তারপর মানুষ যখন পশুচারণ জীবনে গিয়া উপনীত হইল তখন ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভবের জন্য চৌর্যবৃত্তির বিরুদ্ধে এবং উত্তরাধিকারের সম্পর্কে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে এই সম্পর্কে প্রণীত হইল বিভিন্ন নিয়মকানুন ও প্রথা। পশুচারণ জীবনের পর মানুষ যখন কৃষি-জীবন সুরু করিল তখন ভূমি ও ক্রীতদাসকেই প্রধান সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হইতে লাগিল। কৃষি-জীবনে অধিকন্তু ধনবৈষম্যের ফলে ধনসম্পত্তি লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার জন্য আরও অধিকসংখ্যক নিয়ম-কানুন প্রণীত হইল। তারপর পণ্য বিনিময়-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বাণিজ্যের প্রসার হইল; এবং ইহার ফলে উদ্ভব হইল বণিকশ্রেণীর। বণিকশ্রেণীর স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে এক জনগোষ্ঠীকে অপরাপর জনগোষ্ঠীর সহিত বিরোধ সংযত করিতে হইত। অনেক সময় আবার বিরোধে লিপ্ত হইতে হইত।

ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি সরকারের সৃষ্টি অপরিহার্য করিয়া তুলে

এইভাবে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন ও যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সরকারের সৃষ্টি অপরিহার্য করিয়া তুলে। সরকার সৃষ্টি হওয়ায় রাষ্ট্রের গঠন সম্পূর্ণ হইল।

৫। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা (Political Consciousness): রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না।

প্রথমে ছিল অন্ধ আনুগত্য

আদিমকাল হইতেই মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বাস করিলেও তাহারা সংঘবদ্ধতার আদর্শ সম্বন্ধে সুরু হইতেই সচেতন ছিল না। প্রথমে আত্মীয়তাবোধ ও ধর্মের বন্ধন গোষ্ঠীর প্রতি অন্ধ আনুগত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। তখন লোকে ভয়ে বা অপরের অনুকরণে গোষ্ঠীপতিদের আনুগত্য স্বীকার করিত। এই অন্ধ আনুগত্যের যুগকে 'রাষ্ট্র-নৈতিক অবচেতনা'র যুগ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। গোষ্ঠী ক্রমশ

সম্প্রসারিত হইতে থাকিলে এই অবচেতনা ঘুচিয়া গেল। বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘাতের ফলে মানুষ দলীয় ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হইল—বুঝিল ঐক্য ব্যতীত সংঘর্ষে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। এই অবস্থাকে 'রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ' (dawn of political consciousness) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষের ফলে লোকে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে যুদ্ধনায়কদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিল ; এবং ইহার ফলে যুদ্ধনায়কদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্বীকৃত হইল।

পরে আনুগত্য সচেতন হইয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্ভব করিল

শান্তির সময়েও লোকে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির সংরক্ষণ এবং বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার জন্য সচেতনভাবে ঐ যুদ্ধনায়কদের অনুগত হইয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে যুদ্ধনায়কগণ রাজার আসনে বসিলেন এবং প্রজার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজার অধীনে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিল।

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদের সার্থকতা : ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রত্যেকটি মতবাদের কিছু-না-কিছু অংশের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, রক্তের সম্বন্ধ পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের নির্দেশ করে ; দ্বিতীয়ত, ধর্ম ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদের ইংগিত দেয় ; তৃতীয়ত, যুদ্ধবিগ্রহ রাষ্ট্র গঠনে বলপ্রয়োগের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ; এবং চতুর্থত, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা সামাজিক চুক্তিবাদের আভাস দেয়। এই কারণগুলির কোনটিই এককভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব ব্যাখ্যা করে না, অথচ ইহাদের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে অল্পবিস্তর সহায়তা করিয়াছে। ঐতিহাসিক মতবাদের সার্থকতা এইখানে যে অন্য কোন মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির সকল কারণের ব্যাখ্যা সমভাবে করে নাই ; তাহারা একটিমাত্র শক্তিকে রাষ্ট্রের উদ্ভবের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া ভুল করিয়াছে।

একমাত্র এই মতবাদ রাষ্ট্রের উদ্ভবের সকল কারণকে সমভাবে ব্যাখ্যা করে

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) কল্পনাপ্রসূত মতবাদ, (২) বৈজ্ঞানিক মতবাদ। একমাত্র ঐতিহাসিক মতবাদই বৈজ্ঞানিক মতবাদ ; অন্য সকল মতবাদই কল্পনাপ্রসূত।

ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ : এই মতবাদের মূল কথা হইল রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি ; এই কারণে তিনি একমাত্র ঈশ্বরের নিকটই দায়ী।

এই মতবাদ স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন করে বলিয়া এবং অযৌক্তিক ও অসম্পূর্ণ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। তবুও ইতিহাসের দিক দিয়া ইহার কিছুটা মূল্য আছে।

বলপ্রয়োগ মতবাদ : একমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্র সৃষ্ট হইয়াছে—ইহাই এই মতবাদের মূল বক্তব্য।

এই মতবাদ আংশিকভাবে সত্য। বলপ্রয়োগ বা যুদ্ধবিগ্রহ রাষ্ট্রের উদ্ভবের অন্যতম কারণ হইলেও একমাত্র কারণ নয়।

পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ: এই দুই মতবাদ অনুসারে পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ: রাষ্ট্রের কল্পনাপ্রসূত মতবাদসমূহের মধ্যে এই মতবাদই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা চলিয়া আসিলেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর তিনজন দার্শনিক—হবস্‌, লক্‌ ও রুশো ইহাকে পরিস্ফুট করেন।

এই তিনজন দার্শনিকের মতেই রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ 'প্রাকৃতিক অবস্থা'র মধ্যে বাস করিত। কিন্তু এই প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনজন দার্শনিক পরস্পরের সহিত একমত নহেন। প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল—(১) হবসের মতে, বর্বরসুলভ অবস্থা; (২) লকের মতে, শান্তি ও শুভেচ্ছার রাজ্য কিন্তু অসম্পূর্ণ অবস্থা; (৩) রুশোর মতে, মর্ত্যের স্বর্গ।

ফলে (১) হবসের মতে, মানুষ দুর্বিষহ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাজার হস্তে সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছিল; (২) লকের মতে, অসম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য আদিম মানুষ চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল; (৩) রুশোর মতে, জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে তাঁহার কল্পিত মর্ত্যের স্বর্গে সুখশান্তি বিনষ্ট হওয়ায় মানুষ চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল পূর্বের অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে। রুশোর মতবাদে রাজার স্থান নাই।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনৈতিহাসিক, অযৌক্তিক ও বিপজ্জনক মতবাদ বলিয়া সমালোচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। ইহা গণতন্ত্র সম্বন্ধে ধারণার পরিস্ফুটনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

ঐতিহাসিক মতবাদ: ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফল। এই মতবাদ অনুসারে মানবসমাজ দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্রমবিকশিত হইয়া বর্তমানের জটিল রাষ্ট্র-রূপ ধারণ করিয়াছে। এই ক্রমবিকাশে প্রধানত পাঁচটি শক্তি—যথা, রক্তের সম্বন্ধ, ধর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা—ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌ পর্যায়ে কি পরিমাণে কার্য করিয়াছে তাহা অবশ্য নির্ণয় করা কঠিন।

প্রশ্নোত্তর

1. **Examine the 'Force' theory of the origin of the State.** **(En. 1964)**

রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে বলপ্রয়োগ মতবাদ কতদূর গ্রহণযোগ্য তাহা আলোচনা করিয়া দেখাও।

প্রশ্নটি এইভাবেও আসিতে পারে—

"The State is the result of the subjugation of the weaker by the stronger." Do you accept this theory of the origin of the State? Give reasons for your answer. **(C. U. 1945)**

"বলবান কর্তৃক দুর্বলকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করার ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে।" রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য কি না? যুক্তিসহ উত্তর দাও। [১৯ পৃষ্ঠা]

2. **Discuss critically the Social Contract Theory of the origin of the State.** **(C. U. 1961)**

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদের আলোচনা কর। [২১-২৪ পৃষ্ঠা]

3. Give a brief account of the Theory of Social Contract as an explanation of the origin of the State. (C. U. 1957)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত কর।

[ইঙ্গিত: ২নং প্রশ্ন হইতে এই প্রশ্নটির পার্থক্য আছে। ২নং প্রশ্নের উত্তরে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা উভয়ই করিতে হইবে ; কিন্তু এই ৩নং প্রশ্নের উত্তরে মতবাদের শুধু ব্যাখ্যা করিতে হইবে—সমালোচনা করিতে হইবে না।...(২১-২৩ পৃষ্ঠা)]

4. Briefly describe the Historical Theory of the origin of the State.

(C. U. 19[illegible]6)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত কর।

প্রশ্নটি এইভাবেও আসিতে পারে—

"The State is neither a divine institution nor a deliberate human contrivance ; it has come into existence as the result of natural evolution." Discuss this statement and indicate the process through which the State has come into existence. (C. U. 1944)

"রাষ্ট্র ঈশ্বর-সৃষ্ট নহে মানুষের কলাকৌশলের ফলও নহে, ইহা স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে।" উক্তিটির সমালোচনা কর এবং যেভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনা কর।

[২৪-২৮ পৃষ্ঠা]

চতুর্থ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন রূপ

(Forms of Government)

এ্যারিষ্টটল প্রভৃতি প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়া ইহার বিভিন্ন রূপের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সকল রাষ্ট্রেরই প্রকৃতি এক বলিয়া,—সকল রাষ্ট্র জনসমষ্টি, ভূখণ্ড প্রভৃতি একই উপাদানে গঠিত বলিয়া—এই শ্রেণীবিভাগ সন্তোষজনক হয় নাই। এই কারণে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রের পরিবর্তে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়া সরকারেরই বিভিন্ন রূপের আলোচনা করিয়া থাকেন।

সরকারের শ্রেণীবিভাগ: একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র

সরকার বা শাসন-ব্যবস্থার* শ্রেণীবিভাগে প্রথমে দেখা হয় যে শাসনক্ষমতা একজন না বহুজনের হস্তে ন্যস্ত। ক্ষমতা একজনের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে সরকারকে একনায়কতন্ত্র (Dictatorship), এবং বহুজনের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে উহাকে গণতন্ত্র (Democracy) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

একনায়কতন্ত্র সাধারণত একই ধরনের হয়; কিন্তু গণতন্ত্র বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে। গণতান্ত্রিক সরকারের এই সকল রূপের মধ্যে বিশেষভাবে

* ইংরাজী শব্দ Government-এর বাংলা 'সরকার' ও 'শাসন-ব্যবস্থা' দুইই করা হয়।

উল্লেখযোগ্য হইল চারিটি—(১) এককেন্দ্রিক সরকার (Unitary Government), (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Federal Government), (৩) পার্লামেন্টীয় বা দায়িত্বশীল সরকার (Parliamentary or Responsible Government), এবং (৪) রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার (Presidential Government)।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা একটিমাত্র সরকারে কেন্দ্রীভূত থাকিলে উহাকে এককেন্দ্রিক সরকার এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বণ্টিত হইলে উহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইংলণ্ড ও ভারতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে শাসনক্ষমতা একটিমাত্র সরকারের হস্তে ন্যস্ত। সুতরাং ঐ দেশের শাসন-ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক। অপরদিকে ভারতে শাসনক্ষমতা কেন্দ্র বা ইউনিয়ন সরকার (Union Government) এবং পশ্চিমবংগ বিহার উড়িষ্যা আসামের ন্যায় রাজ্য সরকারগুলির (State Governments) মধ্যে বণ্টিত। সুতরাং ভারতের শাসন-ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়।

গণতান্ত্রিক সরকারের দুইটি রূপ : এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়

কিন্তু ইংলণ্ড ও ভারত উভয় দেশেই পার্লামেন্টীয় বা দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তিত। এই প্রকার সরকারের বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহাতে শাসন ও আইন প্রণয়ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের পরিবর্তে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান থাকে; এবং যাঁহারা প্রকৃত শাসন পরিচালনা করেন তাঁহারা আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকেন। ইংলণ্ড ও ভারতে প্রকৃত শাসন পরিচালনা করে মন্ত্রি-পরিষদ (Cabinet)। উভয় দেশেই মন্ত্রি-পরিষদ পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল। মন্ত্রি-পরিষদই প্রকৃত শাসক বলিয়া এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থাকে 'মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত সরকার' (Cabinet Government) নামেও অভিহিত করা হয়। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে বলা হয় 'রাষ্ট্রপতি-শাসিত' (Presidential)। এই ধরনের সরকারে শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক থাকিয়া কার্য করে এবং আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের কোন দায়িত্বশীলতা থাকে না।

গণতান্ত্রিক সরকারের আর দুইটি রূপ : পার্লামেন্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার

সরকারের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগকে নিম্নলিখিতভাবে সাজানো যাইতে পারে :
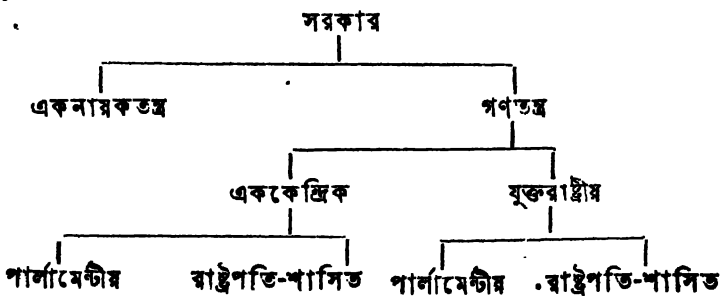
এখন সরকারের বিভিন্ন রূপের প্রত্যেকটির সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করা হইতেছে।

গণতন্ত্র (Democracy) : 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলিতে এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা বুঝায় যাহা পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ সমাজ জন্মগত ও ধনগত বৈষম্যকে কোনরূপ মর্যাদা দেয় না, বলপ্রয়োগ বা শোষণকে কোনরূপ সমর্থন করে না। এইরূপ সমাজে সকলেরই দায়িত্ব রহিয়াছে সমাজজীবনকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার ; এবং সমাজের উন্নতিকল্পে সকলের প্রচেষ্টাকেই সমান মূল্যবান বলিয়া গণ্য করা হয়। এইভাবে একমাত্র সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজ গণতান্ত্রিক রূপ ধারণ করে। সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় 'গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা'। ইহা শুধু রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য বা সকলের সমান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ও মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সাম্যের সন্ধান নাও মিলিতে পারে।

ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক সমাজ

সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক সরকার

সাধারণত এই সংকীর্ণ অর্থেই 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়—অর্থাৎ, গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক সরকার। এই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Democratic Government) : শব্দগত অর্থে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় জনগণের শাসন (rule of the people)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি এ্যাব্রাহাম লিংকনের মতে, গণতন্ত্র ইহার উপর জনগণের দ্বারা (by the people) এবং জনগণের (কল্যাণার্থে) জন্য (for the people) শাসন। এই তিনটিকে মিলাইয়া রাষ্ট্রপতি লিংকন গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার যে-সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই সুপ্রচলিত হইয়াছে। লিংকনের ভাষায়, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা হইল "জনগণের (কল্যাণার্থে) জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন।"*

লিংকন প্রদত্ত সুপ্রচলিত সংজ্ঞা

এখন প্রশ্ন উঠে যে জনগণ বলিতে কি বুঝায়? জনগণ বলিতে 'কখনই দেশের সকল লোককে বুঝায় না, অধিকাংশকেই বুঝায় মাত্র।' এমন শাসন-ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই যাহাতে দেশের সমগ্র জনসাধারণ অংশগ্রহণ করিয়াছে। নাবালক উন্মাদ সমাজদ্রোহী প্রভৃতিকে কখনই শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না। এই কারণে অধ্যাপক ডাইসি (Prof. A. V. Dicey)

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃতি :

* "...Government of the people, by the people and for the people..."

গণতন্ত্রের যে-সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাই গ্রহণীয় বিবেচিত হয়। ডাইসির মতে, জনসাধারণের অধিকাংশই যদি শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে তবে তাহাই গণতন্ত্র। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) বলেন, এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা জনগণ বা সম্প্রদায়ের সকলের হস্তে ন্যস্ত থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে পরিণত হয়। কারণ, সম্প্রদায়ের ইচ্ছা প্রকাশিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে এবং সম্প্রদায়ের সকলে একমতাবলম্বী নহে বলিয়া নির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই শাসনভার প্রাপ্ত হয়।

১। ইহা 'জনগণের শাসন'

বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। ভারতে গণতান্ত্রিক সরকার প্রবর্তিত বলিয়া শাসনক্ষমতা নাগরিক সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু সকল নাগরিক একমতাবলম্বী নয়। এই কারণে নির্বাচনের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দলই শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছে।

২। কার্যক্ষেত্রে ইহা কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মাত্র

সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'জনগণ' বলিতে বুঝায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়; এবং স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক শাসন হইল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, সর্বসাধারণের নহে।

এইভাবে শাসনকার্যের পরিচালনার ভার সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর ন্যস্ত থাকিলেও শাসনকার্য কিন্তু পরিচালিত হয় সকলেরই কল্যাণার্থে, মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্বার্থেই নহে। গণতান্ত্রিক সরকার কোন অবস্থাতেই সংখ্যালঘিষ্ঠের মংগলকে উপেক্ষা করিতে পারে না। ফলে এই শাসন-ব্যবস্থা সকলেরই প্রিয়; এই কারণে ইহাকে 'জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা'ও (Popular Form of Government) বলা হয়।

৩। শাসনকার্য কিন্তু পরিচালিত হয় সকলেরই কল্যাণার্থে

গণতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সকলের শাসনক্ষমতায় আস্থাবান। 'রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য' বলিতে বুঝায় সকলেরই শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিবার সমান সুযোগসুবিধা। এই সুযোগসুবিধা প্রদান করাই গণতান্ত্রিক আদর্শ। কোন ব্যক্তি বা কোন শ্রেণী একচেটিয়াভাবে শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া থাকিবে, এইরূপ ধারণা গণতান্ত্রিক আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব শাসিতের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত, পাশবিক বলের উপর নয়। এই কারণে শাসনকার্য সর্বদাই জনমতের অনুকূলে পরিচালিত হয়। সুতরাং গণতন্ত্রকে 'জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা' (Government based on Public Opinion) বলিয়াও বর্ণনা করা যাইতে পারে।

৪। এই শাসন-ব্যবস্থা সকলের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Direct and Indirect or Representative Democracy): বর্তমানে যে গণতান্ত্রিক সরকারের

সাক্ষাৎ আমরা পাই—যে গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে তাহা হইল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Indirect or Representative Democracy)। ইহা ছাড়া গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধও (Direct or Pure) হইতে পারে।

গণতান্ত্রিক সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ই হইতে পারে

প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই শাসন-ব্যবস্থাকে যাহাতে নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রসমূহে এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে সমগ্র নাগরিক কোন বিশেষ স্থানে সমবেত হইয়া আইন প্রণয়ন, রাজস্ব ও ব্যয় নির্ধারণ, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিত। সময় সময় তাহারা আবার বিচারের ব্যবস্থাও করিত। এইভাবে শাসনকার্য নাগরিক সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হইত। নির্বাচন বা প্রতিনিধি প্রেরণের কোন ব্যবস্থাই ছিল না।

প্রাচীনকালের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

প্রাচীন গ্রীসের মত প্রাচীন ভারতেও নগর-রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহাভারতে এইরূপ নগর-রাষ্ট্রের উল্লেখ আছে। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন তিনি সিন্ধু নদের দুই তীরে বহুসংখ্যক নগর-রাষ্ট্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সেখানে তখন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রবর্তিত ছিল।

প্রাচীন গ্রীস ও ভারতের নগর-রাষ্ট্রে এইরূপ শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। রাষ্ট্রের আয়তন ক্ষুদ্র এবং জনসংখ্যা স্বল্প হইলে এখনও এইরূপ ব্যবস্থা চলিতে পারে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের আয়তন ক্ষুদ্র নহে, জনসংখ্যাও স্বল্প নহে। সুতরাং বর্তমান যুগে এই শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল। ফলে মাত্র সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি 'ক্যাণ্টন' ও 'অর্ধ-ক্যাণ্টনে'* এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অংগরাজ্যে (States) এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে।

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে না—পরোক্ষভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে করে। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ভাষায়, এই প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র হইল সেইরূপ শাসন-ব্যবস্থা যেখানে "জনসংখ্যার অধিকাংশ তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনক্ষমতার ব্যবহার করে।" নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আইনসভায় জনমতের অনুকূলে আইন পাস করেন এবং শাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ করেন।

আধুনিক কালের পরোক্ষ গণতন্ত্র

শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণও হয় নাগরিকগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন, না-হয় আইনসভায় প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন। সুতরাং

* সুইজারল্যাণ্ডে প্রদেশগুলি 'ক্যাণ্টন' (Cantons) এবং ক্ষুদ্রাকার প্রদেশগুলি 'অর্ধ-ক্যাণ্টন' (Half-Cantons) নামে অভিহিত। ক্যাণ্টন ও অর্ধ-ক্যাণ্টনের সংখ্যা হইল যথাক্রমে ১৯ ও ৬।

তাঁহারাও জনমতের অনুকূলে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। প্রতিনিধি যদি জনমতের বিরুদ্ধে কার্য করেন, তবে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁহার নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং তিনি জনমতের সপক্ষেই কার্য করিতে সচেষ্ট থাকেন।

পরোক্ষ গণতন্ত্রের ত্রুটি

অবশ্য প্রতিনিধি যে সকল সময় জনমতের অনুকূলেই কার্য করিবেন, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। নির্বাচিত হইয়া তিনি জনমতের বিরুদ্ধেও কার্য করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করিবার জন্য নির্বাচকগণকে পুনর্নির্বাচন অবধি অপেক্ষা করিতে হয়। এই কারণে অনেক সময় এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যাহাতে প্রতিনিধির উপর নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ সর্বদা বজায় থাকে।

ত্রুটির প্রতিবিধান—প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ :

প্রতিনিধির উপর নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার পন্থা প্রধানত তিনটি—গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative) এবং পদচ্যুতি (Recall)। ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (Direct Democratic Checks) বলা হয়। গণভোট পদ্ধতির দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহকে নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটের দ্বারা পাস করানো বাধ্যতামূলক করা যাইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। নির্বাচক-মণ্ডলীর অধিকাংশ ইহা অনুমোদন করিলে তবে ইহা আইনে পরিণত হইবে। এককথায় বলা যায়, গণভোটের ব্যবস্থা থাকিলে আইন প্রণয়নের চরম ক্ষমতা নির্বাচকমণ্ডলীর হস্তেই থাকে, প্রতিনিধিগণের নিকট হস্তান্তরিত হয় না।

১। গণভোট

গণ-উদ্যোগ বলা হয় সেই ব্যবস্থাকে যেখানে নির্বাচকগণ উদ্যোগী হইয়া আইন প্রণয়ন করিতে পারে। শাসনতন্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিতে পারে যে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচক যদি আবেদন করে তবে আইনসভা সেই আইন পাস করিতে বাধ্য হইবে।

২। গণ-উদ্যোগ

পদচ্যুতির ব্যবস্থা থাকিলে নির্বাচকগণ নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বেই প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করিতে পারে। এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচক যদি আবেদন করে যে প্রতিনিধি তাহাদের মতের বিরুদ্ধে কার্য করিতেছেন, তবে প্রতিনিধিকে পদত্যাগ করিয়া পুনর্নির্বাচনে অবতীর্ণ হইতে হয়। এইভাবে পদ্ধতিগুলি দ্বারা আজিকার দিনের বৃহৎ রাষ্ট্রে বিশুদ্ধ বা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখার প্রচেষ্টাই করা হয়।

৩। পদচ্যুতি

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ (Merits and Defects of Democratic Government) : সর্বসাধারণের কল্যাণ-সাধন রাষ্ট্রের আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইলে গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। কারণ, একমাত্র গণতন্ত্রেই

গুণ :

শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না বলিয়া শাসনযন্ত্র সকলের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত হইতে পারে। ব্যাখ্যা করিয়া বলা যায়, গণতন্ত্রে শাসনক্ষমতা সাধারণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। সুতরাং সাধারণের পক্ষে যাহা মংগলজনক সেইরূপ কার্যই গণতন্ত্রে সম্পাদিত হয়; সাধারণের পক্ষে কল্যাণকর আইনই গণতন্ত্রে প্রণীত হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনস্বার্থকে উপেক্ষা করিতে পারেন না; করিলে তাঁহাদের পক্ষে পুনরায় নির্বাচিত হইবার আশা থাকে না।

১। একমাত্র গণতন্ত্রই সকলের কল্যাণসাধন করিতে পারে

এ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন, একমাত্র গণতন্ত্রেই ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ন্যায় ও সত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধারণা থাকিতে পারে। এই কারণে প্রকৃত ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হইল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও ভাব-বিনিময়। একমাত্র গণতন্ত্রেই ইহা সম্ভব। একনায়ক-তন্ত্রে আলাপ-আলোচনার কোন সুযোগ নাই, ভাব-বিনিময়ের কোন ক্ষেত্র নাই। সেখানে একনায়কের মতকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

২। একমাত্র এই শাসন-ব্যবস্থাতেই সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব

গণতন্ত্র স্বাধীনতার ভিত্তিতে গঠিত। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সকলেরই অধিকার রহিয়াছে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিবার, অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করিয়া আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হইবার। এইজন্য একমাত্র গণতন্ত্রেই সুন্দর ও সার্থক জীবন সম্ভবপর হয়।

৩। ইহা স্বাধীনতার ভিত্তিতে সংগঠিত

গণতন্ত্র সাম্যের নীতিকেও সমর্থন করে। গণতন্ত্রে ধনী ও দরিদ্রে, অভিজাত ও অভাজনে, উচ্চবর্ণ ও নীচবর্ণে কোন ভেদ নাই। এখানে সকলেই সমান অধিকার ও সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। ধনীরও একটি ভোট, দরিদ্রেরও একটি ভোট; ধনীর নির্বাচিত হইবার অধিকার আছে, পথচারী দরিদ্রেরও নির্বাচিত হইবার অধিকার আছে।

৪। ইহা সাম্যকেও সমর্থন করে

গণতন্ত্র সকলকে সমান মর্যাদা দিয়া সাধারণ মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে। সকলে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে বলিয়া তাহারা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, তাহাদের দেশপ্রীতি গভীর হয় এবং তাহাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। কেহ যখন কাহারও অপেক্ষা কম নহে তখন দেশরক্ষা সকলেরই দায়িত্ব, রাষ্ট্রের উন্নয়ন সকলেরই কর্তব্য—এইরূপ ধারণা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়া জাতীয় জীবনকে মংগলের পথে লইয়া যায়। জনসাধারণও শাসনকার্যে অংশগ্রহণের ফলে উত্তরোত্তর রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠে। মিলের মতে, সুশাসনই সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, জনসাধারণকে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা-প্রদান করাও অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। গণতন্ত্র এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও সাধন করে।

৫। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার বিস্তার করে

পরিশেষে, গণতন্ত্রে গণ-অভ্যুত্থান বা বিপ্লবের আশংকা বিশেষ থাকে না। গণতন্ত্রের অধীনে জনসাধারণ ইহা বুঝে যে রাষ্ট্র তাহাদেরই রাষ্ট্র, সরকার তাহাদেরই সরকার। বর্তমানে যাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছেন তাঁহারা তাহাদের প্রতিনিধি; সুতরাং আজ্ঞাবাহী। সৈন্যসামন্ত, পুলিস, চৌকিদার, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি তাহাদেরই ভৃত্য। এই কারণে জনসাধারণ আইনকানুন স্বেচ্ছায় পালন করে। আর যদি তাহারা দেখে সরকার অন্যায় করিতেছে, অযৌক্তিক আইনকানুন পাস করিতেছে তবে পরবর্তী নির্বাচনে তাহারা সরকার গঠনকারী ঐ দলকে সরাইয়া দিয়া অন্য দলের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনসাধারণ যদি কংগ্রেস দলের শাসন পছন্দ না করে, তবে পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসকে সরাইয়া অন্য এক দলকে গদিতে বসাইতে পারে। সহজে শাসক-পরিবর্তন সম্ভব বলিয়া গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় বিপ্লব সহসা ঘটে না।

৬। ইহা বিপ্লবের আশংকা হইতে অনেকাংশে মুক্ত

উপরি-উক্ত গুণাবলী সত্ত্বেও গণতন্ত্র বিরুদ্ধ সমালোচনার হাত এড়াইতে পারে নাই। একশ্রেণীর সমালোচকের মতে, গণতন্ত্র অক্ষম ও অশিক্ষিত জনসাধারণের শাসন। ইঁহারা বলেন, শাসন-ব্যবস্থার সফলতা নির্ভর করে শাসকবর্গের শিক্ষা, কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিবিবেচনার উপর। কিন্তু গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠত্বের উপযুক্ত মর্যাদা দেয় না। ইহা সকলকেই সমান জ্ঞান করে বলিয়া অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকেই সাধারণত শাসনকার্য পরিচালনা করিতে দেখা যায়। সমালোচকের ভাষায় বলিতে গেলে, গণতন্ত্র "সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, সর্বাপেক্ষা অজ্ঞ এবং সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্যের শাসন—কারণ, এই শ্রেণীর লোকই সংখ্যায় অধিক।"

ত্রুটি:

১। গণতন্ত্র অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিতের শাসন বলিয়া অভিযোগ

ইহাও বলা হইয়াছে, অজ্ঞ ও অকর্মণ্যের শাসন বলিয়া গণতন্ত্র বিশেষভাবে রক্ষণশীল। নূতন নূতন আবিষ্কার, নূতন নূতন ধ্যানধারণা অশিক্ষিত শাসকবর্গ এবং জনসাধারণের মনে বিশেষ সাড়া জাগাইতে পারে না। ফলে শাসনযন্ত্র পুরাতন পদ্ধতিতেই চলে।

২। ইহা রক্ষণশীল শাসন-ব্যবস্থা

গণতন্ত্রে যে স্বাধীনতার কল্পনা করা হয় তাহাও সমালোচকগণের মতে ভুল। বলা হয় যে জনসাধারণের প্রকৃত স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকিতে পারে না। প্রকৃত স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণার জন্য যে চিন্তাশক্তি ও উপলব্ধির ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, তাহার কোনটাই সাধারণ লোকের থাকে না। সুতরাং তাহারা গতানুগতিক পথে চলে এবং নির্দিষ্ট গণ্ডির বাহিরে সকল প্রকার কার্য ও মতামত প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করে। এইভাবে গণতন্ত্রে দেখা দেয়

৩। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অলীক

নিয়ন্ত্রণের আধিক্য। এই নিয়ন্ত্রণাধিক্যের জন্য সাধারণের স্বাধীনতা অলীক প্রতিপন্ন হয়।

৪। দলপ্রথার জন্য ত্রুটি

দলপ্রথা গণতন্ত্রের অংগ। এই কারণে গণতন্ত্রে অপচয় দলগত স্বার্থপরতা প্রভৃতি কুফল দৃষ্ট হয়। প্রথমত, নির্বাচন ইত্যাদির জন্য বিরাট ব্যয় হয়। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় মিতব্যয়িতার প্রতি কাহারও দৃষ্টি থাকে না। শাসকবর্গ সাধারণের অর্থ অপব্যয় করিয়াও জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করেন। অপরদিকে আবার শাসকবর্গ এবং সাধারণ লোক সকলেই রাষ্ট্রের মংগল অপেক্ষা নিজ দলের স্বার্থের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখে। এই সকলের ফলে জাতীয় কল্যাণ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

৫। গণতন্ত্রের স্থায়িত্বে সন্দেহ

গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। গণতন্ত্রে পরস্পরবিরোধী মত প্রচলিত থাকায় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের পক্ষে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার বিশেষ সুবিধা হয়। এই কারণে গণতান্ত্রিক সরকারের ঘন ঘন উত্থানপতন দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। গণতান্ত্রিক সভ্যতাকে নিম্নস্তরের বলা হয়

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হইল যে এই শাসন-ব্যবস্থা চারুকলা বিজ্ঞান সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতি মানসিক সম্পদের উন্নতির পরিপন্থী। যে জনসাধারণ গণতন্ত্রে ক্ষমতার অধিকারী তাহাদের নিকট এই সকল বিষয়ে প্রগতির কোন মূল্যই নাই। তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা নিম্নস্তরের বলিয়া তাহারা নিম্নস্তরের সাহিত্য, নিম্নস্তরের শিল্পকলারই পৃষ্ঠপোষকতা করে। ফলে প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তির সৃজনীশক্তি প্রকাশিত হইতে পারে না এবং গণতান্ত্রিক সভ্যতা 'বস্তু, সাধারণ ও স্থূল' (banal, mediocre and dull) হইয়া দাঁড়ায়।

৭। ইহা জরুরী অবস্থার উপযোগী নহে

আরও বলা হয় যে বিপৎকালীন ব্যবস্থা অবলম্বনে গণতন্ত্র বিশেষ কার্যকর নহে। গণতন্ত্রে শাসক সংখ্যায় বহু বলিয়া প্রতি পদে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হয়। ইহাতে শাসনযন্ত্র মন্থরগতি হইয়া পড়ে, এবং বিপদের সময় জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না।

৮। ইহা পুঁজিবাদের প্রশ্রয় দেয়

পরিশেষে, গণতন্ত্র পুঁজিবাদের (Capitalism) প্রশ্রয় দেয় বলিয়াও অভিযোগ করা হইয়াছে। সংজ্ঞা অনুসারে এবং তত্ত্বের দিক দিয়া গণতন্ত্র সর্বসাধারণের শাসন-ব্যবস্থা; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহা ধনী ও মূলধন-মালিকদের স্বার্থেই পরিচালিত হয়। তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য থাকিলেও অর্থনৈতিক সাম্য থাকে না। ইহার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক সাম্য মূল্যহীন হইয়া পড়ে।

গণতন্ত্র কিভাবে সফল হইতে পারে (Conditions for Success of Democracy) : গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ যে বেশ কিছুটা অতিরঞ্জিত তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে গণতন্ত্র যে ত্রুটিবিহীন

শাসন-ব্যবস্থা সে-কথাও বলা চলে না। আদর্শের দিক দিয়া গণতন্ত্রের স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু এই সকল আদর্শ উপলব্ধির দ্বারা গণতন্ত্রকে সফল করিয়া তোলা বিশেষ কঠিন।

গণতন্ত্রের সাফল্য কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে, গণতন্ত্রের সফলতার জন্য প্রয়োজন হইল 'গণতান্ত্রিক জনগণে'র (democratic men)। 'গণতান্ত্রিক জনগণ' বলিতে মিল এরূপ জনসাধারণকে বুঝিয়াছিলেন (১) যাহাদের গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে; (২) যাহারা কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ নহে; (৩) যাহারা গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে সর্বদা প্রস্তুত। সুতরাং গণতন্ত্র প্রবর্তন করিলেই উহা সাফল্যলাভ করে না। জনসাধারণ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উপযোগী হইলে তবেই উহা সফল হইয়া উঠিতে পারে।

১। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক জনগণের

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র নাগরিকগণের নিকট হইতে বুঝাপড়াও দাবি করে। কার্যক্ষেত্রে গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মানিয়া লইতে হইবে। অপরদিকে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষেও সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামত ও স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে। এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে সহযোগিতা থাকিলে তবেই গণতন্ত্র সফল হইতে পারে।

২। গণতন্ত্র বুঝাপড়াও দাবি করে

তৃতীয়ত, গণতন্ত্রে জনগণই প্রকৃত শাসক বলিয়া জনমত প্রকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ইহা না থাকিলে জনগণের পক্ষে শাসকবর্গকে কোনরূপে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না বলিয়া 'জনগণের শাসন' মিথ্যায় পরিণত হইতে পারে।

৩। জনমত প্রকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন

পরিশেষে, গণতন্ত্রের সফলতার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় বিষয় হইল জনগণের অর্থনৈতিক অধিকারের। অর্থনৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় যথাযোগ্য কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকার, উপযুক্ত মজুরি পাইবার অধিকার, বেকারত্ব হইতে মুক্তির অধিকার, পর্যাপ্ত বিশ্রামের অধিকার, ইত্যাদি। এগুলি না থাকিলে লোক ভোটাধিকার লইয়া কি করিবে? নাগরিক যদি দৈনন্দিন অভাব মিটাইতেই সকল সময় ব্যস্ত থাকে তবে সে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার লইয়া কখন চিন্তা করিবে?

৪। এবং অর্থনৈতিক অধিকার সম্পূর্ণ অপরিহার্য

কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া নাগরিককে অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করা যায় না। শ্রমিককে যথাযোগ্য মজুরি প্রদান করিতে হইলে নিয়োগকর্তার স্বাধীনতা খর্ব করিতে হয়। গণতন্ত্রের প্রয়োজনে ইহাই করিতে হইবে; বহুর কল্যাণের জন্য কতিপয় ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে। এরূপ করিলে তবেই সাধারণ নাগরিক গণতন্ত্রে আগ্রহান্বিত

হইয়া ইহাকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইবে; এবং তখনই গণতন্ত্র হইয়া উঠিবে প্রকৃত জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা (Popular Form of Government)।

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship): একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা। গণতন্ত্রে শাসনক্ষমতা বহুজনের হস্তে ন্যস্ত থাকে, একনায়কতন্ত্রে ন্যস্ত থাকে মাত্র একজনের হস্তে। একনায়কতন্ত্রে একনায়কই (Dictator) একমাত্র শাসক; অন্যান্য যে-সকল ব্যক্তি শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁহারা একনায়কের অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র।

একনায়কতন্ত্রের অর্থ

প্রাচীনকালে রাজার হস্তেই শাসনের চরম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিত। এইরূপ রাজতন্ত্রকে চরম রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) বলা হয়। তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে এই চরম রাজতন্ত্রও একনায়কতন্ত্র। কিন্তু বর্তমানে 'একনায়কতন্ত্র' শব্দটি একটু ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে একনায়কতন্ত্র বলিতে সেই শাসন-ব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে চরম ক্ষমতার অধিকারী হইলেন কোন রাষ্ট্রনৈতিক দলের নায়ক—উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনপ্রাপ্ত রাজা নহেন। এইরূপ রাষ্ট্রনৈতিক দলের নায়ক প্রথমে বিপ্লবের সাহায্যে বা নির্বাচনের ফলে ক্ষমতা অধিকার করেন। তারপর সকল বিরোধী দলের বিলোপসাধন করিয়া নিজ দলের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দলের মধ্যেও তিনি আর কোন নেতাকে মাথা তুলিতে দেন না। এইভাবে ক্রমে তিনি হইয়া দাঁড়ান দল ও দেশের একমাত্র নায়ক বা একনায়ক। একনায়কগণের প্রত্যেকের নিজস্ব রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকে বলিয়া গণতান্ত্রিকতার কিছুটা আভাস একনায়কতন্ত্রে পাওয়া যায়।

তবুও বলা যায়, একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা। গণতন্ত্রে জনগণ শাসকবর্গকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে শাসকই জনগণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। মানুষে মানুষে সাম্য, বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের অস্তিত্ব, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, জনমতের প্রাধান্য প্রভৃতি গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান একনায়কতন্ত্রে পাওয়া যায় না। ইহাদের পরিবর্তে দেখা যায় একদলীয় শাসন, দলের উপর একনায়কের একাধিপত্য, মূল্যহীন ভোটাধিকার, জনমত নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ত ও তরবারির নীতি অনুসরণ।

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

একনায়কতন্ত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকার ও অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয় এবং অনেক সময় তাহাদিগকে দমনও করা হয়। অপরদিকে আবার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতার সম্ভাবনা লুপ্ত করা হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠের দমনের জন্য, জনমত নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হইলে গুলিগোলা জেল নির্বাসন প্রভৃতি সবকিছু ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়।

গুণাগুণ: একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া গণতন্ত্রের যাহা ত্রুটি একনায়কতন্ত্রের তাহা গুণ এবং গণতন্ত্রের যাহা গুণ

একনায়কতন্ত্রের তাহা দোষ। প্রথমে গুণ লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, একনায়কতন্ত্রে বহুজনের কুশাসনের পরিবর্তে একজনের সুশাসনের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে। নানা মুনির নানা মতের ফলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় যে-বিশৃংখলার সম্ভাবনা থাকে, একনায়ক সুদক্ষ অভিজ্ঞ এবং কর্মক্ষম হইলে সে-আশংকা দূর হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, একনায়কতন্ত্রে দলীয় বিরোধ না থাকায় অপব্যয়, দলীয় স্বার্থসাধন প্রভৃতি রহিত হইয়া দেশের সর্বাংগীণ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। তৃতীয়ত, বিপদের সময় এবং জরুরী অবস্থায় একনায়ক দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন, বহুজন-শাসিত গণতন্ত্রে যাহা সম্ভব হয় না। পরিশেষে, জনমতের জোয়ারভাঁটার ফলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মত একনায়কতন্ত্রে সরকারের ঘন ঘন উত্থানপতন ঘটে না। সরকারের এই স্থায়িত্বের ফলে একনায়কতন্ত্রে দীর্ঘদিন ধরিয়া বিশেষ নীতি অনুসৃত হইতে পারে।

একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া উভয়ের গুণাগুণ বিপরীত

একনায়কতন্ত্রের গুণ

অপরদিকে কিন্তু একনায়কতন্ত্রের অধীনে জনসাধারণ রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয়। শাসন-ব্যবস্থায় কোথায় গলদ তাহা তাহারা জানিতে পারে না; জানিতে পারিলেও সে-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে পারে না। একনায়কতন্ত্রে শুধু এই মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাই নহে, অন্যান্য স্বাধীনতা ও মানুষে মানুষে সাম্যও অস্বীকৃত হয়। সকলেরই যে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের ক্ষমতা ও অধিকার আছে তাহা মোটেই মানিয়া লওয়া হয় না। ফলে নাগরিকের আত্মবিকাশ ব্যাহত হয়; রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি তাহার আকর্ষণ গভীর হইতে পারে না। একনায়ক-তান্ত্রিক সরকারকে সে বিদেশী সরকারের ন্যায় জ্ঞান করিতে শিখে। এই সরকারের পরিবর্তন নির্বাচনের মাধ্যমে সম্ভব নয় বলিয়া পরিবর্তন প্রয়োজনীয় মনে করিলে লোকে বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয়। ফলে একনায়ককে সর্বদা সচেতন হইয়া থাকিতে হয়, বিপ্লবের কানাঘুষা চলিতেছে কি না তাহা জানিবার জন্য বহু গুপ্তচর পোষণ করিতে হয়। এই বাবদ অর্থের অপচয় ছাড়াও গুপ্তচরদের কার্যকলাপের ফলে সাধারণ লোকের জীবন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে।

ত্রুটি

উপসংহার হিসাবে বলা যায় যে ত্রুটি সত্ত্বেও একনায়কতন্ত্রে মোটামুটি সুশাসনের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উহাই যথেষ্ট নহে। কারণ, লোকে মাত্র সুশাসনই চায় না, নিজস্ব শাসন বা স্বায়ত্তশাসনও চায়।*

একনায়কতন্ত্রের দুইটি সাম্প্রতিক রূপ (Two Modern Forms of Dictatorship): সাম্প্রতিক একনায়কতন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর

* "Good government is no substitute for self-government." H. C. Bannerman

ইতালীর ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্র (Fascist Dictatorship) এবং জার্মেনীর নাৎসীবাদী একনায়কতন্ত্র (Nazi Dictatorship) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফ্যাসীবাদ প্রচারের সাহায্যে মুসোলিনী এবং নাৎসীবাদের সাহায্যে হিটলার যথাক্রমে ইতালী ও জার্মেনীর সর্বময় কর্তা হইয়া দাঁড়ান।

ক। ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্র, খ। নাৎসীবাদী একনায়কতন্ত্র

মুসোলিনী গণতন্ত্রকে সরাসরি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনই যে সুশাসন হইবে এমন কোন কথা নাই। সংখ্যালঘিষ্ঠের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকিতে পারেন যিনি শাসন পরিচালনার কার্যে যোগ্যতম। সুতরাং এইরূপ ব্যক্তির সন্ধান করিয়া তাঁহার হস্তেই শাসন পরিচালনার ভার দিতে হইবে। নির্বাচনের প্রয়োজন নাই, আইনসভার বিতর্কও নিরর্থক; শাসনের ভার যোগ্য ব্যক্তির হস্তে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিয়া এইরূপ যোগ্য ব্যক্তিকে পূজা করাই জনসাধারণের কর্তব্য।

হিটলারও গণতন্ত্রের ধ্বংস করিয়া নেতৃপূজার ব্যবস্থা প্রচলন করেন। হিটলারই সমগ্র জার্মান জাতির নেতা হইয়া দাঁড়ান; এবং তাঁহার অধীনে নাৎসী দল (Nazi Party) জার্মেনীকে পরিচালিত করিতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইতালী ও জার্মেনী উভয় দেশেই একনায়কতন্ত্র ধ্বংস হইয়া গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে একনায়কতন্ত্র পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয় নাই; অন্তত ফ্রাংকোর অধীনে স্পেনে ইহা আবার মাথা তুলিয়াছে।

একাকেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (Unitary and Federal Governments): বর্তমানের জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ (Nation States) অতি বৃহদায়তন বলিয়া অনেক সময় একটিমাত্র কেন্দ্র হইতে সমগ্র দেশ শাসন করা অতি কঠিন হইয়া পড়ে। এই কারণে এই সকল রাষ্ট্রে দুই শ্রেণীর সরকার গঠন করা হয়—(১) একটি কেন্দ্রীয় বা সমগ্র দেশের সরকার, এবং (২) কতকগুলি আঞ্চলিক বা দেশের বিভিন্ন অংশের সরকার। দেশের শাসনতন্ত্র অনুসারে সমগ্র শাসনক্ষমতা যদি একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তেই ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারই যদি নিজের ইচ্ছা ও সুবিধামত আঞ্চলিক সরকারসমূহের সৃষ্টি করে তবে ঐ শাসন-ব্যবস্থাকে 'এককেন্দ্রিক' (Unitary) বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু যদি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র দ্বারা সৃষ্ট হয় এবং শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতা বণ্টিত হয় তবে ঐরূপ শাসন-ব্যবস্থাকে 'যুক্তরাষ্ট্রীয়' (Federal) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এখন প্রথমে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

একাকেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Unitary Government): এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সমগ্র শাসনক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ প্রাধান্য

বর্তমান থাকে। নিজের সুবিধামত আঞ্চলিক সরকারসমূহের সৃষ্টি ও উহাদের ক্ষমতা প্রদান করা ছাড়াও অন্যভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রাধান্য প্রকাশ করিতে পারে। ইচ্ছা করিলে ইহা আঞ্চলিক সরকারসমূহকে পুনর্গঠিত করিতে পারে, ইহাদের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে, এমনকি উহাদের অস্তিত্বও বিলুপ্ত করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ সর্বতোমুখী প্রাধান্যের জন্য অন্যতম আধুনিক লেখক স্ট্রং (C. F. Strong) বলিয়াছেন, "এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকারের অস্তিত্ব নাই।"

কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বতোমুখী প্রাধান্যই এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

বর্তমানে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে এইরূপ শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত। ব্রিটিশ আমলে ভারতের শাসন-ব্যবস্থাও প্রথমে এককেন্দ্রিক ছিল; পরে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়।

গুণাগুণ : এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকারের পূর্ণ প্রাধান্য বর্তমান থাকে বলিয়া সমগ্র দেশব্যাপী একই শাসননীতি ও শাসন-পদ্ধতি অনুসৃত হইতে পারে। ইহার ফলে বিভিন্ন সরকার-প্রণীত আইনের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা লুপ্ত হয় এবং শাসন-ব্যবস্থার দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। বৈদেশিক নীতি অনুসরণের পক্ষে এবং সংকটজনক সময়ে এই দৃঢ়তা বিশেষ উপযোগী। ঐ একই কারণে আবার শাসনযন্ত্র বিরাট ও জটিল হইয়া উঠে না; ফলে ব্যয়াধিক্যও ঘটে না।

গুণ: অখণ্ড শাসন-নীতি কিন্তু সুপরিবর্তনীয় অথচ দৃঢ় শাসন-ব্যবস্থা

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার আর একটি সুবিধা হইল যে ইহা বিশেষ সুপরিবর্তনীয়। কেন্দ্রীয় সরকার নিজের ইচ্ছামত আঞ্চলিক সরকারের সৃষ্টি ও বিলোপ এবং তাহাদের ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া শাসনকার্যের উন্নতিসাধন করিতে পারে। ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সম্ভব হয় না।

কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে। আঞ্চলিক সরকারসমূহকে কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয় বলিয়া স্থানীয় লোকের শাসনকার্যে বিশেষ উৎসাহ থাকে না। সুতরাং এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্র-বিরোধী। উপরন্তু, বর্তমান সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে এত জটিল জাতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে যে উহার পক্ষে অঞ্চলগুলির প্রতি সম্যক দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে আঞ্চলিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। আঞ্চলিক বা অংশগুলির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলে জাতীয় স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হয়, কারণ অংশগুলি লইয়াই ত সমগ্র জাতীয় জীবন।

ত্রুটি: কিন্তু ইহা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (Federal Government): যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তে লিখিত সংবিধান বা শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বর্তমান থাকে। এই লিখিত সংবিধানই কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক

সরকারসমূহের সৃষ্টি করে এবং উভয়ের মধ্যে শাসনক্ষমতা বণ্টিত করিয়া দেয়। ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বারা বণ্টিত হয় বলিয়া কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারসমূহের কেহ কাহারও অধীন থাকে না। উভয়ে নিজ নিজ এলাকার মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রের ন্যায় আঞ্চলিক সরকারসমূহের ক্ষমতাও মৌলিক (original) ক্ষমতা; ইহার কোনরূপ পরিবর্তনসাধন করিতে হইলে প্রথমে সংবিধানের পরিবর্তনসাধন করিতে হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Features of Federal Government): যে-কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়:

(১) **শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন:** শাসনতন্ত্র বা সংবিধান দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ক্ষমতা বণ্টন নানাভাবে হইতে পারে। তবে সাধারণত যে-বিষয়গুলি জাতির স্বার্থের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়—যেমন, দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি, রেলপথ, মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রভৃতি—সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে দেওয়া হয়; এবং যে-বিষয়গুলির সহিত আঞ্চলিক স্বার্থই অধিক জড়িত—যেমন, শিক্ষা, স্থানীয় শান্তিরক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, কৃষি, জলসেচ প্রভৃতি—সেগুলি রাজ্য বা অংশগুলির হস্তে ন্যস্ত করা হয়। অবশ্য এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের হস্তে সমর্পণ করা যায় না। করিলে বিষয়গুলি ঠিকমত পরিচালিত হয় না। সুতরাং এইরূপ বিষয়গুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উভয় প্রকার সরকারের যুক্ত কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়।

১। শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন

ক্ষমতা কিভাবে বণ্টিত হয়

(২) **লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র:** যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা লিখিত হয় এবং সুপরিবর্তনীয় হয় না। সুপরিবর্তনীয় বলিতে বুঝায় সহজ পরিবর্তন-যোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রকে সহজে পরিবর্তিত করা যায় না। যাইলে ক্ষমতার ভাগাভাগি লইয়া কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকারগুলি পরস্পরের সহিত বিবাদে লিপ্ত থাকিত। ফলে শাসনকার্যও ব্যাহত হইত।

২। লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র

(৩) **যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত:** পরিশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় 'সাধারণত' একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত থাকে।* এই আদালতের কার্য হইল শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করা এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করা। কেন্দ্র বা কোন রাজ্য সরকার যদি এমন কোন আইন প্রণয়ন করে যাহা তাহার সংবিধান-প্রদত্ত ক্ষমতার বহির্ভূত, তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত

৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত

* যুক্তরাষ্ট্রে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত থাকিতেই হইবে এরূপ কোন কথা নাই। সুইজারল্যাণ্ড ও সোবিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালতের উপর শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যার ভার নাই।

তাহা বাতিল করিয়া দিতে পারে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যাহাতে কোন সরকার নিজস্ব সীমা লংঘন না করে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ভারসাম্য (equilibrium) রক্ষা করে।

ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইজারল্যাণ্ড, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত।

গুণ: ১। ইহা গণতন্ত্রের পরিপোষক

গুণাগুণ: যুক্তরাষ্ট্রে অঞ্চলসমূহের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত হয়। স্বায়ত্তশাসনই গণতন্ত্রের মূলকথা। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্রের পরিপোষক।

২। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র একত্রিত হইয়া বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভূতপূর্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি লইয়া গঠিত। এই উপনিবেশগুলির প্রত্যেকটি যদি একটি করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিত তবে বর্তমানের শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব কখনই সম্ভব হইত না।

৩। ইহা জাতীয় ঐক্য-সাধনের প্রকৃষ্টতম উপায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা জাতীয় ঐক্যসাধনের প্রকৃষ্টতম উপায়। একই জাতির বিভিন্ন অংশ যদি পাশাপাশি রাষ্ট্র গঠন করিয়া বাস করে তবে তাহারা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে। ভারতবাসী এক জাতি। কিন্তু ধরা যাউক যে, তাহারা পশ্চিমবংগ বিহার উড়িষ্যা আসাম প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিয়া বাস করিতেছে। এরূপ অবস্থায় পশ্চিমবংগ বিহার উড়িষ্যা আসাম প্রভৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমবায়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়া ভারতবাসীর জাতীয় ঐক্যসাধন করা যাইতে পারে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিমবংগ বিহার উড়িষ্যা ও আসামের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও থাকিবে, অথচ ভারতবাসী একই শাসনাধীনে বাস করে।

৪। ইহা কর্মবিভাগ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কর্মবিভাগ (division of functions) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রমবিভাগ (division of labour) বা কর্মবিভাগ দক্ষতার মূলসূত্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্ষমতা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকারসমূহের মধ্যে বণ্টিত হয় বলিয়া কর্মও বিভক্ত হয়। ফলে উভয় প্রকার সরকারই দক্ষতার সহিত আপনাপন কার্য সম্পাদন করিতে পারে।

৫। ইহাতে শাসন ব্যাপারে পরীক্ষা চালানো যায়

লর্ড ব্রাইস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার আর একটি গুণের নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইল, যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিকভাবে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা লইয়া পরীক্ষা চালানো যায়; কিন্তু এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সমগ্র দেশব্যাপী এইরূপ করা বিশেষ বিপজ্জনক।

পরিশেষে, যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য (regional autonomy) বর্তমান থাকে বলিয়া, আঞ্চলিক অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, আঞ্চলিক

বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা এরূপ সুষ্ঠুভাবে করা যাইতে পারে যাহা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কোনমতেই সম্ভবপর নহে। উদাহরণ-স্বরূপ, পশ্চিমবংগ সরকার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে যেরূপ যত্নবান হইতে পারে, ভারত সরকারের পক্ষে তাহা কোনমতেই সম্ভবপর নহে।

৬। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের উপর সম্যক দৃষ্টি দেওয়া সম্ভবপর হয়

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কয়েকটি সুস্পষ্ট ত্রুটিও লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এককেন্দ্রিক সরকার অপেক্ষা দুর্বল। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সমগ্র ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকায় শাসনকার্যে দুর্বলতা প্রকাশ পাইতে পারে না; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা বণ্টিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় শাসন ব্যাপারে বিশেষ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

ত্রুটি: ১। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অপেক্ষাকৃত দুর্বল

কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রে এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকাশ পায় আন্তর্জাতিক সন্ধি ও সর্তাদি পালন ব্যাপারে। আন্তর্জাতিক সন্ধি ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পালন নির্ভর করে সমগ্র দেশের সহযোগিতার উপর। কিন্তু আঞ্চলিক সরকারগুলি সহযোগিতার পরিবর্তে বিরোধিতা করিয়া সন্ধি ইত্যাদি পালনে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে। ইহাতে জাতির আন্তর্জাতিক মর্যাদার লাঘব ঘটে।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে ক্ষমতা বণ্টিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে। অনেক সময় এই বিরোধের ফলে জাতির শক্তিরও হানি ঘটে।

২। ইহাতে সংঘর্ষের সম্ভাবনা বর্তমান থাকে

তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ব্যয়বহুল ও জটিল। একটির পরিবর্তে অনেকগুলি সরকার থাকায় এবং ক্ষমতা বণ্টিত হওয়ায় শাসনকার্যে ব্যয়বাহুল্য ও জটিলতা দেখা দেয়।

৩। ইহা ব্যয়বহুল ও জটিল

চতুর্থত, শাসন-ব্যবস্থায় দেশের বিভিন্ন অংশে পরস্পরবিরোধী আইন প্রণীত হইতে পারে। এরূপ ঘটিলে নানারূপ অশান্তি ও গোলযোগের আশংকা থাকে। এই অশান্তি ও গোলযোগ ক্রমে গৃহযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে। এই কারণে একজন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্রোহের সম্ভাবনা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে।

৪। দেশের বিভিন্ন অংশে পরস্পরবিরোধী আইন প্রণীত হইতে পারে

উপসংহার: এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় কোন শাসন-ব্যবস্থাই সকল অবস্থার উপযোগী নহে। তবুও বলা যাইতে পারে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য।

পার্লামেন্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার (Parliamentary and Presidential Governments): শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের

মধ্যে সম্বন্ধ অনুসারে—অর্থাৎ, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির প্রয়োগ অনুসারে গণতান্ত্রিক সরকারসমূহকে (ক) পার্লামেন্টীয় (Parliamentary) এবং (খ) রাষ্ট্রপতি-শাসিত (Presidential)—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। পার্লামেন্টীয় সরকারে শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান থাকে; এবং রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে এই দুই বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান থাকে।

সরকারের এই দুই রূপের মধ্যে পার্থক্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি অনুসারে

পার্লামেন্টীয় বা মন্ত্রি-পরিষদ শাসিত সরকার (Parliamentary or Cabinet Government): পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পার্লামেন্টীয় সরকার মন্ত্রি-পরিষদ শাসিত সরকার (Cabinet Government) নামেও অভিহিত।* এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থার প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল নিয়মতান্ত্রিক শাসক (Constitutional Head) এবং প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য। নিয়মতান্ত্রিক শাসক হইলেন নামসর্বস্ব শাসক (nominal executive)। শাসনকার্য তাঁহার নামে পরিচালিত হয়, কিন্তু প্রকৃত শাসনভার থাকে প্রকৃত শাসক (real executive) বা মন্ত্রিবর্গের উপর। নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ অনুসারে কার্য করেন; তাঁহার কোন স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা থাকে না বলিলেই চলে। ইংলণ্ডের রাণী ও ভারতের রাষ্ট্রপতি এইরূপ নিয়মতান্ত্রিক শাসকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইঁহারা দুইজনেই রাষ্ট্র-প্রধান (Heads of States), কিন্তু সরকারের মধ্যে প্রধান নহেন। "ইঁহারা জাতির প্রতীক, কিন্তু ইঁহারা জাতিকে শাসন করেন না। ইঁহাদের পদ মর্যাদাসম্পন্ন, কিন্তু কর্তৃত্বহীন; সুতরাং দায়িত্বশূন্য।"

পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য :

১। নিয়মতান্ত্রিক ও প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য

দায়িত্বপূর্ণ পদ হইল প্রকৃত শাসকবর্গ বা মন্ত্রিগণের। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের কার্যাকার্যের জন্য ব্যবস্থা বিভাগের নিকট সম্পূর্ণভাবে দায়িত্বশীল। ব্যবস্থাপক সভার আস্থা হারাইলে তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হয়। এইজন্যই পার্লামেন্টীয় সরকার দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা (Responsible Government) নামে পরিচিত।

২। মন্ত্রিবর্গের দায়িত্বশীলতা

ব্যবস্থা বিভাগের নিকট মন্ত্রিবর্গের দায়িত্ব যৌথ দায়িত্ব (collective responsibility)। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে সরকারী নীতি ও কার্য পরিচালনার জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকেন।** এইভাবে শাসকবর্গের উপর আইনসভা বা

৩। দায়িত্বশীলতার যৌথ প্রকৃতি

---

* ৩১ পৃষ্ঠা।

** আইনসভার দুইটি পরিষদ থাকিলে মন্ত্রিগণ একমাত্র নিম্নতর পরিষদের নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকেন।

পার্লামেণ্টের প্রাধান্য বজায় থাকে বলিয়াই এই প্রকার সরকারকে 'পার্লামেন্টীয় সরকার' বলা হয়।

মন্ত্রিগণ আইনসভার সভ্যদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন। আইনসভায় তাঁহাদের দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। সুতরাং তাঁহারা যে-প্রস্তাব উত্থাপন করেন আইনসভায় তাহা পাস হয়। এইভাবে ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ভিত্তিতেই পার্লামেন্টীয় সরকার পরিচালিত হয়।

৪। ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগ—উভয় ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব করেন প্রধান মন্ত্রী। মন্ত্রিগণ প্রধান মন্ত্রীর অধীনে সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য করেন এবং যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকেন। প্রধান মন্ত্রী আবার আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বও করেন। এইজন্য প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বকেও পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া নির্দেশ করা হয়।

৫। প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্ব

পরিশেষে, অনেকের মতে পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটি সুসংগঠিত বিরোধী দল থাকিবে। বিখ্যাত ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রবিদ অধ্যাপক জেনিংসের (Jennings) ভাষায়, "বিরোধী দল পার্লামেণ্টীয় গণতন্ত্রের নির্দিষ্ট ও অপরিহার্য অংগ।" এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি প্রবর্তিত থাকে না বলিয়া বিরোধী দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বৈরাচারিতার প্রতিবন্ধকতা করিয়া গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে। পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থা ভারত, ইংলণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচলিত।

৬। বিরোধী দলের অস্তিত্ব

গুণাগুণ: পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল যে ইহা ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগকে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ করে। সরকারের এই দুই বিভাগের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান থাকিলে তবেই সুশাসন সম্ভবপর হয়।

গুণ: ১। সুশাসন সম্ভবপর হয়

দ্বিতীয়ত, শাসকবর্গ জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ দ্বারা গঠিত আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকেন বলিয়া গণতন্ত্র বা জনসাধারণের শাসনের স্বরূপ বজায় থাকে। আইনসভায় প্রতিনিধিগণ জনমতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শাসকবর্গকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করেন; ফলে শাসকবর্গকেও জনপ্রতিনিধিদের মতামত অনুসারে চলিতে হয়। এইভাবে শাসন-ব্যবস্থা জনমত দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে।

২। গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে

পার্লামেণ্টীয় সরকারে সহজেই শাসক পরিবর্তন করা যাইতে পারে। যে-মন্ত্রিগণ আজ শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছেন তাঁহারা যদি অদক্ষতার পরিচয়

যেন বা অন্যায় করেন, তবে আইনসভার জনপ্রতিনিধিবর্গ কাল তাঁহাদের সরাইয়া তাঁহাদের স্থলে অন্য একদল মন্ত্রীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। রাষ্ট্রপতি একবার পদে অধিষ্ঠিত হইলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায় না।*

৩। যে-কোন সময় শাসক পরিবর্তন সম্ভব

পার্লামেণ্টীয় সরকার রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ উপযোগী। এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিগণকে আইনসভায় শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। এই প্রশ্নোত্তর সংবাদপত্রে ছাপা হয় বলিয়া ইহা হইতে জনসাধারণ অনেক শিক্ষালাভ করে। আবার নির্বাচন যে-কোন সময় অনুষ্ঠিত হইতে পারে বলিয়া সর্বদাই দলীয় প্রচারকার্য চলিতে থাকে। ইহা হইতেও জনসাধারণ শাসনসংক্রান্ত ব্যাপার সম্বন্ধে অবহিত হয়।

৪। রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার বিস্তার হয়

পার্লামেণ্টীয় সরকারের সমালোচকেরা বলেন যে এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ না থাকায় সরকার স্বৈরাচারী হইয়া উঠে এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। এই সমালোচনা বর্তমানে একরূপ মূল্যহীন, কারণ বর্তমানে সুশাসনের জন্য ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের স্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে উভয়ের মধ্যে সহযোগিতাই কাম্য বিবেচিত হয়।

ত্রুটি: ১। বলা হয়, ইহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যাহত হয়

দ্বিতীয়ত, মন্ত্রিগণের পক্ষে আইনসভার সদস্যপদ শাসনকার্য পরিচালনায় অসুবিধার সৃষ্টি করে বলিয়া অভিযোগ করা হয়। এই প্রসংগে একজন সমালোচক উক্তি করিয়াছেন যে অর্থমন্ত্রী যদি আইনসভায় প্রশ্নের উত্তর দিতেই ব্যস্ত থাকেন, তবে অর্থদপ্তর পরিচালনা করিবার সময় কখন পাইবেন?

২। শাসনকার্য পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটে

পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসক-পরিবর্তন সহজসাধ্য বলিয়া ইহা ঘন ঘন ঘটিতে দেখা যায়। ফলে দীর্ঘদিন ধরিয়া অনুসৃত কোন সরকারী নীতির সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক সময় দেখা যায় যে, আজ মন্ত্রি-পরিষদ যে-নীতি গ্রহণ করিল, কাল নূতন মন্ত্রি-পরিষদ আসিয়া তাহা বদলাইয়া দিল।

৩। সরকারী নীতির ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটে

ঘন ঘন শাসক-পরিবর্তন ঘটে বলিয়াই আবার মন্ত্রিগণ শাসনকার্যে দক্ষতা-লাভ করিবার সময় পান না। পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তাঁহাদের পক্ষে দল এবং আইনসভার সদস্যদের মনস্তুষ্টি করিয়া চলিতে হয়। ইহার ফলে তাঁহারা শাসনকার্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন না।

৪। শাসকবর্গ দক্ষ হইতে পারেন না

---

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে এই নির্দিষ্ট সময় হইল চারি বৎসর।

বহু শাসক লইয়া গঠিত বলিয়া পার্লামেণ্টীয় সরকার দ্রুত নীতি-নির্ধারণ করিতে পারে না। ইহাতে যুদ্ধ ইত্যাদি সংকটের সময়ে বিশেষ ক্ষতি হয়।

৫। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়

পরিশেষে, ইহাও বলা হয় যে এই শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিবর্গ স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারেন। মন্ত্রিগণ হইলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। সুতরাং তাঁহারা আইনসভার মাধ্যমে যে-কোন প্রস্তাব, যে-কোন আইন পাস করাইয়া এবং যে-কোন ব্যয় অনুমোদন করাইয়া লইতে সমর্থ। ফলে শাসনকার্য জনমত দ্বারা পরিচালিত না হইয়া মন্ত্রিবর্গের স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারাই পরিচালিত হয়। মন্ত্রিবর্গের এই স্বেচ্ছাচারকে 'নয়া স্বৈরাচার' (New Despotism) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।*

৬। মন্ত্রিবর্গ স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারেন

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার (Presidential Form of Government): রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রি-করণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহাতে শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকে।

বৈশিষ্ট্য:

এই শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে একমাত্র রাষ্ট্রপতির হস্তে। "রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রের পতি এবং শাসন বিভাগেরও কর্তা।" নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব শাসক বলিয়া রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে কিছু নাই। রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা করিবার জন্য একটি মন্ত্রি-পরিষদ থাকে। কিন্তু ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়, "মন্ত্রিগণ তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র, তাঁহার সহকর্মী নহেন।" মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য হইতে পারেন না; আইনসভার নিকট তাঁহারা দায়িত্বশীলও নহেন। তাঁহাদের দায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট।

১। ইহাতে নিয়মতান্ত্রিক শাসক নাই

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের ভিত্তিতে সংগঠিত বলিয়া রাষ্ট্রপতিও তাঁহার কার্যকলাপের জন্য আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল নহেন। তিনি জনসাধারণ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে সংবিধান-ভংগ (violation of the constitution) বা দুর্নীতিমূলক কর্ম ছাড়া অন্য কোন কারণে পদচ্যুত করা যায় না।

২। ক্ষমতা স্বতন্ত্রি-করণের জন্য ব্যবস্থা বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের দায়িত্ব নাই

অপরদিকে আইনসভাও রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে পরিচালিত হয় না। মন্ত্রি-বর্গের মত রাষ্ট্রপতিও আইনসভার কার্যে যোগদান করিতে পারেন না। দূর হইতে প্রস্তাব পাঠাইয়া, ব্যয়বরাদ্দ দাবি করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত থাকিতে হয়। আইনসভা ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে, ব্যয়বরাদ্দের দাবি না-মঞ্জুর করিতে

৩। ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ নহে

* পুরাতন স্বৈরাচার হইল একনায়ক বা রাজার স্বেচ্ছাচার।

পারে। তখন রাষ্ট্রপতি বাণী (message) পাঠাইতে পারেন। আইনসভা এই বাণীকেও উপেক্ষা করিতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহা ছাড়াও কয়েকটি ল্যাটিন আমেরিকান দেশে এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

গুণাগুণ: রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থার মত দ্রুত পরিবর্তনশীল নহে। স্থায়িত্ব রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া নীতি অনুসরণ করা যায় এবং শাসকবর্গ শাসনকার্যে দক্ষতা অর্জন করিতে পারেন। ফলে দেশের উন্নতি সাধিত হয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

গুণ:
১। প্রধান গুণ স্থায়িত্ব

সমর্থকদের মতে, এই শাসন-ব্যবস্থা বিশেষ শান্তিপূর্ণ, কারণ ইহাতে শাসন বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা বিশেষ নাই। স্বতন্ত্র ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে উভয়ই নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে পারে।

২। বলা হয়, এই ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণ

শাসন বিভাগের চরম কর্তৃত্ব একমাত্র রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত থাকে বলিয়া এই প্রকার শাসন-পদ্ধতি জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের বিশেষ উপযোগী। রাষ্ট্রপতির কোন সহকর্মী নাই; সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি কাহারও সহিত কোন পরামর্শ করিতে বাধ্য নহেন। সুতরাং তিনি যেরূপ তৎপরতার সহিত কার্য করিতে পারেন পার্লামেন্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে সেরূপ সম্ভব হয় না।

৩। জরুরী অবস্থায় উপযোগী

সমর্থকগণ আরও বলেন, যে-দেশে বহু রাষ্ট্রনৈতিক দল আছে সে-দেশের পক্ষে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারই প্রকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা। বহুদল থাকিলে কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না; ফলে পার্লামেন্টীয় সরকারের মন্ত্রি-পরিষদও একদলীয় না হইয়া বহুদলীয় হয়। বহুদলীয় মন্ত্রি-পরিষদ দুর্বল হইতে বাধ্য। এইজন্য এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারই বাঞ্ছনীয়।

৪। বহুদলীয় রাষ্ট্রের পক্ষে প্রকৃত শাসন-ব্যবস্থা

অপরদিকে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের ত্রুটিগুলিও বিশেষ প্রকট। শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগ পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র থাকে বলিয়া ইহারা পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এইরূপ সংঘর্ষের অসংখ্য উদাহরণ রহিয়াছে। সুতরাং সমর্থকগণ যে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারকে শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা বলিয়া মনে করেন, তাহা ভুল।

ত্রুটি:

শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনার দরুন সুশাসন ব্যাহত হইবার আশংকাও রহিয়াছে।

১। ইহাতে কুশাসনের আশংকা রহিয়াছে

দ্বিতীয়ত, এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারেন। সংবিধানভংগ ও দুর্নীতিমূলক কার্য না করিলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায় না। ফলে তিনি এই দুই বিষয় বাঁচাইয়া সম্পূর্ণ খুশিমত কার্য করিতে পারেন। ইহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। এইজন্য পার্লামেণ্টীয় গণতন্ত্রের সমর্থকদের নিকট রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার স্বৈরাচারমূলক বলিয়া মনে হয়।

২। রাষ্ট্রপতি স্বৈরাচারী হইতে পারেন

পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রি-পরিষদ আইন প্রণয়নকার্য পরিচালনা করে; কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের এই কার্য সম্পাদিত হয় আইনসভার বিভিন্ন কমিটির দ্বারা। এক একটি কমিটির উপর এক এক প্রকার আইন প্রণয়নের ভার ন্যস্ত থাকে। ইহার ফলে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব বিভক্ত হইয়া পড়ে। দায়িত্ব বিভক্ত হইলে দায়িত্ব বিলুপ্তও হয়, কারণ শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগ উভয়েই দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করে। বস্তুত, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার একরূপ দায়িত্বহীন শাসন-ব্যবস্থা। ইহাতে শাসন বিভাগ আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল নহে, এবং আইন প্রণয়নের সামগ্রিক দায়িত্ব কাহারও নাই।

৩। ইহা দায়িত্বহীন শাসন-ব্যবস্থা

দায়িত্বহীন শাসন-ব্যবস্থা বিশেষ বিপজ্জনক। ইহাতে জনগণ অত্যাচারিত হইতে পারে, অকাম্য আইন প্রণীত হইয়া জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে এইরূপ আশংকা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে।

৪। এই কারণে ইহা বিপজ্জনকও বটে

সংক্ষিপ্তসার

প্রাচীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। বর্তমানে কিন্তু রাষ্ট্রের পরিবর্তে সরকারেরই শ্রেণীবিভাগ করা হয়। সরকারের একটি শ্রেণীবিভাগ হইল একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে। গণতন্ত্র আবার বিভিন্ন ধরনের হয়—যথা, (ক) এককেন্দ্রিক, (খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়, (গ) পার্লামেণ্টীয়, (ঘ) রাষ্ট্রপতি-শাসিত।

গণতন্ত্র: ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় গণতান্ত্রিক সমাজ এবং সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় গণতান্ত্রিক সরকার। গণতান্ত্রিক সরকারই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

তত্ত্বের দিক হইতে গণতন্ত্র জনসাধারণের শাসন হইলেও, কার্যক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা ব্যবহার করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কিন্তু গণতন্ত্রে শাসনকার্য পরিচালিত হয় সকলের জন্য, মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য নহে। উপরন্তু, গণতন্ত্র সকলের সম্মতির উপরও প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য ইহা জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা নামেও অভিহিত।

গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—উভয়ই হইতে পারে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বর্তমান যুগে অচল। তাই বর্তমানে সকল দেশেই গণতন্ত্র হইল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক। তবে অনেক সময় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখিবার জন্য গণভোট, গণ-উদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ: গণতন্ত্রের নিম্নলিখিত গুণগুলির নির্দেশ করা যাইতে পারে—১। একমাত্র গণতন্ত্রই সকলের কল্যাণসাধন করিতে পারে; ২। একমাত্র ইহাতেই ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব; ৩। ইহা স্বাধীনতার ভিত্তিতে সংগঠিত; ৪। ইহা সাম্যকেও সমর্থন করে; ৫। ইহা রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার বিস্তার করে; ৬। ইহাতে বিপ্লবের আশংকা কম থাকে।

ত্রুটি : কিন্তু অভিযোগ করা হইয়াছে যে—১। গণতন্ত্র অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিতের শাসন ; ২। এই শাসন-ব্যবস্থা রক্ষণশীল ; ৩। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অলীক ; ৪। গণতন্ত্র দলগত ত্রুটিসম্পন্ন ; ৫। ইহা অস্থায়ী ; ৬। গণতান্ত্রিক সভ্যতা নিম্নস্তরের ; ৭। এই শাসন-ব্যবস্থা জরুরী অবস্থার উপযোগী নহে ; ৮। ইহা পুঁজিবাদ সমর্থন করে।

গণতন্ত্র কিভাবে সফল হইতে পারে : গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ অতিরঞ্জিত হইলেও গণতন্ত্রকে সফল করা কঠিন। ইহার জন্য প্রয়োজন—১। গণতান্ত্রিক জনগণের, ২। নাগরিকগণের মধ্যে বুঝাপড়ার, ৩। জনমত প্রকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থার, এবং ৪। অর্থনৈতিক অধিকারের।

একনায়কতন্ত্র : একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাসন-ব্যবস্থা। ইহাতে চূড়ান্ত শাসনক্ষমতা একজনের হস্তে ন্যস্ত থাকে। ইহার গুণাগুণও গণতন্ত্রের বিপরীত। একনায়কতন্ত্রের দুইটি সাম্প্রতিক রূপ হইল—(১) ফ্যাসীবাদ, (২) নাৎসীবাদ।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা : বর্তমানে বিশাল জাতীয় রাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও অনেকগুলি করিয়া আঞ্চলিক সরকার থাকে। এই কেন্দ্রীয় সরকার যদি আঞ্চলিক সরকারসমূহকে সৃষ্টি করে এবং উহাদের উপর প্রাধান্য বজায় রাখে তবে শাসন-ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক বলা হয়।

গুণাগুণ : অখণ্ড শাসন ও নীতি কিন্তু সুপরিবর্তনীয় অথচ দৃঢ় শাসন এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ। অপরদিকে ইহা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে অস্বীকার করে বলিয়া এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের উপযোগী নহে বলিয়া কাম্য নহে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা : যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তে সংবিধানের প্রাধান্য বর্তমান থাকে। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল—১। শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন, ২। লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র, এবং ৩। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত।

গুণ : ইহা ১। গণতন্ত্রের পরিপোষক ; ২। জাতীয় ঐক্যসাধনের প্রকৃষ্টতম উপায় ; ৩। ইহাতে শাসনকার্য পরিচালনা-ব্যাপারে পরীক্ষা চালানো যায় ; ৪। আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতি প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেওয়া যায়।

ত্রুটি : কিন্তু ইহা ১। অপেক্ষাকৃত দুর্বল, ২। সংঘর্ষের সম্ভাবনাপূর্ণ, ৩। ব্যয়বহুল, ৪। জটিলতা-সম্পন্ন।

পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার : ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি অনুসারে সরকারের এই দুই রূপের মধ্যে পার্থক্য করা হয়।

পার্লামেণ্টীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য : ১। নিয়মতান্ত্রিক ও প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য, ২। ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ৩। ব্যবস্থা বিভাগের নিকট মন্ত্রিবর্গের যৌথ দায়িত্বশীলতা, এবং ৪। প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্ব।

গুণ : এই পার্লামেণ্টীয় সরকারে—১। সুশাসন সম্ভবপর হয় ; ২। গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে ; ৩। সহজে শাসক পরিবর্তন করা যায় ; ৪। রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটে।

ত্রুটি : ১। কিন্তু ঘন ঘন শাসক পরিবর্তন কাম্য নাও হইতে পারে ; ২। শাসকবর্গ দক্ষ হইতে পারেন না ; ৩। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না ; ৪। মন্ত্রিবর্গ স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারেন ; ৫। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যাহত হইতে পারে।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার : ১। ইহাতে নিয়মতান্ত্রিক শাসক নাই ; ২। ব্যবস্থা বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের কোন দায়িত্ব নাই ; ৩। এই দুই বিভাগের মধ্যে সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ নহে।

গুণ : ১। স্থায়িত্ব ইহার সর্বপ্রধান গুণ, ২। বলা হয়, এই ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণ, ৩। জরুরী অবস্থার উপযোগী, এবং ৪। বহুদলীয় রাষ্ট্রের পক্ষে প্রকৃত শাসন-ব্যবস্থা।

ত্রুটি : ১। কিন্তু ইহাতে কুশাসনের আশংকাও রহিয়াছে ; ২। রাষ্ট্রপতি একমাত্র শাসক বলিয়া স্বৈরাচারী হইতে পারেন। ৩। ইহা দায়িত্বহীন শাসন-ব্যবস্থা ; ৪। সুতরাং ইহা বিপজ্জনকও বটে।

প্রশ্নোত্তর

1. **What do you understand by Democracy? Distinguish between Direct and Indirect Democracy.**

গণতন্ত্র বলিতে কি বুঝ? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [৩২-৩৫ পৃষ্ঠা]

2. **What is Indirect Democracy? What are its disadvantages?**

পরোক্ষ গণতন্ত্র কাহাকে বলে? ইহার অসুবিধা কি কি? [৩৪-৩৫ এবং ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা]

3. **Distinguish between Democracy and Dictatorship. Which of these two would you prefer, and why?** (P. U 1961; C. U. 1961)

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। উহাদের মধ্যে কোন্‌টিকে তুমি সমর্থন কর; এবং কেন কর? [৩২-৩৩ এবং ৪০-৪১ পৃষ্ঠা]

4. **What do you understand by Dictatorship? State its demerits. Has Dictatorship any merits? If so, what are they?** (C. U. 1959, '63)

একনায়কতন্ত্র বলিতে কি বুঝ? ইহার ত্রুটি কি কি? একনায়কতন্ত্রের কোন গুণ আছে কি? থাকিলে গুণগুলি বর্ণনা কর। [৪০-৪১ পৃষ্ঠা]

5. **Distinguish between Democracy and Dictatorship. What are the conditions for the success of democracy in a country?**

(En. 1961; B. U. 1961)

গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। কোন দেশে গণতন্ত্র কিভাবে সফল হইতে পারে? [৩২-৩৩, ৪০ এবং ৩৮-৪০ পৃষ্ঠা]

6. **Discuss the merits and defects of Democratic Form of Government.**

(C. U. 1962; P.U. 1964)

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা কর। [৩৫-৩৮ পৃষ্ঠা]

7. **How will you distinguish Unitary Government from Federal Government? Illustrate your answer.** (C. U. 1952, '58; P. U. 1962; En. 1962)

কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা হইতে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্য নির্দেশ করিবে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

[ইংগিত: ইংলণ্ডে এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা এবং ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত।… এবং ৪২-৪৫ পৃষ্ঠা]

8. **Compare the advantages and disadvantages of the Unitary Government with those of a Federal Government.** (C. U. 1945; P. U. 1962)

এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণের সহিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ তুলনা কর।

[৪৩ এবং ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা]

9. **Distinguish between Parliamentary Form of Government and Presidential Form of Government. Discuss their respective merits and demerits.**

(C. U. 1957; P. U. 1961; En. 1961)

পার্লামেণ্টীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। উহাদের গুণাগুণের তুলনা কর। [৪৬-৫২ পৃষ্ঠা]

10. **Distinguish between: (*a*) Unitary Government and Federal Government, (*b*) Parliamentary Government and Presidential Government.** (En. 1964)

পার্থক্য নির্দেশ কর: (ক) এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা (সরকার) ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (সরকার), (খ) পার্লামেণ্টীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার। [৪২-৪৫, ৪৬ ৪৮ এবং ৫০-৫১ পৃষ্ঠা]

পঞ্চম অধ্যায়

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

(Separation of Powers and Organs of Government)

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি (Principle of Separation of Powers) : সরকারই রাষ্ট্রের হইয়া কার্য পরিচালনা করে। সুতরাং রাষ্ট্রের কার্যাবলী বলিতে বুঝায় সরকারেরই কার্যাবলী। সরকারের কার্যাবলী প্রধানত তিন শ্রেণীর—যথা, আইন প্রণয়ন করা, আইন বলবৎ বা শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং বিচারের ব্যবস্থা করা। এই তিন প্রকার কার্য পরিচালনার জন্য সরকারী ক্ষমতাকেও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : (ক) আইন প্রণয়নসংক্রান্ত ক্ষমতা, (খ) শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা, এবং (গ) বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা। সাধারণত এই তিন প্রকার কার্য সম্পাদন বা ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য সরকারের তিনটি বিভাগ বা অংগ (organs) থাকে : (ক) আইন বা ব্যবস্থা বিভাগ (Legislature), (খ) শাসন বিভাগ (Executive) এবং (গ) বিচার বিভাগ (Judiciary)। সংক্ষেপে, সরকারের তিন শ্রেণীর কার্য বা ক্ষমতা এই তিন বিভাগ দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদিত বা ব্যবহৃত হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইলে তাহাকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বলে। অন্যভাবে বলিতে গেলে, আইন প্রণয়ন ব্যাপারে আইন বা ব্যবস্থা বিভাগ, আইন বলবৎকরণের ব্যাপারে শাসন বিভাগ এবং বিচার সম্পর্কিত ব্যাপারে বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য প্রদানের নীতিই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি। বিপরীত দিক দিয়া দেখিলে ইহা হইল কোন বিভাগের পক্ষে নিজস্ব গণ্ডি ছাড়াইয়া অপর বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি।

সরকারী ক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ

সংক্ষেপে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি কাহাকে বলে

এই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির তিন প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে : (১) সরকারের এক বিভাগ অন্য কোন বিভাগের কার্য পরিচালনা করিবে না; (২) একই ব্যক্তি সরকারের একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত থাকিবে না; এবং (৩) সরকারের কোন বিভাগ অপর কোন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ বা উহার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিবে না। এখন দেখা যাউক, এই তিন অর্থের কোন্‌টিতে কতদূর পর্যন্ত ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং উহা কতদূর প্রযুক্ত হওয়া কাম্য। তাহার পূর্বে অবশ্য আলোচনা করা প্রয়োজন ক্ষমতা স্বতন্ত্রি-করণের উদ্দেশ্য কি ?

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের তিনটি অর্থ

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উদ্দেশ্য : বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ কর্তৃক আলোচিত ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির মোটামুটি তিনটি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায় :

(১) শাসনকার্যের ক্ষেত্রে কর্মবিভাগের সুবিধা (advantages of division of labour) লাভ করা; (২) সরকারের তিনটি বিভাগের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা সুশাসন সম্ভব করা; এবং (৩) ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা।

তিনটি উদ্দেশ্য:

একরূপ এ্যারিষ্টটলই প্রথমে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সরকারী কার্যাবলী তিন শ্রেণীর—যথা, নীতি-নির্ধারণ করা, ঐ নীতি অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং বিচারকার্য সম্পাদন করা। সরকারী কার্যাবলী এইভাবে বিভক্ত হইলে শাসনকার্য পরিচালনায় কর্মবিভাগ বা শ্রমবিভাগের সুবিধা লাভ করা যায় বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

১। কর্মবিভাগের সুবিধা লাভ করা

পরবর্তীকালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ সরকারের তিনটি বিভাগের স্বাতন্ত্র্যের দিক দিয়া ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির উপযোগিতা নির্দেশ করেন। ইঁহাদের মতে, সরকারের তিনটি বিভাগ যদি পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র থাকে—অর্থাৎ, পরস্পরের কার্যে হস্তক্ষেপ না করে তবেই সুশাসন সম্ভব হয়।

২। সুশাসন সম্ভব করা

ইহার পর ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ আলোচনা করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মণ্টেস্কু (Montesquieu)। মণ্টেস্কুর হস্তে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংরক্ষণ। বলা যায়, মণ্টেস্কুই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির ধারণাকে (concept) মতবাদে (theory) পরিণত করিয়া উহার পূর্ণ রূপদান করেন।

৩। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা

মণ্টেস্কু চরম স্বৈরাচারী ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর সমসাময়িক ছিলেন। লুই-এর স্বৈরাচারের ফলে ফ্রান্সে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছিল বলা চলে। একবার ইংলণ্ড ভ্রমণে আসিয়া মণ্টেস্কু ঐ দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ব্যাপক রূপ দেখিয়া একরূপ অভিভূত হইয়া পড়েন। স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে এইরূপ পার্থক্যের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ক্ষমতার স্বতন্ত্রিকরণই ইংলণ্ডের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অস্তিত্বের হেতু। এই সিদ্ধান্ত হইতে পরে তিনি স্বাধীনতার সর্বপ্রধান রক্ষাকবচ (safeguard) হিসাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ মতবাদের সৃষ্টি করেন।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি ও মণ্টেস্কু

মণ্টেস্কুর বক্তব্য হইল, একই ব্যক্তির হস্তে একাধিক ক্ষমতা ন্যস্ত রাখিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। রাজা যদি আইন প্রণয়ন, আইন বলবৎকরণ, বিচারকার্য সকলই সম্পাদন করিতে সমর্থ হন তবে তিনি ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন করিয়া অযৌক্তিকভাবে উহাকে বলবৎ করিতে এবং অন্যায়ভাবে আইনভংগকারীর শাস্তিপ্রদান করিতে পারেন। এরূপ ঘটিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অস্তিত্ব

মণ্টেস্কুর মতে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ স্বাধীনতার সর্বপ্রধান রক্ষাকবচ

থাকিতে পারে না। অতএব, এই তিন প্রকার কার্য পৃথক তিন শ্রেণীর ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

মণ্টেস্কু ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভুল কল্পনা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা কোন কালেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের পদ্ধতিতে সংগঠিত হয় নাই। তবুও মণ্টেস্কুর মতবাদ চিন্তাজগতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং বহু লোকের নিকট ইহা স্বাধীনতার মূল-মন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। ১৭৮৯ সালে ফরাসীরা ঘোষণা করে, যে-দেশে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি গৃহীত হয় নাই সে-দেশে শাসনতন্ত্রই নাই। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আমেরিকার ভূতপূর্ব ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি মিলিয়া গঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে এই নীতি সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে প্রণীত ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলির শাসনতন্ত্রেও এই নীতি গৃহীত হয়। ইউরোপে কিন্তু ফ্রান্স ছাড়া অন্য কোন দেশ এই মতবাদের প্রভাবে পড়ে নাই।

মণ্টেস্কুর মতবাদের প্রভাব ও এই নীতির প্রয়োগ

সমালোচনা: বর্তমানে নানা দিক দিয়া ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির সমালোচনা করা হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর সমালোচকের মতে, সরকারের কার্যাবলী ঠিক তিন শ্রেণীর নয়; সুতরাং সরকারের বিভাগও সংখ্যায় তিনটি নয়। ইঁহাদের কয়েকজন বিচারকার্যকে শাসনকার্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বলেন যে সরকারী বিভাগ সংখ্যায় মাত্র দুইটি: (১) শাসন বিভাগ, এবং (২) ব্যবস্থা বিভাগ। সমালোচক দলের অপর অংশ সরকারী কার্যাবলীকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করার পক্ষপাতী—যথা, (১) নির্বাচন, (২) আইন প্রণয়ন, (৩) শাসননীতি নির্ধারণ ও শাসনকার্য পরিচালনা, (৪) আইন ও নীতিকে কার্যকর করা, এবং (৫) বিচারকার্য। ফলে ইঁহাদের মতে, সরকারী বিভাগও সংখ্যায় পাঁচটি—যথা, (১) নির্বাচকমণ্ডলী, (২) ব্যবস্থা বিভাগ, (৩) শাসন বিভাগের কর্মকর্তাগণের বিভাগ, (৪) শাসন বিভাগের সাধারণ কর্মচারিগণের বিভাগ, এবং (৫) বিচার বিভাগ।

১। সরকারের কার্যাবলী তিন শ্রেণীর নহে সুতরাং সরকারের বিভাগও সংখ্যায় তিনটি নহে

প্রয়োগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন রাষ্ট্রেই সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া কার্য সম্পাদন করিতে পারে না। সরকারকে একটি জীবদেহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জীবদেহের বিভিন্ন অংশ—যথা, হস্ত পদ মস্তিষ্ক প্রভৃতি যেরূপ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, সরকারের বিভিন্ন বিভাগও সেইরূপ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই বিভাগগুলিকে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুত করা একেবারে অসম্ভব। ফলে প্রত্যেকটি বিভাগ

২। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পর হইতে সম্পর্কচ্যুত হইতে পারে না:

এমন সমস্ত কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে যাহা ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের সূক্ষ্ম নীতি অনুসারে অপর বিভাগের কর্তব্য। উদাহরণস্বরূপ, আইন প্রণয়নের উল্লেখ করিতে পারা যায়। আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা বিভাগের কার্য। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন প্রণীত হয় শাসন বিভাগের নির্দেশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—যেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ প্রধান নীতি হিসাবে গৃহীত সেখানেও আইনসভা অল্পবিস্তর শাসন বিভাগের নির্দেশানুযায়ী আইন প্রণয়ন করে। উপরন্তু, আইনসভা অধিবেশনে না থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে শাসন বিভাগকে জরুরী আইন (ordinance) পাস করিতে হয়। আবার শাসন বিভাগকে উপ-আইন (by-law) প্রণয়নের দ্বারা আইনসভা-প্রণীত আইনের ফাঁকগুলি পূরণ করিয়া লইতে হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়ায় আইনসভা আইন প্রণয়নের কিছু ভার শাসন বিভাগের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অপরদিকে আবার আইন প্রণয়ন করা বিচার বিভাগেরও কার্য। বর্তমানে বিচারকগণ-প্রণীত আইন (judge-made law) বিচার-ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করিয়া আছে। প্রচলিত আইন যখন অ-পর্যাপ্ত বা অযৌক্তিক বিবেচিত হয় তখন বিচারসভা এইরূপ আইন প্রণয়ন করে।

ক। দেখা যায়, এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে

এইভাবে এক বিভাগ অপর বিভাগের কার্য সম্পাদন করে বলিয়া একই ব্যক্তিকে একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত থাকিতে হয়। ইংলণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশের পার্লামেণ্টীয় শাসন-ব্যবস্থাতে প্রকৃত শাসকবর্গ বা মন্ত্রিগণ ব্যবস্থা বিভাগেরই অংশ।

খ। একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সহিত জড়িতও থাকে

আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে এক বিভাগ অপর বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। তত্ত্বের দিক দিয়া সরকারের তিনটি বিভাগ সমক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও কার্যক্ষেত্রে শাসন বিভাগের উপর ব্যবস্থা বিভাগের প্রাধান্য প্রায় সকল দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। পার্লামেণ্টীয় সরকারে শাসন বিভাগের কর্মকর্তা বা মন্ত্রিগণ সরাসরি ব্যবস্থা বিভাগের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন; আইনসভার আস্থা হারাইলে তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হয়। রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে শাসন বিভাগের কতিপয় কার্য আইনসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ বলিয়া ঐ শাসন-ব্যবস্থাতেও আইনসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। অপরদিকে আবার আইনের বৈধতা-অবৈধতা ঘোষণার দ্বারা বিচার বিভাগ ব্যবস্থা বিভাগকে অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের তিন অর্থের কোনটিতেই এই নীতির পূর্ণ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

গ। এক বিভাগ অপর বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করে

কোন অর্থেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয়

শুধু যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ অসম্ভব তাহাই নহে, ইহার পূর্ণ প্রয়োগ কাম্যও নহে। বিভিন্ন বিভাগ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া

কার্য সম্পাদন করিলে শাসনকার্যে দক্ষতার অভাব দেখা দিবে। ইহা উপলব্ধি করিয়া জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছিলেন যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ প্রবর্তিত থাকিলে প্রত্যেক বিভাগ নিজস্ব ক্ষমতা সংরক্ষণেই ব্যস্ত থাকিবে এবং কখনই অপর বিভাগগুলিকে সাহায্য করিবে না। ইহার ফলে শাসনকার্যে দক্ষতার যে-অভাব ঘটিবে তাহা এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের সুফল কখনই পূরণ করিতে পারিবে না।

৩। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের ফলে শাসনকার্যে দক্ষতার অভাব ঘটে

উপরন্তু, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণকে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হিসাবে দেখা ভুল। ইতিহাসের দিক দিয়া মণ্টেস্কু ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছেন। ইংলণ্ডে শাসন-ক্ষমতার স্বতন্ত্রিকরণ কোনদিনই ছিল না। তবুও ইংরাজরা কোনকালেই অন্য দেশের লোক অপেক্ষা কম ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করে নাই। ব্যক্তি-স্বাধীনতা নির্ভর করে দেশের জনসাধারণের উপর। জনসাধারণ যদি স্বাধীনতাকাংক্ষী হয় তবে রাষ্ট্র উহা প্রদান না করিয়া পারে না। আবার জনসাধারণকেই স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বাধীনতা ব্যাহত হইতেছে কি না, তাহার প্রতি জনগণকে চিরকাল সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এবং ব্যাহত হইলে তৎক্ষণাৎ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সুতরাং স্বাধীনতা নির্ভর করে দেশের জনগণের স্বাধীনতাকাংক্ষা ও নির্ভীকতার উপর, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উপর নহে।

৪। ইহা স্বাধীনতার মূলমন্ত্রও নহে

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের উপরি-উক্ত ত্রুটির জন্য বর্তমানে এই নীতির মাত্র আংশিক প্রয়োগ সমর্থন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই আংশিক প্রয়োগ বলিতে মাত্র বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্যই বুঝায়।

বর্তমানে মাত্র বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্যই সমর্থন করা হয়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ (Organs of Government):

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ মতবাদে ধরিয়া লওয়া হয় যে সরকারের তিনটি বিভাগ সমক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে দেখা যায় যে ব্যবস্থা বিভাগ সরকারের অপর দুই অংশ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে। ইহার দুইটি কারণ আছে: প্রথমত, ব্যবস্থা বিভাগ জনপ্রতিনিধিবর্গকে লইয়া গঠিত হয়, এবং দ্বিতীয়ত, ব্যবস্থা বিভাগ আইন করিলে তবেই শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের কার্যের সুযোগ ঘটে। রাষ্ট্র আইনানুসারে সংগঠিত জনসমষ্টি (a people organized for law) বলিয়া প্রথমেই প্রয়োজন আইন প্রণয়নের। সেই আইন অনুসারে শাসন ও আইনভংগের বিচার হইল পরের কথা। অতএব, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনা সুরু করা উচিত ব্যবস্থা বিভাগ হইতে।

সরকারের সকল বিভাগ সমক্ষমতা-সম্পন্ন নহে

ব্যবস্থা বিভাগ (The Legislature): ব্যবস্থা বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা হইল ইহার কার্যাবলী ও সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা।

ব্যবস্থা বিভাগের কার্যাবলী পাঁচ প্রকার

কার্যাবলী (Functions): ব্যবস্থা বিভাগের কার্য আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু বর্তমান যুগে ইহা অন্যান্য কার্যও সম্পাদন করে। ব্যবস্থা বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান:

(ক) **আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য:** ইহাই ব্যবস্থা বিভাগের প্রধান কার্য। পূর্বে অধিকাংশ আইন ছিল প্রথাগত (customary laws)। কিন্তু বর্তমানে ব্যবস্থাপক সভা প্রণীত আইনই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। আজিকার দিনের ব্যবস্থাপক সভা প্রথাগত আইনের (customary laws) সংশোধন করে; এবং প্রয়োজন হইলে ইহার বিলোপসাধন করিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করে।

(খ) **অর্থসংক্রান্ত কার্য:** গণতন্ত্রের অন্যতম মৌলিক নীতি হইল যে জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের সম্মতি লইয়াই করধার্য বা ব্যয়বরাদ্দ করিতে হইবে। ইহার ফলে সকল গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রীয় অর্থের নিয়ন্ত্রণ ও তদারক ব্যবস্থা বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধে রাষ্ট্রীয় অর্থ-ব্যয়ের প্রশ্ন রহিয়াছে বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণাও করা যায় না।

(গ) **শাসনসংক্রান্ত কার্য:** ব্যবস্থা বিভাগকে কর্মচারী নিয়োগ, যুদ্ধ ঘোষণা, সন্ধি অনুমোদন প্রভৃতি শাসনসংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করিতে দেখা যায়। শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করাও শাসনসংক্রান্ত কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) **বিচারসংক্রান্ত কার্য:** ব্যবস্থা বিভাগের বিচারসংক্রান্ত কার্যও রহিয়াছে। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার করে ব্যবস্থাপক সভা। ইহা ছাড়া ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের আচরণের বিচার হয় ঐ ব্যবস্থাপক সভাতেই। ইংলণ্ডে আবার ব্যবস্থাপক সভার উচ্চতর কক্ষ লর্ড সভা (House of Lords) ঐ দেশের আপিল বিচারের চূড়ান্ত আদালত।

(ঙ) **শাসনতন্ত্রসংক্রান্ত কার্য:** শাসনতন্ত্র বা সংবিধান সংক্রান্ত কার্য বলিতে সংবিধানের পরিবর্তন ও ব্যাখ্যার কার্য বুঝায়। ভারতের ন্যায় অনেক রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা সমগ্র বা আংশিকভাবে সংবিধানের পরিবর্তন করিতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডে সংবিধানের ব্যাখ্যার চূড়ান্ত ভার ঐ দেশের ব্যবস্থাপক সভার হস্তে ন্যস্ত।

একপরিষদ ও দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভা

গঠন (Organisation): ব্যবস্থাপক সভা একটি অথবা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইতে পারে। একটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইলে উহাকে একপরিষদসম্পন্ন আইনসভা (Unicameral Legislature) এবং দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত

হইলে উহাকে দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভা* (Bicameral Legislature) বলা হয়।

দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভার পরিষদ দুইটিকে যথাক্রমে প্রথম বা নিম্নতর (lower) এবং দ্বিতীয় বা উচ্চতর (upper) পরিষদ বা কক্ষ (chamber) বলিয়া অভিহিত করা হয়। নিম্নতর পরিষদ সকল ক্ষেত্রেই জনগণের প্রতিনিধি-বর্গ লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহা জনপ্রিয় পরিষদ (popular chamber) নামেও পরিচিত।

দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভার সপক্ষে যুক্তি:

আইনসভা দ্বিপরিষদসম্পন্ন অথবা একপরিষদসম্পন্ন হইবে ইহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার সমর্থকেরা নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন:

(ক) দুইটি পরিষদ না থাকিলে সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভব হয় না। একটিমাত্র পরিষদে প্রত্যেকটি বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইতে পারে না। ফলে ইহাতে সর্বদাই অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়নের আশংকা রহিয়াছে।

১। ইহাতে সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভবপর

একপরিষদসম্পন্ন আইনসভা মুহূর্তের আবেগে এরূপ আকস্মিক আইনও পাস করিতে পারে, যাহাতে দেশের ক্ষতি হয়। কিন্তু দুইটি পরিষদ থাকিলে এরূপ ঘটা দুষ্কর। নিম্ন পরিষদ কোন বিল পাস করিলে দ্বিতীয় পরিষদ ধীরভাবে উহার বিচার করে। ইহাতে বিলটির দোষত্রুটি ধরা পড়ে এবং আকস্মিক আইনও প্রণীত হইতে পারে না। এইভাবে দ্বিতীয় পরিষদ অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে।

(খ) লর্ড ব্রাইসের মতে, দ্বিতীয় পরিষদ নাগরিকগণকে একটিমাত্র পরিষদের স্বৈরাচার হইতে রক্ষা করে। তিনি বলেন, সকল আইন-সভারই স্বৈরাচারী হইবার একটি অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি আছে। একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে এই প্রবৃত্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। তাই আইনসভাকে সমক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি পরিষদে বিভক্ত করা উচিত যাহাতে একটি অপরটির স্বৈরাচারিতা রোধ করিতে পারে।**

২। ইহা একটিমাত্র পরিষদের স্বৈরাচার রোধ করে

বর্তমান যুগে ব্রাইসের এই যুক্তি মানিয়া লওয়া হয় না। দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইন-সভার সমর্থকরাও উভয় পরিষদকে সমান ক্ষমতা প্রদানের পক্ষপাতী নহেন।

(গ) উচ্চতর বা দ্বিতীয় পরিষদে মনোনয়ন ও পরোক্ষ নির্বাচনের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যগুলির আইন-সভার দ্বিতীয় পরিষদে শিল্পকলা বিজ্ঞান সাহিত্য

৩। বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা সম্ভব

* 'Legislature'-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'ব্যবস্থাপক সভা' ও 'আইনসভা' দুইই করা হয়।

** "The innate tendency of the assembly to become hateful, tyrannical and corrupt needs to be checked by the co-existence of another house."

সমাজসেবা প্রভৃতিতে খ্যাতিসম্পন্ন বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মনোনয়নের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) অধিকাংশ সময় উচ্চতর পরিষদে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সংখ্যায় অধিক থাকেন বলিয়া ঐ পরিষদ নিম্নতর পরিষদের উৎসাহী অথচ অনভিজ্ঞ সভাগণকে সংযত রাখিতে পারেন। অপরদিকে প্রথম পরিষদও উচ্চতর পরিষদের রক্ষণশীলতা কতকাংশে দূর করিতে পারে।

৪। দুইটি পরিষদ পরস্পরকে সংযত রাখিতে পারে

(ঙ) বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিপুলভাবে বাড়িয়া যাওয়ায় একটি পরিষদের পক্ষে আইনসভার সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয় বলিয়াই অনেকে মনে করেন। সুতরাং প্রয়োজন হইল দুইটি পরিষদের।

৫। বর্তমানে একটি-মাত্র পরিষদ পর্যাপ্ত নহে

(চ) দ্বিতীয় পরিষদেও প্রত্যেক বিল সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা হইতে জনসাধারণ রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষালাভ করে। একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে হয়ত বিতর্ক ও আলোচনায় ত্রুটি থাকিয়া যাইত; ফলে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষাও ত্রুটিপূর্ণ হইত।

৬। রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে

(ছ) অনেকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভায় দুইটি পরিষদ সম্পূর্ণ অপরিহার্য। যুক্তরাষ্ট্রে দুই প্রকার স্বার্থের সমন্বয়সাধন করা হয়—যথা, জাতীয় স্বার্থ ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বার্থ। এই দুই পৃথক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের জন্য দুইটি পরিষদের প্রয়োজন। যেমন, ভারতবাসী হিসাবে আমাদিগকে সমগ্র ভারতের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে; আবার পশ্চিমবংগবাসীদের পশ্চিমবংগের স্বার্থের দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। সুতরাং আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার একটি পরিষদে থাকিবে সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধিবর্গ, আর অপরটিতে থাকিবে পশ্চিমবংগ বিহার উড়িষ্যা আসাম প্রভৃতি সকল রাজ্যের প্রতিনিধি।

৭। ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য

দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভার বিরোধিতা করিয়া ফরাসী লেখক আবে সিয়ে (Abbes Sieyes) বলিয়াছেন, উচ্চতর পরিষদ যদি নিম্নতর পরিষদের সহিত একমত হয় তবে উহা অনাবশ্যক; আর যদি একমত না হয় তবে উহা অনিষ্টকর। ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারা যায়, উচ্চতর পরিষদ যদি নিম্নতর পরিষদকে সমর্থন করিতেই থাকে তবে দুইটি পরিষদ বজায় রাখিয়া অনর্থক জটিলতা সৃষ্টি ও সময় নষ্ট করিবার কোন হেতু নাই। এ-ক্ষেত্রে উচ্চতর পরিষদের বিলোপসাধনই করা উচিত। অপরদিকে যদি উচ্চতর পরিষদ নিম্নতর পরিষদের কার্যে বাধার সৃষ্টিই করিতে থাকে তবে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় বলিয়া এই ব্যবস্থা অনিষ্টকর। সুতরাং আইনসভা একটিমাত্র পরিষদসম্পন্নই হইবে। বস্তুত, উচ্চতর পরিষদ সকল সময় বিবেচনার সহিত কার্য করে না।

বিপক্ষে যুক্তি:

১। দ্বিতীয় পরিষদকে অনাবশ্যক মনে করা হয়

ইহা একরূপ ধরিয়া লয় যে নিম্নতর পরিষদের বিরোধিতা করাই ইহার কর্তব্য। অর্থাৎ, উহার পক্ষে বিরোধিতা করা একপ্রকার রীতিতে পরিণত হয়। ফলে অনেক সময় ইহা কাম্য আইন প্রণয়নেও বাধা প্রদান করিয়া দেশের অনিষ্টসাধন করে।

২। ইহা অনিষ্টকরও হইতে পারে

উপরন্তু, দুইটি পরিষদ থাকিলে অতিরিক্ত অর্থব্যয় হয়। উচ্চতর পরিষদ যদি অনাবশ্যক এবং অকাম্যই হয় তবে এই অর্থব্যয়কে অপচয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

৩। ইহা অপচয়মূলক

উচ্চতর পরিষদ সাধারণত ধনী, রক্ষণশীল ও মনোনীত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়। এইরূপ গঠন অগণতান্ত্রিক বলিয়াও দ্বিপরিষদ-সম্পন্ন আইনসভার বিরোধিতা করা হয়। বলা হয়, গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভা মাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গকে লইয়াই গঠিত হইবে, ইহাতে মনোনয়ন বা ইংলণ্ডের লর্ড সভার মত উত্তরাধিকার সূত্রে সভ্যপদপ্রাপ্তির কোন ব্যবস্থাই থাকিবে না।

৪। দ্বিতীয় পরিষদ অগণতান্ত্রিক

আর একটি কারণে দ্বিতীয় পরিষদকে অগণতান্ত্রিক মনে করা হয়। গণতন্ত্র হইল জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা। ব্যবস্থা বিভাগ জনমতের অনুকূলে আইন পাস করিবে এবং শাসন বিভাগ তাহা বলবৎ করিবে—ইহাই এই শাসন-ব্যবস্থার মূলকথা। কিন্তু দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভায় কোন্‌টি ঠিক জনমত তাহা নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ, দেখা যায় যে দুইটি পরিষদ পরস্পরের বিরোধী মত প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং বলা হয়, আইনসভা জনমতের প্রতিফলন-ক্ষেত্র বলিয়া ইহা ঐক্যবদ্ধই হইবে, দুইটি পরস্পরবিরোধী পরিষদে বিভক্ত হইবে না।

আরও বলা হয়, আইনসভা দ্বিপরিষদসম্পন্ন হইলে ব্যবস্থা বিভাগের দায়িত্ব বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং দুইটি পরিষদের প্রত্যেকটি পরস্পরের উপর দোষ চাপাইয়া অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিবে।

৫। ইহা ব্যবস্থা বিভাগের দায়িত্ব বিভক্ত করে

অন্যতম আধুনিক লেখক ল্যাস্কি বলেন, একপরিষদসম্পন্ন আইনসভাই বর্তমান যুগের পক্ষে প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা। বর্তমানে বিশেষ বিচারবিবেচনা না করিয়া কোন আইন পাস করা হয় না। প্রথম পরিষদের পর দ্বিতীয় পরিষদ এই আলোচনারই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র। ফলে অনর্থক সময় নষ্ট হয় এবং প্রয়োজনীয় আইন পাসে অযথা বিলম্ব ঘটে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভায় দ্বিতীয় পরিষদের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করা হয়। ল্যাস্কির মতে, ইহাও ভুল। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেই ঐ স্বার্থ-সংরক্ষণের যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সংখ্যায় তিনটি: (ক) শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বণ্টন, (খ) লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র, এবং (গ) ক্ষমতা বণ্টন লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ

৬। যুক্তরাষ্ট্রেও ইহার প্রয়োজন নাই

মীমাংসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত।* আঞ্চলিক স্বার্থসংরক্ষণের জন্য এগুলিই যথেষ্ট। ইহার উপর দ্বিতীয় পরিষদ সম্পূর্ণ অহেতুক।

উপরি-উক্ত কারণসমূহের জন্য দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভার প্রতি আকর্ষণ অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে। তবুও অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইহার বিলোপ-সাধন অপেক্ষা সংস্কারেরই পক্ষপাতী। ইঁহারা মনে করেন, প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হইলেই দ্বিতীয় পরিষদের ত্রুটিগুলি দূর হইবে এবং তখন ইহা সংশোধনকারী পরিষদ (revising chamber) হিসাবে জনকল্যাণে নিয়োজিত থাকিতে পারিবে।

উপসংহার

শাসন বিভাগ (The Executive): সরকারের যে অংশ আইন বলবৎকরণের কার্যে নিযুক্ত তাহাকে শাসন বিভাগ বলা হয়। ব্যাপক অর্থে প্রধান কর্মকর্তা (Chief Executive) হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ পুলিস কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সংকীর্ণ অর্থে মাত্র প্রধান কর্মকর্তা ও কর্মসচিবগণকে লইয়া শাসন বিভাগ গঠিত এইরূপ মনে করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাধারণত এই সংকীর্ণ অর্থেই 'শাসন বিভাগ' কথাটি ব্যবহৃত হয়।

প্রধান কর্মকর্তা ইংলণ্ডের মত উত্তরাধিকার সূত্রে পদলাভ করিতে পারেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যসমূহের রাজ্যপালগণের ন্যায় জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইতে পারেন, ভারতের রাষ্ট্রপতির ন্যায় আইনসভার সভ্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইতে পারেন, অথবা কানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের গভর্নর-জেনারেলের ন্যায় মনোনীত হইতে পারেন।

প্রধান কর্মকর্তার নিয়োগ

শাসন বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Executive): রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধির সংগে সংগে শাসন বিভাগের কার্যও বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমান জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ যে-সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

শাসন বিভাগ নানা প্রকার কার্য সম্পাদন করে

(ক) আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা: আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা বলিতে দেশের অভ্যন্তরে শান্তিশৃংখলা রক্ষা, নিম্নতন কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ, সরকারী কর্মচারীদের জন্য নিয়মকানুন প্রণয়ন, জরুরী অবস্থায় অস্থায়ী আইন (ordinance) পাস প্রভৃতি কার্যাবলীকে বুঝায়। শাসন বিভাগের যে দপ্তরের উপর আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনার ভার থাকে তাহাকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর (Home Department) বলা হয়।

(খ) পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্য: পররাষ্ট্রসংক্রান্ত ব্যাপার বলিতে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন, এই সকল রাষ্ট্রে দূত প্রেরণ, ইহাদের প্রেরিত

* ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

রাষ্ট্রদূত গ্রহণ, রাষ্ট্রনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি বুঝায়। বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি এবং অর্থনৈতিক পরস্পর নির্ভরশীলতার জন্য বর্তমান জগতে শাসন বিভাগের এই পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(গ) যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা : অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা বিভাগের সম্মতি লইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলেও যুদ্ধ পরিচালনা প্রধানত শাসন বিভাগই করিয়া থাকে। শাসন বিভাগের যিনি প্রধান তিনিই সাধারণত সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (Supreme Commander of the Armed Forces) হইয়া থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। শাসন বিভাগের যে-দপ্তরের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী ও যুদ্ধবিষয়ক ব্যাপার পরিচালনা করা হয় তাহাকে প্রতিরক্ষা দপ্তর (Defence Department) বলে।

(ঘ) অর্থসংক্রান্ত কার্য : সরকারী কর্তব্য সম্পাদনের জন্য করধার্যের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করা হয়। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত করধার্য ও অর্থব্যয় করা যায় না সত্য, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া থাকে শাসন বিভাগ। যে-দপ্তরের মাধ্যমে এই কার্য করা হইয়া থাকে তাহাকে অর্থদপ্তর (Finance Department) বা রাজস্ব দপ্তর (Treasury) বলে। কর সংগ্রহ বা ব্যয় করা ছাড়াও এই দপ্তর হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করে।

(ঙ) আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য : শাসন বিভাগের আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্যও কিছু কিছু রহিয়াছে। শাসন বিভাগই আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করে এবং উহার অধিবেশন স্থগিত রাখে। আবার প্রধান কর্মকর্তার সম্মতি না পাইলে কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। আইনসভা অধিবেশনে না থাকিলে শাসন বিভাগ প্রয়োজনবোধে জরুরী অস্থায়ী আইনও পাস করিতে পারে। বর্তমানে আইনসভা-প্রণীত মূল আইনের ফাঁকগুলি পূরণ করিবার জন্য শাসন বিভাগ নিয়মিতভাবে উপ-আইন (by-law) প্রণয়ন করিয়া থাকে। রাষ্ট্রের কার্যবৃদ্ধির ফলে আইনসভা আইন প্রণয়নের ভার শাসন বিভাগের উপর উত্তরোত্তর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে।

(চ) বিচারসংক্রান্ত কার্য : দণ্ডিত অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন প্রভৃতির দ্বারা শাসন বিভাগ বিচারসংক্রান্ত কার্যও সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহা ছাড়াও শাসন বিভাগ কোন কোন ক্ষেত্রে করধার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আপত্তির বিচার করে, অন্যায়ভাবে পদচ্যুত করা হইলে আবেদনের বিচার করে, ইত্যাদি।

(ছ) অন্যান্য কার্য : বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্য বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় শাসন বিভাগকে অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। শিক্ষা বিভাগ ও ডাক বিভাগ পরিচালনা, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ প্রভৃতি মামুলী কর্তব্যের উপরেও রাষ্ট্র আজ নানাবিধ সেবামূলক কার্য সম্পাদন করে। ফলে শাসন বিভাগকেও এই

সকল কার্য লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে হয়। আজিকার দিনের সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ উত্তরোত্তর জনকল্যাণের সহিত জড়িত হইয়া পড়িতেছে।

বিচার বিভাগ (The Judiciary): সরকারের তৃতীয় অংগ বিচার বিভাগ। ইহার প্রধান কার্য ন্যায়বিচার করা। সমাজ-কল্যাণ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ বিশেষভাবে নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। লর্ড ব্রাইস যথার্থই বলিয়াছেন যে বিচার বিভাগের কর্মকুশলতা অপেক্ষা সরকারের যোগ্যতা বিচারের অধিকতর উপযোগী মাপকাঠি আর নাই।

প্রাচীনকালে শাসনকার্য ও বিচারকার্যের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। উভয় কার্যই সম্পাদন করিতেন স্বয়ং রাজা বা রাজকর্মচারী। এই ব্যবস্থাকে 'স্বৈরাচারের নামান্তর' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাই বর্তমান সময়ে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি সম্পূর্ণ গৃহীত না হইলেও বিচার বিভাগের যে স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন এ-সম্বন্ধে সকলেরই একমত। ফলে অধিকাংশ দেশে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে বা করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

বিচার বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Judiciary): বিচার বিভাগের প্রধান কার্য প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা করা এবং দণ্ডবিধান করা। কিন্তু প্রচলিত আইনের সাহায্যে সকল সময় বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করা যায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে বিচারকগণ ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়বোধ অনুসারে বিচার করিয়া থাকেন। এইরূপ বিচারের রায় ভবিষ্যৎ বিচারকার্যে আইন (case law) হিসাবে গণ্য করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিচারকগণও শুধু আইনের ব্যাখ্যা ও দণ্ডবিধানই করেন না, আইনের সৃষ্টিও করেন।

বিচার বিভাগের কার্যাবলী বিভিন্ন ধরনের

বিচার বিভাগ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের অভিভাবক। সংবিধানের ব্যাখ্যা দ্বারা কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের স্বরূপ বজায় রাখে। আমাদের দেশের সুপ্রীম কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধিকরণের উপর এই ভার ন্যস্ত।

বিচার বিভাগ শাসন বিভাগকে পরামর্শদানও করে। আমাদের সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে পরামর্শদানের ব্যবস্থা আছে।

বিচার বিভাগের আরও কতকগুলি কার্য আছে যাহা ঠিক বিচারকার্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ, মৃত ব্যক্তির বিচারাধীন সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা, লাইসেন্স প্রদান প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক সময় আবার ইহা দুষ্কর্ম বা অন্যায় রহিত করিবার জন্য নির্দেশ বা লেখ (writs) জারি করে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of the Judiciary): পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচার এবং ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিচার বিভাগের

স্বাধীনতা অপরিহার্য। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এই কয়টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে :

(ক) বিচারকগণের নিয়োগ-পদ্ধতি : বর্তমানে শাসন বিভাগই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে নিয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত যে, সাধারণভাবে উর্ধ্বতন বিচারপতিগণের সহিত পরামর্শ করিয়াই নিয়োগ করিতে হইবে। নচেৎ, বিচারকগণ শাসন বিভাগের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িবেন। ভারতে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণের নিয়োগের ভার রাষ্ট্রপতির হস্তে থাকিলেও নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে এরূপ পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়।

(খ) বিচারকগণের কার্যকাল ও পদচ্যুতি : বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য বিচারকগণের কার্যকাল তাঁহাদের নিয়োগ-পদ্ধতির ন্যায়ই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রে বিচারকগণকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয় এবং অক্ষমতা বা দুষ্কর্ম প্রমাণিত না হইলে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা যায় না।

(গ) বিচারকগণের বেতন ও ভাতা : বিচারকগণকে উপযুক্ত বেতন ও ভাতা না দিলে তাঁহারা তাঁহাদের পদের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন না। দেখা গিয়াছে, স্বল্প বেতনভোগী বিচারপতিগণ উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি দুষ্কর্মের জন্য উন্মুখ থাকেন।

(ঘ) বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রিকরণ : পরিশেষে, বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র না করিলে স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থার সৃষ্টি করা যায় না।

সংক্ষিপ্তসার

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি : সরকারের কার্যাবলী প্রধানত তিন শ্রেণীর—(ক) আইন প্রণয়ন, (খ) শাসনকার্য পরিচালনা, এবং (গ) বিচারের ব্যবস্থা। এই তিন প্রকার কার্য সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক সরকারের তিনটি করিয়া বিভাগ থাকে—(ক) ব্যবস্থা বিভাগ, (খ) শাসন বিভাগ, এবং (গ) বিচার বিভাগ। যে নীতি অনুসারে এই তিন শ্রেণীর কার্য এই তিন বিভাগ দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদিত হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হয় তাহাকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি বলে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির তিন প্রকার অর্থ করা হয় : ১। সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগের কার্য পরিচালনা করিবে না; ২। একই ব্যক্তি সরকারের একাধিক বিভাগের সহিত জড়িত থাকিবে না; ৩। এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ বা উহার কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ সম্বন্ধে ধারণা এ্যারিস্টটলের সময় হইতে চলিয়া আসিলেও ইহাকে মতবাদে পরিণত করেন মন্টেস্কু। মন্টেস্কুর মতে, স্বাধীনতা-সংরক্ষণের জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ অপরিহার্য। ইহা ছাড়াও ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের ফলে সুশাসন সম্ভব হয় বলিয়া দাবি করা হয়।

সমালোচনা : নানাদিক হইতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, বলা হইয়াছে যে সরকারের কার্যাবলী তিন শ্রেণীর নহে বলিয়া সরকারও তিনটি বিভাগ লইয়া গঠিত নয়।

দ্বিতীয়ত, দেখানো হইয়াছে যে উক্ত তিনটি অর্থের কোনটিতেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ বাস্তব ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে কার্যকর হইতে পারে না।

তৃতীয়ত, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের ফলে শাসনকার্যে দক্ষতার অভাব ঘটে।

চতুর্থত, ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ স্বাধীনতার মূলমন্ত্রও নহে।

এই সকল কারণে বর্তমানে একমাত্র বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ছাড়া আর কোনপ্রকারে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের দাবি করা হয় না।

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ: সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ব্যবস্থা বিভাগই অধিকতর ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পন্ন।

ব্যবস্থা বিভাগের কার্যাবলী: ব্যবস্থা বিভাগ পাঁচ প্রকারের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে: ১। আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য, ২। অর্থসংক্রান্ত কার্য, ৩। শাসনসংক্রান্ত কার্য, ৪। বিচারসংক্রান্ত কার্য, এবং ৫। শাসনতন্ত্রসংক্রান্ত কার্য।

ব্যবস্থা বিভাগের গঠন: ব্যবস্থা বিভাগ একটি না দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইবে সে-বিষয়ে বিশেষ মতবিরোধ আছে। দুইটি পরিষদের সপক্ষে বলা হয় যে—১। ইহাতে সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভব হয়, ২। ইহা একটিমাত্র পরিষদের স্বৈরাচারিতা রোধ করে, ৩। ইহাতে বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা সম্ভব, ৪। বর্তমানের কর্মবহুল রাষ্ট্রে একটিমাত্র পরিষদই যথেষ্ট নয়, ৫। দুইটি পরিষদ পরস্পরকে সংযত রাখিতে পারে, ৬। ইহাতে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে, ৭। ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য।

অপরদিকে দুইটি পরিষদের বিপক্ষে বলা হয় যে—১। দ্বিতীয় পরিষদ অনাবশ্যক; ২। ইহা অনিষ্টকরও হইতে পারে, ৩। ইহা অপচয়মূলক, ৪। ইহা অগণতান্ত্রিক, ৫। ইহা ব্যবস্থা বিভাগের দায়িত্ব বিভক্ত করে, ৬। যুক্তরাষ্ট্রেও ইহা অপ্রয়োজনীয়।

শাসন বিভাগ: শাসন বিভাগ নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পাদন করে:

১। আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা, ২। পররাষ্ট্রসংক্রান্ত কার্য, ৩। যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা, ৪। অর্থ-সংক্রান্ত কার্য, ৫। আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্য, ৬। বিচারসংক্রান্ত কার্য, ৭। অন্যান্য কার্য।

বিচার বিভাগ: বিচার বিভাগ বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে—১। আইনের ব্যাখ্যা, ২। আইনের সৃষ্টি, ৩। শাসন বিভাগকে পরামর্শদান, ৪। শাসনতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখা, ৫। কিছু কিছু শাসনসংক্রান্ত কার্য।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যথা, ১। বিচারকগণের নিয়োগ-পদ্ধতি, ২। বিচারকগণের কার্যকাল ও পদচ্যুতি, ৩। বিচারকগণের বেতন ও ভাতা, ৪। ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকিকরণ।

প্রশ্নোত্তর

1. **Discuss the Theory of Separation of Powers.** (C. U. 1951)

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতির আলোচনা কর।

[ইংগিত: সংক্ষেপে নীতির ব্যাখ্যা ও সমালোচনা উভয়ই করিতে হইবে।... (৫৫, ৫০-৫৯ পৃষ্ঠা)]

2. **Explain the Theory of Separation of Powers.** (P. U. 1964)
How far is a strict separation of powers practicable and desirable? (P. U. 1962)

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ মতবাদটি ব্যাখ্যা কর। পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ কতদূর সম্ভব বা কাম্য?

[৫৫ এবং ৫৭-৫৯ পৃষ্ঠা]

3. **What is a Bicameral Legislature? Discuss its merits and demerits.** (C. U. 1962; B. U. 1961; En. 1962)

দ্বিপরিষদসম্পন্ন আইনসভা কাহাকে বলে? ইহার গুণাগুণ আলোচনা কর। [৬০-৬৪ পৃষ্ঠা]

4. Which would you prefer, a unicameral or a bicameral legislature? Give reasons for your preference. (P. U. 1961)

একপরিষদসম্পন্ন না দ্বিপরিষদসম্পন্ন কোন্ প্রকার আইনসভা তুমি সমর্থন কর? তোমার সমর্থনের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [৬০-৬৪ পৃষ্ঠা]

5. Discuss the functions of the Executive in modern States.

আধুনিক রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের কার্যাবলী বর্ণনা কর। [৬৪-৬৬ পৃষ্ঠা]

6. Describe the functions of the Judiciary and the factors upon which the independence of the Judiciary depends in modern States.

আধুনিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের কার্যাবলী এবং যে-সে বিষয়ের উপর ইহার স্বাধীনতা নির্ভর করে তাহা বর্ণনা কর। [৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা]

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতা

(Nation, Nationalism and Internationalism)

আধুনিক নাগরিক কেবলমাত্র রাষ্ট্রের সমস্যা লইয়া বিব্রত থাকিতে পারে না, তাহাকে বিশ্বের সমস্যা লইয়াও মাথা ঘামাইতে হয়। এই কারণে তাহার পক্ষে যে-সকল শক্তি বিশ্বশান্তির, বিশ্ব-সমবায়ের পরিপন্থী তাহাদের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এইরূপ অন্যতম সক্রিয় শক্তি হইল জাতীয়তাবাদ (Nationalism)। সুতরাং নাগরিকের শাস্ত্র পৌরবিজ্ঞানে জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা একরূপ অপরিহার্য। কিন্তু জাতি (Nation) সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না করিয়া জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি অনুধাবন করা যায় না। সুতরাং আলোচনা 'জাতি' হইতেই সুরু করা উচিত। আমরা তাহাই করিব।

জাতীয়তাবাদের গুরুত্ব

জাতীয় জনসমাজ ও জাতি (Nationality and Nation) : অনেক লেখক 'জাতীয় জনসমাজ' (Nationality) এবং 'জাতি'র (Nation) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, জাতীয় জনসমাজ হইল এমন একটি জনসমষ্টি যাহারা ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস-সংস্কৃতি, আচারব্যবহার প্রভৃতিতে পরস্পরের সহিত ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ, কিন্তু অনুরূপভাবে ঐক্যবদ্ধ অপরাপর জনসমষ্টি হইতে স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন। অতএব, জাতীয় জনসমাজ হইল এমন এক জনসমষ্টি যাহারা নিজেদের মধ্যে ঐক্য, এবং ঐ কারণেই অন্যান্য মনুষ্য-সম্প্রদায় হইতে স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে। যখন এইরূপ জনসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয় তখন তাহারা জাতি বলিয়া অভিহিত হয়। লর্ড ব্রাইসকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, "জাতি হইল এইরূপ এক জাতীয় জনসমাজ যাহা রাষ্ট্রনৈতিক-ভাবে সংঘবদ্ধ, এবং যাহা হয় স্বাধীন হইয়াছে না-হয় স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে।" অতএব, এই মতানুসারে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য বা রাষ্ট্রনৈতিক

জাতীয় জনসমাজ

জাতি

সংগঠনই জাতীয় জনসমাজ ও জাতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। অন্যভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যসমন্বিত জাতীয় সমাজই 'জাতি', এবং বিপরীত পক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যরহিত জাতিই 'জাতীয় জনসমাজ'।

জাতীয় জনসমাজ ও জাতির মধ্যে পার্থক্য অনেকে স্বীকার করেন না

অন্য অনেক লেখক অবশ্য এইভাবে জাতীয় জনসমাজ ও জাতির পক্ষে পার্থক্য নির্দেশের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা শব্দ দুইটি সমার্থকভাবে ব্যবহারেরই পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা হইল পরিমাণগত ব্যাপার। কোন জনসমাজ যখনই নিজেদের মধ্যে ঐক্য অনুভব করে তখন তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত ইহুদিরা যখন নিজেদের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিল, বা ভারতীয় মুসলমানরা যখন অনুরূপ ভাবিতে শিখিল—তখন যে তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইয়াছিল বলিয়াই তাহারা শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় জনসমাজকে জাতি হইতে পৃথক করিয়া দেখা যায় না, কারণ জাতীয় জনসমাজ কখন ঠিক জাতিতে পরিণত হয় তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব। যাহা হউক, কার্যক্ষেত্রের দিক দিয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই জাতির লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই কারণে বর্তমান বিশ্বসংঘকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং ভূতপূর্ব বিশ্বসংঘেরও নাম ছিল জাতিসংঘ (League of Nations)।

উপসংহার: স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই জাতির লক্ষণ

জাতীয় জনসমাজের উপাদান (Elements of Nationality): দেখা গিয়াছে, জনসমাজের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হইলে প্রথমে উহা জাতীয় জনসমাজে এবং পরে জাতিতে পরিণত হয়। ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জনসমষ্টির মধ্যে ঐক্যবোধ গড়িয়া উঠে নানা কারণে—যথা, একই স্থানে বসবাস, একই গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত বলিয়া বিশ্বাস, অভিন্ন ভাষা ধর্ম সাহিত্য সংস্কৃতি ও ইতিহাস, অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সমচেতনা, ইত্যাদি।

ইহাদের মধ্যে কোনটিই অবশ্য অপরিহার্য নয়। এক স্থানে বসবাস না করা সত্ত্বেও জনসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে দেখা গিয়াছে। প্যালেষ্টাইনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে ইহুদিরা সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়াছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহুদি জনসমাজ গঠিত হইয়াছিল। আবার এইভাবে উদ্ভূত না হইলেও জনসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। ইংরাজ বা মার্কিনদের জাতি বলিতে কেহই আপত্তি করিবেন না। কিন্তু উভয়েই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উদ্ভূত। অভিন্ন ভাষা ধর্ম সাহিত্য সংস্কৃতি ও ইতিহাসকেও অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা চারিটি স্বতন্ত্র ভাষাভাষী হইয়াও এক জনসমাজ*;

* ভাষা চারিটি হইল জার্মান, ফরাসী, ইতালীয় এবং রোমান্স (Romansch)।

বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতবাসীও এক জনসমাজ। ধর্মের পার্থক্য সত্ত্বেও জনসমাজ গড়িয়া উঠে। চীন ও সোবিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন ধর্ম জনসমাজ গঠনের অন্তরায় হয় নাই।

এইরূপে জাতীয় জনসমাজ গঠনের জন্য কোন উপাদান অপরিহার্য না হইলেও কয়েকটি বর্তমান থাকা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে একমাত্র ধর্মগত ঐক্যের ভিত্তিতে প্রথমে মুসলমান জাতীয় জনসমাজ এবং পরে মুসলমান জাতি গঠিত হইয়া পাকিস্তানের সৃষ্টি করিয়াছিল।

আসল কথা হইল, জাতীয় জনসমাজের যে-ঐক্য তাহা প্রধানত চিন্তা বা ভাবগত। কোন জনসমষ্টি যদি ভাবে যে তাহারা একটি পৃথক জনসমাজ তবেই তাহারা জাতীয় জনসমাজে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের মুসলমানেরা যেদিন ভাবিতে শিখিল যে তাহারা অন্যান্য ভারতবাসী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক সেইদিনই তাহারা জাতীয় জনসমাজে পরিণত হইল। তাহার পূর্বে হিন্দু মুসলমান শিখ জৈন খ্রীষ্টান—সকলেই ছিল ভারতীয় জনসমাজের অন্তর্গত।

জাতি বা জনসমাজের ঐক্য প্রধানত ভাবগত

এইভাবে জাতীয় জনসমাজ গঠিত হইলে ক্রমশই তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত হইতে থাকে। সেই অবস্থায় জাতীয় জনসমাজকে 'জাতি' (Nation) আখ্যা দেওয়া হয়।

জাতীয়তাবাদ (Nationalism): জাতীয় জনসমাজ বা জাতির মধ্যে যে ঐক্যবোধ (spirit) বর্তমান থাকে তাহাকে জাতীয়তাবাদ (Nationalism) বলিয়া অভিহিত করা হয়। জাতীয়তাবাদ স্বাতন্ত্র্যবোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। জাতি ভাবিতে শিখে, তাহারা যখন পৃথিবীর মনুষ্য-সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র তখন তাহাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রও থাকা প্রয়োজন। সুতরাং তাহারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করিতে থাকে। ইহাকে 'আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি' বা অধিকার (right of self-determination) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ভারতের মুসলমানেরা যখন ভাবিল যে তাহারা এক স্বতন্ত্র জাতীয় জনসমাজ, তখন তাহারা পাকিস্তান গঠনের দাবি করিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর স্বতন্ত্র জাতির রূপ সুস্পষ্ট হইল। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হইলেও জাতি বিলুপ্ত হয় না বলিয়া জাতীয়তাবাদেরও অবসান ঘটে না। তখন জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ পরিগ্রহ করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের পথেও অগ্রসর হইতে পারে। এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইতেছে।

জাতির মধ্যে যে-ভাব বর্তমান থাকে তাহাকে জাতীয়তাবাদ বলে

জাতীয় জনসমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

জাতীয়তাবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Nationalism and Right of Self-determination): বলা হইয়াছে, নবগঠিত জাতীয় জনসমাজ বা জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করিতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এই দাবিকে মানিয়া লওয়া হয়, অনেক সময় ইহাকে অস্বীকার করা হয়।

অস্বীকার করার ফল অবশ্য সকল সময় শুভ হয় না; সকল সময় আবার এই দাবিকে মানিয়া লওয়াও যায় না। এই কারণে দেখা প্রয়োজন, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কতদূর স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একটি পুরাতন ধারণা। তবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই ইহা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, জাতীয় জনসমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করিয়া লওয়াই উচিত। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন, "জাতীয় জনসমাজের সীমারেখা রাষ্ট্রের সীমারেখার সহিত এক হওয়া প্রয়োজন"—অর্থাৎ, প্রত্যেক রাষ্ট্রে মাত্র একটি করিয়া জাতি বাস করিবে। ইহাকে একজাতীয় রাষ্ট্রের (Mono-national State) আদর্শ বলা হয়।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সপক্ষে যুক্তি

মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন এই একজাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শের মধ্যে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান ও বিশ্বশান্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সকল ক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া হইলে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, সকল জাতিরই দাবি পূর্ণ হইবে। ফলে পৃথিবীতে আর যুদ্ধ বাধিবে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে অনেক নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া উইলসনের এই ধারণাকে রূপ দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেল, অনেক নূতন রাষ্ট্র-গঠনের পরও যুদ্ধের আশংকা বিলুপ্ত হইল না। ইহার কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নূতন রাষ্ট্রের সীমারেখা জাতির সীমারেখার সহিত এক হইল না। অনেক পুরাতন ও নবগঠিত রাষ্ট্রে—যেমন, জার্মেনী ও চেকোশ্লোভাকিয়ায়—অন্যান্য জাতির অংশবিশেষ রহিয়া গেল। ফলে আবার উঠিল আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি।

বিপক্ষে যুক্তি

বস্তুত, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারের দ্বারা সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান বা শান্তিপ্রতিষ্ঠা করা—কোনটিই সম্ভব নয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে ভারত দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হয় নাই; শান্তিভংগের সম্ভাবনাও দূরীভূত হয় নাই। বরং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষের আশংকা সর্বদাই বর্তমান রহিয়াছে।

ভারতের উদাহরণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরই পর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লইয়া আলোচনাকালে লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন, ইহা এমন একটি অস্ত্র যাহার দুই দিকে ধার। ইহার ফলে জনগোষ্ঠী যেমন নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তেমনি অপরাপর জনগোষ্ঠী হইতে পৃথক হইবার প্রচেষ্টাও করে। এই পৃথক হইবার প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি নাই। কার্জনের এই উক্তির সারবত্তা শীঘ্রই প্রমাণিত হইল। নবসৃষ্ট চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে জার্মান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু দল আবার পৃথক হইবার দাবি করিতে লাগিল। ভারত দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর ভারতে অনেক মুসলমান এবং পাকিস্তানে কিছু হিন্দু

আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির শেষ নাই

রহিয়া গিয়াছে। তাহারা যদি আবার পৃথক হইবার দাবি করে এবং এই দাবি যদি প্রবল হয়, তবে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রকে বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে। সুতরাং আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির শেষ বলিয়া কিছুই নাই।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক লর্ড এ্যাক্টন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে 'ইতিহাসের পশ্চাৎগতি'র লক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি পৃথিবীর অন্যান্য মনুষ্য-সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইবার দাবি মাত্র। ইহা আদিম অসভ্য যুগের সহিত বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ। আদিম যুগে এক জনগোষ্ঠী যেমন অন্য জনগোষ্ঠীর সহিত মিলিতে চাহিত না, এই সভ্য যুগেও যদি মানুষ তাহাই করে তবে বুঝিতে হইবে যে তাহারা পিছনে হাঁটিতেছে। সুতরাং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি পরিত্যাগ করা উচিত।

তবে রাষ্ট্রনৈতিক কারণে এই দাবিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইতে পারে

কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বর্তমানে শুধু মতবাদই নয়, ইহা একটি সক্রিয় শক্তি। সুতরাং শুধু যুক্তি দ্বারা ইহাকে খণ্ডন করিলেই চলিবে না, কার্যক্ষেত্রে খণ্ডনের ফলাফলও বিচার করিতে হইবে। রাষ্ট্রের জনসমষ্টির এক বৃহৎ অংশের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি যদি প্রবল হয় তখন উহাকে মানিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইতে পারে। কারণ, এই দাবিকে অস্বীকার করিলে গৃহযুদ্ধের ফলে রাষ্ট্রেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা (Nationalism and Internationalism): জাতীয়তাবাদ মূর্ত হইয়া উঠে রাষ্ট্রনৈতিক আকাংক্ষার মধ্যে। পরাধীন থাকাকালীন জাতীয় জনসমাজ স্বাধীন হইবার আকাংক্ষা প্রকাশ করে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি জানায়। তারপর স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইলে জাতীয়তাবাদ প্রথমে স্বাদেশিকতার (patriotism) রূপ ধারণ করে। স্বাদেশিকতা বলিতে বুঝায় স্বদেশের প্রতি ভক্তি এবং স্বদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ। স্বদেশ ও স্বজনের প্রতি অনুরাগের ফলে ঐ জাতিভুক্ত ব্যক্তিগণ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নিজেদের সব কিছুকেই শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য জাতির সব কিছুকেই

বিকৃত জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগির সৃষ্টি করে

হেয় বলিয়া জ্ঞান করিতে থাকে। তাহারা বিশ্বাস করিতে থাকে যে তাহাদের জাতির মত জাতি নাই, ভাষার মত ভাষা নাই, সাহিত্যের মত সাহিত্য নাই, সংস্কৃতির মত সংস্কৃতি নাই। ইহার ফলে জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিভংগি সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইয়া আসে। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি তাহাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে যে অন্যান্য জাতির উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার তাহাদের আছে। ফলে তাহারা সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে অগ্রসর হয়। হিটলারের অধীনে জার্মান জাতি এইরূপই করিয়াছিল।

জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে ধারণার আধুনিক স্রষ্টা ইতালীয় স্বদেশপ্রেমিক ম্যাট্‌সিনি (Mazzini) কিন্তু জাতীয়তাবাদকে এই প্রকার বিকৃত রূপে দেখেন নাই। তাঁহার

বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক জাতিরই কোন-না-কোন বিষয়ে বিশেষ প্রতিভা আছে। এই প্রতিভার বিকাশের জন্যই উহার পক্ষে স্বতন্ত্র থাকা প্রয়োজন। স্বতন্ত্র থাকিলেও তাহারা পরস্পরের সহিত বিরোধে লিপ্ত হইবে না; সাম্য স্বাধীনতা শান্তি ও মৈত্রীর পথে পরস্পরের সমবায়ে সমগ্র মানবসমাজের উন্নতিবিধান করিয়া চলিবে।

প্রকৃত জাতীয়তাবাদ কিন্তু উদার নীতি পোষণ করে

সাধারণত ম্যাট্‌সিনির এই আদর্শ স্মরণ করিয়া জাতীয়তাবাদীরা পথ চলে না। মানবতার কথা ভুলিয়া গিয়া জাতীয় স্বার্থকেই ধ্রুবতারকা গণ্য করিয়া অগ্রসর হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ'। ফলে জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ ধারণ করে এবং দেখা দেয় 'সভ্যতার সংকট'।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ উগ্র রূপ ধারণ করিলে দেখা দেয় সভ্যতার সংকট

সভ্যতার এই সংকট দূর করিবার জন্য শুধু ম্যাট্‌সিনি নন, যুগে যুগে দার্শনিকগণ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগি প্রসারের প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বারবার বলিয়াছেন যে, প্রকৃত জাতীয়তাবাদী মানবতারই পূজা করিবেন। ব্যক্তি যেমন রাষ্ট্রের মধ্যেই নিজেকে বিকশিত করিতে পারে, রাষ্ট্রের সমৃদ্ধিতেই যেমন ব্যক্তির সমৃদ্ধি—সেইরূপ জাতিও বিশ্ব জাতিসংঘের মধ্য দিয়াই নিজেকে বিকশিত করিতে পারে; মানবসমাজের সমৃদ্ধিতেই জাতির সমৃদ্ধি।

বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি ও যাতায়াতের অকল্পিত সুবিধার ফলে পৃথিবী আজ অতি ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়াছে। এ-পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁচিবার দিন আর নাই। সুতরাং মানবতার পথে, আন্তর্জাতিকতার পথেই চলিতে হইবে। বিপরীত মুখে চলিলে ধ্বংস অনিবার্য।*

আন্তর্জাতিক আদর্শের গুরুত্ব

জাতিসংঘ (League of Nations) : আন্তর্জাতিকতার আদর্শকে রূপ দিবার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা করা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের (League of Nations) প্রতিষ্ঠার দ্বারা। যাঁহারা জাতিসংঘ গঠন করিয়াছিলেন তাঁহাদের আশা ছিল যে, ইহার ফলে সকল রাষ্ট্র মিলিয়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবে। সুতরাং যুদ্ধ বিলুপ্ত হইয়া পৃথিবীতে অপার শান্তি ও অপূর্ব সমৃদ্ধি বিরাজ করিবে। আশাবাদী উদ্যোক্তাদের এই স্বপ্ন কিন্তু সফল হয় নাই—জাতিসংঘ রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা রক্ষা অথবা পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই।

আন্তর্জাতিক আদর্শের রূপদানের প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা : জাতিসংঘ

জাতিসংঘের এই ব্যর্থতার বিভিন্ন কারণ ছিল। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগদান না করায় সংঘ দুর্বল হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়ত, যে ভার্সাই সন্ধির ভিত্তিতে জাতিসংঘের নিয়মাবলী রচনা করা হইয়াছিল তাহা আক্রোশমূলক ছিল। সুতরাং ভার্সাই সন্ধি যাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল

* "Unless we think internationally, we perish."

জাতিসংঘের প্রতি তাহাদের কোন শ্রদ্ধা ছিল না; বরং বিরুদ্ধ ভাবই ছিল। তৃতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংঘে যোগদান না করায় সংঘের বিধানগুলি কার্যকর করার ভার পড়িয়াছিল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের উপর। প্রয়োজনের সময় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে এড়াইয়া গিয়াছিল। চতুর্থত, জাতিসংঘের বলপ্রয়োগের কোন নিজস্ব সংস্থা ছিল না। ফলে উহা সভ্য-রাষ্ট্রসমূহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মত অন্যান্য সভ্য-রাষ্ট্রও তাহাদের দায়িত্ব পালন করে নাই।

জাতিসংঘের ব্যর্থতা

যাহা হউক, পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলেও জাতিসংঘ বিশ্বের বহু কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করিয়াছিল। ইহার মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের মাধ্যমে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি, পৃথিবীব্যাপী সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে ছোটখাট বিরোধের মীমাংসা, ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Naticns): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে জাতিসংঘের উদ্ভব হইয়াছিল; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা বৃহত্তর যুদ্ধের ফলে ঐ একই উদ্দেশ্যে উদ্ভব হইয়াছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের। অর্থাৎ, পৃথিবীকে যুদ্ধবিহীন করিবার উদ্দেশ্যে, পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে জাতিপুঞ্জ সম্মিলিত হইয়াছে।

উদ্ভব: দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রথমাবস্থাতেই কয়েকটি মিত্রশক্তি ঘোষণা করে যে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তিতে গঠন করিতে হইবে। মিত্র-পক্ষীয় শক্তিসমূহের এই ঘোষণা ১৯৪১ সালের 'লণ্ডন ঘোষণা' (London Declaration, 1941) নামে পরিচিত।

ঐ বৎসরই নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকট আটলান্টিক মহাসাগরে পরস্পরের সহিত আলাপ-আলোচনার পর ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট তাঁহাদের বিখ্যাত 'আটলান্টিক সনদ' (Atlantic Charter) ঘোষণা করেন। এই সনদে যুদ্ধোত্তর যুগে অন্যান্যের মধ্যে নিরস্ত্রিকরণ ও স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' কথাটি প্রথম ব্যবহার করা হয় পরবর্তী বৎসরের সূচনায়। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে বিভিন্ন মিত্রশক্তি স্বাক্ষরিত যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা (United Nations Declaration) প্রকাশ করা হয় তাহাতে আটলান্টিক সনদ কার্যকর করিবার নীতি সমর্থন করা হয়।

এ-পর্যন্ত অবশ্য বিশ্বসংঘ প্রতিষ্ঠার কোন উল্লেখ করা হয় নাই, জাতিপুঞ্জ সম্মিলিত হইলেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় নাই। ইহা করা হয় মিত্রশক্তিসমূহের পরবর্তী চুক্তিতে যাহা 'মস্কো ঘোষণা' (Moscow Declaration, 1943) নামে পরিচিত। মস্কো ঘোষণায় বলা হয় যে যুদ্ধ পরিসমাপ্তির অব্যবহিত পরেই শান্তিকামী রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌম সাম্যের

ভিত্তিতে এক আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হইবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা।

পরবর্তী অধ্যায়গুলি এই সংগঠনের রূপদান করে। ইহার জন্য ওয়াশিংটনে ও ইয়াল্টায় মিত্রশক্তিসমূহের দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা চলে। অবশেষে ১৯৪৫ সালের জুন মাসের ২৬ তারিখে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো সম্মেলনে ৫১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ দ্বারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংবিধান গৃহীত হয়, এবং ঐ বৎসরের অক্টোবর মাসের ২৪ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দেশ্য: সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে ভাবীকালকে যুদ্ধের নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিতে জাতিপুঞ্জ দৃঢ়সংকল্প। এই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রসমূহ সম্মিলিত হইয়াছে এবং তাহারা তাহাদের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করিবে। অর্থাৎ, শান্তিভংগকারী রাষ্ট্রকে সকলে সম্মিলিতভাবে শাস্তি দিবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধের মীমাংসা করিবে। সুতরাং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠা। সম্মিলিতভাবে নিরাপত্তা রক্ষার দ্বারা এই শান্তি রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করা হয় বলিয়া ইহাকে 'সামগ্রিক নিরাপত্তা' (collective security) বলে। অতএব, বলিতে পারা যায় যে সামগ্রিক নিরাপত্তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রাথমিক লক্ষ্য। পরোক্ষ ও চরম লক্ষ্য হইল বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠা।

প্রাথমিক ও চরম লক্ষ্য

সংবিধানে আরও কয়েকটি গৌণ উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হইয়াছে—যথা, রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতা দ্বারা বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টা করা; মানুষের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা; জাতিসমূহের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা; এবং পরাধীন জাতিসমূহকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করা।

গৌণ উদ্দেশ্য

যে-সকল গৌণ উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হইল, আপাতদৃষ্টিতে তাহারা গৌণ হইলেও কার্যত তাহারা চরম লক্ষ্য বা বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পর্কিত। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়া বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলির সমাধান না হইলে, পরাধীন জাতি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার না পাইলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব হইবে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনের কল্পনা যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বপ্ন ছিল যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়া, মানুষের অধিকারের প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রদ্ধার মধ্য দিয়া এবং সর্বোপরি সামগ্রিক নিরাপত্তার মধ্য দিয়া এক নূতন পৃথিবী গড়িয়া উঠিবে। এই পৃথিবীতে জাতি থাকিলেও জাতি নাই, রাষ্ট্র

গৌণ উদ্দেশ্যগুলি চরম লক্ষ্যের সহিত সম্পর্কিত

থাকিলেও রাষ্ট্র নাই। সকল জাতি ও রাষ্ট্র সহযোগিতা ও মৈত্রীর বন্ধনে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ; সমগ্র মানবজাতি যেন এক পরিবার। এ এক নূতন পৃথিবী।

গঠন: জার্মেনী ও জাপানের বিরুদ্ধে যে-সকল মিত্রশক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল সদস্য। ভারতবর্ষও অন্যতম মূল সদস্য। স্বাধীনতার পর ভারত মূল সদস্যপদে আসীন রহিল। পাকিস্তান নূতন সদস্য হিসাবে জাতিপুঞ্জে গৃহীত হইল। মূল সদস্যগণ ব্যতিরেকে যে-কোন রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালও ইহার সদস্য। সদস্যসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া ১১৩-তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।*

জাতিপুঞ্জ এক বিরাট সংগঠন। ইহা নানা বিভাগে বিভক্ত। নিম্নলিখিত-গুলিই ইহার প্রধান বিভাগ।

সাধারণ সভা (General Assembly): ইহা জাতিপুঞ্জের সকল সদস্য-রাষ্ট্র লইয়াই গঠিত। প্রত্যেক রাষ্ট্রের মাত্র একটি করিয়া ভোটদানের ক্ষমতা আছে, যদিও প্রত্যেক রাষ্ট্রই পাঁচজন করিয়া সদস্য সাধারণ সভায় প্রেরণ করিতে পারে। সভা সংবিধানের অন্তর্গত যে-কোন বিষয় আলোচনা করিতে পারে। ইহা যে-কোন সদস্য-রাষ্ট্র বা নিরাপত্তা পরিষদকে সুপারিশও করিতে পারে। সভায় জাতিপুঞ্জের অন্যান্য বিভাগের রিপোর্টের সমালোচনা করা হয়।

নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council): নিরাপত্তা পরিষদই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রকৃত ভার ইহার উপর ন্যস্ত। আন্তর্জাতিক শান্তিভংগ হইল কি না, শান্তিভংগের আশংকা আছে কি না এবং শান্তিভংগ হইলে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে প্রভৃতি সমস্তই নির্ধারণ করে এই পরিষদ। শান্তিভংগ হইলে পরিষদ নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। প্রথমত, ইহা সকল সদস্য-রাষ্ট্রকে শান্তি-বিপন্নকারী দেশের সহিত অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে নির্দেশ দিতে পারে। এই ব্যবস্থা যথেষ্ট না হইলে পরিষদ বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সাহায্য লইয়া বলপ্রয়োগ করিতে পারে। উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ এইরূপ বলপ্রয়োগই করিয়াছিল এবং কংগোতে এইরূপ বলপ্রয়োগই করিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদকে বিশ্বশান্তির রক্ষক বা অভিভাবক বলিয়া বর্ণনা করা যায়। ইহা 'স্বস্তি পরিষদ' নামেও খ্যাত।

নিরাপত্তা পরিষদই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ

* ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে জাঞ্জিবর ও কেনিয়া সদস্য হিসাবে গৃহীত হইলে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া উক্ত ১১৩-তে পরিণত হয়।

নিরাপত্তা পরিষদ পাঁচজন স্থায়ী ও ছয়জন অস্থায়ী সদস্য লইয়া গঠিত। পাঁচজন স্থায়ী সদস্য হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জাতীয়তাবাদী চীন। ছয়জন অস্থায়ী সদস্য সাধারণ সভা কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। সদস্যপদের মেয়াদ শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই কোন অস্থায়ী সদস্যকে পুনর্নির্বাচিত করা হয় না।

ভিটো

নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যদের গুরুত্বই অধিক। স্থায়ী সদস্যদের কেহ যদি কোন প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করে তবে সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব বাতিল হইয়া যায়। স্থায়ী সদস্যগণের এই ক্ষমতাই 'ভিটো' (Veto) নামে অভিহিত। 'ভিটো' প্রয়োগের দরুন অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসাকল্পে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে নাই।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice): ইহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিচার বিভাগ। এই বিচারালয় ৯ বৎসরের জন্য নির্বাচিত ১৫ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত। সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয় এই বিচারালয়ের এলাকাধীন। জাতিপুঞ্জের যে-কোন সদস্য এই বিচারালয়ে মামলা রুজু করিতে পারে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council or ECOSOC): ইহা সাধারণ পরিষদ দ্বারা মনোনীত ১৮ জন সদস্য লইয়া গঠিত। এই পরিষদের উদ্দেশ্য হইল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা। ঐ সকল উদ্দেশ্যে এই পরিষদের সহিত সংযুক্ত বিভিন্ন মানবহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠান-

এই পরিষদের সহিত সংযুক্ত কয়েকটি মানব-হিতকর প্রতিষ্ঠান আছে

গুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংঘ (ILO); খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠান (FAO); আন্তর্জাতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (UNESCO); আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF); বিশ্বব্যাংক (World Bank)*; বিশ্বস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (WHO); আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (ITO) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত হওয়া ছাড়াও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ মানবহিতের জন্য অনেকগুলি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছে; এই কমিশনগুলির মধ্যে 'মানুষের অধিকারের উপর কমিশন'ই (Commission on Human Rights) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কমিশনের ফলে ১৯৪৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা বিশ্বজনীনভাবে মানুষের মৌলিক অধিকার ঘোষণা করিয়াছে। স্বল্পোন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নের জন্য

* ইহার পুরা নাম হইল 'International Bank for Reconstruction and Development.' এইজন্য ইহাকে সংক্ষেপে IBRDও বলা হয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে ১৯৫৮ সালে একটি অর্থভাণ্ডারও (Development Fund) গঠন করা হইয়াছে।

অভিভাবক পরিষদ (Trusteeship Council): স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতকগুলি অনুন্নত দেশের তত্ত্বাবধানের ভার লইয়াছে। এই তত্ত্বাবধানকার্য পরিচালনা করে অভিভাবক পরিষদ। এই পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যগণও আছেন।

উপরি-উক্ত বিভাগগুলি ছাড়া জাতিপুঞ্জের একটি কর্মদপ্তর আছে। জাতিপুঞ্জের সাধারণ সম্পাদক বা প্রধান কর্মসচিবই (Secretary-General) হইলেন প্রধান কর্মকর্তা। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সাধারণ সভা কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। কার্যকাল শেষ হইলে পুনর্নিযুক্তও হইতে পারেন।

কার্যক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (The United Nations at Work): যে নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন করা হইয়াছিল তাহা সফল হয় নাই। বিরাট আয়োজন ও সংগঠন সত্ত্বেও জাতিপুঞ্জ শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিপ্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই; পৃথিবী হইতে যুদ্ধের ছায়া মোটেই দূরীভূত হয় নাই; মানুষের মৌলিক অধিকার ঘোষিত হইলেও তাহা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; পরাধীন জাতিসমূহ এখনও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায় নাই। এই সকল কারণে অনেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা অবশ্য সত্য যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জ কিছু কিছু কার্য করিয়াছে; কিন্তু তাহা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার তুলনায় একরূপ নগণ্য।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে

জাতিপুঞ্জের এইরূপ ব্যর্থতার মূলে আছে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতার অভাব। অধিকাংশ বিষয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একমত হইতে পারে না। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, ১৯৬৩ সালে সম্পাদিত আণবিক অস্ত্রশস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করিবার চুক্তিতে ফ্রান্স স্বাক্ষর করে নাই। ইহার উপর অধিকাংশ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য আন্তরিকতারও অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দরুন তাহারা নিয়মিত প্রদেয় চাঁদাও দেয় না। ১৯৬৩ সালের মধ্যভাগে জাতিপুঞ্জের তৎকালীন সভাপতি স্যর জাফরুল্লা খাঁ উক্তি করেন যে, ইহার দরুনই জাতিপুঞ্জ হয়ত ভাঙিয়া পড়িবে।

উপসংহার: এই অবস্থায় জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ইংগিত দেওয়া কঠিন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সম্পূর্ণ বিফল হইলে মানব-

জাতির পক্ষে ভীষণ দুর্দিন ঘনাইয়া আসিবে। সুতরাং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগির প্রসারের দ্বারা আমাদিগকে এই আন্তর্জাতিক সংগঠনকে সফল করিয়া তুলিতেই হইবে। দার্শনিকগণ বলেন, সাধারণ মানুষকেই এই কার্য সুরু করিতে হইবে। সাধারণ লোকে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগিসম্পন্ন হইলে রাষ্ট্রনেতাগণ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। সভ্যতার সংকট তখন দূর হইবে।

কিন্তু সাধারণ মানুষকেই ইহা সফল করিয়া তুলিতে হইবে

সংক্ষিপ্তসার

জাতীয় জনসমাজ ও জাতি: নাগরিকের পক্ষে বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা করিবার প্রয়োজন হয়। সংক্ষেপে ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টিকে 'জাতীয় জনসমাজ' এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জাতীয় জনসমাজকে 'জাতি' বলা যাইতে পারে। সুতরাং 'জাতি' 'জাতীয় জনসমাজের' পরবর্তী স্তর।

জাতীয় জনসমাজের উপাদান: একই স্থানে বসবাস, একই গোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত বলিয়া বিশ্বাস, অভিন্ন ভাষা ধর্ম সাহিত্য ও ইতিহাস, অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সমচেতনা জাতীয় জনসমাজ গঠনের উপাদান। ইহাদের মধ্যে কোনটিই অপরিহার্য নয়। সুতরাং জাতীয় জনসমাজ বা জাতির মধ্যে যে ঐক্য পরিলক্ষিত হয় তাহা প্রধানত ভাবগত (spiritual)।

জাতীয়তাবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ: আধুনিক যুগে জাতীয়তাবাদ অন্যতম সক্রিয় আন্তর্জাতিক শক্তি। জাতির মধ্যে যে-ভাব বর্তমান থাকে তাহাকেই জাতীয়তাবাদ বলে। জাতি হইল রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসমাজ। এইরূপ জনসমাজ নানা কারণে গড়িয়া উঠে। পরাধীন জাতির মধ্যে 'ঐক্যভাব বা 'জাতীয়তাবাদ' জাগ্রত হইলে ঐ জাতি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করিতে থাকে। অনেকে বলেন, এই দাবি মানিয়া লওয়া উচিত। অনেকে আবার বলেন যে এই দাবির শেষ নাই—সুতরাং ইহাকে মানিয়া লইবার বেলায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। আত্মনিয়ন্ত্রণের ফলে সকল সমস্যার যে সমাধান হয় না ভারতই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা: স্বাধীন জাতির জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিতে পারে। ইহা প্রথমে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি করিয়া পরে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হইতে পারে। এইরূপ ঘটিলে দেখা দেয় 'সভ্যতার সংকট। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগির প্রসারের দ্বারা সভ্যতার এই সংকট দূর করিবার চেষ্টা অনেক দিন হইতেই করিয়া আসা হইতেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ এবং বর্তমানের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন এইভাবে আন্তর্জাতিক আদর্শকে রূপদানের প্রচেষ্টারই ফল।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভাবীকালকে যুদ্ধের নিগ্রহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য জাতিপুঞ্জ সম্মিলিত হয়। সামগ্রিক নিরাপত্তাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রচেষ্টা, মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা, পরাধীন জাতিসমূহকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান করা, জাতিসমূহের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদিও ইহার লক্ষ্য।

জাতিপুঞ্জ এক বিরাট সংগঠন। ইহা নিম্নলিখিত বিভাগে বিভক্ত: ১। সাধারণ সভা; ২। নিরাপত্তা পরিষদ; ৩। আন্তর্জাতিক বিচারালয়; ৪। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ; ৫। অভিভাবক পরিষদ। ইহা ছাড়া একটি কর্মদপ্তরও আছে। প্রধান কর্মসচিব বা সাধারণ সম্পাদকের অধীনে দৈনন্দিন কার্য পরিচালিত হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একরূপ ব্যর্থ হইয়াছে। ইহার মূলে আছে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতা এবং অধিকাংশ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার অভাব। কিন্তু জাতিপুঞ্জ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইলে মানবজাতির সম্মুখে ভীষণ

দুর্দিন ঘনাইয়া আসিবে। সুতরাং আমাদিগকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে সফল করিয়া তুলিতেই হইবে।

প্রশ্নোত্তর

1. What do you understand by 'Nation' and 'Nationalism'? Illustrate your answer. (C. U 1952)

'জাতি' ও 'জাতীয়তাবাদ' বলিতে কি বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [৬৯-৭০ এবং ৭১ পৃষ্ঠা]

2. What do you mean by the following terms ?—(*a*) State, (*b*) Government, (*c*) Nation, and (*d*) Nationality. (P. U. 1961)

নিম্নলিখিত শব্দগুলি দ্বারা কি বুঝ ?—(ক) রাষ্ট্র, (খ) সরকার, (গ) জাতি, এবং (ঘ) জাতীয় জনসমাজ। [৮, ১০ এবং ৬৯-৭০ পৃষ্ঠা]

3. Explain the theory : "One Nation, One State." Would you accept it ? State your reasons fully. (C. U. 1960, '62)

"এক জাতি, এক রাষ্ট্র"—এই নীতির ব্যাখ্যা কর। ইহা কি গ্রহণযোগ্য ? সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।
[ইংগিত: জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার—অর্থাৎ, একজাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শের পর্যালোচনা করিতে হইবে।...(৭১-৭৩ পৃষ্ঠা)]

4. What do you mean by the right of Self-determination ? What are its limitations ? (En. 1964)

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলিতে কি বুঝ ? ইহার সীমা কি কি ?

[ইংগিত: প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কতদূর মানিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহার আলোচনা করিতে হইবে।...(৭১-৭৩ পৃষ্ঠা)]

5. Write short notes on :

(*a*) Nation, (*b*) Nationality, (*c*) United Nations, and (*d*) Right of Self-determination. (En. 1962)

নিম্নলিখিতগুলির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ:

(ক) জাতি, (খ) জাতীয় জনসমাজ, (গ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, এবং (ঘ) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। [৬৯-৭০, ৭৫-৭৬ এবং ৭১-৭২ পৃষ্ঠা]

6. Write a short note on the functions and importance of the United Nations Organisation. (C. U. 1961, '63)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যাবলী ও গুরুত্বের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর। [৭৬-৭৯ পৃষ্ঠা]

সপ্তম অধ্যায়

নাগরিকতা

(Citizenship)

পৌরবিজ্ঞানে সমাজ ও রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে মানুষের আচরণের আলোচনা করা হয়। এ-পর্যন্ত সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল; এখন ইহাদের সভ্য নাগরিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

নাগরিক (Citizen): শব্দগত অর্থ ধরিলে নাগরিক হইল নগরবাসী। ইহার কারণ প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্র ছিল ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র (City States)। সুতরাং যাহারা নগর-রাষ্ট্রের সভ্য ছিল তাহাদেরই 'নাগরিক' বলা হইত। কিন্তু নাগরিকতা সম্পর্কে বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগের ধারণা এবং প্রাচীন গ্রীসের ধারণার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রহিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসে নগর ও রাষ্ট্র অভিন্ন থাকিলেও নগরের সকল অধিবাসীই নাগরিক-অধিকার ভোগ করিত না। রাষ্ট্রের সভ্য বা নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইত তাহারাই, যাহারা প্রত্যক্ষভাবে নগর-রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করিত। প্রত্যেক গ্রীক নাগরিকই একাধারে ছিল সৈন্য এবং বিচারকার্য ও শাসনকার্য পরিচালনাকারী সংস্থার সদস্য। তাই গ্রীক দার্শনিক এ্যারিষ্টটলের মতে, যাহারা শাসনকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে মাত্র তাহারাই নাগরিক। এই সকল নাগরিক মাত্র শাসন-পরিচালনার কার্যেই ব্যাপৃত থাকিত, আর তাহাদের জীবনধারণের দ্রব্যাদি যোগাইত অসংখ্য ক্রীতদাস।

শব্দগত অর্থে নাগরিক নগরবাসী মাত্র

জনসংখ্যার অধিকাংশ হইলেও শাসনকার্যে ইহাদের কোন অংশ ছিল না; সুতরাং ইহারা নাগরিক-পর্যায়ভুক্ত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, খ্রীষ্টপূর্ব ৪:৩ অব্দে এথেন্স নগর-রাষ্ট্রে ১ লক্ষ ১৫ হাজার পুরুষের মধ্যে ৫০ হাজার ছিল ক্রীতদাস এবং এথেনীয় নাগরিকদের সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার; আর বাকী ১৫ হাজার ছিল বিদেশীয়।

প্রাচীনকালে নাগরিক-অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল

রোমক সভ্যতার যুগেও নাগরিক-অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম প্রথম মাত্র প্যাট্রিসিয়ান (Patricians) বা অভিজাতশ্রেণীই উহা ভোগ করিতে সমর্থ ছিল; অন্যান্য শ্রেণী নাগরিকতার সুখসুবিধা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইত। পরে অবশ্য নাগরিক-অধিকার কেবলমাত্র স্বাধীন ব্যক্তিদের দেওয়া হয়। সামন্তপ্রথার যুগে (Feudal Age) অধিকাংশ লোক ছিল ভূমিদাস (serfs); এবং তাহাদের কোনপ্রকার নাগরিক-অধিকার ছিল না।

জাতীয় রাষ্ট্র উদ্ভবের ফলে ইহা সম্প্রসারিত হয়

তারপর সমাজ-বিবর্তনের ফলে দাসত্বপ্রথা ও সামন্তযুগের অবসান ঘটে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে জাতীয় রাষ্ট্র প্রবর্তিত হয়। ফলে নাগরিক-অধিকার সম্প্রসারিত হয়।

বর্তমানে সাধারণত 'নাগরিক' বলিতে বুঝায় সেই সকল ব্যক্তিকে যাহারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকারের ফলে আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সভ্য বা আপন জন বলিয়া পরিগণিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মিলারের (Mr. Justice Miller) ভাষায় বলা যায়: "নাগরিকগণ রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সভ্য। তাহারা সেই জনসমষ্টি যাহার দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং তাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার সংরক্ষণের জন্ম সরকারের প্রতিষ্ঠা করে বা সরকারের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে।"

আধুনিক অর্থে নাগরিক

নাগরিকের আইনগত সংজ্ঞা

কে বা কাহারা নাগরিক হইবে এবং কোন্ কোন্ সর্তে নাগরিক-অধিকার অর্জিত হইবে, কোন্ কোন্ কারণে নাগরিকতার বিলুপ্তি ঘটিবে, ইত্যাদি বিষয় প্রত্যেক রাষ্ট্র আইন করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। রাষ্ট্রের সভ্য বা আপন জন-রূপে পরিগণিত হইবার ফলে তাহারা কতকগুলি অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ হয় যাহা বিদেশীয়রা পায় না। এগুলিকে সাধারণত রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (political rights) বলা হয়। অবশ্য সকল নাগরিকের সকল সময় পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার নাও থাকিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচন করিবার এবং নির্বাচিত হইবার অধিকারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে কোন ভারতীয় নাগরিক ২১ বৎসর বয়স্ক না হইলে লোকসভা কিংবা কোন বিধানসভার নির্বাচনে ভোটদানে সমর্থ হয় না; এবং ২৫ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে লোকসভা কিংবা বিধানসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হইতে পারে না। আবার যে-ব্যক্তি বিকৃতমস্তিষ্ক অথবা যে বেআইনী বা দুর্নীতিপরায়ণ কার্যে লিপ্ত হয় তাহাকে নির্বাচন করিবার এবং নির্বাচিত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায়। যাহা হউক, বলা যাইতে পারে যে আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, রাষ্ট্র কর্তৃক সভ্য বলিয়া স্বীকার এবং রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ হইল নাগরিকের লক্ষণ।

আইনের দৃষ্টিতে নাগরিকের লক্ষণ

অধিকার দায়িত্ব বা কর্তব্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নাগরিক যেমন রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে কতকগুলি সুবিধাসুযোগ বা অধিকার ভোগ করে তেমনি আবার তাহাকে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কতকগুলি কর্তব্যও পালন করিতে হয়। এই কারণে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ নাগরিকের আইনগত ধারণা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। ইঁহারা অধিকারের সহিত নাগরিকের কর্তব্যের উপরও সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন নাগরিকের প্রাথমিক কর্তব্য হইলেও আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ধারণা অনুসারে নাগরিককে অন্যান্য কর্তব্যপালনের দ্বারাও সমাজের মংগলসাধনের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। নাগরিকের এই লক্ষণ বিচার করিয়া নাগরিকের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে: "যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সভ্য

এবং রাষ্ট্রের মধ্যে থাকিয়া পূর্ণভাবে আত্মবিকাশের জন্ত সচেষ্ট এবং সমাজের সর্বাধিক মংগল সম্পর্কে সচেতন থাকে তাহাকেই নাগরিক আখ্যা দেওয়া যায়।" লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ল্যাস্কি নাগরিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "নাগরিকতা হইল সমাজের কল্যাণসাধনের জন্ত নিজের জ্ঞানসম্পন্ন বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ।"* সমাজের মধ্যে ব্যক্তির প্রকাশ; সমাজকে অবলম্বন করিয়াই সে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের পক্ষে টিকিয়া থাকা সম্ভব নয়, আত্মবিকাশ ত দূরের কথা। সমাজের কল্যাণ ব্যক্তি-কল্যাণের সূচনা করে। তাই নাগরিককে সমাজের মংগলে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তাহাকে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহার বিচারবুদ্ধি যাহাতে জ্ঞানপ্রসূত হয় তাহাও দেখিতে হইবে, কারণ অশিক্ষিত অজ্ঞের বিচারবুদ্ধি সমাজ-কল্যাণের সহায়ক হইতে পারে না। এইরূপ ব্যক্তি সমাজের জটিল সমস্যা বুঝিয়াই উঠিতে পারে না।

আধুনিক বা পূর্ণ অর্থে নাগরিক

স্বজাতীয় ও প্রজা (Nationals and Subjects): নাগরিকতার আলোচনা প্রসংগে 'স্বজাতীয়' ও 'প্রজা' শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। 'স্বজাতীয়' (Nationals) শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক সময় ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত সমতা প্রভৃতির বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ একই জাতির (Nation) অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের 'স্বজাতীয়' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই অর্থে বিভিন্ন দেশে যে ভারতীয়গণ বসবাস করে তাহাদের আমরা আমাদের স্বজাতীয় বলিয়া মনে করি। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনে (International Law) 'স্বজাতীয়' শব্দটিকে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। এই দ্বিতীয় অর্থে কোন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদানকারী সমস্ত ব্যক্তিকেই ঐ রাষ্ট্রের 'স্বজাতীয়' বলা হয়। কিন্তু স্বজাতীয় হইলেই যে নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে এরূপ কোন কথা নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে একটি উদাহরণ লওয়া যাইতে পারে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলে পরও ফিলিপাইনের অধিবাসীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা দেওয়া হয় নাই, যদিও তাহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। বর্তমানেও তাহাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'স্বজাতীয়' বলিয়া অভিহিত করা হয়, নাগরিক বলিয়া নহে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, সকল নাগরিকই স্বজাতীয়, কিন্তু সকল স্বজাতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য নাও হইতে পারে।

'স্বজাতীয়' শব্দের দুই অর্থ

সকল স্বজাতীয় নাগরিক-মর্যাদা নাও পাইতে পারে

* "Citizenship is the contribution of one's *instructed judgement to the* public good."

'প্রজা' (Subjects) শব্দটির মধ্যেও যথেষ্ট অস্পষ্টতা রহিয়াছে। অনেক লেখক আছেন, যাহারা ভোটাধিকারী নয় এমন সমস্ত স্বজাতীয়দের 'প্রজা' বলিয়া অভিহিত করার পক্ষপাতী। এই অর্থ গ্রহণ করিলে রাষ্ট্রের সভ্যদের দুই ভাগ করিয়া যাহারা পূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করে তাহাদের নাগরিক আখ্যা দিতে হয়, আর যাহারা ঐ অধিকার আংশিকভাবে ভোগ করে তাহাদের 'প্রজা' বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। কিন্তু প্রজা শব্দটির সহিত রাজতন্ত্রের স্মৃতি বিজড়িত আছে বলিয়া অনেকে ইহার ব্যবহারে আপত্তি করেন। তাই গণতান্ত্রিক দেশসমূহে রাষ্ট্র-সভ্যদের 'নাগরিক' আখ্যাই দেওয়া হয়। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সকল ভারতীয়ই ভারতের নাগরিক—কেহই ভারত-রাষ্ট্রের 'প্রজা' নহে।

'প্রজা' শব্দের অর্থ

বর্তমানে শব্দটি ব্যবহারে আপত্তি

নাগরিক ও বিদেশীয় (Citizens and Aliens) : নাগরিক রাষ্ট্রের আপন জন। আপন জন হিসাবে রাষ্ট্রের প্রতি তাহার স্থায়ী আনুগত্য থাকে। রাষ্ট্রও তাহাকে নাগরিক হিসাবে কতকগুলি সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করে। অপর-দিকে বিদেশীয় (Aliens) হইল অপর কোন রাষ্ট্রের সভ্য বা সেই রাষ্ট্রের আপন জন। সুতরাং তাহার স্থায়ী আনুগত্য হইল নিজ রাষ্ট্রের প্রতি। অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত সে অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাস করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে ঐ বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি অস্থায়ী আনুগত্য প্রদর্শন করিতে হয়, সম্পূর্ণভাবে ঐ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে থাকিতে হয় এবং সাধারণ আইনকানুন মানিয়া চলিতে হয়। ইহার ব্যতিক্রম ঘটলে—অর্থাৎ, বিদেশী রাষ্ট্রের আইনকানুন ভংগ করিলে ঐ বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকের মত তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। আবার বিদেশীয়কে নাগরিকের মতই কর প্রভৃতি প্রদান করিতে হয়। তবে নাগরিকদের মত তাহাকে সৈন্যবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য করানো যায় না।

স্থায়ী আনুগত্য ও পূর্ণ অধিকারের ভোগ নাগরিকের লক্ষণ

বিদেশীয়ের আনুগত্য কিন্তু অস্থায়ী

বিদেশীয় হইলেও কতকগুলি বিষয়ে নাগরিকের মত তাহাকে অধিকার প্রদান করা হয়। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে এই অধিকারের পরিমাণ ক্রমশই সম্প্রসারিত হইতেছে। জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিদেশীয়ের অন্যতম স্বীকৃত অধিকার। অপরাপর সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রেও নাগরিক ও বিদেশীয়দের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য করা হয় না। আমাদের দেশে নাগরিকের জন্য সংবিধানে যে-সকল মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই বিদেশীয়রা সমভাবে ভোগ করিতে পারে। যেমন, সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জীবনের অধিকার,

ফলে অধিকারও আংশিক

তবে ইহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি ভারতে অবস্থানকারী বিদেশীয় ভারতীয় নাগরিকের মতই ভোগ করিয়া থাকে।

কিন্তু বিদেশীয়দের সাধারণত রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার প্রদান করা হয় না। এই অধিকার একমাত্র নাগরিকরাই ভোগ করিতে পারে। ভারতে একমাত্র নাগরিকরাই আইনসভার সদস্য নির্বাচন করিবার অথবা সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার অধিকার ভোগ করে; ভারতে অবস্থানকারী কোন বিদেশীয়, যেমন রুশ বা জাপানী বা মার্কিন নাগরিক, ঐ অধিকার ভোগ করিতে সমর্থ নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই আবার জনস্বার্থের প্রয়োজনে বিদেশীয়দের রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত অথবা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে পারে। সুতরাং সভ্যতার অগ্রগতি এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের ফলে বিদেশীয়দের মর্যাদা ও অধিকার সামাজিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইলেও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নাগরিক ও বিদেশীয়দের মধ্যে এখনও পার্থক্য রহিয়াছে।

নাগরিক ও বিদেশীয়দের মধ্যে পার্থক্য রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লইয়া

বিদেশীয়দের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। অনেক রাষ্ট্রে বসবাসকারী ও অ-বসবাসকারী বিদেশীয়দের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। যাহারা বিদেশী রাষ্ট্রে বসবাসের অভিপ্রায়ে অবস্থান করে তাহাদের বসবাসকারী বিদেশীয় (resident or domiciled aliens) আখ্যা দেওয়া হয়; আর যাহারা সাময়িকভাবে বিদেশী রাষ্ট্রে অবস্থান করে তাহাদিগকে অ-বসবাসকারী বিদেশীয় (non-resident aliens or temporary sojourners) বলা হয়। এই দুই শ্রেণীর বিদেশীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রে স্থাবর সম্পত্তি ভোগদখল করিবার অধিকার একমাত্র বসবাসকারী বিদেশীয়দেরই থাকে।

বিদেশীয়দের শ্রেণী-বিভাগ: ১। বসবাস-কারী ও অ-বসবাস-কারী বিদেশীয়

অন্য আর একভাবেও বিদেশীয়দের ভাগ করা যায়। বিদেশীয়রা মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয় (friendly aliens) অথবা শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয় (enemy aliens) হইতে পারে। যুদ্ধ বাধিলে শত্রুপক্ষীয় বিদেশীয় রাষ্ট্রের নাগরিকদের শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয় বলা হয়; আর যে-সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সংগ্রাম থাকে না তাহাদের নাগরিকদের মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয় বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতের সহিত অপর কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সংগ্রাম বাধিলে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকরা ভারতের নিকট শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। অপরপক্ষে, ভারতের সহিত সংগ্রাম নাই এমন সমস্ত রাষ্ট্রের নাগরিকরা ভারতের নিকট মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয় থাকিবে।

২। মিত্রভাবাপন্ন ও শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয়

এই আলোচনা প্রসংগে ভারতে কে বা কাহারা বিদেশীয় তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই মনে হইতে পারে যে, অপরাপর সকল রাষ্ট্রের নাগরিকই ভারতের নিকট বিদেশীয়। এই ধারণা কিন্তু ভুল। ভারতীয়

সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি যে-কোন রাষ্ট্রকে 'বিদেশী রাষ্ট্র নয়' বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। ১৯৫০ সালে এইরূপ একটি ঘোষণার দ্বারা যুক্তরাজ্য (U. K.), কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে ভারতের নিকট বিদেশী রাষ্ট্র নয় বলিয়া ঘোষণা করা হয়।* সুতরাং এই সকল দেশের নাগরিকগণও ভারতের নিকট বিদেশীয় নয়। ১৯৫৫ সালের ভারতীয় নাগরিকতা আইনে** এই সকল ব্যক্তিকে 'কমনওয়েলথ্ নাগরিকে'র মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে; এবং ভারত সরকার ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে সকল নাগরিক-অধিকার প্রদান করিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সোবিয়েত ইউনিয়ন, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি কমনওয়েলথের বহির্ভূত দেশগুলির নাগরিকেরা ভারতের নিকট বিদেশীয়। অপরদিকে যুক্তরাজ্য, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির নাগরিকেরা ভারতের নিকট বিদেশীয় বলিয়া পরিগণিত নয়।

ভারতে বিদেশীয় কাহারা

নাগরিকতা অর্জন (Acquisition of Citizenship): প্রধানত দুইটি পদ্ধতিতে নাগরিকতা অর্জন করা যায়: (১) জন্ম দ্বারা (by birth or descent), এবং (২) রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদন দ্বারা (by formal grant or conferment by the State)। যাহারা প্রথম উপায়ে নাগরিকতা অর্জন করে তাহাদিগকে জন্মসূত্রে নাগরিক (natural-born citizens) এবং যাহারা রাষ্ট্রের অনুমোদন দ্বারা নাগরিক হিসাবে গৃহীত হয় তাহাদিগকে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক (naturalized citizens) বলা হয়।

নাগরিকতা অর্জনের দুইটি পদ্ধতি

জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি (Acquisition of Citizenship by Birth): জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের আবার দুইটি মূলনীতি আছে—রক্তের সম্পর্ক-নীতি (*Jus Sanguinis*) এবং জন্মস্থান-নীতি (*Jus Soli* or *Jus Loci*)। রক্তের সম্পর্ক-নীতি অনুসারে শিশু যে-স্থানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন সে পিতামাতার নাগরিকতা পাইবে। অর্থাৎ, পিতামাতা যে-রাষ্ট্রের নাগরিক সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় নাগরিকতা আইনের একটি নিয়মানুসারে ভারতের বাহিরে ভারতীয় নাগরিকের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সে ভারতীয় নাগরিকতা পাইবে। অপরদিকে জন্মস্থান-নীতি অনুসারে শিশু যে-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে

জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুইটি পদ্ধতি

১। রক্তের সম্পর্ক-নীতি

---

* The Constitution (Declaration as to Foreign States) Order, 1950

** Citizenship Act, 1955

জন্মগ্রহণ করে সেই রাষ্ট্রেরই নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে—তাহার পিতামাতা যে-রাষ্ট্রেরই নাগরিক হউন না কেন। যেমন, ভারতীয় নাগরিকতা আইনের একটি নিয়ম অনুসারে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে ভারতের অভ্যন্তরে যে-ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। কোন জাহাজ বা বিমানে জন্ম হইলে ঐ জাহাজ বা বিমান যে-রাষ্ট্রের সেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জন্ম হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে পররাষ্ট্রদূতের ক্ষেত্রে জন্মস্থান-নীতি প্রযুক্ত হয় না। যেমন, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ভারতে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে জন্মস্থান-নীতি তাহার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

২। জন্মস্থান-নীতি

উপরি-উক্ত দুইটি নীতির মধ্যে রক্তের সম্পর্ক-নীতি অপেক্ষাকৃত পুরাতন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এই নীতি অনুসৃত হইত। পরে রাষ্ট্রের ভূমিগত সার্বভৌমিকতার* ধারণা প্রসারের সংগে জন্মস্থান-নীতিও গৃহীত হয়। যাহা হউক, পৃথিবীর সর্বত্র একই নীতি অনুসৃত হয় না; অনেক রাষ্ট্রই উভয় নীতিকে অল্পবিস্তর অনুসরণ করিয়া থাকে। আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি যে ভারত রক্তের সম্পর্ক-নীতি ও জন্মস্থান-নীতি উভয়কেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অনুরূপভাবে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি নীতিই প্রচলিত। জন্মস্থান-নীতি অনুসরণের ফলে যাহারা ইংলণ্ড কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করে তাহারা স্বাভাবিকভাবেই ঐ দেশের নাগরিকতা পায়; আবার বিদেশে অবস্থানকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা ইংলণ্ডের কোন নাগরিকের সন্তানসন্ততি হইলে সে যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা ইংলণ্ডের নাগরিকতা অর্জন করে।

অনেক রাষ্ট্র উভয় নীতি অনুসরণ করে

এইভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র নাগরিকতা অর্জন সম্পর্কে বিভিন্ন নীতির অনুসরণ করার ফলে অসংগতি ও বিরোধের উদ্ভব হয়। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন নাগরিকের সন্তান যদি ইংলণ্ডের সীমানার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয় তাহা হইলে সে জন্মস্থান-নীতি অনুসারে ইংলণ্ডের, কিন্তু রক্তের সম্পর্ক-নীতি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। এইভাবে দ্বৈত নাগরিকতার (double citizenship) সমস্যা দেখা দিবে—একই ব্যক্তি দুইটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা পাইবার অধিকারী হইবে; এবং দুই রাষ্ট্রই তাহাকে আপন নাগরিক বলিয়া দাবি করিলে বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দিবে।

উভয় নীতি অনুসরণের ফলে দ্বৈত নাগরিকতার উদ্ভব হয়

অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে মীমাংসার ব্যবস্থাও আছে। সাধারণত এরূপ নাগরিক রাষ্ট্রের সীমানার বাহিরে থাকিলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ঐ ব্যক্তিকে আপন জন বলিয়া

---

* ৯ পৃষ্ঠা দেখ।

দাবি করে না। অনেক ক্ষেত্রে আবার দ্বৈত নাগরিকতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহাকে যে-কোন একটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা বাছিয়া লওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়। ভারতীয় আইনের এক নিয়ম অনুযায়ী কোন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি একই সময় ভারত এবং অপর কোন দেশের নাগরিক হইলে সে-ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ভারতীয় নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে পারে। উপরি-উক্ত ব্যবস্থা ছাড়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে চুক্তির সাহায্যেও দ্বৈত নাগরিকতার সমস্যার সমাধান করা হয়।

দ্বৈত নাগরিকতার সমস্যার মীমাংসা

এখন প্রশ্ন হইল, জন্মস্থান-নীতি ও রক্তের সম্পর্ক-নীতির মধ্যে কোন্‌টি যুক্তি-সংগত? গুণাগুণ বিচার করিয়া বলা যায়, দুইটি নীতির কোনটিই সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত নয়। জন্মস্থান-নীতির একমাত্র গুণ হইল যে জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির নাগরিকতা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। কিন্তু অন্যান্য দিক হইতেদেখিলে জন্মস্থান-নীতি অযৌক্তিক ও অকাম্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়। কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করা নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা এবং উহার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির নাগরিকতা নির্ধারণ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত নহে। উদাহরণ-স্বরূপ, যদি কোন ভ্রাম্যমাণ মার্কিন নাগরিকের তিনটি পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে অবস্থানকালে তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে জন্মস্থান-নীতি অনুযায়ী ঐ তিনটি সন্তান ভিন্ন ভিন্ন তিনটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিবে। এরূপ অদ্ভুত অবস্থাকে কোনমতেই যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা যায় না।

এই দুই নীতির কোনটিই ক্রটিবিহীন নহে

রক্তের সম্পর্ক-নীতি এইদিক হইতে ক্রটিবিহীন। কিন্তু জন্মস্থান যেমন সহজেই নির্ণয় করা যায়, পিতার নাগরিকতা অনেক ক্ষেত্রে অত সহজে প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্ক-নীতি অনুসারে নাগরিকতা নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। যাহা হউক, সকল দিক বিচার করিয়া দেখিলে রক্তের সম্পর্ক-নীতিকেই অপেক্ষাকৃত সমীচীন এবং স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

তবে রক্তের সম্পর্ক-নীতিই অপেক্ষাকৃত সমীচীন

অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক হইবার পদ্ধতি (Acquisition of Citizenship by Naturalisation): অনুমোদন দ্বারা বিদেশীয় পররাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিতে পারে। 'অনুমোদন' (naturalisation) শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে অনুমোদন বলিতে বুঝায় বিবাহ, সম্পত্তি ক্রয়, সৈন্যবাহিনীতে যোগদান, সরকারী চাকরিতে প্রবেশ, দীর্ঘকাল বসবাস প্রভৃতি উপায়ের যে-কোনটিকে অবলম্বন করিয়া পররাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গৃহীত হওয়া। মোটকথা, যে-কোন ভাবেই বিদেশীয়কে নাগরিকতা প্রদান করা হইলে ব্যাপক অর্থে তাহাকে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক বলা হয়।

ব্যাপক অর্থে অনুমোদন

ইংলণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশে 'অনুমোদন' শব্দটি সাধারণত সংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সংকীর্ণ অর্থে 'অনুমোদন' বলিতে বুঝায় কতকগুলি নির্দিষ্ট সর্ত পূরণ করিয়া শাসন বিভাগ বা আদালতের মাধ্যমে পররাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গৃহীত হওয়া। এইভাবে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক হইবার জন্য বিদেশীয়কে বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাইতে হয়; তাহাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নাগরিকতার জন্য আবেদন করিতে হয়; এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট সর্ত পালন করিলে তবেই আবেদন করিতে পারা যায়। এই সকল সর্তের মধ্যে 'বসবাসের সর্ত' (condition of domicile) প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত। ভারত ও ইংলণ্ডে নিয়ম আছে যে আবেদনকারী অন্তত ৪ বৎসর কাল বসবাস করিয়াছে বা অন্তত ঐ সময়ের জন্য সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত রহিয়াছে অথবা অংশত বসবাস ও অংশত সরকারী চাকরিতে তাহার ৪ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, এইরূপ প্রমাণ তাহাকে দিতে হইবে। বসবাসের সর্ত ব্যতীত আবেদনকারীকে অন্যান্য সর্ত পূরণ করিতে হইতে পারে। যেমন, ভারত ও ইংলণ্ডে নিয়ম আছে যে আবেদনকারী বিদেশীয়কে প্রমাণ করিতে হইবে—প্রথমত, সে সচ্চরিত্র; দ্বিতীয়ত, নাগরিকতা প্রদত্ত হইলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের অভিপ্রায় তাহার আছে, এবং তৃতীয়ত, ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা ও ভারতের ক্ষেত্রে সংবিধানে উল্লিখিত ১৪টি ভাষার যে-কোন একটিতে সে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন।

সংকীর্ণ অর্থে অনুমোদন

এই প্রকার অনুমোদন বিভিন্ন সর্তাধীন

অনুমোদনের মাধ্যমে নাগরিকতা অর্জন পূর্ণ (grand) বা আংশিক (partial) হইতে পারে। যে-সকল রাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে কোনপ্রকার ভেদাভেদ করা হয় না, সেই সকল রাষ্ট্রে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা পূর্ণ নাগরিকতা। ভারত ও ইংলণ্ডে অনুমোদনপদ্ধতির সাহায্যে এইরূপ পূর্ণ নাগরিকতা অর্জিত হয়। অর্থাৎ, এই দুইটি দেশে জন্মসূত্রে নাগরিক ও অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক একই মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিকের মধ্যে কতিপয় ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হয়। যেমন, কোন অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হইতে পারে না; একমাত্র জন্মসূত্রে নাগরিকেরাই ঐ দুই পদ অলংকৃত করিতে পারে। এইভাবে যেখানে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিককে সকল প্রকার অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হয় না সেখানে অনুমোদন দ্বারা নাগরিকতা অর্জন অপূর্ণাংগ বা আংশিক।

পূর্ণ বা আংশিক নাগরিকতা অর্জন

বলা হইয়াছে, আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির মাধ্যমে অনুমোদন ছাড়াও বিবাহ, সম্পত্তি ক্রয়, সরকারী চাকরি প্রভৃতি দ্বারাও পররাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গৃহীত

হওয়া যায়। ইহার উপর ভারত ইংলণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে নিয়ম আছে যে, অন্য কোন দেশ ঐ সকল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলে ঐ দেশের অধিবাসীদের নাগরিকতা প্রদান করা যাইতে পারে। এই পদ্ধতি দ্বারা নাগরিকতা অর্জনকে অনেক সময় 'সমষ্টিগত অনুমোদনকরণ' (group naturalisation) বলা হয়।

সমষ্টিগত অনুমোদন

নাগরিকতার বিলোপ (Loss or Termination of Citizenship):

নাগরিকতার আবার অবসানও ঘটিতে পারে। এ-বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। যাহা হউক, এখানে কতকগুলি সাধারণ নিয়মের উল্লেখ করা হইতেছে। প্রথমত, কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে পারে। যেমন, যদি কোন ভারতীয় নাগরিক অপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিক বা স্বজাতীয় হয় তাহা হইলে সে ঘোষণার দ্বারা ভারতীয় নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভারতের মত কোন কোন দেশে নিয়ম আছে যে কোন নাগরিক স্বেচ্ছায় পররাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করিলে সে নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত হইবে। তৃতীয়ত, অনেক সময় আবার অপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন না করিয়াও কোন ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকতা হারাইতে পারে। সৈন্যদল হইতে পলায়ন, দীর্ঘকাল ধরিয়া নিজ রাষ্ট্রে অনুপস্থিতি, অসদুপায়ে অনুমোদন দ্বারা নাগরিকতা অর্জন, দেশদ্রোহিতা, বিদেশী রাষ্ট্রের উপাধি বা সম্মান গ্রহণ প্রভৃতি কারণেও বিভিন্ন রাষ্ট্রে নাগরিকতার অবসান ঘটিয়া থাকে। এইভাবে নাগরিকতার অবসান ঘটিলে ব্যক্তি নাগরিকতাহীন বা রাষ্ট্রহীন (Stateless) হইয়া পড়ে।

ক। নাগরিকতা পরিত্যাগ করা যায়

খ। এক রাষ্ট্রের নাগরিকতা পাইলে অপর এক রাষ্ট্রের নাগরিকতার অবসান ঘটে

গ। নানা কারণে ব্যক্তি নাগরিকতা-হীনও হইতে পারে

সংক্ষিপ্তসার

শব্দগত অর্থে নাগরিক বলিতে বুঝায় নগরবাসী মাত্র। প্রাচীনকালে শাসনকার্য পরিচালনাকারী ব্যক্তিদেরই নাগরিক আখ্যা দেওয়া হইত। বর্তমানে আইনের দৃষ্টিতে (১) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, (২) রাষ্ট্র কর্তৃক সভ্য বলিয়া স্বীকার, এবং (৩) রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারভোগকে নাগরিকের লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়।

নাগরিক অধিকার ভোগ করে বলিয়া তাহাকে কর্তব্যও পালন করিতে হয়, কারণ কর্তব্য অধিকারের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই কর্তব্যপালনের জন্য নাগরিককে উপযুক্ত হইতে হইবে।

স্বজাতীয় ও প্রজা: নাগরিকতার আলোচনা প্রসংগে 'স্বজাতীয়' ও 'প্রজা' শব্দ দুইটি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। স্বজাতীয় বলিতে রাষ্ট্রের সকল 'আপন জন'কে বুঝায়। সুতরাং সকল নাগরিকই স্বজাতীয়, কিন্তু সকল স্বজাতীয় নাগরিক নাও হইতে পারে।

অনেক সময় যাহারা পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না এরূপ স্বজাতীয়দের 'প্রজা' বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু 'প্রজা' শব্দটির সহিত রাজতন্ত্রের স্মৃতি বিজড়িত আছে বলিয়া বর্তমানে ইহার ব্যবহারে অনেকে আপত্তি করেন।

নাগরিক ও বিদেশীয়: নাগরিক বিদেশীয় হইতে পৃথক। নাগরিকের আনুগত্য স্থায়ী এবং তাহার অধিকার পূর্ণ—অপরদিকে বিদেশীয়ের আনুগত্য অস্থায়ী এবং অধিকারও আংশিক; নাগরিকের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার আছে বিদেশীয়ের নাই।

বিদেশীয়রা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা, (ক) বসবাসকারী ও অ-বসবাসকারী বিদেশীয়; (খ) মিত্রভাবাপন্ন ও শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয়।

নাগরিকতা অর্জন: নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি প্রধানত দুইটি—(১) জন্ম, এবং (২) অনুমোদন।

জন্ম দ্বারা আবার দুইভাবে নাগরিকতা অর্জন করা যায়—(ক) রক্তের সম্পর্কে, এবং (খ) রাষ্ট্রাভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া। এই নীতি দুইটি যথাক্রমে রক্তের সম্পর্ক-নীতি এবং জন্মস্থান-নীতি নামে পরিচিত। নীতি দুইটির কোনটিই ত্রুটিবিহীন নহে; তবে রক্তের সম্পর্ক-নীতিই অধিকতর সমীচীন।

অনুমোদন দ্বারা যাহারা নাগরিকতা অর্জন করে তাহাদিগকে অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক বলা হয়। 'অনুমোদন' শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অনুমোদন আবার পূর্ণ বা আংশিক হয়।

নাগরিকতার বিলোপ: নাগরিকতার বিলোপ বলিতে নাগরিকতার পরিবর্তন মাত্র বুঝাইতে পারে। (১) নাগরিক স্বেচ্ছায় কোন রাষ্ট্রের নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে পারে; (২) এক রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করিলে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতার অবসান ঘটে; এবং (৩) নানা কারণে ব্যক্তি নাগরিকতাহীনও হইতে পারে।

প্রশ্নোত্তর

1. Define 'Citizen'. Distinguish a Citizen from an Alien. (C. U. 1954, '58)
'নাগরিকে'র সংজ্ঞা নির্দেশ কর। নাগরিক ও বিদেশীয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।
[৮২-৮৩ এবং ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠা]

2. Describe the different ways of acquiring citizenship. (C. U. 1943, '54, '58)
নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন প্রকৃতির পদ্ধতি বর্ণনা কর। [৮৭-৯১ পৃষ্ঠা]

3. How is citizenship lost?
কিভাবে নাগরিকতা বিলুপ্ত হয়? [৯১ পৃষ্ঠা]

4. Distinguish between: (a) Resident Aliens and Non-resident Aliens; (b) Friendly Aliens and Enemy Aliens.
পার্থক্য নির্দেশ কর: (ক) বসবাসকারী বিদেশীয় এবং অ-বসবাসকারী বিদেশীয়; (খ) মিত্রভাবাপন্ন বিদেশীয় এবং শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীয়। [৮৬ পৃষ্ঠা]

অষ্টম অধ্যায়

সুনাগরিকতা

(Good Citizenship)

বর্তমান পৃথিবীর আদর্শ গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া মানবসমাজ সুন্দর ও সম্পূর্ণ জীবন গড়িয়া তুলিতে আকাংক্ষিত। কিন্তু গণতন্ত্রের আদর্শকে সার্থক করিতে হইলে নাগরিকগণের মধ্যে বিশেষ কতকগুলি গুণ বর্তমান থাকা প্রয়োজন, কারণ গণতন্ত্রে রাষ্ট্র ও সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্ব নাগরিকগণের উপর ন্যস্ত থাকে। সুতরাং তাহাদের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের গুণাগুণ ও সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণ। যে-সকল গুণ গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে করা হয় তাহা যে-নাগরিকের মধ্যে আছে তাহাকেই 'সুনাগরিক' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

গণতন্ত্রকে সার্থক করিবার জন্য প্রয়োজন সুনাগরিকের

সুনাগরিক কাহাকে বলে

এখন প্রশ্ন হইল, সুনাগরিকতার এই অপরিহার্য লক্ষণগুলি কি কি? লর্ড ব্রাইস সুযোগ্য নাগরিকের তিনটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সুনাগরিককে (১) বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, (২) সংযমী, এবং (৩) বিবেকসম্পন্ন হইতে হইবে। বর্তমান সমাজ সমস্যাবহুল; এই সকল সমস্যা আবার জটিল। সুতরাং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন না হইলে নাগরিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির প্রকৃতি বুঝিতে পারিবে না এবং উহাদের সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতে পারিবে না। ফলে সে মন্দ লোক কর্তৃক ভুল পথে চালিত হইতে পারে। এইজন্য শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সুনাগরিকতার আলোচনা প্রসংগে উক্তি করিয়াছেন যে, প্রত্যেক নাগরিককে ভালমন্দ, সত্যাসত্যের উপলব্ধি করিবার মত যোগ্য বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে হইবে। এই জ্ঞান ব্যতীত সে নিজের কল্যাণ এবং সমাজের কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হইবে না। সুনাগরিকতার জ্ঞানগত দিক ছাড়া নৈতিক দিকও আছে। নৈতিক দিক হইতে সুনাগরিকতার জন্য আত্মসংযম ও সমাজচেতনা বা বিবেকের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।* এই গুণাবলীর কথা চিন্তা করিয়াই অন্যতম আধুনিক ইংরাজ লেখক বার্ণস (Delisle Burns) বলিয়াছেন যে, গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিককে সমাজদরদী ও স্বাধীনচিত্ত হইতে হইবে।** আত্মসংযম ব্যতীত সুষ্ঠু ও সবল সামাজিক জীবন গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় না। আত্মসংযমী ব্যক্তিই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা

সুনাগরিকতার তিনটি লক্ষণ :

১। বিচারবুদ্ধি

২। আত্মসংযম, এবং
৩। বিবেক

---

* V. 3. Srinivasa Sastri : *The Rights and Duties of the Indian Citizen* (Kamala Lectures)

** C. Delisle Burns : *Democracy—Its Defects and Advantages*

করিতে পারে, সাময়িক উত্তেজনাকে দমন করিতে পারে এবং সহিষ্ণুতার সহিত অপরের মতামতের বিচার করিতে পারে। আবার বিবেক সম্পন্ন ও স্বাধীন-চেতা নাগরিকই সমাজের কল্যাণে নিজেকে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে নিয়োগ করে, নাগরিক-দায়িত্ব পালন করে এবং প্রয়োজন হইলে সামাজিক স্বার্থের জন্য নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত থাকে। সে নির্ভীক হইলেও উদ্ধত নহে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হইলেও বলপূর্বক নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় না। মোটকথা, আত্মসংযমী ও বিবেকসম্পন্ন নাগরিক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সমাজবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রাণবন্ত। গণতন্ত্রের বনিয়াদ এইরূপ নাগরিক ভিন্ন গড়িয়া তোলা যায় না।

সুনাগরিক সমাজ-কল্যাণে অনুপ্রাণিত

সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধক (Hindrances to Good Citizenship): সুনাগরিকতার পথে নানা প্রকারের বাধা-বিঘ্ন আছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান তিনটি—যথা, (ক) নির্লিপ্ততা, (খ) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, এবং (গ) দলীয় মনোভাব।

সুনাগরিকতার পথে তিনটি প্রধান প্রতিবন্ধক :

(ক) নির্লিপ্ততা (Indolence): নির্লিপ্ততাকেই সুনাগরিকতার প্রধান অন্তরায় হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। নির্লিপ্ততার জন্যই নাগরিক সাধারণের কার্যে ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে উদাসীন ও উৎসাহহীন হইয়া পড়ে এবং নাগরিক-কর্তব্যকে অবহেলা করিয়া চলে। সর্বসাধারণের কাজ বিশেষভাবে কাহারই কাজ নয়—এই মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া নাগরিক সমাজের প্রতি নিজের কর্তব্যটুকু ভুলিয়া যায়। সে মনে করে আরও দশজন ত আছে; সুতরাং তাহাকে না হইলেও চলিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া সাধারণের কার্যে ব্যক্তিগত লাভের প্রত্যক্ষ সম্ভাবনা খুব কম থাকে বলিয়া নাগরিক উৎসাহহীন হইয়া এই সকল ব্যাপারে নিলিপ্ত থাকিতে চেষ্টা করে।

ক। নির্লিপ্ততা

কিভাবে নির্লিপ্ততার সৃষ্টি হয়

এইরূপ মনোভাবের জন্য সে নির্বাচনের সময় ভোটদান হইতে বিরত থাকে, নিজের মতামতকে সত্য জানিয়াও তাহার জন্য সংগ্রাম করিতে চায় না, শত্রুর আক্রমণে দেশ বিপন্ন হইলেও দেশরক্ষাকার্যে অগ্রসর হয় না এবং অবিলম্বে খ্যাতিলাভের সম্ভাবনা না থাকিলে সাধারণের প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে ইচ্ছুক হয় না। নিলিপ্ততার জন্যই আবার সে পৌরকর্তব্যকে (civic duties) এড়াইয়া চলে। অথচ, সমাজবন্ধনের গোড়ার কথা হইল সহযোগিতা; সহযোগিতার উপর ভিত্তি করিয়াই মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে। সামাজিক কল্যাণ ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের কল্যাণ সম্ভব হয় না, আর একমাত্র প্রত্যেকটি ব্যক্তির শুভবুদ্ধিপ্রসূত কর্মপ্রচেষ্টাই সমাজ-কল্যাণকে সর্বাধিক এবং সমাজজীবনকে

নির্লিপ্ততা কিভাবে প্রকাশ পায়

সার্থক করিয়া তুলিতে পারে। সমাজজীবনকে দুর্বল রাখিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। সমাজ পংগু ও শৃংখলিত হইয়া পড়িলে সমাজভুক্ত মানুষও পংগু ও শৃংখলিত হইতে বাধ্য। তাই কর্মজড়তা, মানসিক অবসাদ ও ব্যক্তিগত লোভ মানুষের পরম শত্রু।

নির্লিপ্ততার ফলে ব্যক্তি ও সমাজজীবন উভয়ই ব্যাহত হয়

কিন্তু বর্তমান সময়ে নানাবিধ কারণে নাগরিকদের মধ্যে নির্লিপ্ততা প্রসারের সম্ভাবনা বাড়িয়া গিয়াছে। প্রথমত, গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের মত প্রাচীন যুগের রাষ্ট্র আকারে ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং স্বল্প জনসংখ্যাসমন্বিত। সুতরাং নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু বর্তমান যুগের জাতীয় রাষ্ট্র আয়তনে এবং জনসংখ্যায় বৃহৎ। এই বিশাল আয়তন ও জনসমুদ্রের মধ্যে ব্যক্তি নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য বলিয়া মনে করে। যেমন, নির্বাচনের সময় সে মনে করে অগণিত ভোটের মধ্যে তাহার একটি ভোটের মূল্য অতি সামান্যই। এই মনোভাবের দরুন সে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিরুৎসাহ ও কর্মবিমুখ হইয়া পড়ে।

নির্লিপ্ততার কারণ

১। বৃহদাকার রাষ্ট্র

দ্বিতীয়ত, বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রনৈতিক দিক ছাড়া অন্যান্য দিকের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং স্বাভাবিকভাবেই মানুষের দৃষ্টি অন্যান্য ক্ষেত্রে অধিকমাত্রায় আকৃষ্ট হইতেছে। যেমন, খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ, শিল্প, সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদিতে মানুষ অধিক মত্ত হইয়া পড়ায় রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে ঔদাসীন্যের মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে এবং নাগরিক-কর্তব্যে অবহেলার মনোভাব অধিকাংশের মধ্যে সংক্রমিত হইতেছে।

২। নানাদিকে নাগরিকের আকর্ষণ বৃদ্ধি

তৃতীয়ত, বর্তমান পৃথিবীতে বিশেষ করিয়া ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে জীবনসংগ্রাম তীব্রতর হইয়া পড়িয়াছে। জীবনধারণের জন্য উপার্জন করিতেই মানুষের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়; অবসর তাহার হাতে সামান্যই থাকে। এই অবস্থায় ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে চিন্তা বা কার্য করিবার সুযোগ অতি সামান্যই পায়।

৩। জীবনসংগ্রামের তীব্রতা

চতুর্থত, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা উভয়ই মানসিক অসাড়তা টানিয়া আনে। ভারতের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেই বিষয়টি সহজে বুঝা যাইবে। এতদিন পর্যন্ত ভারতে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাতে প্রকৃত মানুষ গড়িয়া তুলিবার কোন চেষ্টাই ছিল না। পুঁথিগত বিদ্যাকে কোনরকমে মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই ছিল উহার একমাত্র সার্থকতা। ফলে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার বা জানিবার কোন আকাংক্ষাই থাকিত না বলিলে চলে। শুধু ইহাই নয়, অধিকাংশের ভাগ্যে এ-শিক্ষাও

৪। অশিক্ষা ও কুশিক্ষা

স্ফুটিত না। সম্প্রতি অবশ্য আমাদের দেশে শিক্ষাকে নূতনভাবে ঢালিয়া সাজাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

(খ) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা (Private Interest): নির্লিপ্ততার পরেই সুনাগরিকতার প্রধান প্রতিবন্ধক হইল ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ। ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভে মানুষ অনেক সময়ই নাগরিক-কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং সমাজবিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী কার্য করিতে প্রয়াস পায়। নানাভাবে এই স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়—যথা, উৎকোচ গ্রহণ ও প্রদান। অনেক সময়ই উৎকোচের বিনিময়ে ভোট ক্রয়বিক্রয় চলে। উপযুক্ত প্রার্থীকে ভোটপ্রদান না করিয়া অযোগ্য প্রার্থীকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির লোভে নির্বাচিত করা হয়। সরকারী দল অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনে জয়লাভের আশায় গুণাগুণ বিচার না করিয়া প্রভাবশীল ব্যক্তিদের খেতাব ও সম্মান বিতরণ করিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করে। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজকর্ম বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার হাতে বিভিন্ন কাজের 'কণ্ট্রাক্ট' প্রদানের ক্ষমতাও যথেষ্ট রহিয়াছে। ব্যবসায়ীশ্রেণী, ঠিকাদার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। একদিক দিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা নির্লিপ্ততা অপেক্ষাও সমাজের অধিক অহিতসাধন করে। স্বার্থের হানাহানি সমাজবন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয় এবং সমাজের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব অনবরত চলিতেই থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম সমাজধর্ম, লোভ রিপু তাহার প্রধান হন্তারক।

খ। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা

কিভাবে স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়

ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা নির্লিপ্ততা অপেক্ষাও ক্ষতিকর হইতে পারে

(গ) দলীয় মনোবৃত্তি (Party Spirit): দলীয় মনোবৃত্তিকে সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক বলিয়া অভিহিত করা হয়। আবার ইহাও বলা হয় যে গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হইল দলপ্রথা। দলপ্রথার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও শিক্ষা প্রসারলাভ করে, জনমত সংগঠিত ও মূর্ত হয়, নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচন ও নীতি-নির্ধারণ এবং স্বৈরাচারিতার পথকে অবরোধ করিতে পারে। তাহা হইলে সুনাগরিকতা ও দলপ্রথার মধ্যে বিরোধ কোথায়? ইহার উত্তরে বলা হয় যে, প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক দল নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে সর্বসাধারণের কল্যাণ-সাধন করিতে চায়। এই আদর্শ হইতে যখন কোন দল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, যখন ইহা জনসাধারণের বৃহত্তর মংগলের পরিবর্তে দলভুক্ত মুষ্টিমেয়ের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করিবার যন্ত্রে পরিণত হয় তখনই ইহা সমাজবিরোধী হইয়া সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য করে। দলীয় সদস্যগণ দলীয় আনুগত্যের ফলে নাগরিকতার আদর্শ ভুলিয়া

গ। দলীয় মনোবৃত্তি

আদর্শভ্রষ্ট দলই সুনাগরিকতার অন্তরায়

যায় এবং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ অপেক্ষা দলগত স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে থাকে। ভারতের কথা উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, এখনও এমন দল আছে যাহা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াইয়া আপন সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে।

ঘ। অন্যান্য প্রতিবন্ধক —সংবাদপত্র প্রভৃতি

উপরি-উক্ত প্রতিবন্ধক ছাড়া সংবাদপত্র, নির্বাচন-পদ্ধতি প্রভৃতি সুনাগরিকতার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায়, সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সুচিন্তিত অভিমতপ্রদানই সুনাগরিকতার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত দিতে হইলে উহাদের বিভিন্ন দিকের মতামত জানিতে হইবে। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। সাধারণ নাগরিকদের উপর ইহাদের প্রভাব অপরিসীম। সুতরাং ইহারা যে-ধরনের সংবাদাদি সরবরাহ করে তাহার দ্বারাই অনেক পরিমাণে নাগরিকদের মতামত গঠিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় অনেক সময়ই সংবাদপত্রগুলি বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করিয়া সাধারণ নাগরিককে ভুলপথে পরিচালিত করে। এইজন্যই লর্ড ব্রাইস উক্তি করিয়াছেন যে, সংবাদপত্রগুলি দিনের পর দিন বিভিন্ন ঘটনাকে বিকৃত করিয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করিয়া চলে।

কিভাবে সংবাদপত্র প্রতিবন্ধকের কার্য করিতে পারে

নির্বাচন-পদ্ধতির ত্রুটি-জনিত প্রতিবন্ধকতা

নির্বাচন-পদ্ধতির ত্রুটির জন্যও নাগরিকগণ অনেক সময় রাষ্ট্রনৈতিক কার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ না পাইয়া নির্লিপ্ত হইয়া পড়ে। সংখ্যালঘু দলভুক্ত নাগরিকগণ যদি দেখে যে কোনমতেই তাহারা আইন-সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে না তবে নির্বাচন প্রভৃতিতে তাহাদের কোন উৎসাহ থাকে না; রাষ্ট্রকার্যে অংশগ্রহণের দ্বারা তাহারা নাগরিকের কর্তব্যও পালন করিতে পারে না।

সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধক দূরিকরণের পন্থা (Measures to remove the Hindrances to Good Citizenship):

দুই প্রকার প্রতি-বিধান: (১) শাসন-তান্ত্রিক, (২) নৈতিক

সুনাগরিকতার অন্তরায়সমূহের আলোচনার পর স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা করিতে হয় যে, কিভাবে এই সকল প্রতিবন্ধককে দূর করা যায়। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন প্রতিবিধানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই সকল প্রতিবিধানকে মোটামুটিভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি—(ক) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান, এবং (খ) নৈতিক প্রতিবিধান।

ক। শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান: নানাবিধ শাসনতান্ত্রিক নিয়মকানুন প্রবর্তনের দ্বারা সুনাগরিকতার পথ সুগম করাই এই প্রকার প্রতিবিধানের উদ্দেশ্য। দেখা যায়, অনেক নাগরিকই নির্বাচন ব্যাপারে নির্লিপ্ত এবং ভোট-

প্রদানে বিরত থাকে। এই নির্লিপ্ততা গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলিয়া মনে করা হয়, কারণ নাগরিকগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করিলে নির্বাচনের ফলাফলকে 'জন-মতের প্রকাশ' (expression of public opinion) বলিয়া ধরা ভুল হইবে।

১। বাধ্যতামূলক ভোটদান

এইজন্য অনেকের মতে, ভোটপ্রদান বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশে এই পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এই সকল দেশের আইন অনুসারে উপযুক্ত কারণ ব্যতীত ভোট না দেওয়া দণ্ডনীয়। কিন্তু এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রকৃত নাগরিক গড়িয়া তোলা যায় না, এবং নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে অনুভূতি ও উৎসাহের উদ্রেক না করিতে পারিলে কোন সুফলই ফলিবে না। শিক্ষা বিস্তার ও প্রচারের মাধ্যমেই নাগরিকদের মধ্যে কর্তব্য সম্পর্কে উপলব্ধি ও সচেতনা জাগ্রত করা সম্ভবপর হয়।

ইহা প্রকৃত প্রতিকার নহে

২। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

আবার বলা হয়, গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে হইলে একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নাগরিকগণের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা থাকিলে চলিবে না, অন্যান্য সময়েও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগসুবিধা থাকা প্রয়োজন। ইহার দ্বারা একদিকে যেমন সরকার জনগণের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, অপরদিকে তেমনি নাগরিকগণও সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত হয়। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহের মধ্যে গণভোট (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative) এবং পদচ্যুতির (Recall) কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।* এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ল্যাস্কি প্রমুখ বহু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান রাষ্ট্রসমূহে নির্বাচকদের সংখ্যা এত বেশী ও সমস্যা-সমূহ এত জটিল যে গণভোট বা গণ-উদ্যোগের দ্বারা আইন নির্ধারণ করা সম্ভব বা কাম্য নয়।

অনেকে ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধেও সন্দিহান

৩। সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্রের আর একটি প্রধান সমস্যা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন ও বিভিন্ন সমস্যার বিচারবিবেচনায় সংখ্যালঘিষ্ঠগণের মতামত প্রকাশের সুযোগসুবিধা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইহা না করিলে স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যালঘিষ্ঠগণ মনে করিবে তাহাদের মতামতের কোন মূল্য নাই এবং তাহাদের স্বার্থ অসংরক্ষিত। কিন্তু সাধারণ নির্বাচন-পদ্ধতির সাহায্যে তাহারা ভোটসংখ্যার অনুপাতে আইনসভায় আসনলাভ করিতে পারে না।

---

* ৩৫ পৃষ্ঠা।

এমন হইতে পারে যে, তাহারা মোট নির্বাচকদের শতকরা ২৫ ভাগের সমর্থন পাইয়াও আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্য অনেক দেশে আইনসভা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থার নির্বাচনের জন্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (Proportional Representation) ব্যবস্থা আছে।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা—সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

এই পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক দল ভোটসংখ্যার অনুপাতে আসন অধিকার করিতে সমর্থ হয়। যেমন, আইনসভায় যদি ১০০টি আসন থাকে তবে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল মোট নির্বাচকদের শতকরা ২৫ ভাগ হইলে উহারা ২৫টি আসন অধিকার করিতে পারিবে। আমাদের দেশে রাজ্যসভার নির্বাচনে এই পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই এই পদ্ধতিকে সুনজরে দেখেন না। কারণ, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ফলে কোন দলই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না; ফলে একাধিক দল লইয়া 'সম্মিলিত সরকার' (coalition government) গঠিত হয়। এই ধরনের সরকার দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী হয়। সুতরাং উহা কাম্য নহে।

বর্তমানে এই পদ্ধতিকে সমর্থন করা হয় না

উপরি-উক্ত পদ্ধতি ছাড়া সকল রাষ্ট্রেই দুর্নীতি ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ ও নির্বাচনে অসাধু উপায় অবলম্বনের জন্য শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা আছে—যেমন, ভারতে উৎকোচ প্রদান, ভোটদাতাদের উপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার, ভোটদানকেন্দ্র হইতে ব্যালট কাগজ সরানো, ইত্যাদি কার্য বেআইনী ও অসাধু আচরণের অন্তর্গত।

৪। দুর্নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

খ। **নৈতিক প্রতিবিধান :** সুনাগরিকতার পথে অন্তরায়কে দূর করিবার জন্য শাসনযন্ত্রের উন্নতিসাধনই যথেষ্ট নয়। মানুষকে প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিলে সমস্ত ব্যবস্থাই বিফল হইতে বাধ্য। সুতরাং আসল সমস্যা হইল মানুষের নৈতিক বা মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষসাধন। তাহা হইলেই নাগরিকদের মধ্যে সমাজবোধ, উদ্যম ও শুভবুদ্ধি প্রকাশ পাইবে। ইহার জন্য চাই জনসাধারণের জন্য সুশিক্ষা—এ-শিক্ষা কেবল জীবিকার্জনেই সাহায্য করিবে না, অপরের প্রতি দরদী এবং সমাজহিতের প্রতি অনুগত করিয়াও তুলিবে।

নৈতিক প্রতিবিধানের গুরুত্ব

সংক্ষিপ্তসার

গণতন্ত্রকে সার্থক করিবার জন্য প্রয়োজন সুনাগরিকের। সুনাগরিক বিচারবুদ্ধি, আত্মসংযম, বিবেক প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হইয়া সমাজ-কল্যাণে অনুপ্রাণিত হয়।

সুনাগরিকতার পথে নানা প্রতিবন্ধক আছে—যথা, ১। নির্লিপ্ততা, ২। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, এবং ৩। দলীয় মনোভাব। তন্মধ্যে নির্লিপ্ততাই প্রধান। নির্লিপ্ততার কারণ হইল বর্তমানের বৃহদাকার রাষ্ট্র,

সাধারণভাবে নাগরিকের আকর্ষণবৃদ্ধি, জীবনসংগ্রামে তীব্রতা এবং অশিক্ষা ও কুশিক্ষা। ইহাদের জন্য নাগরিক সামাজিক কর্তব্য এড়াইয়া চলে।

ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের ফলে নাগরিক সমাজের ক্ষতি করে।

দলীয় মনোবৃত্তির ফলে নাগরিক জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে।

ইহা ছাড়াও সংবাদপত্র, নির্বাচন-পদ্ধতি প্রভৃতি সুনাগরিকতার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকে।

প্রতিবিধান : প্রতিবিধান প্রধানত দুই প্রকারের—১। শাসনতান্ত্রিক, এবং ২। নৈতিক।

শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের মধ্যে (ক) বাধ্যতামূলক ভোটপ্রদান ; (খ) গণভোট, গণ-উদ্যোগ ও পদচ্যুতির ন্যায় প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ; (গ) সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ; (ঘ) সমাজবিরোধী ও দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম দমন—এইগুলিই প্রধান।

নৈতিক প্রতিবিধান হইল নাগরিককে প্রকৃত শিক্ষিত করিয়া তোলা।

প্রশ্নোত্তর

1. What do you understand by 'Good Citizenship'? Describe the factors that hinder it. (C. U. 1947)

'সুনাগরিকতা' বলিতে কি বুঝ? যে যে বিষয় ইহার পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে তাহা বর্ণনা কর।

[৯৩-৯৭ পৃষ্ঠা]

2. Explain the hindrances to Good Citizenship. Show how they can be removed. (C. U. 1955, '59, '61 '63 ; En. 1962)

সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধকগুলি ব্যাখ্যা কর। ঐগুলি কিভাবে দূরীভূত করা যায় দেখাও।

[৯৪-৯৭ এবং ৯৭-৯৯ পৃষ্ঠা]

3. Discuss the hindrances to Good Citizenship (En. 1964)

সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

[৯৪-৯৭ পৃষ্ঠা]

নবম অধ্যায়

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

(Rights and Duties of Citizens)

অধিকার কাহাকে বলে ? (What are Rights ?) : সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিই সুখী হইতে চায়—তাহার আত্মশক্তিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিয়া ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করিতে চায়। জনসাধারণের এই অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনা বিকাশের ব্যবস্থা করিয়া সুন্দর নাগরিক জীবন গড়িয়া তোলাই সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার। যেমন, জনসাধারণের মানসিক ও নৈতিক বিকাশের জন্য চাই শিক্ষার সুযোগ। ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য এইরূপ যে-সকল সুযোগসুবিধার প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাহাদিগকেই অধিকার বলিয়া অভিহিত করা হয়।

অধিকার বলিতে আত্মবিকাশের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা বুঝায়

প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রের নিকট হইতে এই সকল সুযোগসুবিধা বা অধিকার দাবি করিতে পারে; আর রাষ্ট্রেরও কর্তব্য হইল ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য অপরিহার্য অধিকারগুলি প্রদান করিয়া নাগরিককে সুন্দর ও পরিপূর্ণ জীবন গঠন করিতে সহায়তা করা। উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা অধিকারের সংজ্ঞা এইভাবে নির্দেশ করিতে পারি: যে-সকল সামাজিক সুযোগসুবিধা ব্যতীত মানুষ তাহার পূর্ণ উন্নতি-বিধানে সচেষ্ট হইতে পারে না তাহাদিগকে অধিকার বলা যায়।

অধিকারের সংজ্ঞা

অধিকারের বৈশিষ্ট্য:
১। অধিকার আত্ম-বিকাশে সহায়তা করে

এই সংজ্ঞার বিশ্লেষণ করিলে অধিকারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত, অধিকারের উদ্দেশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগপ্রদান।

দ্বিতীয়ত, অধিকার হইল সামাজিক সুযোগসুবিধা। অর্থাৎ, সমাজের মধ্যে থাকিয়াই মানুষ অধিকার ভোগ করিতে পারে, সমাজের বাহিরে নয়। সমাজবদ্ধ লোকের পারস্পরিক স্বীকৃত দাবিই অধিকার। যেমন, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকারের জন্য আমি দাবি করি যে অপরে আমার গতিবিধিতে বাধা দিবে না; অপরেও সেইরূপ দাবি করে যে আমি তাহাদের গতিবিধিতে বাধা দিব না। কিন্তু সমাজ-বহির্ভূত লোক কাহার উপর দাবি করিবে? এবং কেই বা তাহার দাবি মানিয়া লইবে? সুতরাং সমাজ-বহির্ভূত অধিকার বলিয়া কিছুই নাই।

২। সমাজের বাহিরে অধিকার থাকিতে পারে না

তৃতীয়ত, অধিকার চিরন্তন বা শাশ্বত নয়। সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সংগে সংগে ইহারাও পরিবর্তিত হইতেছে। অন্যভাবে বলা যায়, অধিকার স্থান কাল এবং অবস্থার আপেক্ষিক। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি বুঝা যাইবে। আদিম যুগে মানুষ যখন বনজংগলে ঘুরিয়া বেড়াইত তখন শ্রমিক-সংঘ গড়িবার অধিকারের কোন প্রশ্নই উঠে নাই। কিন্তু বর্তমান শিল্প-সভ্যতার যুগে শ্রমিক-সংঘ গঠনের অধিকার শ্রমিকদের একটি বিশেষ মূল্যবান অধিকার। আবার এক সময় ছিল যখন কলকারখানা প্রভৃতি উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা একটি প্রধান অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইত; এখন কিন্তু সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে ব্যক্তিগত মালিকানার স্থলে সামাজিক মালিকানা প্রবর্তিত হইবার দিকে ঝোঁক দেখা দিয়াছে।

৩। অধিকার স্থান ও কালের আপেক্ষিক

চতুর্থত, অধিকার ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা হইলেও বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এই সুযোগসুবিধা কোন ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীর এক-চেটিয়া অধিকার হইতে পারে না। সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকলেই সমানভাবে এই সকল সুযোগসুবিধা ভোগ করিবে। যখন এইরূপ ঘটে তখনই অধিকার হইয়া উঠে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের সহায়ক সার্থক অধিকার। এইরূপ সার্থক অধিকারের প্রতিষ্ঠাই গণতান্ত্রিক আদর্শ।

৪। অধিকার সকলের জন্য

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Rights): নানাভাবে অধিকারের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে একটি শ্রেণীবিভাগ হইল নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে। আইনগত অধিকার আবার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক—প্রধানত এই দুই প্রকারের হয়। ইহার উপর সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক অধিকারও বিশেষ গুরুত্বলাভ করিয়াছে। নিম্নে অধিকারের এই সকল শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইল:

(১) নৈতিক ও আইনগত অধিকার (Moral and Legal Rights): সমাজের ন্যায়বোধ ও বিবেক দ্বারা সমর্থিত পারস্পরিক দাবিকেই 'নৈতিক অধিকার' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এইরূপ অধিকারের পশ্চাতে রাষ্ট্র-শক্তি বা আইনের সমর্থন থাকে না। ফলে নৈতিক অধিকার ভংগ করা হইলে আইনসংগতভাবে প্রতিকারবিধানের কোন উপায় থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সমাজে মাতাপিতার নৈতিক অধিকার রহিয়াছে বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের নিকট হইতে আদর-যত্ন পাইবার। এখন কোন সন্তান যদি এই কর্তব্যপালন না করে তবে মাতাপিতা আইনে তাহার প্রতিবিধান পাইতে পারেন না।

নৈতিক অধিকার সমাজের ন্যায়বোধ দ্বারা সমর্থিত

আইনগত অধিকার হইল আইনানুমোদিত পারস্পরিক দাবি। আইন দ্বারা অনুমোদিত বলিয়া রাষ্ট্র ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। ইহা ভংগ করা হইলে আইন-আদালতে প্রতিকার পাওয়া যায়। যেমন, প্রত্যেকের জীবনের নিরাপত্তার অধিকার আছে। কেহ অপরের জীবননাশ করিলে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

আইনগত অধিকারের ভিত্তি হইল রাষ্ট্রের আইন

আইনগত অধিকারই প্রকৃত নাগরিক-অধিকার। নৈতিক অধিকারের পশ্চাতে রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন থাকে না বলিয়া নাগরিকের শাস্ত্র পৌরবিজ্ঞানে ইহা লইয়া আলোচনা করা হয় না।

(২) সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (Civil and Political Rights): বলা হইয়াছে যে আইনগত অধিকারকে সাধারণত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সামাজিক অধিকার বলিতে বুঝায় সেই অধিকারগুলিকে যাহা ব্যতীত মানুষের পক্ষে সুসভ্য সামাজিক জীবনযাপন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। জীবনের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের অধিকার, পরিবার-গঠনের অধিকার প্রভৃতি এই সামাজিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। এইগুলি না থাকিলে মানুষের জীবন বন্য পশুর জীবনে পরিণত হইয়া পড়িত। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ। বর্তমান যুগে নির্বাচন করিবার অধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার, সরকারী চাকরি পাইবার অধিকার প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত।

সামাজিক অধিকার কাহাকে বলে

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার কাহাকে বলে

বিভিন্ন সামাজিক অধিকার : নাগরিকের কি কি সামাজিক অধিকার থাকিবে সে-সম্বন্ধে বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করা হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও বর্তমানে কতকগুলি সামাজিক অধিকারকে মৌলিক হিসাবে গণ্য করা হয়, কারণ এই অধিকারগুলি না থাকিলে মানুষের পক্ষে সামাজিক জীবন নিরর্থক হইয়া পড়ে। নিম্নে মৌলিক সামাজিক অধিকারগুলির বর্ণনা করা হইল :

(ক) জীবনের অধিকার (Right to Life): জীবনের অধিকার বলিতে বাঁচিয়া থাকার অধিকার বুঝায়। ইহা মৌলিক সামাজিক অধিকারগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান। এই অধিকার না থাকিলে অন্য সকল অধিকার মূল্যহীন হইয়া পড়ে। আমাকে যদি কেহ যখন ইচ্ছা হত্যা করিতে পারে এবং তাহার যদি কোন প্রতিবিধানের ব্যবস্থা না থাকে তবে আমার পক্ষে সমাজে বা রাষ্ট্রে বাস করা অর্থহীন। এই কারণে প্রত্যেক রাষ্ট্রই পুলিসবাহিনী, বিচারব্যবস্থা, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতির সাহায্যে ব্যক্তির নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করে। হবসের মতে, এইভাবে জীবনরক্ষার সুযোগ লাভ করিবার জন্যই আদিম মানুষ চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল। আত্মরক্ষার অধিকার জীবনের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করাও অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

(খ) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Liberty): "জীবনধারণই যথেষ্ট নয়, ধারণোপযোগী জীবনও হওয়া প্রয়োজন।" মানুষ সামাজিক জীব। সে চায় পরিপূর্ণ জীবনযাপন করিতে। এইজন্য তাহার পক্ষে প্রয়োজন স্বাধীনতার অধিকারের। স্বাধীনতার অধিকার বলিতে দুইটি অধিকার বুঝায়—যথা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার ও স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করিবার অধিকার বা সুযোগ। এই অধিকার থাকিলেই মানুষ নিজেকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে। বর্তমানে কেহই যে দাসত্বপ্রথা সমর্থন করে না, তাহার কারণ হইল দাসত্ব মানুষের স্বাধীনতার বিরোধী। স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া ইহা সুন্দর ও সার্থক জীবনেরও পরিপন্থী। স্বাধীনতার অধিকার অবশ্য অব্যাহত অধিকার নয়। যুদ্ধের সময়ে বা আভ্যন্তরীণ শৃংখলার প্রয়োজনে ইহা কিছুটা খর্ব করা যাইতে পারে।

স্বাধীনতার অধিকার বলিতে কি বুঝায়

(গ) স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার (Right to Freedom of Opinion): গণতন্ত্র হইল সেই শাসন-ব্যবস্থা যাহা জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। জনমতগঠনের জন্য প্রয়োজন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দুই প্রকারের—(ক) বাক্-স্বাধীনতা, এবং (খ) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। মৌখিক ও লিখিতভাবে স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রই তাহাদের অধিবাসীদের দিয়াছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কখনই অবাধ স্বাধীনতা হইতে পারে না। স্বাধীনভাবে

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দুই প্রকারের

মতপ্রকাশের অধিকার আছে বলিয়া মানহানিকর, দুর্নীতিমূলক, রাষ্ট্রদ্রোহিতা-মূলক প্রভৃতি কোনকিছু বলিবার বা লিখিয়া প্রকাশ করিবার অধিকার থাকিতে পারে না। যুদ্ধের সময় বা জনস্বার্থের খাতিরে ইহা খর্বও করা যাইতে পারে।

(ঘ) সম্পত্তির অধিকার (Right to Property): জীবনধারণের জন্য কিছু কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি অপরিহার্য এবং ইহা ভোগ ও অর্জনের ইচ্ছা মানুষের প্রকৃতিগত। এ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন, "ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজ-বন্ধনের অন্যতম মূল গ্রন্থি।" ইহার অর্থ হইল, যে-সমাজ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করে, সে-সমাজের বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়িবে। ফলে সমাজ ভাঙনের পথে চলিবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমানে এই বিষয়ে অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তিই একমত যে, স্বোপার্জিত সম্পত্তিভোগের অধিকার প্রত্যেককেই দেওয়া উচিত। তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার অবাধ নয়; সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনের জন্য রাষ্ট্র এই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে এবং করিয়া থাকে।

(ঙ) চুক্তির অধিকার (Right to Contract): স্বাধীনতার অধিকার ও সম্পত্তির অধিকারের সংগে চুক্তির অধিকার জড়িত। মানুষের যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকে, তবে তাহার পক্ষে চুক্তি করিবার অধিকার থাকাও প্রয়োজনীয়। প্রকৃতপক্ষে, সৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ন্যায্য চুক্তির অধিকার আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি। একথাও অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র এমন চুক্তির অধিকারকেই স্বীকার করে যাহা সামাজিক জীবনের অনুকূল। বেআইনী, দুর্নীতিমূলক অথবা সমাজ-কল্যাণের পরিপন্থী কোন চুক্তিকে রাষ্ট্র কখনই চুক্তির মর্যাদা দেয় না।

(চ) পরিবার-গঠনের অধিকার (Right to Family): পারিবারিক জীবনযাপনের অধিকার অন্যতম মৌলিক অধিকার। পরিবারই আদিমতম সমাজ কি না সে-বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও বর্তমানে ইহা যে সমাজ-জীবনের কেন্দ্র সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকিলে হয়ত সমাজ চলিতে পারে, পারিবারিক জীবন না থাকিলে সমাজ বিনষ্ট হইবেই। সুতরাং এই অধিকার সকল রাষ্ট্রই স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

(ছ) স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার (Right to Freedom of Religion): বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই অধিকারটিকে মানিয়া লইয়াছে। ধর্ম-নিরপেক্ষতা সমাজের প্রগতির লক্ষণ। ভারত অন্যতম ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

(জ) সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার (Right to Association): সমাজে বাস করিবার প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবগত। রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন।

রাষ্ট্রের ভিতরে মানুষ তাহার রাষ্ট্রনৈতিক আশা ও আকাংক্ষাকে রূপায়িত করিবার সুযোগ পায়। কিন্তু মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাংক্ষা ছাড়াও অন্যান্য আশা-আকাংক্ষাও আছে। তাই প্রয়োজন হয় অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের। মানুষের জীবন সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া এই অধিকারটিকে অধিকাংশ রাষ্ট্রই মানিয়া লইয়াছে।

(ঝ) আইনের চক্ষে সমানাধিকার (Right to Equality before Law): বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে আইনের চক্ষে সমানাধিকার অন্যতম মৌলিক সামাজিক অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইন ধনী ও নির্ধন, অভিজাত ও অভাজনের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না।

(ঞ) ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অধিকার (Right to Preserve Distinct Language and Culture): সংখ্যালঘুদের জন্য এই অধিকারটি অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সাধারণতান্ত্রিক ভারতের সংবিধানে সংখ্যালঘুদের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকার লিখিতভাবে দেওয়া হইয়াছে।

এই অধিকারটি সংখ্যালঘুদের জন্য

(ট) শিক্ষার অধিকার (Right to Education): শিক্ষা ব্যতীত মানুষ আত্মবিকাশে সমর্থ হয় না বলিয়া অনেক দেশে শিক্ষার অধিকারও অন্যতম মৌলিক সামাজিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সমাজের প্রগতির সংগে সংগে সামাজিক মৌলিক অধিকারের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার: নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার:

(ক) স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার (Right of Residence): রাষ্ট্রের যে-কোন অংশে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার নাগরিকের আছে। বিদেশীয়দের এই অধিকার নাই।

(খ) বিদেশে অবস্থানকালীন রাষ্ট্রের দ্বারা নিরাপত্তা রক্ষার অধিকার (Right to Protection while staying Abroad): নাগরিকের বিদেশে অবস্থানকালীন রাষ্ট্র তাহার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যদি নাগরিক বিদেশে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেই রাষ্ট্রের কাছে যদি কোন প্রতিকার না পায়, তবে নাগরিকের রাষ্ট্র তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবে।

(গ) নির্বাচন করিবার বা ভোটদানের অধিকার (Right to Vote): নির্বাচন করিবার বা ভোট দিবার অধিকার নাগরিকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। নাগরিক ভোট দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা আর সম্ভব নয়। ভোটাধিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলিয়া ইহার

ভোটাধিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার

প্রসার বিশেষ কাম্য এবং জাতি-ধর্ম, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রদান করাই রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ। এই আদর্শের উপলব্ধি হইলে তবেই শাসন-ব্যবস্থা প্রকৃত গণতান্ত্রিক রূপ ধারণ করে।

(ঘ) নির্বাচিত হইবার অধিকার (Right to be Elected): গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের নির্বাচিত হইবার অধিকারও থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য বিশেষ পদে নির্বাচিত হইবার জন্য নাগরিকের পক্ষে উপযুক্ত বয়স্ক বা বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন হইবার প্রয়োজন হয়। যেমন, ভারতের রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীকে ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচিত হইবার অধিকার সকল নাগরিকের না থাকিলেও যোগ্যতাসম্পন্ন, উপযুক্ত বয়স্ক প্রত্যেক নাগরিকেরই থাকে।

(ঙ) সরকারী চাকরিতে অধিকার (Right to hold Public Office): অধিকাংশ রাষ্ট্রে সকল নাগরিকেরই সরকারী চাকরি পাইবার অধিকার আছে। সরকারী চাকরি করিয়াও নাগরিক শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। অনেক সময় বিদেশীয়কেও সরকারী চাকরিতে নিয়োগ করা হয়; কিন্তু বিদেশীয়ের কোন অধিকার নাই।

(চ) আবেদন করিবার অধিকার (Right to Petition): নাগরিকগণ আবেদন দ্বারা অভাব-অভিযোগ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া প্রতিকারের প্রার্থনা করিতে পারে।

অর্থনৈতিক অধিকার: পূর্বে বলা হইয়াছে যে, নাগরিকের আইনগত অধিকার প্রধানত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক—এই দুই প্রকার হইলেও, সম্প্রতি অর্থনৈতিক অধিকার (economic rights) বিশেষ গুরুত্বলাভ করিয়াছে। অর্থনৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ ও বেকারত্বের ভয়ভাবনা হইতে মুক্তি। ইহার জন্য নাগরিকের যথাযোগ্য কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকার থাকিবে, তাহার জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকিবে, তাহাকে পর্যাপ্ত মজুরি দিতে হইবে, সে যাহাতে যথেষ্ট অবকাশ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইত্যাদি। আধুনিক সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রে এই সকল অধিকার মানিয়া লওয়া হইতেছে। ইহার উপর কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিককে শিল্প-পরিচালনার অধিকারও দেওয়া হইতেছে।

অর্থনৈতিক অধিকারের স্বরূপ

নাগরিকের কর্তব্য (Duties of a Citizen): নাগরিকের অধিকারের আলোচনার পর তাহার কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে হয়, কারণ অধিকারের ধারণার মধ্যেই কর্তব্যের ধারণা নিহিত রহিয়াছে। আমি যদি অধিকার ভোগ করিতে চাই তাহা হইলে অপরকে কর্তব্যপালন করিয়া চলিতে হইবে। আবার অপরে যদি অধিকার ভোগ করিতে চায় তাহা হইলে আমাকে কর্তব্যপালন করিতে হইবে। যেমন, আমার যদি জীবনের

অধিকার ভোগের জন্যই কর্তব্যপালন করিতে হয়

নিরাপত্তার অধিকার থাকে তাহা হইলে অপরের কর্তব্য রহিয়াছে আমার জীবননাশ না করার। আবার অপরের জীবনের নিরাপত্তার অধিকার থাকিলে আমার কর্তব্য রহিয়াছে অপরের জীবনহানি না করার। সুতরাং কর্তব্যের তাৎপর্য, বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য এবং কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে সম্বন্ধ প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে বিশদভাবে জানা প্রয়োজন।

কর্তব্য কাহাকে বলে? (What are Duties?): কোনকিছু করিবার অথবা না করিবার দায়িত্বকেই কর্তব্য আখ্যা দেওয়া যায়। যেমন, প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব রহিয়াছে রাষ্ট্রকে আনুগত্য প্রদান করিবার অথবা অপরের জীবনহানি না করিবার। আধুনিককালে নাগরিকের দায়িত্ব বা কর্তব্যের উপর অধিকারের মতই গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

আইনগত ও নৈতিক কর্তব্য (Legal and Moral Duties): অধিকারের মত কর্তব্যকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) আইনগত কর্তব্য, এবং (২) নৈতিক কর্তব্য। আইনের দ্বারা যে-সকল দায়িত্ব নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং যাহা ভংগ করিলে রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা থাকে তাহাদের আইনগত কর্তব্য বলা হয়। যেমন, আয় অনুযায়ী আয়কর দেওয়া নাগরিকের আইনগত কর্তব্য। কেহ এই কর্তব্যপালন না করিলে তাহাকে রাষ্ট্র আইন অনুযায়ী শাস্তিপ্রদান করিয়া থাকে। অপরদিকে নৈতিক কর্তব্য হইল সেই সকল দায়িত্ব যাহা ব্যক্তি বা সমাজের নৈতিক বোধের উপর নির্ভরশীল। নৈতিক দায়িত্ব পালন না করা হইলে ব্যক্তি সমাজের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু আইনের চক্ষে দণ্ডনীয় হয় না—অর্থাৎ, তাহাকে আইন-আদালতের হস্তে শাস্তি ভোগ করিতে হয় না। যেমন, বৃদ্ধ পিতামাতাকে প্রতিপালন করা সন্তানের নৈতিক কর্তব্য। কিন্তু কোন সন্তান এই কর্তব্য অবহেলা করিলে বা পালন না করিলে তাহাকে আইন-নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করিতে হয় না। অবশ্য নৈতিক ও আইনগত কর্তব্যের শ্রেণী-বিভাগ সকল দেশে এক নহে। কোন দেশে যাহা নৈতিক কর্তব্য অপর দেশে তাহা আইনগত কর্তব্যের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। যেমন, অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নাগরিকের নির্বাচনের সময় ভোটপ্রদান করা নৈতিক কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু বেলজিয়াম বা সুইজারল্যাণ্ডে ভোটপ্রদান করা আইনগত অবশ্য করণীয় কর্তব্য।

আইনগত কর্তব্য রাষ্ট্রের আইন দ্বারা সমর্থিত

নৈতিক কর্তব্যের ভিত্তি সমাজের বিবেক

আইনগত ও নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য সকল সময় সুস্পষ্ট নয়

অনেক সময় নৈতিক কর্তব্য ও আইনগত কর্তব্যের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিতে পারে। যেমন, আইন মান্য করা নাগরিকের কর্তব্য; কিন্তু ইতিহাসে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে যে অনেক সময় আইন অধিকাংশ লোকের স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ করিয়াছে,

আইনগত ও নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিতে পারে

এবং ফলে কাম্য সমাজজীবনের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় প্রকৃত নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য হইল এই প্রকার বিকৃত রাষ্ট্র ও বিকৃত আইনের বিরোধিতা করা। এই কারণেই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক সময় আমরা 'আইন অমান্য আন্দোলন' চালাইয়াছি। তবে শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে অনুসরণ করিয়া বলা যায়, সমস্ত দিকের সম্যক বিচারবিবেচনা করিয়া অতি সতর্কতার সহিত আইন ও রাষ্ট্রের বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হইতে হইবে।

নাগরিকের বিভিন্ন প্রকারের কর্তব্য (Different Kinds of Duties of a Citizen): ব্যাপক দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে প্রত্যেক নাগরিকের পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি ও রাষ্ট্রের প্রতি বিভিন্ন ধরনের কর্তব্য রহিয়াছে।

ক। পরিবারের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য

সামাজিক সংগঠনের মূলভিত্তি ও প্রাথমিক সংস্থা হইল পরিবার। পরিবারের অংগ হইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে, লালিতপালিত হয় এবং আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হয়; ইহার মধ্য দিয়াই সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতির সহিত তাহার প্রথম পরিচয় ঘটে; ইহার মধ্যেই স্নেহ মমতা ভালবাসা সহযোগিতা প্রভৃতি মানবীয় অনুভূতির প্রকাশ ও প্রসার ঘটে। সুতরাং সুস্থ ও সবল পারিবারিক বন্ধন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণের অপরিহার্য সর্ত।

নাগরিকের এই কর্তব্যই প্রাথমিক

পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব-বন্ধনের দ্বারাই সুখী ও সুস্থ পরিবার গড়িয়া তোলা সম্ভব। পিতামাতার দায়িত্ব রহিয়াছে সন্তানসন্ততিদের লালন-পালন করা ও শিক্ষা দেওয়ার; সন্তানসন্ততিদের কর্তব্য রহিয়াছে পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনের ভক্তি ও মান্য করার; স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব রহিয়াছে সুখে-দুঃখে এক সহযোগে ও একাত্মভাবে সংসার-ধর্ম পালন করার। ভারতীয় সমাজে পরিবার শুধু স্বামী-স্ত্রী সন্তানসন্ততিদের লইয়া গঠিত নয়, অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই দিক দিয়া পরিবারভুক্ত প্রত্যেকের অপর সকলের প্রতি কর্তব্যপালন করিতে হয়। যাহা হউক, পারিবারিক দায়িত্ব পালনের দ্বারাই নাগরিক কল্যাণকর সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারে। যেখানে পারিবারিক সম্বন্ধ শিথিল সেখানে সামাজিক বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়ে।

খ। সমাজের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য

পরিবারের গণ্ডির মধ্যেই নাগরিকের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়; পরিবারের বাহিরে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রেও তাহার দায়িত্ব রহিয়াছে। সমাজকে আশ্রয় করিয়াই মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে; সমাজবদ্ধ জীব হিসাবেই সে বর্তমানের উন্নত জীবনযাত্রা সম্ভব করিয়াছে। মানুষের মধ্যে পূর্ণ বিকাশের যে আকাংক্ষা রহিয়াছে তাহা কখনও সমাজের বাহিরে সফল হইতে পারে না। ব্যক্তিগত মংগল ও সমষ্টিগত মংগল অংগাংগিভাবে জড়িত। অপরের শক্তির সহিত নিজের

শক্তিকে সংযুক্ত করিয়া, অপরের কল্যাণের সহিত নিজের কল্যাণের সামঞ্জস্য-সাধন করিয়াই মানুষ সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে।' এইজন্য প্রত্যেক নাগরিককে অপরের প্রতি দরদ ও সহযোগিতার ভাব লইয়া চলিতে হইবে। অপরের অধিকার যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার প্রতি যত্নবান হইতে হইবে। যাহারা অক্ষম, যাহারা সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের কল্যাণসাধন করা তাহার নাগরিক-দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত; সকল প্রকার সমাজ-সেবামূলক কার্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া সমাজের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন নাগরিকের অন্যতম আদর্শ। ভারতের দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিশাল ভারতের অগণিত জনসংখ্যার অধিকাংশই বাস করে পল্লী অঞ্চলে এবং পল্লীই ভারতের প্রাণকেন্দ্র। দুর্ভাগ্যবশত বহু-দিনের অবহেলা ও শোষণের ফলে পল্লীজীবন আজ নিষ্প্রাণ। সেখানে না আছে শিক্ষা, না আছে সম্বল, না আছে স্বাস্থ্য। প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের দায়িত্ব রহিয়াছে এই অবহেলিত জনগণকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবার। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা, জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা, সমবায় সংগঠন, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি পন্থার সাহায্যে পল্লীসমাজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার যে-প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহার সহিত সক্রিয় সহযোগিতা করা প্রত্যেক ভারতীয়ের কর্তব্য। মোটকথা, সামাজিক ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি আমাদের কর্তব্য রহিয়াছে। এই কর্তব্যপালন করিয়া সামাজিক শান্তি, সামঞ্জস্য ও মংগল প্রতিষ্ঠিত করাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

সমাজের প্রতি কর্তব্য কিভাবে পালন করিতে হইবে

ভারতের উদাহরণ

রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের সদস্য হিসাবে নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতিও কতকগুলি কর্তব্যপালন করিতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনগত পালনীয় হইলেও কতকগুলি সমাজের নৈতিক চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যের মধ্যে প্রধান তিনটি হইল (ক) আনুগত্য প্রদর্শন, (খ) আইন মান্য করা, এবং (গ) করপ্রদান করা।

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য

(ক) আনুগত্য: আনুগত্য (allegiance) নাগরিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। নাগরিক যদি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত না হয়, তবে তাহার নাগরিক-অধিকার কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারে। রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত হওয়ার অর্থ রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতিও অনুগত হওয়া। নাগরিক রাষ্ট্রের আদর্শকে মানিয়া লইয়া সর্বদা তাহার উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করিবে। যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হইলে নাগরিককে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে হইবে; আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলা রক্ষায় সর্বদা তাহাকে সরকারী কর্মচারীর সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। এইভাবেই আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়।

(খ) আইন মান্য করিয়া চলা: নাগরিক রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি অনুগত।

সুতরাং সে রাষ্ট্রের আইন মান্য করিয়া চলিবে। নিজে আইন মান্য করাই যথেষ্ট নয়, অপর সকলে যাহাতে মান্য করে তাহার দিকেও নাগরিককে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নাগরিককে আইন মান্য করিয়া রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপালন করিতে হইবে বলিয়া যে সকল আইনই বিনা প্রতিবাদে মান্য করিয়া চলিতে হইবে এইরূপ মতবাদ অনেকে সমর্থন করেন না। আইন যদি ব্যক্তির অধিকার হরণ করে, ইহা যদি সুষ্ঠু সমাজজীবনের পরিপন্থী হয় তবে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নাগরিকের কর্তব্য।

(গ) নিয়মিতভাবে ন্যায্য করপ্রদান : রাষ্ট্র নাগরিকগণের সংগঠন; নাগরিকগণের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। কোন সংগঠনের কার্যই অর্থ ব্যতিরেকে চলিতে পারে না। নাগরিকগণের সংগঠন রাষ্ট্র যাহাতে সুপরিচালিত হয় তাহার জন্য নাগরিকের কর্তব্য নিয়মিতভাবে ন্যায্য করপ্রদান করা। যে-ব্যক্তি কর ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে সে নাগরিক-মর্যাদা পাইবার অধিকারী নহে।

(ঘ) অন্যান্য কর্তব্য : উপরি-উক্ত তিনটি মুখ্য কর্তব্য ছাড়া নাগরিকের আরও কয়েকটি কর্তব্য রহিয়াছে। রাষ্ট্র যদি নাগরিকের উপর কোন কর্মভার অর্পণ করে তবে নাগরিকের পক্ষে তাহা নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করা উচিত। যদি নাগরিককে রাষ্ট্রের অধীনে কর্ম গ্রহণ করিতে বলা হয়, তবে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নাগরিকের পক্ষে সে কর্ম গ্রহণ করা উচিত। যেমন, কোন বিশিষ্ট আইন-ব্যবসায়ীকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে বলিলে, আইন-ব্যবসায়ীর পক্ষে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য তাহা গ্রহণ করা উচিত। দলগত স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সৎভাবে ভোট দেওয়াও নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য।

অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties) : অধিকার ও কর্তব্যের পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত আছে। বস্তুত, মানুষের সমাজবোধ হইতে অধিকার ও কর্তব্য উভয়েরই জন্ম। সমাজবদ্ধ মানুষের পরস্পরের উপর কতকগুলি দাবি থাকে। এই দাবিগুলি স্বীকারের অর্থ হইল কতকগুলি দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া। এই দায়িত্বগুলিই কর্তব্য। আইনের দ্বারা অনুমোদিত হইলে ইহারা আইনগত কর্তব্যে পরিণত হয়। সুতরাং কর্তব্য ব্যতীত অধিকারের কল্পনা করা যায় না। আমার অধিকারভোগ অপরের কর্তব্যপালনের উপর নির্ভর করে এবং অপরের অধিকারভোগ আমার কর্তব্যপালনের উপর নির্ভর করে। যেমন, ধাক্কা না খাইয়া পথ চলিবার অধিকার যদি আমার থাকে তবে অপরের কর্তব্য হইল আমাকে প্রয়োজনমত পথ ছাড়িয়া দেওয়া।* যাহাতে এই

অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত আছে

উদাহরণ

* "If I have the right to walk along the street without being pushed off the pavement, it is your duty to give me reasonable room." Hobhouse

অধিকার অপর সকলেও ভোগ করিতে পারে তাহার জন্য আমারও কর্তব্য অপরের চলার পথ ছাড়িয়া দেওয়া। আবার জীবনের নিরাপত্তার অধিকার ভোগ করিবার জন্য প্রত্যেকের কর্তব্য রহিয়াছে অপরকে অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে আক্রমণ না করিবার।

অধিকার ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা। এই সুযোগ-সুবিধা সমাজ-বহির্ভূত নয়, সমাজের মধ্যেই ইহা নিহিত। সুতরাং এই সকল সামাজিক সুযোগসুবিধা এমনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যেন ব্যক্তিগত কল্যাণ ও সামাজিক কল্যাণের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় সাধিত হয়। অসামাজিক-ভাবে ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য অধিকারের উদ্ভব হয় নাই। এইজন্য প্রত্যেকটি অধিকারের সহিত একই সময় ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণসাধন করিবার পূর্ণ দায়িত্ব সংযুক্ত রহিয়াছে। মোটকথা, সমাজের মধ্যে থাকিয়া অধিকার ভোগ করা হয় বলিয়া ব্যক্তির পক্ষে সমাজকে কিছুটা প্রতি-দান দেওয়াও প্রয়োজন। এইজন্যই একটি উক্তি আছে যে, যে-ব্যক্তি কার্য করিবে না, সে খাইতেও পাইবে না। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি সমাজের উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণ না করিয়া সমাজের নিকট হইতে ভোগের দাবি করিতে পারে না। আবার নাগরিকের যদি ভোটদানের অধিকার থাকে, তাহার কর্তব্য হইল ব্যক্তিগত স্বার্থের উধ্বে উঠিয়া এবং সমস্যাসমূহের সম্যক বিচারবিবেচনা করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোটদান করা।

প্রত্যেকটি অধিকারের সংগে কর্তব্য সংযুক্ত আছে

অধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্রেরও কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত না হইলে কোন দাবিই আইনের দৃষ্টিতে অধিকার বলিয়া পরিগণিত হয় না, এবং ঐ অধিকারকে আইনগতভাবে বলবৎ করিবারও উপায় থাকে না। শুধু ইহাই নয়। স্বীকৃত অধিকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থার দ্বারা সংরক্ষিত না করিলে উহার মূল্য বিশেষ থাকে না—উহা নামমাত্র অধিকার হইয়া পড়ে। আমাদের অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইয়া ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলে তবেই রাষ্ট্র আমাদের নিকট হইতে আনুগত্য, করপ্রদান প্রভৃতি নানাবিধ কর্তব্য দাবি করিতে পারে। সুতরাং একদিকে অধিকারভোগের জন্য রাষ্ট্রেরপ্রতি আমাদের যেমন কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে, অপরদিকে আবার তেমনি রাষ্ট্রের কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে নাগরিকের আত্মোপলব্ধির উপযোগী অধিকারসমূহকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবার। এই কারণেই উন্নত দেশ-সমূহে মৌলিক অধিকারসমূহকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেশের প্রধান আদালতের উপর উহাদের সংরক্ষণের ভার ন্যস্ত করা হয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ইহাই করা হইয়াছে।

ব্যক্তির অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ রাষ্ট্রের কর্তব্য

এই কর্তব্যপালন করিয়া তবেই রাষ্ট্র আনুগত্য প্রভৃতি দাবি করিতে পারে

রাষ্ট্র যদি তাহার কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হয় তবে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি কর্তব্যপালন করিতে বাধ্য কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক ল্যাস্কি, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষিগণ বলেন যে, প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করা নাগরিকের কর্তব্য; কিন্তু সমস্ত দিকের বিচারবিবেচনা করিয়া অতি সতর্কতার সহিত বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হইবে। তাহা না করিলে আইন ও শৃংখলার পরিবর্তে অরাজকতা ও সমাজবিরোধী শক্তি প্রশ্রয় পাইবে।

রাষ্ট্র তাহার কর্তব্য-পালন না করিলে নাগরিক রাষ্ট্রের বিরোধিতা করিতে পারে

সংক্ষিপ্তসার

আত্মবিকাশের উপযোগী সুযোগসুবিধাকেই অধিকার বলা হয়। অধিকারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যাইতে পারে—১। অধিকার আত্মবিকাশে সহায়তা করে; ২। সমাজের বাহিরে অধিকার থাকিতে পারে না; ৩। অধিকার স্থান ও কালের আপেক্ষিক; ৪। অধিকার সকলের জন্য।

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ: প্রথম শ্রেণীবিভাগ হইল নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে। নৈতিক অধিকার সমাজের ন্যায়বোধ দ্বারা সমর্থিত; আইনগত অধিকারের ভিত্তি রাষ্ট্রের আইন। দ্বিতীয় শ্রেণীবিভাগ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে। ইহা ছাড়া, অর্থনৈতিক অধিকারও আছে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার: সামাজিক অধিকার বলিতে সেই সকল সুযোগসুবিধাকে বুঝায় যাহা সুষ্ঠু সমাজজীবনের সহায়ক। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইল রাষ্ট্রের কার্যে অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ।

বিভিন্ন সামাজিক অধিকার: ১। জীবনের অধিকার, ২। স্বাধীনতার অধিকার, ৩। স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার, ৪। সম্পত্তির অধিকার, ৫। চুক্তির অধিকার, ৬। পরিবার-গঠনের অধিকার, ৭। সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার, এবং ৮। ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকার—এই কয়টি হইল মৌলিক সামাজিক অধিকার।

বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার: ১। স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার, ২। বিদেশে অবস্থানকালীন নিরাপত্তার অধিকার, ৩। ভোটাধিকার, ৪। নির্বাচিত হইবার অধিকার, ৫। সরকারী চাকরিতে অধিকার, এবং ৬। আবেদন করিবার অধিকারকে মৌলিক রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলিয়া গণ্য করা হয়।

অর্থনৈতিক অধিকার: সম্প্রতি অর্থনৈতিক অধিকারও বিশেষ গুরুত্বলাভ করিয়াছে।

নাগরিকের কর্তব্য: অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত আছে। কর্তব্য হইল কিছু করিবার বা না করিবার দায়িত্ব। কর্তব্য আইনগত ও নৈতিক উভয়ই হইতে পারে। নাগরিকের কর্তব্যের তিনটি দিক আছে—১। পরিবারের প্রতি কর্তব্য, ২। সমাজের প্রতি কর্তব্য, এবং ৩। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য।

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য প্রধানত চারি প্রকারের—১। আনুগত্য; ২। আইন মান্য করিয়া চলা; ৩। নিয়মিতভাবে ন্যায্য করপ্রদান; এবং ৪। অন্যান্য কর্তব্য।

অধিকার ও কর্তব্য: মানুষের সমাজবোধ হইতে উভয়েরই জন্ম। সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক দাবি অধিকার ও কর্তব্য বলিয়া অভিহিত হয়। প্রত্যেকটি অধিকারের সহিত কর্তব্য সংযুক্ত আছে। ব্যক্তির অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য; ব্যক্তির নিকট হইতে আনুগত্য লাভ রাষ্ট্রের অধিকার।

প্রশ্নোত্তর

1. Briefly describe the rights and duties of a Citizen of a modern State.
(C. U. 1940, '43, '50; P. U. 1961, '64)

আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[প্রশ্নটির উত্তর সাধারণত ছাত্রছাত্রীরা অতি দীর্ঘ হইবে মনে করে বলিয়া নিম্নে উত্তরের পুরা কাঠামো বা একপ্রকার পূর্ণ উত্তর দেওয়া হইল।

উত্তরের কাঠামো: নাগরিক রাষ্ট্রের আইন দ্বারা অনুমোদিত অধিকার বা আইনগত অধিকার ভোগ করে। পূর্বে এই প্রকার অধিকার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক—এই দুই শ্রেণীর বলিয়া ধরা হইত। বর্তমানে উহার সহিত অর্থনৈতিক অধিকারও যোগ করা হয়। সুতরাং বর্তমান দিনে নাগরিকগণ সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক—এই তিন প্রকার অধিকারই ভোগ করিয়া থাকে। তবে সকল রাষ্ট্রের নাগরিক ঠিক একই অধিকার ভোগ করে না। যে-দেশ যত উন্নত সে-দেশে নাগরিক-অধিকারের পরিমাণও তত বেশী। নিম্নে উন্নত দেশের নাগরিকগণ সাধারণত যে-সকল সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করিয়া থাকে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

সামাজিক অধিকার: সামাজিক অধিকারের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইল ১। জীবনের অধিকার, ২। স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও জীবিকার্জনের অধিকার, ৩। স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার, ৪। সম্পত্তির অধিকার, ৫। চুক্তির অধিকার, ৬। পরিবার-গঠনের অধিকার, ৭। স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের অধিকার, ৮। সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার, ৯। আইনের চক্ষে সমানাধিকার, ১০। ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অধিকার, এবং ১১। শিক্ষার অধিকার।

এই সামাজিক অধিকারগুলিকে উন্নত দেশে মৌলিক বা ন্যূনতম বলিয়া গণ্য করা হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার: রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে সম্পূর্ণ অপরিহার্য হইল ১। স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার, ২। প্রবাসী জীবনের নিরাপত্তার অধিকার, ৩। নির্বাচন করিবার অধিকার, ৪। নির্বাচিত হইবার অধিকার, ৫। সরকারী চাকরিতে অধিকার, এবং ৬। আবেদন করিবার অধিকার। এই অধিকারগুলি সম্পূর্ণ অপরিহার্য, কারণ ইহারা না থাকিলে শুধু যে গণতন্ত্র সম্ভব হয় না তাহাই নহে, মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনও ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

অর্থনৈতিক অধিকার: বর্তমানের ধারণা অনুসারে নাগরিককে আত্মবিকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হইলে, তাহাকে যথার্থ সক্রিয় নাগরিক করিয়া তুলিতে হইলে উপরি-বর্ণিত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ছাড়া কয়েকটি অর্থনৈতিক অধিকারও দিতে হইবে—যথা, কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকার, পর্যাপ্ত মজুরির অধিকার, পর্যাপ্ত অবকাশের অধিকার, ইত্যাদি। উন্নত দেশসমূহে নাগরিকের এই অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে।

অধিকার কর্তব্যের সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত বলিয়া নাগরিকের শুধু অধিকার নাই, বিভিন্ন কর্তব্যও রহিয়াছে। এই সকল কর্তব্য হইল ১। পরিবারের প্রতি, ২। সমাজের প্রতি, এবং ৩। রাষ্ট্রের প্রতি। ইহার মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যই আইনগত কর্তব্য। সুতরাং নাগরিক উহা এড়াইয়া যাইতে পারে না। যদি এড়াইবার চেষ্টা করে তবে তাহার নাগরিকতার অবসান ঘটিতে পারে। রাষ্ট্রের প্রতি এই কর্তব্য প্রধানত তিনটি—১। আনুগত্য, ২। আইন মান্য করিয়া চলা, ৩। নিয়মিতভাবে ন্যায্য কর প্রদান। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রনৈতিক অর্পিত কর্মভার গ্রহণ করা, সৎভাবে ভোট দেওয়া, সমাজের উন্নতিসাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকা, প্রভৃতি কয়েকটি নৈতিক কর্তব্যও নাগরিকের রহিয়াছে।]

2. What is meant by the term 'Right'? Distinguish between (a) Legal and Moral Rights, and (b) Civil and Political Rights. Give illustrations.

(C. U. 1953)

অধিকার কাহাকে বলে? উদাহরণসহ (ক) আইনগত ও নৈতিক অধিকার, এবং (খ) সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [১০০-১০২ পৃষ্ঠা]

3. What are Political Rights? Describe the Fundamental Political Rights of a Citizen in a modern State.

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার কাহাকে বলে? আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকের মৌলিক রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারগুলি বর্ণনা কর। [১০২ এবং ১০৫-১০৬ পৃষ্ঠা]

4. Describe the Fundamental Civil Rights of a Citizen of a modern State.

আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকের মৌলিক সামাজিক অধিকারগুলি বর্ণনা কর। [১০৩-১০৫ পৃষ্ঠা]

5. Write an essay on the Duties of Citizens.

নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে ছোট একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

[ইংগিত: পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলের প্রতিই নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।...(১০৬-১১০ পৃষ্ঠা)]

6. "Rights imply duties." Discuss.

"অধিকার কর্তব্যেরই নামান্তর মাত্র।" বর্ণনা কর।

প্রশ্নটি এইভাবেও আসিতে পারে—'Rights and Duties are correlative.' Explain.

'অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত।' ব্যাখ্যা কর। [১১০-১১২ পৃষ্ঠা]

7. Define Rights and Duties. What is the relation between Rights and Duties? (C. U. 1962)

অধিকার ও কর্তব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি তাহা দেখাও।

[পূর্ববর্তী প্রশ্নোত্তর এবং ১০০-১০১ ও ১০৭ পৃষ্ঠা দেখ।]

দশম অধ্যায়

আইন ও স্বাধীনতা

(Law and Liberty)

সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করিতে হইলে, সংঘবদ্ধভাবে কাজকর্ম করিতে হইলে, সংঘবদ্ধভাবে কোন উদ্দেশ্যসাধন করিতে হইলে কতকগুলি সাধারণ নিয়মকানুন প্রবর্তন করা এবং মানিয়া চলা প্রয়োজন। তাহা না হইলে বিশৃংখলা দেখা দিবে, সামাজিক কাজকর্ম অচল হইয়া পড়িবে। এমনকি সুদূর অতীতেও যখন রাষ্ট্র সরকার জেল পুলিস প্রভৃতি গড়িয়া উঠে নাই, মানুষ তখন প্রথা ও ধর্মের অনুশাসন মানিয়া লইয়া সহজ সরল সামাজিক জীবনযাপন করিত। মোটকথা, নিয়মকানুন ব্যতীত জীবনের কোন ক্ষেত্রেই চলা সম্ভব নয়। সভা বল, সমিতি বল, মানুষের সংগে মানুষের সম্পর্ক বল, সর্বত্রই নিয়মকানুন না থাকিলে অরাজকতা বিরাজ করিবে। সাধারণ ফুটবল খেলার কথা ধরিলে দেখা যায় যে, খেলার নিয়মকানুন না থাকিলে বা না মানিলে খেলাই হইবে না। স্কুলের কথা ধরিলে দেখা যায় যে, স্কুল-পরিচালনার নিয়মকানুন না থাকিলে এবং উহাদের মানিয়া না চলিলে স্কুলের কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যাইবে। কলিকাতা মহানগরীর রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়ার কথা ধরিলে দেখা যায়, যানবাহন চলাচলের

নিয়মকানুন সংঘবদ্ধ জীবনের অপরিহার্য সর্ত

নিয়মকানুন না মানিয়া চলিলে দুর্ঘটনা ও বিশৃংখলা দেখা দিবে। মানুষের সংগে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহজেই বুঝা যায় যে, যাঁহার যাহা ইচ্ছা করিবার অবাধ ক্ষমতা থাকিলে মারামারি কাটাকাটি লাগিয়াই থাকিবে। সুতরাং নিয়মকানুন সমাজজীবনের পক্ষে অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন এবং সমাজজীবনের মধ্যেই নিহিত। কিন্তু সমাজে মানুষ যে-সকল নিয়মকানুন মানিয়া চলে তাহাদের প্রত্যেকটিকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইন আখ্যা দেওয়া হয় না। আইন বলিতে রাষ্ট্রের বিধি বুঝায়। অর্থাৎ, যে-সকল নিয়মকানুনকে রাষ্ট্র সৃষ্টি বা স্বীকার করিয়া লইয়া বলবৎ করে তাহাদিগকেই আইন বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই আইন কেহ ভংগ করিলে রাষ্ট্র শাস্তিপ্রদান করে। পুলিস সৈন্য আদালত ও জেল এই কারণেই রাখা হয়।

কিন্তু সকল সামাজিক নিয়মকানুন আইন নয়

যে-সকল নিয়মকানুন রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট বা স্বীকৃত ও প্রযুক্ত হয় তাহাই আইন

আইন ব্যতীত সমাজে অন্যান্য নিয়মকানুনও আছে—যথা, সামাজিক নিয়মকানুন, নৈতিক নিয়মকানুন, বিভিন্ন সমিতির নিয়মকানুন ইত্যাদি। প্রচলিত রীতিনীতি, প্রথা, ফ্যাসান প্রভৃতি হইল সামাজিক নিয়মকানুন; আর সত্যকথন, সত্যভংগ ও প্রবঞ্চনা না করা, অপরের অনিষ্টসাধন না করা ইত্যাদি নৈতিক নিয়মকানুনের অন্তর্ভুক্ত। এগুলির সংগে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রধান পার্থক্য হইল যে আইনভংগ করা হইলে রাষ্ট্রশক্তি শাস্তিপ্রদান করে কিন্তু অন্যান্য নিয়মকানুন মান্য না করা হইলে রাষ্ট্রের নিকট কোন ব্যক্তিকে দণ্ডনীয় হইতে হয় না। তবে রাষ্ট্রের হস্তে শাস্তিভোগ না করিতে হইলেও তাহাকে সমাজের নিন্দা অথবা বিবেকের দংশন সহ্য করিতে হয় অথবা সভাসমিতি হইতে বিতাড়িত হইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক নিয়মানুসারে বয়ঃকনিষ্ঠ বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সম্মান করিয়া চলিবে; কেহ যদি এ-নিয়ম ভংগ করে অপর দশ-জনে তাহার নিন্দা করিবে, কিন্তু আইন-আদালতে তাহাকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে না। নৈতিক নিয়মানুসারে অপরের অনিষ্ট চিন্তা করা অন্যায়; কিন্তু এ-নিয়ম ভংগ করা হইলে রাষ্ট্র-প্রদত্ত শাস্তি ভোগ করিতে হয় না। তবে ব্যক্তি নিজের অন্যায় বুঝিতে পারিলে তাহার অনুশোচনা হয়।

অন্যান্য সামাজিক নিয়মকানুনের সহিত আইনের পার্থক্য

তবে একথা মনে করা ভুল হইবে যে সামাজিক প্রথা বা রীতিনীতি এবং ন্যায়-অন্যায়ের নীতির সহিত রাষ্ট্রীয় আইনের কোন সম্পর্ক নাই। প্রকৃতপক্ষে, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে-সকল রীতিনীতি ও ন্যায়-অন্যায়ের নীতি গড়িয়া উঠে তাহার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের আইনকানুন প্রবর্তিত হয়। এক সময় আমাদের দেশে সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল; কিন্তু আজ উহা আইনত দণ্ডনীয়।

সামাজিক রীতিনীতির সহিত আইনের সম্পর্ক

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে আমরা আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট উইলসনের (Woodrow Wilson) ভাষায় "আইন হইল মানুষের প্রচলিত আচারব্যবহার ও চিন্তার সেই অংশ যাহা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিধিতে পরিণত হইয়াছে এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট সমর্থন আছে।" অধ্যাপক হল্যাণ্ড (Holland) বলেন, "আইন হইল মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সার্বভৌম রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্ব দ্বারা প্রযুক্ত সাধারণ নিয়মকানুন।"*

আইনের সংজ্ঞা

এই দুইটি সংজ্ঞার মধ্যে আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্টই ধরা পড়ে। প্রথমত, আইন মাত্র মানুষের বাহ্যিক আচরণকেই নিয়ন্ত্রিত করে; মানুষের আভ্যন্তরীণ মনের চিন্তা বা ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। যেমন, আইনত চুরি করা দণ্ডনীয়, কেহ চুরি করিলে তাহাকে শাস্তিপ্রদান করা হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি মনে মনে চুরির চিন্তা বা বাসনা করিলে তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে ধরা এবং তাহাতে বাধাপ্রদান করা সম্ভব হয় না। সুতরাং মানুষের বাহিরের ব্যবহার বা আচরণ লইয়াই আইনের কাজকারবার। দ্বিতীয়ত, আইনের পিছনে থাকে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের শক্তি—অর্থাৎ, রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুলিস আদালত জেল প্রভৃতির মাধ্যমে বলপ্রয়োগ করিয়া আইন মান্য করিতে বাধ্য করায়। তৃতীয়ত, যে-পর্যন্ত-না রাষ্ট্র প্রচলিত রীতিনীতিকে স্বীকার করিয়া লইয়া উহা বলবৎ-করণের ব্যবস্থা করে সে-পর্যন্ত উহা আইন বলিয়া গণ্য হয় না।

আইনের বৈশিষ্ট্য :

১। আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে

২। রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ দ্বারাই আইন বলবৎ করে

৩। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত না হইলে কোন নিয়মকানুনই আইনে পরিণত হয় না

আইনের উৎস (Sources of Law) : আইনের উৎস প্রধানত ছয়টি—যথা, প্রথা, ধর্ম, বিচারের রায়, ন্যায়বিচার, পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা এবং আইন প্রণয়ন।

১। প্রথা (Custom) : আইনের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হইল প্রথা। প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র, আইনসভা, জেল, পুলিস, সৈন্য প্রভৃতি ছিল না। তবুও সমাজজীবন বিশৃংখল ছিল না। মানুষ তখন প্রথার সাহায্যেই বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিয়া লইত। পরিবার, গোষ্ঠী এবং উপজাতির আচারব্যবহারের ভিত্তিতেই বিভিন্ন প্রথা গড়িয়া উঠে। ধর্মের ভয়েই হউক অথবা অপরের অনুসরণে বা প্রয়োজনের তাগিদেই হউক সকলে আচারব্যবহার বা প্রথাকে মানিয়া চলিত। সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে অনেক দিন ধরিয়া সমাজের

প্রথা সর্বপ্রাচীন উৎস

* "A Law is a general rule of external action enforced by the sovereign political authority."

নেতৃবৃন্দ এই সকল প্রথার ভিত্তিতেই দ্বন্দ্ব-মীমাংসার ব্যবস্থা করিতেন। বর্তমানেও রাষ্ট্রের আইনকানুনের উপর প্রথার অসামান্য প্রভাব রহিয়াছে। আমাদের বহু আইনই প্রথাগত আইন।

বর্তমানেও প্রথার গুরুত্ব রহিয়াছে

২। **ধর্ম (Religion) :** প্রাচীনকালে প্রথাগত অনুশাসন ও ধর্ম এমনভাবে মিশিয়াছিল যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যাইত না। প্রথাই ছিল আইন আর আইনই ছিল ধর্ম। ধর্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আইনের ক্রমবিকাশে সহায়তা করিয়াছিল। পরোক্ষভাবে ইহা প্রথাকে সমর্থন করিয়া উহার স্থায়িত্ব প্রদান করিয়াছিল ; এবং প্রত্যক্ষভাবে দলপতি রাজা বা পুরোহিতকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া প্রচার করিয়া তাঁহার নির্দেশকেই ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মান্য করিতে শিখাইয়াছিল। বর্তমানেও আইনের উপর ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন বিশেষভাবে ধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত। ইহাদের ভিত্তিতে মনু ও কোরানের বিধান বর্তমান রহিয়াছে।

ধর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা

বর্তমানে ধর্মের প্রভাব

৩। **বিচারের রায় (Judicial Decisions) :** বিচারের রায় আইনের আর একটি উৎস। অতি প্রাচীনকালে প্রথা ও ধর্মীয় নিয়মকানুনের সাহায্যে সহজেই বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করা যাইত। কিন্তু পরে যখন সমাজ জটিল রূপ ধারণ করিল তখন আর প্রথা ও ধর্মের মধ্যে সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ফলে বিচারকের আসনে আসীন দলপতি বা রাজা ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি অনুসারে বিচার করিতে লাগিলেন। এই প্রকার বিচারের রায় ভবিষ্যতে বিচারকার্যে আইন হিসাবে গণ্য হইতে লাগিল।

বিচারের রায় হইতে আইনের সৃষ্টি

শুধু প্রাচীনকালেই নয়, বর্তমানেও বিচারের রায় হইতে অনেক আইনের সৃষ্টি হয়। মূল আইনে অনেক ফাঁক থাকিতে পারে ; আইনের অর্থও সুস্পষ্ট না হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণ বিচারের রায় দ্বারা আইনের ফাঁক পূরণ করেন ; আইনের অর্থও সুস্পষ্ট করিয়া তুলেন। এই কার্য প্রকৃতপক্ষে আইন প্রণয়নকার্য। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বিচারপতি হোমস্ (Holmes) বলিয়াছেন, "বিচারপতিগণ অবশ্যই আইন প্রণয়ন করেন এবং চিরকালই করিয়া যাইবেন।"

এখনও বিচারপতিগণ আইন প্রণয়ন করেন

৪। **ন্যায়বিচার (Equity) :** ন্যায়বিচার আইনের আর একটি উৎপত্তি-স্থল। এই সূত্রটির প্রকৃতি বিচারের রায়ের মতই। বিচারপতির কার্য ন্যায়-বিচার করা। কিন্তু প্রচলিত আইনের সাহায্যে সকল সময় ন্যায়বিচার করা যায় না। বর্তমান সমাজ বিশেষভাবে গতিশীল বলিয়া কোন আইন কিছুদিন

ধরিয়া প্রবর্তিত থাকিলে পর উহা সমাজের ন্যায়বোধের সহিত সম্পর্কবিহীন হইয়া পড়িতে পারে। ধরা যাউক, দেশের আইন অস্পৃশ্যতাকে সমর্থন করে; কিন্তু সমাজে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জনমত বিশেষ জাগরিত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে নিজস্ব ন্যায়বোধ অনুসারেই বিচারকার্য সম্পাদন করিতে হয়। ফলে আইনের রূপ পরিবর্তিত হইতে পারে, নূতন আইনেরও সৃষ্টি হইতে পারে। আমাদের উদাহরণে অস্পৃশ্যতা সমর্থনকারী যে-আইন বর্তমান আছে তাহার স্থলে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আইন প্রবর্তিত হইতে পারে।

ন্যায়বিচারের ফলেও আইনের সৃষ্টি হয়

৫। **পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা (Scientific Commentaries):** আইন সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা হইতেও আইনের উদ্ভব হয়। প্রত্যেক সভ্য দেশেই আইন সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতামত আইনজীবী ও বিচারপতিগণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আইন অনেক সময় প্রথার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। পরবর্তী যুগে প্রথার পরিবর্তন ঘটিলেও আইনটি প্রচলিত থাকে। ফলে ঐ আইন সমাজের ধ্যানধারণার সহিত অসংগত হইয়া পড়ে। আবার অনেক সময় আইন যে-উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় লোকে তাহা ভুলিয়া যায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা আইনের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে, প্রকৃত উদ্দেশ্য স্মরণ করাইয়া দেয়। পণ্ডিত ব্যক্তিরা প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা ও স্বরূপ বর্ণনা করেন। ইহা হইতে আইনের সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করা যায়। এইভাবে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আইনের উপর টীকা ও রচনা বিভিন্ন দেশের আইনের অনেক সংস্কারসাধন করিয়াছে। কিছুদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে মনুর টীকাই ছিল হিন্দু আইনের মূলভিত্তি। বর্তমানে অবশ্য হিন্দু সংহিতা (Hindu Code) পাস হওয়ায় হিন্দু আইন মনুর ব্যাখ্যা হইতে অনেকটা বিচ্যুত হইয়াছে।

পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা হইতেও আইনের উদ্ভব হয়

৬। **আইন প্রণয়ন (Legislation):** আইন প্রণয়ন বলিতে বুঝায় আনুষ্ঠানিকভাবে আইনসভা কর্তৃক আইন রচনা। আধুনিক যুগে এই আইন প্রণয়নই আইনের সর্বপ্রধান উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতকে আইনের একমাত্র উৎস বলিয়া বর্ণনা করা হয়। আইনসভা জনমতকে আনুষ্ঠানিকভাবে আইনের রূপদান করে। প্রথা, ধর্মীয় নীতি, ন্যায়বোধ প্রভৃতি প্রায় সকলই আইনসভা দ্বারা বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হইতেছে। ফলে সমাজে অন্যান্য সূত্র হইতে উদ্ভূত আইন ক্রমশ অপ্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। উদাহরণস্বরূপ, আবার হিন্দু সংহিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত হিন্দু সংহিতা, প্রথা, ধর্ম, পণ্ডিত ব্যক্তিদের টীকা প্রভৃতির ভিত্তিতে উদ্ভূত পুরাতন হিন্দু আইনকে অপ্রচলিত করিয়াছে।

বর্তমানে আইনসভা প্রণীত আইনই সর্বপ্রধান উৎস

উপসংহার: উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এ-ধারণা সহজেই করা যাইবে যে আইনের উৎসসমূহ সকল সময়ে একই প্রকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। প্রাচীনতম যুগে প্রথার ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তারপর ক্রমে ঐ স্থান অধিকার করে ধর্ম, বিচারের রায় ও ন্যায়বিচার। পরে সভ্যতা আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে আইন প্রণয়ন ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা উভয়ে আইনের সর্বপ্রধান উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়। বর্তমানে আবার একমাত্র আইন প্রণয়নই আইনের প্রধান উৎপত্তিস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আইন ও নীতি (Law and Morality): প্রাচীনকালে আইন ও নৈতিক বিধির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হইত না, কারণ তখন রাষ্ট্রীয় জীবন একমাত্র নৈতিক আদর্শ দ্বারাই পরিচালিত হইত। এই দিক দিয়াই এ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন যে মংগলময় জীবন সম্ভব করিবার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব—অর্থাৎ, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য মংগলময় জীবন গঠন করা; এবং একমাত্র এই নৈতিক আদর্শ দ্বারাই রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও এইরূপ রাষ্ট্রনীতি ও সমাজের নৈতিক বিশ্বাসের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। ভবভূতি লিখিয়াছেন, "নাগরিকগণ সকল অসত্যের কবল হইতে মুক্ত হইয়া সুখী হউক, রাষ্ট্রপাল নীতিপরায়ণ হইয়া দেশরক্ষা করুন, মেঘ নাগরিকগণের সুকৃতির ফলে সর্বঋতুতে বারিবর্ষণ করুক, এবং সকলে বন্ধু-স্বজন সহবাসে আনন্দ উপভোগ করুক।" আইন ও নৈতিক বিধি প্রাচীনকালে অভিন্ন থাকিলেও বর্তমানে উহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যাইতে পারে।

অতীতে আইন ও নীতি অভিন্ন ছিল

পরে অবশ্য উভয়ে পৃথক হইয়া পড়ে

প্রথমত, নীতিশাস্ত্রের পরিধি আইন অপেক্ষা ব্যাপকতর। নৈতিক সূত্রগুলি মানুষের বাহিরের আচরণ ও মনের চিন্তা উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করে। নীতিশাস্ত্র অনুসারে শুধু যে লোকের অনিষ্ট করা অন্যায় তাহাই নহে, অনিষ্টের চিন্তা করাও অনুচিত। অপরদিকে আইনের উদ্দেশ্য হইল লোকের বাহিরের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, যদিও বা অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক আচরণের পশ্চাতে উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, স্বভাববশে চুরি করিলে যে-শাস্তি হয়, কয়েক-দিন অনাহারে থাকিয়া চুরি করিলে তদপেক্ষা লঘু দণ্ডই হয়। উপরন্তু, আইন মানুষের সকল প্রকার বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে না; কিন্তু নীতিশাস্ত্র কোন বাহ্যিক আচরণকেই বাদ দেয় না। ফলে দেখা যায় যে, এরূপ অনেক কার্য দুর্নীতিমূলক বলিয়া ঘোষিত হয় যাহা আইনের দৃষ্টিতে অন্যায় নহে। মিথ্যা বলাকে নীতিশাস্ত্র কখনই সমর্থন করে না; কিন্তু মিথ্যা কথা দ্বারা যতক্ষণ কাহারও ক্ষতি না হয়, ততক্ষণ ইহা আইনের গণ্ডির মধ্যে আসে না।

১। বর্তমানে উভয়ের পরিধি এক নহে

দ্বিতীয়ত, সমাজের কল্যাণসাধন আইনের উদ্দেশ্য। এই কারণে সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়াও আইন প্রণীত হয়, কিন্তু নৈতিক সূত্র

রচিত হয় একমাত্র স্থায়-অন্যায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। ফলে যাহা বেআইনী তাহা দুর্নীতিমূলক নাও হইতে পারে। প্রেক্ষাগৃহে বা ট্রামে বাসে ধূমপানও বেআইনী, কিন্তু দুর্নীতিমূলক নহে।

২। উদ্দেশ্যও পৃথক

তৃতীয়ত, প্রয়োগের দিক হইতেই আইন ও নীতির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। আইন প্রযুক্ত হয় রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা ; ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনভংগকারীকে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করিতে হয়। কিন্তু নীতি প্রযুক্ত হয় মানুষের নিজের বিবেক ও সমাজের অনুশাসন দ্বারা। ফলে নৈতিক বিধিভংগের শাস্তি হইল সম্পূর্ণ মানসিক—নিজের বিবেকের দংশন এবং লোকের 'ছি ছি' সহ্য করা।

৩। প্রয়োগের দিক হইতেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে

পরিশেষে, আইন নির্দিষ্ট কিন্তু নৈতিক সূত্র অনির্দিষ্ট। আইন কি তাহা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় ; কিন্তু কোন্‌টি সুনীতি এবং কোন্‌টি দুর্নীতি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। নৈতিক বিশ্বাস অনেকাংশে ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং একজনের নিকট যাহা দুর্নীতিমূলক, অপর একজনের নিকট তাহা দুর্নীতিমূলক নাও হইতে পারে। অস্পৃশ্যতাকে অনেকে দুর্নীতিমূলক বলিয়া মনে করেন, অনেকে করেন না।

৪। আইন নির্দিষ্ট কিন্তু নৈতিক বিধি অনির্দিষ্ট

এইভাবে আইন ও নীতির মধ্যে পার্থক্য দেখানো হইলেও উভয়ের মধ্যে আজও গভীর সম্পর্ক বর্তমান আছে, এবং চিরকালই থাকিবে। আইন ও নৈতিক সূত্র উভয়েই সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং উভয়ে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে বাধ্য। সমাজের স্থায়বোধ—অর্থাৎ, স্থায়-অন্যায় সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা আইনে রূপান্তরিত হইয়া মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। আইনও আবার কুনীতি দূর করিয়া সুনীতিকে আহ্বান করে। পূর্বে যে আইন দ্বারা সতীদাহ প্রথার বিলোপের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এই সুনীতি আহ্বানেরও অন্যতম উদাহরণ।* কিন্তু আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র যদি জোর করিয়া সহসা কোন নৈতিক ধারণা সমাজের উপর চাপাইয়া দিতে চায়, তবে সে আইনকে বলবৎ করা কঠিন।

কিন্তু উভয়ের মধ্যে এখনও গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে

আইন ও নীতি পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে

উদাহরণস্বরূপ, যতক্ষণ পর্যন্ত অধিকাংশ লোক মদ্যপানকে নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আইন করিয়া মদ্যপান বন্ধ করা অসম্ভব। এই কারণে অনেক দেশে মদ্যপানের বিরুদ্ধে আইন বিশেষ কার্যকর হয় নাই। সুতরাং আইনের কার্যকারিতা সমাজের নৈতিক বিশ্বাসের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এইজন্য আইন প্রণীত হয় নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া। অবশ্য প্রচলিত নীতি যদি বর্তমান অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিহীন হইয়া পড়ে তবে আইনের

আইন প্রণীত হয় নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া

---

* ১১৫ পৃষ্ঠা।

মাধ্যমে উহার পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা না করিলে রাষ্ট্র কখনই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনে সমর্থ হইবে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সামগ্রিক কল্যাণসাধনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

আইন নীতির পরিবর্তনসাধনও করে

স্বাধীনতা (Liberty): আইনের পরই স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। আইন ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে; অপরদিকে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় নিয়ন্ত্রণবিহীনতা। সুতরাং আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় আইন স্বাধীনতার বিরোধী। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, আইন স্বাধীনতার পরিপন্থী নহে; বরং আইনই স্বাধীনতার ভিত্তি। এই কারণে স্বাধীনতার স্বরূপ এবং আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক আলোচনা করিয়া দেখিতে হয়।

আইন স্বাধীনতার বিরোধী নহে

স্বাধীনতার স্বরূপ (Nature of Liberty): স্বাধীনতা অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ (political ideal)। এই আদর্শ যুগে যুগে মানুষকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তবে স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায় সে-সম্বন্ধে মানুষ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করিয়াছে।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণা উদ্ভূত হয় প্রাচীন গ্রীসে। গ্রীকদের অনুসরণে প্রাচীনকালে স্বাধীনতা বলিতে বুঝাইত ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অনুসরণের জন্য বাহ্যিক আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা। অর্থাৎ, ব্যক্তি যদি বাধাবিহীনভাবে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধানে নিয়োজিত থাকিতে পারে তবেই সে স্বাধীন। স্বাধীনতার এই অর্থ গ্রহণ করা হইলে আইনকে স্বাধীনতার পরিপন্থী হিসাবে গণ্য করিতে হইবে, কারণ আইন ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের উপর বাধানিষেধ আরোপ করিয়া তাহার কার্যাবলী নির্দিষ্ট করিয়া দেয়।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা

কিন্তু বর্তমানে স্বাধীনতা বলিতে ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা না বুঝাইয়া এমন একটি পরিবেশকে (atmosphere) বুঝায় যেখানে মানুষ নিজেকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে সমর্থ হয়। ল্যাস্কি বলেন, "স্বাধীনতা বলিতে আমি সেইরূপ পরিবেশ রক্ষার কথা বলিতেছি যেখানে মানুষ নিজেকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে।"

স্বাধীনতা সম্বন্ধে বর্তমান ধারণা

অতএব, বর্তমানে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় ব্যক্তির আত্মবিকাশের উপযোগী পরিবেশ। এই পরিবেশের সৃষ্টি হয় অধিকারের দ্বারা। সুতরাং স্বাধীনতা অধিকারেরই ফল।

স্বাধীনতা অধিকারের ফল

বিষয়টিকে আরও একটু পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। স্বাধীনতা হইল আত্মবিকাশের উপযোগী পরিবেশ। আত্মবিকাশের বিশেষ বিশেষ সুযোগ-

"Liberty is a product of rights." Laski

সুবিধা বা অধিকারের অস্তিত্ব থাকিলে তবেই এই পরিবেশ সৃষ্ট হয়। সুতরাং স্বাধীনতা নির্ভর করে অধিকারভোগের উপর। আমার যদি স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার থাকে, তবেই আমার গতিবিধির স্বাধীনতা থাকিতে পারে। এইভাবে বিভিন্ন অধিকার যখন পরিপূর্ণভাবে ব্যক্তির আত্মবিকাশের সহায়ক হয়, তখনই স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে।

দেখা গেল যে স্বাধীনতা বলিতে বাধানিষেধ রহিত অবস্থা বা নিয়ন্ত্রণবিহীনতা বুঝায় না—বুঝায় অধিকারের অস্তিত্ব।* একদিক দিয়া কিন্তু স্বাধীনতাকে 'নিয়ন্ত্রণবিহীনতা' বলিয়াই বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণবিহীনতা দ্বারা ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণের পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝায় না, বুঝায় আত্মবিকাশের সুযোগসুবিধা বা অধিকারের উপর বাধানিষেধ সম্পূর্ণভাবে অপসারিত থাকা। অর্থাৎ, যে-যে অধিকার স্বাধীনতার পরিবেশের সৃষ্টি করে তাহারা কোনরূপে নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ হইবে না; হইলে স্বাধীনতা সংকুচিত হইয়া পড়িবে। স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার সীমাবদ্ধ অধিকার হইলে গতিবিধির স্বাধীনতাও পূর্ণ স্বাধীনতা হইতে পারে না।

স্বাধীনতা বলিতে যে-অধিকার বুঝায় তাহা নিয়ন্ত্রণবিহীন হইবে

নাগরিকের জন্য স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু স্বাধীনতা থাকিলেই যে নাগরিক তাহার পূর্ণ আত্মবিকাশে সমর্থ হইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। মানুষ স্বাধীনতা বা আত্মবিকাশের সুযোগসুবিধার যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে সমর্থ নাও হইতে পারে।' বাক্-স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও নাগরিক সরকারের সমালোচনায় বিমুখ থাকিয়া সরকারকে স্বৈরাচারী হইবার সুযোগ প্রদান করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা হইয়া উঠে নিরর্থক। এইজন্যই ইংরাজ লেখক ম্যাথু আরনল্ড (Mathew Arnold) বলিয়াছেন, "যদি আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত ব্যবহার না করিতে পারি তবে স্বাধীনতা পাই বা না পাই তাহাতে কিছু যায় আসে না।" সুতরাং স্বাধীনতা প্রদান করা যেরূপ রাষ্ট্রের কর্তব্য, ইহার যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা ইহাকে সার্থক করিয়া তোলাও তেমনি নাগরিকের কর্তব্য। অন্যভাবে বলিতে গেলে, নাগরিকের যদি স্বাধীনতা প্রাপ্তির অধিকার থাকে তবে ইহাকে সার্থক করিয়া তুলিবার দায়িত্ব বা কর্তব্যও তাহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

নাগরিক যদি স্বাধীনতার প্রকৃত ব্যবহার করিতে পারে তবেই উহা সার্থক হয়

আইন ও স্বাধীনতা (Law and Liberty): রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির আত্মবিকাশের উপযোগী অধিকারসমূহকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে তবেই স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্ট হইতে পারে। আইনের দ্বারাই রাষ্ট্র এই অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। সুতরাং

* "Liberty implies not the absence of restraints, but the presence of rights."

স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইনের উপর এবং পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভরশীল। এইভাবে স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং আইনের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ইহাকে আইনসংগত স্বাধীনতা (Legal Liberty) বলা হয়। আইনসংগত বলিয়া এরূপ স্বাধীনতা অব্যাহত বা নিয়ন্ত্রণবিহীন হইতে পারে না, কারণ আইনের অর্থই নিয়ন্ত্রণ—সকলের জন্য ব্যক্তির যথেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রণ। সকলকে স্বাধীনতা প্রদানের উদ্দেশ্যেই আইন দ্বারা ব্যক্তির স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইংরাজ লেখক বার্কারের ভাষায় বলা যায়, "প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার দ্বারা সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত।" কারখানার মালিকের পক্ষে যেমন শ্রমিকের কার্যের সর্ত নির্ধারণ করিবার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন, তেমনি শ্রমিকের পক্ষেও সে যে-কার্যে নিযুক্ত হইবে তাহার সর্তাবলী—যথা, মজুরি, কয় ঘণ্টা করিয়া কাজ করিতে হইবে ইত্যাদি—নির্ধারণ করিবার স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। শ্রমিকের এই স্বাধীনতা না থাকিলে শ্রমিক একরূপ ক্রীতদাসে পরিণত হইবে; সে তাহার আত্মশক্তিকে বিকশিত করিবার সুযোগ পাইবে না। সুতরাং মালিকের স্বাধীনতা ও শ্রমিকের স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে; শ্রমিকের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পেই মালিকের স্বাধীনতাকে খর্ব করিতে হইবে।

স্বাধীনতা আইন ও রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভরশীল

আইনসংগত স্বাধীনতা

আইনসংগত স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হইতে বাধ্য

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আত্মবিকাশের জন্য স্বাধীনতা যখন প্রত্যেকের পক্ষেই প্রয়োজনীয় তখন ইহা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া পারে না। বস্তুত, নিয়ন্ত্রিত না হইলে স্বাধীনতার অস্তিত্বই বজায় থাকে না। আইনই এই নিয়ন্ত্রণকার্য সম্পাদন করে বলিয়া আইন স্বাধীনতার ভিত্তি।

আইন স্বাধীনতার ভিত্তি

যাঁহারা আইনকে স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া মনে করিয়াছেন তাঁহারা স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্বাধীনতাকে তাঁহারা যথেচ্ছাচারিতা বলিয়া মনে করিয়াছেন। যথেচ্ছাচারিতার ফলে কয়েকজনের সুবিধা হয় সত্য, কিন্তু অধিকাংশেরই আত্মবিকাশ হয় ব্যাহত। শিল্পপতির যথেচ্ছাচারিতার ক্ষমতা থাকিলে শ্রমিকের কোন স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিককে শিল্পপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট কার্যের সর্ত মানিয়া লইতে হইবে, তাহাকে যে-কোন মজুরিতে কার্য করিতে হইবে। আবার যদি ধর্মাচরণের স্বাধীনতা অব্যাহত হয় তবে এক ধর্মসম্প্রদায়ের উগ্র আচরণের ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ঐ স্বাধীনতা বিপন্ন হইতে পারে। এইভাবে অব্যাহত বা অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার ফলে দুর্বল সবলের দ্বারা অত্যাচারিত হয়, ব্যক্তির লোভে সমষ্টির স্বার্থহানি ঘটে।

আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে স্বাধীনতার স্বরূপ বজায় থাকে না

তাই প্রয়োজন হইল আইনের। আইন সকলের অধিকার ও আচরণের সীমা নির্দেশ করিয়া সবলের লোভের কবল হইতে দুর্বলকে রক্ষা করে। ইহার ফলে সকলের পক্ষেই আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয়। প্রকৃত স্বাধীনতার উদ্দেশ্যই হইল সকলের আত্মবিকাশে সহায়তা করা—মাত্র কয়েকজনের নহে। সুতরাং আইনই স্বাধীনতার স্বরূপ বজায় রাখে। আইনই প্রকৃত স্বাধীনতার প্রাণ।

আইনই প্রকৃত স্বাধীনতার প্রাণ

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (Forms of Liberty): এতক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীনতার যে-রূপ লইয়া আলোচনা করা হইল তাহাকে ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা বা ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলা হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার তিনটি দিক আছে—সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক। উপরন্তু, ব্যক্তির ন্যায় জাতির পক্ষেও স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। এই শেষোক্ত স্বাধীনতাকে 'জাতীয় স্বাধীনতা' বলা হয়। নিম্নে স্বাধীনতার এই সকল রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার তিনটি দিক

১। সামাজিক স্বাধীনতা (Social Liberty): সমাজজীবনে ব্যক্তির পক্ষে যে-স্বাধীনতা প্রয়োজনীয় তাহাকে সামাজিক স্বাধীনতা বলা হয়। সামাজিক অধিকারগুলি (Civil Rights) ভোগের দ্বারাই এই স্বাধীনতা উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং সামাজিক স্বাধীনতা বলিতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, গতিবিধির স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা, অপরের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা প্রভৃতি বুঝায়।

সামাজিক অধিকার সামাজিক স্বাধীনতার উপাদান

২। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty): রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা। নাগরিক-জীবনে এই স্বাধীনতা সামাজিক স্বাধীনতার মতই গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন করিবার অধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার, রাষ্ট্রনৈতিক দলগঠনের অধিকার, সরকারের কার্যের সমালোচনা করিবার অধিকার প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার উপাদান।

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার উপাদান

৩। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty): সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রের ন্যায় অন্নসংস্থান ব্যাপারেও ব্যক্তির পক্ষে স্বাধীনতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার এই তৃতীয় রূপ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নামে অভিহিত। ইহা দ্বারা বুঝায় নাগরিকের পক্ষে অভাব-অনটনের ভাবনা ও সর্বদা বেকারত্বের ভয় হইতে মুক্তি এবং পর্যাপ্ত অবসর। সুতরাং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্ভব করিতে হইলে প্রত্যেককে উপযুক্ত মজুরি ও পর্যাপ্ত অবসর প্রদান করিতে হইবে, বেকারত্বের ভাবনা হইতে মুক্ত করিতে হইবে, জীবিকা নির্বাচনের স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হইবে। অন্নচিন্তাতেই মানুষের যদি দিন

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায়

কাটিয়া যায়, উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়াও যদি সে পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করিতে পারে, বেকার হইবার ভয়ে তাহাকে যদি সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হয় তবে তাহার নিকট মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, নির্বাচনাধিকার প্রভৃতির কোনই মূল্য থাকে না। এই কারণে সমভোগবাদীরা (Communists) অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন

জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty): অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও জাতীয় স্বাধীনতা অন্য সকল প্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি। জাতীয় স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ-পাশ হইতে দেশ বা জাতির সর্বপ্রকার মুক্তি। দেশ পরাধীন থাকিলে ব্যক্তির পক্ষে আত্মবিকাশের সহায়ক অধিকারসমূহ ভোগ করা সম্ভব হয় না। মাত্র স্বাধীন দেশের লোকই পূর্ণ অধিকার ভোগ করিতে পারে। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইল জাতীয় স্বাধীনতার—অর্থাৎ, বৈদেশিক অধীনতা হইতে সর্বপ্রকারে মুক্ত অবস্থার।

জাতীয় স্বাধীনতা অন্য সকল প্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (Safeguards of Liberty): আমরা দেখিয়াছি যে, রাষ্ট্রশক্তি আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি পরিচালিত হয় সরকারের দ্বারা; সরকার আমাদের মতই সাধারণ লোক লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহা আদর্শভ্রষ্ট হইতে পারে। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ক্ষমতার আসনে বসিয়া অনেক সময় জনসাধারণের স্বাধীনতা সংরক্ষণের পরিবর্তে ইহার বিনাশের ব্যবস্থা করিতে পারেন। এইজন্য প্রয়োজন হয় স্বাধীনতারক্ষার বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার। ইহাদিগকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (safeguards) বলা হয়।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ কাহাকে বলে

স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ হইল শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলি (Fundamental Rights) লিখিতভাবে গৃহীত হওয়া। মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্রে লিখিতভাবে গৃহীত হইলে উহাদের একটি বিশেষ মর্যাদা থাকে। জনসাধারণ জানিতে পারে যে তাহাদের অধিকার কি কি। নির্দিষ্ট অধিকার ভংগ করা হইলে আদালতে প্রতিবিধানেরও ব্যবস্থা থাকে। আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া আদালতের মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১। মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করা অন্যতম রক্ষাকবচ

ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতিকেও স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচরূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু পূর্বেই দেখিয়াছি যে পূর্ণ অর্থে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ সম্ভব বা কাম্য—কোনটাই নহে। সুতরাং ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষাকবচ নহে। তবে ক্ষমতা

২। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ—ইহা প্রকৃত রক্ষাকবচ নহে

স্বতন্ত্রিকরণের এক অংশ স্বাধীনতার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা হইল বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য। বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের প্রভাব হইতে মুক্ত না হইলে স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইতে পারে না।

'আইনের অনুশাসন'ও (Rule of Law) স্বাধীনতার একটি প্রধান রক্ষা-কবচরূপে পরিগণিত হয়। 'আইনের অনুশাসন' বলিতে মোটামুটি দুইটি জিনিস বুঝায়—(১) আইনানুসারে শাসন, এবং (২) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য। অর্থাৎ, সরকার যে-সকল ক্ষমতা ব্যবহার করে তাহা আইন-প্রদত্ত হইবে এবং সকলের জন্যই একই প্রকার আইন থাকিবে। সুতরাং বেআইনীভাবে কাহারও স্বাধীনতা খর্ব করা যাইবে না; এবং একই প্রকার অপরাধ করিলে সকলকে একই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ইংলণ্ডে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ নীতি গৃহীত না হইলেও এইভাবে আইনের অনুশাসনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংরক্ষিত করা হয়।

৩। আইনের অনুশাসন

তবুও বলা যায়, আইনের অনুশাসন স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষাকবচ নহে। কারণ, আইন-প্রদত্ত ক্ষমতারও অপব্যবহার হইয়া থাকে এবং বর্তমান দিনের ধনবৈষম্যমূলক সমাজে আইন পক্ষপাতহীন হইতে পারে না। অন্যভাবে বলিতে গেলে, যে-সমাজে ধনী-দরিদ্র উভয়ই আছে সে-সমাজের আইনে ধনীদেরই সুবিধা হয়, দরিদ্রদের নহে।

ইহাও প্রকৃত রক্ষাকবচ নহে

অনেকের মতে, দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা স্বাধীনতার আর একটি রক্ষা-কবচ। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ জন-প্রতিনিধিগণ লইয়া গঠিত আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকে এবং আইনসভায় বিরোধী দল সমালোচনা দ্বারা সরকারের দোষক্রটি জনসমক্ষে তুলিয়া ধরে। এই দুই কারণে সরকার জন-স্বাধীনতা হরণ করিতে সাহসী হয় না।

৪। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখিবার জন্য বর্তমানে গণভোট, গণ-উদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি যে-সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়* তাহা-দিগকেও স্বাধীনতার রক্ষাকবচরূপে গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু বর্তমানে বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রসমূহে এই সকল পদ্ধতি বিশেষ অনুসৃত হইতে পারে না বলিয়া ইহাদের ব্যবহারিক মূল্য বিশেষ নাই।

৫। গণভোট, গণ-উদ্যোগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি

স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হইল স্বাধীনতাকামী নাগরিক সম্প্রদায়। এইরূপ নাগরিক সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার জন্য উগ্র আকাংক্ষা এবং ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য তীব্র আবেগ থাকিবে। বিনা-মূল্যে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না—ইহার সংরক্ষণের জন্য মূল্য দিতে হয়। নাগরিকগণের চিরন্তন সতর্কতাই এই মূল্য। স্বাধীনতাকামী নাগরিক সর্বদা সজাগ থাকে এবং কোনরূপে

৬। স্বাধীনতাকামী নাগরিকগণই স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ

* ৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।

স্বাধীনতা ব্যাহত হইলে অবিলম্বে বিঘ্নকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। প্রয়োজন হইলে সেই সংগ্রামে সর্বস্ব বিসর্জনও দেয়। এইজন্য গ্রীক দার্শনিক পেরিক্লিস (Pericles) বলিয়াছেন, "চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য" এবং "সাহসিকতাই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র"।*

ল্যাস্কি বলেন, সাহসিকতা স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হইলেও ইহার প্রকাশের জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রভৃতি হইল এই সকল ব্যবস্থা। সুতরাং এগুলিও থাকা প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্তসার

সংঘবদ্ধ জীবনের পক্ষে নিয়মকানুন অপরিহার্য। যে সকল নিয়মকানুন রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট বা স্বীকৃত এবং প্রযুক্ত হয় তাহাদিগকে আইন বলে।

আইনের সংগে অন্যান্য সামাজিক নিয়মকানুনের পার্থক্য এইখানে যে আইন ভংগ করিলে রাষ্ট্রশক্তি দণ্ড প্রদান করে, কিন্তু অন্য কোন নিয়মকানুন ভংগ করিলে রাষ্ট্র-প্রদত্ত শাস্তি ভোগ করিতে হয় না, কেবল সামাজিক অবমাননা সহ্য বা অনুশোচনা ভোগ করিতে হইতে পারে।

আইনের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়: ১। আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং ২। রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত না হইলে কোন নিয়মকানুনই আইনে পরিণত হয় না।

আইনের উৎস: আইনের উৎস প্রধানত ছয়টি—(ক) প্রথা, (খ) ধর্ম, (গ) বিচারের রায়, (ঘ) ন্যায়বিচার, (ঙ) পণ্ডিত ব্যক্তিদের আলোচনা, এবং (চ) আইন প্রণয়ন।

আইন ও নীতি: অতীতে আইন ও নীতি অভিন্ন ছিল। পরে অবশ্য উভয়ে পৃথক হইয়া পড়ে। বর্তমানে ১। উভয়ের পরিধি এক নহে, ২। উভয়ের উদ্দেশ্য পৃথক, এবং ৩। প্রয়োগের দিক দিয়াও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে।

তবুও আইন ও নীতি পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। নীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অধিকাংশ সময় রাষ্ট্রের আইন রচিত হয়; আইন আবার কুনীতিকে দূর করিয়া সুনীতিকে আহ্বান করে।

স্বাধীনতা: স্বাধীনতা বলিতে যথেচ্ছাচারিতা বুঝায় না—বুঝায় আত্মবিকাশের উপযোগী পরিবেশ। এই পরিবেশ সৃষ্ট হয় অধিকারের স্বীকার ও সংরক্ষণের দ্বারা। সুতরাং স্বাধীনতা অধিকারেরই ফল।

যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে না পারিলে স্বাধীনতা নিরর্থক।

আইন ও স্বাধীনতা: স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইন ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রশক্তির উপর নির্ভরশীল। নিয়ন্ত্রণবিহীন স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রশক্তি আইনের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণকার্য সম্পাদন করিয়া স্বাধীনতাকে প্রকৃত বা সার্থক করিয়া তুলে। তবে আইনের পক্ষে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ: স্বাধীনতা প্রধানত দুই প্রকারের—ব্যক্তিগত এবং সম্প্রদায় বা জাতিগত। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও জাতিগত স্বাধীনতাকে জাতীয় স্বাধীনতা বলা হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার তিনটি দিক আছে—সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক। অপর সকল প্রকার স্বাধীনতা জাতীয় স্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ: স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা সংরক্ষিত হয়। কিন্তু শাসকবর্গ ক্ষমতার আসনে বসিয়া আদর্শভ্রষ্ট হইয়া অকাম্য আইন প্রণয়ন দ্বারা এবং অন্যান্যভাবে জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণে মনোযোগী হইতে পারেন। এইজন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ বিশেষ রক্ষাকবচের।

* "Eternal vigilance is the price for liberty" and "secret of liberty is courage."

নিম্নলিখিতগুলিই স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ:

১। সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধকরণ, ২। ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ বা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ৩। আইনের অনুশাসন, ৪। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা, ৫। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, এবং ৬। স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ।

প্রশ্নোত্তর

1. How would you define Law? What are the different sources of Law? (C. U. 1958)

কিভাবে আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে? আইনের উৎস কি কি? [১১৬ ১১৯ পৃষ্ঠা]

2. Define Law. Indicate the connection between Law and Morality. (C. U. 1960)

আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আইন ও নীতির মধ্যে কি সম্বন্ধ আছে দেখাও। [১১৬ এবং ১১৯-১২১ পৃষ্ঠা]

3. How would you define Liberty? Distinguish between different forms of Liberty. (C. U 1950, '57)

কিভাবে স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিবে? স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [১২১-১২২ এবং ১২৪-১২৫ পৃষ্ঠা]

4. Explain the meaning of 'Liberty', and point out its relation to Law. (P. U. 1962)

'স্বাধীনতা'র অর্থ ব্যাখ্যা কর, এবং স্বাধীনতার সংগে আইনের সম্বন্ধ কি তাহা দেখাও। [১২১-১২২ এবং ১২২-১২৪ পৃষ্ঠা]

প্রশ্নটির দ্বিতীয় অংশ এইভাবেও আসিতে পারে—

"Law is the condition of Liberty."—Explain. (C. U. 1950, '52; B. U. 1961)

"আইন স্বাধীনতার সর্ত।"—ব্যাখ্যা কর। [১২২-১২৪ পৃষ্ঠা]

5. Explain the meaning of 'Law' and point out its relation to 'Liberty'.

'আইনে'র অর্থ ব্যাখ্যা কর এবং আইনের সংগে 'স্বাধীনতা'র কি সম্পর্ক তাহা দেখাও। [১১৬ এবং ১২২-১২৪ পৃষ্ঠা]

6. Define Liberty. What are its main safeguards? (En. 1961)

স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ কি কি? [১২১-১২২ এবং ১২৫-১২৭ পৃষ্ঠা]

একাদশ অধ্যায়

জনমত

(Public Opinion)

গণতন্ত্র ও জনমত (Democracy and Public Opinion): গণতন্ত্রকে জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই প্রকার শাসন-ব্যবস্থায় যাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁহাদিগকে জনসাধারণের সেবক বলিয়াই গণ্য করা হয়। জনসাধারণের কল্যাণসাধনের জন্য জনসাধারণের মতামত অনুসারেই তাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন—নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্য বা নিজেদের খেয়ালখুশি অনুসারে নহে।

গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব:

বিভিন্ন দিক হইতে এইরূপ জনমত পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ইহাতে সকল নাগরিকেরই বুদ্ধিবিবেচনা ও অভিজ্ঞতা

রাষ্ট্র ও সমাজের মংগলসাধনে নিয়োজিত হইতে পারে। স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার থাকায় প্রত্যেকেই তাহার ধ্যানধারণা ও আশা-আকাংক্ষাকে ব্যক্ত করিতে পারে। ফলে রাষ্ট্রও জনসাধারণের অভিজ্ঞতা ও অভিমত জানিয়া তদনুযায়ী নীতি-নির্ধারণ ও আইনকানুন প্রণয়ন করিতে সমর্থ হয়।

১। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থায় সকলের ধ্যানধারণা প্রতিফলিত হয়

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র সাধারণ লোকের শক্তিতে বিশ্বাসী। ইহা এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে প্রত্যেকেরই সমাজকে কিছু-না-কিছু দান করিবার আছে। ফলে ইহা প্রত্যেক নাগরিকের মতামতকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। ইহাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ হয়, ব্যক্তিরও ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়। অতএব, গণতন্ত্রে জনমত সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণের মাধ্যম হিসাবে কার্য করে।

২। জনমত সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণের মাধ্যম হিসাবে কার্য করে

তৃতীয়ত, গণতন্ত্রে জনমতের ভয়ে শাসনকার্যের পরিচালকগণ স্বৈরাচারী হইতে সাহসী হন না। জনসাধারণের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও সরকারী নীতির সমালোচনার সুযোগ থাকায় শাসনকার্যের পরিচালকবর্গকে সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। কারণ, তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদের ক্ষমতা জনমতের উপর নির্ভরশীল। জনসাধারণের সমর্থন হারাইলে পরবর্তী নির্বাচনে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। অতএব, তাঁহাদিগকে সকল সময়ই জনমতের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং জনমত অনুসারেই শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়। অনেক সময় জনমত অনুকূলে না থাকার জন্য আইনসভা বা মন্ত্রিসভাকে নিজস্ব নীতি বা পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে হয়। অপরপক্ষে আবার জনমতের চাপে নূতন নীতি, সংস্কার বা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হয়। পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বিহারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সহিত একমত হইয়া একবার পশ্চিমবংগ ও বিহারকে মিলাইয়া একটি রাজ্যে পরিণত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। জনমতের চাপে তাঁহাদিগকে এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

৩। জনমতের জন্য স্বৈরাচারিতার পথ রুদ্ধ হয়

গণতন্ত্রে শাসকবর্গ জনমতকে ভয় করিয়া চলেন তাহার মূলে আছে বিরোধী দলের অস্তিত্ব। গণতন্ত্রে একাধিক দল থাকায় বিরোধী দল থাকিবেই। এই বিরোধী দল বা দলসমূহই শাসকবর্গের ত্রুটিবিচ্যুতি জনসাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া জনমতকে নিজ অনুকূলে টানিবার চেষ্টা করে। এইজন্যই সরকারী দলকে সর্বদা সতর্ক ও সংযত থাকিতে হয়—শাসকবর্গকে দেখিতে হয় যেন শাসনকার্য পরিচালনায় দোষত্রুটি বা দুর্বলতা না থাকে। এইভাবে বিরোধী দলের মাধ্যমে জনমতই হইয়া দাঁড়ায় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃত নিয়ামক।

৪। সরকারকে সতর্ক ও সংযত হইয়া চলিতে হয়

উপরি-উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে জনমত গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ।

তাই গণতন্ত্রকে সুপরিচালিত করিতে হইলে, সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে জনমত গঠন ও প্রকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। বস্তুত, যেকোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে উহার জনমত গঠন ও প্রকাশের ব্যবস্থার উপর। জনমত গঠন ও প্রকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকিলে গণতন্ত্র নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হয়, কোনক্রমেই উহা জনগণের শাসনে (Rule of the People) পরিণত হয় না।

জনমত কাহাকে বলে? (What is the Public Opinion?): গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে, জনমত কাহাকে বলে? এ-সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে। সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জনগণ বা সাধারণের যে অভিমত তাহাকেই 'জনমত' আখ্যা দেওয়া হয়। অধ্যাপক লাওয়েল (Lowell) বলেন, জনমত বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হওয়াই যথেষ্ট নয়, আবার সমাজস্থ সকলের অভিমত হওয়ার প্রয়োজনও হয় না। বলা হয়, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে সকলের একমত থাকে না। লোকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এরূপ প্রত্যেক বিষয়ের বিচারবিবেচনা করে বলিয়া মতামত বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। ফলে উহাদের মধ্যে কোন কোনটি অন্যান্যগুলি অপেক্ষা প্রবলতর হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রবলতর অভিমতগুলিকেই জনমত বলিয়া অভিহিত করা হয়।

জনমতের ধারণা সুস্পষ্ট নহে

গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় সম্পর্কে প্রবলতর অভিমতই জনমত

আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হইলেই যে জনমত বলিয়া স্বীকৃত হইবে এমন কোন কথা নাই। সংখ্যা অপেক্ষা আস্থার দৃঢ়তা জনমত গঠনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে। অধিকসংখ্যক লোকে কোন অভিমত পোষণ করিলেও তাহাদের আস্থা যদি দৃঢ় না হয় তবে উহা জনমত বলিয়া গৃহীত হয় না। বস্তুত, সমাজে যে-মতানুসারে সরকার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা সুসংবদ্ধ ও চেতনাসম্পন্ন শ্রেণীরই অভিমত। এইজন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সুসংগঠিত সংখ্যালঘুর সুদৃঢ় মতামতই জনমত বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

এইভাবে যে-অভিমত জনমত বলিয়া পরিগণিত হয় তাহা সকলের বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত না হইলেও মোটামুটিভাবে অধিকাংশকে উহা মানিয়া লইতে হইবে; অন্তত উহার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করা চলিবে না। জনমত যখন সার্মগ্রিক কল্যাণ কামনা করে তখনই ইহা সম্ভব হয়।

উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে জনমতের একটি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা নির্দেশ করা যাইতে পারে: গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সুদৃঢ় অভিমতই জনমত। সার্মগ্রিক কল্যাণের সহায়ক বলিয়া ইহাকে অধিকাংশ লোকে মোটামুটিভাবে মান্য করিয়া থাকে।

জনমতের সংজ্ঞা

জনমতের সমালোচনা করিতে গিয়া অনেকে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহা 'জনগণের নয় এবং মতও নয়' (neither public, nor an opinion)। জনসাধারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদাসীন বা অজ্ঞ হয়, অথবা সমস্যা সম্বন্ধে তাহাদের সম্যক জ্ঞান থাকে না। উপরন্তু, অনেক ক্ষেত্রে তাহারা অপরের অনুকরণেও বিশেষ মতামতের সমর্থন করিয়া থাকে। এই অবস্থায় যাহা 'জনমত' নামে পরিচিত হয়, দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি বা স্বার্থান্বেষীশ্রেণীর মত। অজ্ঞতা বা অনুকরণ প্রবৃত্তিবশত সাধারণে ঐ মতকেই মোটামুটি সমর্থন করিয়া উহাকে জনমতে পরিণত করে। এইরূপ হইলে গণতন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাই আলোচনার সুরুতেই বলা হইয়াছে যে প্রয়োজন হইল সুষ্ঠু, সবল ও সুচিন্তিত জনমত গঠন ও প্রকাশের ব্যবস্থার।*

জনমত গঠন ও প্রকাশের সুব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

১ জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম (Organs of Public Opinion):

জনমত গঠন ও প্রকাশের প্রধান প্রধান মাধ্যম হইল—(১) মুদ্রাযন্ত্র, (২) বেতার ও চলচ্চিত্র, (৩) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, (৪) সভাসমিতি, (৫) রাষ্ট্রনৈতিক দল, এবং (৬) আইনসভা।

১। **মুদ্রাযন্ত্র (Press):** জনমত গঠন ও প্রকাশে মুদ্রাযন্ত্র এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে। শিক্ষাবিস্তারের সংগে সংগে সংবাদপত্র, সাময়িক-পত্র, পুস্তিকা ইত্যাদির পাঠকসংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। সংবাদপত্র-গুলিতে সংবাদের যে-ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় এবং যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহা জনসাধারণের মতামতকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে। আবার সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণ তাহাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। সরকারও জনসাধারণের মুখপাত্র হিসাবে সংবাদপত্রের সমালোচনার ভয়ে সংযত থাকে। এইজন্য বলা হয় যে গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি স্বাধীন সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের ভিত্তি

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলি তাহাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে না। অবিকৃত সংবাদ পরিবেশন এবং নির্ভীকভাবে সরকারের সমালোচনার পরিবর্তে তাহারা সংবাদকে বিকৃত করে, সত্য ঘটনাকে চাপিয়া যায় এবং সরকার বা দলের সাফাই গাহিতে থাকে। ইহার কারণ হইল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংবাদপত্রগুলি ব্যবসায় বা দলীয় মুখপাত্র হিসাবে পরিচালিত হয়। সুতরাং বিজ্ঞাপনদাতাদের পক্ষ-সমর্থন বা দলীয় স্তুতিবাদ উহাদের অপরিহার্য নীতি হইয়া দাঁড়ায়।

এইজন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত মালিকানা ও দলীয় প্রভাব হইতে সংবাদ-পত্রগুলিকে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত জনসেবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত

* পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা।

করা। সাময়িকপত্র, পুস্তিকা ইত্যাদি সম্বন্ধেও ঐ একই মন্তব্য প্রযোজ্য। উহাদিগের লেখক ও প্রকাশকদের পক্ষে দল ও স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া প্রকৃত জনমত গঠন ও প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

সুষ্ঠু ও সবল জনমত গঠনে মুদ্রাযন্ত্রের দায়িত্ব

২। **বেতার ও চলচ্চিত্র (Radio and Cinema) :** বেতার ও চলচ্চিত্র মুদ্রাযন্ত্রের পরিপূরক হিসাবে কার্য করে। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ইত্যাদি শিক্ষিত লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু বেতার ও চলচ্চিত্রের সাহায্যে বর্ণপরিচয়হীন জনসাধারণের নিকট সংবাদাদি পরিবেশন করা সম্ভবপর হয়। বেতার ও চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহাদের হিতাহিত করিবার শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কারণে কাম্য জনমত গঠন ও প্রকাশের উদ্দেশ্যে বেতার ও চলচ্চিত্রের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। দেখিতে হইবে যে উহারা যেন ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রনৈতিক দলেরই গুণকীর্তন না করিতে থাকে।

বেতার ও চলচ্চিত্র মুদ্রাযন্ত্রের পরিপূরক

৩। **শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (Educational Institutions) :** জনমত গঠনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অদ্যকার ছাত্র হইল আগামী দিনের সক্রিয় নাগরিক, চিন্তানায়ক এবং শাসন-পরিচালক। স্কুলকলেজে ছাত্ররা যে ধ্যানধারণা ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয়। কিভাবে শিক্ষার মাধ্যমে জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় হিটলারের অধীনে জার্মেনীর শিক্ষা-ব্যবস্থা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইজন্য গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষা গণতন্ত্রসম্মত হওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে পাঠ্যবিষয়কে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার অনুকূল করিতে হইবে, শিক্ষকগণকে গণতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ

৪। **সভাসমিতি (Platform) :** জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সভা-সমিতির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সভাসমিতিতে মিলিত হইয়া বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। নেতৃগণের আলোচনা ও সমালোচনার ভিত্তিতে জনসাধারণও নিজেদের মতামত গঠন করিয়া থাকে। আবার এই সভাসমিতির মধ্য দিয়া জনগণের মনোভাব গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। এইভাবে সভাসমিতির মাধ্যমে জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হয়। এইজন্য বলা হয় যে সভাসমিতির স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অংগস্বরূপ।

সভাসমিতি দ্বারা কিভাবে জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হয়

৫। **রাষ্ট্রনৈতিক দল (Political Parties) :** সভাসমিতির স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অন্যতম অংগ হইলে রাষ্ট্রনৈতিক দলসমূহ হইল ইহার প্রাণ। রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্দেশ্য নিজ সপক্ষে জনমত গঠন করিয়া নির্বাচনে জয়লাভ

করা। ইহা সাধন করিবার জন্য প্রত্যেক দলই সভাসমিতি আহ্বান করে, সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়মিত প্রচারকার্য চালাইতে থাকে। জনসাধারণ দলীয় আলোচনা ও সমালোচনার মধ্য হইতে আপন মতামত গঠন করিতে সমর্থ হয় এবং নির্বাচনে সেই মতামত প্রকাশ করে।

রাষ্ট্রনৈতিক দল গণতন্ত্রের প্রাণ

৬। **আইনসভা (Legislatures) :** রাষ্ট্রনৈতিক দলের সহিত বিশেষ-ভাবে সম্পর্কিত জনমত গঠন ও প্রকাশের আর একটি মাধ্যম হইল আইনসভা। আইনসভা বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের বিশেষ কার্যক্ষেত্র। এখানে বিতর্ক, সমালোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সরকারী দল ও বিরোধী দল পরস্পরের দোষত্রুটিগুলি জনসমক্ষে ধরিয়া বা নিজ দলের উৎকর্ষ প্রমাণ করিয়া জনমত গঠনের চেষ্টা করে। আইনসভায় তর্কবিতর্ক, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সুতরাং জনমত গঠনে আইনসভা সভাসমিতি অপেক্ষা কোন অংশে গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করে না। উপরন্তু, আইনসভাতেই জনমত প্রতিফলিত হয়। সরকারী দল ও বিরোধী দল আইনসভায় যে আলোচনা-সমালোচনা, সমর্থন ও বিরোধিতা করে তাহা জনমতের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই করে।

আইনসভা জনমত গঠন ও প্রতিফলনের ক্ষেত্র

জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম
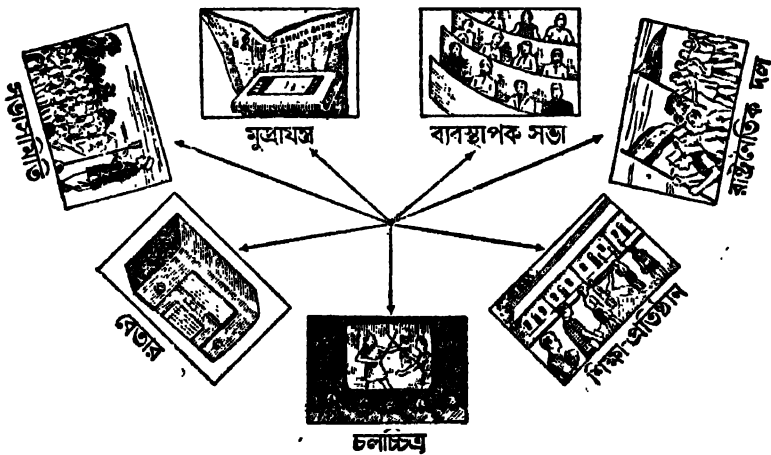
সংক্ষিপ্তসার

গণতন্ত্র জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া গণতন্ত্রে জনমতের গুরুত্বকে লঘু করিয়া দেখা কঠিন। কিন্তু জনমত সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট নহে। তবুও বলা যায়, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় সম্পার্ক প্রবলতর অভিমতই জনমত। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হইলেই যে জনমত হইবে এরূপ কোন কথা নাই। সংখ্যা অপেক্ষা আস্থার দৃঢ়তা জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকার করে। জনমত সকল সময় সামগ্রিক কল্যাণের সহায়ক হইবে।

জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যমের মধ্যে (১) মুদ্রাযন্ত্র, (২) বেতার ও চলচ্চিত্র, (৩) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, (৪) সভাসমিতি, (৫) রাষ্ট্রনৈতিক দল, এবং (৬) আইনসভা—এই কয়টিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্নোত্তর

1. Define 'Public Opinion' and explain how it is related to Democracy.

জনমতের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং কিভাবে ইহা গণতন্ত্রের সহিত জড়িত তাহা ব্যাখ্যা কর।

[১৩০-১৩১ এবং ৩১, ১২৮-১৩০ পৃষ্ঠা]

2. What is Public Opinion? How is it formulated and expressed? (C. U. 1948, '50)

জনমত কাহাকে বলে? কিভাবে ইহা গঠিত ও প্রকাশিত হয়? [১৩০-১৩৩ পৃষ্ঠা]

3. Describe the different organs of Public Opinion. (C. U. 1955)

জনমতের প্রধান মাধ্যমগুলি বর্ণনা কর। [১৩১-১৩৩ পৃষ্ঠা]

4. Explain the nature and importance of Public Opinion in modern States. (C. U. 1960)

আধুনিক রাষ্ট্রে জনমতের প্রকৃতি ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। [৩১, ১২৮-১৩০ পৃষ্ঠা]

5. What is Public Opinion and what are its principal organs? (Fn. 1961; P. U. 1962)

জনমত কাহাকে বলে এবং উহার প্রধান মাধ্যমগুলি কি কি? [১৩০-১৩৩ পৃষ্ঠা]

দ্বাদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রনৈতিক দল

(Political Parties)

গণতন্ত্রে দলপ্রথা অপরিহার্য

তত্ত্বের দিক দিয়া গণতন্ত্র জনগণের শাসন; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে রাষ্ট্রনৈতিক দল। এইজন্য বলা হয়, রাষ্ট্রনৈতিক দলই গণতন্ত্রের প্রাণ। দলপ্রথা ব্যতীত বর্তমানের বিশাল জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা (Representative Government) সফল হইতে পারে না, কারণ জনসাধারণের পক্ষে সুসংগঠিত হওয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করা অধিকাংশ সময়ই সম্ভব হয় না। লোকে রাম শ্যাম যদু হরির মধ্যে কে উপযুক্ত প্রতিনিধি হইবে তাহা সহজে নির্ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু কংগ্রেস কমিউনিস্ট বা স্বতন্ত্র দলের মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত ভাল সে-সম্বন্ধে সহজেই অভিমত প্রদান করিতে পারে। এখন দেখা প্রয়োজন, রাষ্ট্রনৈতিক দল বলিতে কি বুঝায় এবং ইহার কার্যাবলী ও গুণাগুণ কি কি?

রাষ্ট্রনৈতিক দল কাহাকে বলে? (What is a Political Party?): রাষ্ট্রনৈতিক দল কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে

আলোচনা করিতে হয় যে 'দল' কাহাকে বলে। কিছু সংখ্যক একমতাবলম্বী ব্যক্তি যখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সম্মিলিত হয় তখন তাহারা দল গঠন করিয়াছে বলা যায়। এই অর্থে দলের সাক্ষাৎ সর্বত্রই পাওয়া যায়—যেমন, ফুটবল খেলার দল, অস্পৃশ্যতা বিরোধী দল, ইত্যাদি।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের প্রকৃতি ঐ একই। অর্থাৎ, সমমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠন করে।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের প্রকৃতি

'রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন' বলিতে বুঝায় জাতীয় কল্যাণের প্রসার। রাষ্ট্রনৈতিক দল বিশ্বাস করে যে তাহাদের কর্মসূচী ও কার্যপদ্ধতিই জাতীয় স্বার্থের সর্বাপেক্ষা অনুকূল। সুতরাং তাহারা শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিলেই জাতীয় কল্যাণ সর্বাধিক হইবে। এই বিশ্বাসের অনুবর্তী হইয়া তাহারা প্রচারকার্য চালায় এবং শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া নিজ নিজ কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতিকে রূপ দিতে চেষ্টা করে। সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্রনৈতিক দল হইল সমমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ লইয়া এরূপ এক জনসমষ্টি যাহা জাতীয় কল্যাণের জন্য গঠিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের সংজ্ঞা

এই সংজ্ঞা হইতে রাষ্ট্রনৈতিক দলের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করা যাইতে পারে: (১) রাষ্ট্রনৈতিক দলের সভ্যগণ একই মতামত ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সংঘবদ্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ; কমিউনিস্ট দলের সভ্যগণ সাম্যবাদের নীতি ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া একত্রিত হয়। (২) প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক দলই জাতীয় কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকে। (৩) যাহাতে ইহা নিজ নীতি ও আদর্শকে কার্যকর করিতে পারে তাহার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনক্ষমতালাভের চেষ্টা করে।

বৈশিষ্ট্য:
১। সভ্যগণ একমতাবলম্বী হয়
২। প্রত্যেক দল জাতীয় কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকে
৩। উহা শাসনক্ষমতা-অর্জন চেষ্টা করে

এখন প্রশ্ন উঠে, সকল রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যখন এক তখন বিভিন্ন দলের অস্তিত্বের হেতু কি? উত্তরে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, পদ্ধতিগত মতভেদের দরুনই বিভিন্ন দল গড়িয়া উঠে। অর্থাৎ, কোন্ পদ্ধতি, কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে জাতীয় কল্যাণ সর্বাধিক হইবে তাহা লইয়া মতবিরোধ থাকে বলিয়াই গণতন্ত্রে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছু লোক হয়ত দ্রুত সংস্কার-সাধনের পক্ষপাতী, আবার কিছু লোক ধীরে ধীরে সংস্কারসাধন করিতে চায়। এ-ক্ষেত্রে দেশের দুইটি রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্ভব হইবে।

বিভিন্ন দলের অস্তিত্বের কারণ

রাষ্ট্রনৈতিক দলকে নাগরিক-সংঘ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। নাগরিক হিসাবেই বিভিন্ন ব্যক্তি রাষ্ট্রনৈতিক দলে মিলিত হইয়া তাহাদের

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার—যথা, ভোটাধিকার, নির্বাচিত হইবার অধিকার প্রভৃতি —যথাযোগ্যভাবে ভোগ করিতে চেষ্টা করে। বিদেশীয়দের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার নাই বলিয়া তাহাদের পক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠনেরও কোন প্রশ্ন নাই। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠন নাগরিকগণের অনন্য (exclusive) অধিকার। এই অধিকার ভোগের জন্য তাহাদের একটি কর্তব্যও পালন করিতে হয়। দেখিতে হয় যে তাহাদের গঠিত দল যেন জাতীয় কল্যাণের আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক দলকে নাগরিক-সংঘ বলা যায়

জাতীয় কল্যাণের পরিবর্তে সভ্যগণের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য যদি কোন দল কার্য করে তবে উহাকে 'উপদল' (Faction) আখ্যা দেওয়া হয়। উপদলের কোন উচ্চ আদর্শ থাকে না, পদ্ধতিও নীতিমূলক হয় না। উহা ন্যায়-অন্যায় যে-কোন পদ্ধতিতে হউক না কেন দলীয় সভ্যগণের স্বার্থসাধন করিতে থাকে। এইরূপ বিকৃত আদর্শের অনুসরণকারী উপদলকে 'চক্রীদল'ও (Clique or Coterie) বলা হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক দল 'উপদল' হইতে পৃথক

রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলী (Functions of Political Parties) : আধুনিক কালে সমাজের সম্মুখে অগণিত সমস্যা বিশৃংখলভাবে ছড়ানো থাকে। ইহাদের মধ্য হইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণগুলিকে বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির প্রাথমিক কর্তব্য হইল এই কার্য সম্পাদন করা। তাহারা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার ভিত্তিতে নীতি-নির্ধারণ করিয়া বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনয়ন করে। জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে এইগুলিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং ইহাদেরই আশু সমাধান প্রয়োজন।

১। সমস্যা-নির্বাচন রাষ্ট্রনৈতিক দলের অন্যতম কার্য

রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি সমস্যার সমাধানেও সহায়তা করে। নাগরিকগণের পক্ষে সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়াই যথেষ্ট নহে, কিভাবে উহাদের সম্যক সমাধান করা যায় সে-সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্র-নৈতিক দলগুলিই এই ধারণার সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাহারা নির্বাচিত সমস্যাগুলির ভিত্তিতে নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করে। এইভাবে বিভিন্ন নীতি ও কর্মপন্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিয়া জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে কোন্ পদ্ধতিটি সমস্যা-সমাধানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল।

২। ইহা সমস্যার সমাধানেও সহায়তা করে

উপরন্তু, সমস্যা-সমাধানের পদ্ধতি সম্বন্ধে স্থির মত হইলেও কোন্ কোন্ ব্যক্তি সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন, সে-সম্বন্ধে রাষ্ট্রনৈতিক দল না থাকিলে নিশ্চিত হওয়া যায় না। রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি তাহাদের মনোনীত প্রার্থীদের

জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড় করায়। জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে অমুক ব্যক্তিকে সমর্থন করিলে সমস্যার সমাধান এইভাবে হইবে। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি প্রতিনিধি নির্বাচনেও সাহায্য করে। বর্তমান দিনের গণতন্ত্র প্রতিনিধিমূলক বলিয়া রাষ্ট্রনৈতিক দলের এই কার্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৩। ইহা প্রতিনিধি নির্বাচনে সহায়তা করে

রাষ্ট্রনৈতিক দলের আরও কার্য আছে। আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি জনমতের বাহন। সভাসমিতির অনুষ্ঠান, দলীয় প্রচার প্রভৃতি দ্বারা রাষ্ট্রনৈতিক দল জনমতের গঠন ও প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। নির্বাচনের ফলে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনভার গ্রহণ করে তখন বুঝিতে পারা যায় যে ঐ দলের নীতি ও কর্মসূচী জনমত দ্বারা সমর্থিত। আবার অন্যান্য দলের দোষত্রুটিও জনসমক্ষে উপস্থিত করা রাষ্ট্রনৈতিক দলের অন্যতম কার্য। নিজ দলের সপক্ষে সমর্থনলাভের প্রচেষ্টাতেই রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি এই কার্য করিয়া থাকে। এইরূপে বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রনৈতিক দলের দ্বারা জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হয়।

৪। ইহা জনমতের গঠন ও প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে

পরিশেষে, সমস্যা-নির্বাচন, নীতি-নির্ধারণ, প্রার্থী-মনোনয়ন প্রভৃতি নিরর্থক হইয়া পড়ে যদি-না নির্বাচিত সমস্যার সমাধান এবং নির্ধারিত নীতিকে কার্যকর করিবার কোন উপায় থাকে। এই উপায় হইল শাসনক্ষমতালাভ। সুতরাং শাসনক্ষমতা অধিকার করাকে রাষ্ট্রনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলিয়া অভিহিত করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই তাহারা সমস্যা-নির্বাচন করে, নীতি-নির্ধারণ করে, প্রার্থী দাঁড় করায় এবং প্রচারকার্য চালায়। শাসনক্ষমতা অধিকার করিতে সমর্থ হইলে পর রাষ্ট্রনৈতিক দল প্রতিশ্রুত নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট থাকে; আর ক্ষমতা হস্তগত করিতে না পারিলে সরকারী দলের দোষত্রুটির আলোচনার দ্বারা জনসাধারণের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কার্য করে।

৫। ইহা শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া নীতিকে কার্যকর করিতে চেষ্টা করে

৬। ইহা স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবেও কার্য করে

দলপ্রথার গুণাগুণ (Merits and Demerits of Party System): বলা হয় যে রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলীর মধ্যেই উহার গুণ নিহিত আছে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি যে যে কার্য সম্পাদন করে তাহা বর্তমান দিনের জাতীয় রাষ্ট্রে বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলীর মধ্যেই উহার গুণ নিহিত

প্রথমত, আমরা দেখিয়াছি যে রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনয়ন করে। অগণিত সমস্যার মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির নির্বাচন, সমাধানের প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দেশ এবং প্রতিনিধি হইবার উপযুক্ত

ব্যক্তিকে জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি সুশৃংখল শাসন-ব্যবস্থা সম্ভব করে। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বিশাল দেশে রাষ্ট্রনৈতিক দল না থাকিলে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা কখনই সম্ভব হইত না। কারণ, লোকে তখন ব্যক্তিগতভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করিত এবং পরস্পরের সহিত সম্পর্কবিহীন প্রতিনিধিবর্গ শৃংখলাবদ্ধভাবে কোন কাজই করিতে পারিতেন না।

গুণ: ১। দলপ্রথা বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনয়ন করে

দ্বিতীয়ত, দলপ্রথা জনমত গঠন ও প্রকাশে সহায়তা করিয়া গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে। গণতন্ত্রকে 'জনমত-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দলপ্রথা না থাকিলে জনমত কি, তাহা বুঝা যায় না বলিয়া প্রতিনিধিগণ খুশিমত কার্য করিতে পারেন। এইরূপ ঘটিলে গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে না; উহা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়।

২। ইহা গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে

তৃতীয়ত, দলপ্রথা জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার প্রসার করে। দলীয় প্রচারকার্য, দলীয় সমালোচনা প্রভৃতি জনসাধারণকে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলে এবং তাহাদিগকে ভোটদানে উৎসাহিত করে।

৩। রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষারও বিস্তার করে

চতুর্থত, দলপ্রথার সপক্ষে আরও বলা হয় যে ইহা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকে বলিয়া সমালোচনার ভয়ে প্রত্যেক দলকেই সংযত হইয়া চলিতে হয়। শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়াও কোন দল স্বৈরাচারিতার পথে চলিতে পারে না। চলিলে অন্যান্য দল উহার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে; এবং ফলে পরবর্তী নির্বাচনে ঐ দল শাসনক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইবে।

৪। ইহা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ

পঞ্চমত, দলপ্রথা থাকিলে শান্তিশৃংখলা ভংগ না করিয়াও কাম্য সংস্কার-সাধন করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রনৈতিক দল জনমতকে সপক্ষে পরিচালিত করিয়া নির্বাচনে জয়লাভের চেষ্টা করে। নির্বাচনের পর বিজয়ী দল নিজ কর্মসূচী অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করিয়া জনমত-অনুমোদিত সংস্কারসাধনে সচেষ্ট হয়। এইভাবে দেশের অভ্যন্তরে যে স্বার্থের বিরোধিতা বর্তমান থাকে তাহার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সম্ভব হয়।

৫। ইহার জন্য শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সংস্কার-সাধন সম্ভব হয়

ষষ্ঠত, দলপ্রথাই ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগকে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ করে। আমরা দেখিয়াছি যে পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণ কোনমতেই কাম্য নহে; এবং সুশাসনের জন্য ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা সম্পূর্ণ অপরিহার্য। পার্লামেন্টীয় সরকারে এই সহযোগিতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। সেখানে মন্ত্রিগণ ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল

হইতেই নিযুক্ত হন, এবং দলীয় নেতা বলিয়াই ব্যবস্থাপক সভার সমর্থনলাভ করিয়া থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে যেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রিকরণের নীতি বিশেষভাবে স্বীকৃত সেখানেও দলপ্রথার জন্যই ব্যবস্থা বিভাগ ও শাসন বিভাগ ঐক্য-সূত্রে আবদ্ধ থাকে। আইনসভায় রাষ্ট্রপতির যে-দল থাকে তাহা রাষ্ট্রপতিকে সমর্থন করিয়া চলে।

৬। ইহা শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করে

পরিশেষে, দলপ্রথা আবার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারের মধ্যেও সহযোগিতা আনয়ন করে। ভারতে বর্তমানে একমাত্র কেরল ছাড়া সকল স্থানে কংগ্রেস-সরকার গঠিত হইয়াছে। কেরলেও সংযুক্ত ফ্রণ্ট (United Front) কংগ্রেসের সহযোগিতায় সরকার গঠন করিয়াছে। একই দলভুক্ত বলিয়া এই সকল সরকার পরস্পরের সহিত সহযোগিতা এবং পরস্পরের সমর্থন করিয়া থাকে। ফলে সকলে একই নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়।

৭। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারের মধ্যেও সমন্বয়সাধন করে

এইভাবে দলপ্রথার বিশেষ গুনকীর্তন করা হইলেও উহার কতকগুলি দোষত্রুটির উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না।

প্রথমত, বলা যায় দেশের লোকের এত বিভিন্ন মতামত থাকে যে তাহা মাত্র কয়েকটি দলের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতে পারে না। সুতরাং যে দলীয় ঐক্য দেখা যায় তাহা কৃত্রিম। অনেকে তাহাদের মনোমত দলের সন্ধান না পাইয়া বিশেষ একটি দলকে সমর্থন করিতে বাধ্য হয়।

ত্রুটি : ১। বলা হয় দলীয় ঐক্য কৃত্রিম

দ্বিতীয়ত, দলপ্রথা ব্যক্তিত্বের বিনাশসাধন করে। একবার দলভুক্ত হইলে ব্যক্তির পক্ষে নিজস্ব মতামতকে চাপা দিয়াও দলীয় নীতি ও কর্মপদ্ধতিকে সমর্থন করিয়া যাইতে হইবে। অন্যথায় তাহাকে দল হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে।

২। দলপ্রথা ব্যক্তিত্বের বিনাশ করে

তৃতীয়ত, অনেক সময় রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিবর্তে ক্ষুদ্র স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে; এবং দলগত স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থ বলিয়া মিথ্যা প্রচার করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে। নির্বাচনের সময়ও নানারূপ দুর্নীতি ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লয়। ফলে সমাজের নৈতিক মানের অবনতি ঘটে। সাধারণ সময়ে দল অযথা অর্থব্যয় এবং চাকরি, সম্মান প্রভৃতি বিতরণ করিয়া নিজ সমর্থকদের সন্তুষ্ট রাখে।

৩। নানাভাবে জাতীয় স্বার্থের হানি করে

চতুর্থত, দলপ্রথার জন্য অনেক সুযোগ্য ব্যক্তি শাসন-কার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারেন না, কারণ বিজয়ী দল নিজেদের সমর্থকদের মধ্য হইতেই মন্ত্রী, উপমন্ত্রী প্রভৃতি নিযুক্ত করে।

৪। অনেক সুযোগ্য ব্যক্তিকে শাসনকার্যের বাহিরে রাখে

আরও বলা যায় যে, নির্বাচনের সময় অবাঞ্ছনীয় উত্তেজনা ও উন্মাদনার সৃষ্টি করা হয়। ফলে হিংসা, দ্বেষ, মনোমালিন্য, অশোভনীয় বক্তৃতাদি প্রসারলাভ করে এবং জাতীয় জীবনের সংহতি নষ্ট হয়। লোকে দলের ভিত্তিতেই ভাবিতে শিখে, জাতীয় কল্যাণের ভিত্তিতে নয়।

৫। অন্যান্য ত্রুটি

দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থা (Bi-party and Multi-party System): ইহা একরূপ ধরিয়া লওয়া হয় যে একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল ব্যতীত প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইংরাজ লেখক বার্কারকে অনুসরণ করিয়া অনেকেই বলেন, একদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের অস্বীকার মাত্র; একটিমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিলে সেই দেশকে একনায়কতন্ত্রী (dictatorial) বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। কারণ, এইরূপ দেশে গণতন্ত্রের অন্যতম সর্ত রাষ্ট্রনৈতিক দল-গঠনের স্বাধীনতা থাকে না বলিয়াই একটিমাত্র দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

একাধিক দল গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য

সুতরাং গণতন্ত্রে একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিতে হইবে বলিয়া ধরা হয়। 'একাধিক' বলিতে যদি মাত্র দুইটি রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকে তবে উহাকে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (bi-party system) বলা হয়; দুই-এর অধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিলে উহা বহুদলীয় ব্যবস্থা (multi-party system) নামে অভিহিত হয়। ইংলণ্ডে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত। ঐ দেশে রক্ষণশীল (Conservative) ও শ্রমিক (Labour) এই দুইটি প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দল। উদারনৈতিক (Liberal) ও সাম্যবাদী (Communist) দলের সমর্থকসংখ্যা এত কম যে উহাদের অস্তিত্বকেই একরূপ অস্বীকার করা হয়। অপরদিকে ফ্রান্সে বহুদলীয় ব্যবস্থার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক দল সংখ্যায় এত বেশী যে কোন দলের পক্ষেই এককভাবে সরকার গঠন করা সম্ভব হয় না।

দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থা

দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিলে দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকেই সমর্থন করিতে হয়। দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় নাগরিকদের পক্ষে নীতি-নির্বাচন অতি সহজ হয়। দুইটি নীতির মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণ-যোগ্য লোকে তাহার বিচার সহজেই করিতে পারে; কিন্তু বহুপ্রকার নীতি যদি জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করা হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহা নির্ধারণ করা বিশেষ কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থার গুণ: ১। ইহাতে নীতি-নির্বাচন সহজ হয়

আলোচনার দিক হইতেও দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বহুদলীয় ব্যবস্থা অপেক্ষা সমর্থনীয়। দুইটি দলের কর্মসূচী আলোচনা করা যত সহজ, বহু দলের বহু প্রকারের কর্মসূচীর আলোচনা ও বিচারবিবেচনা করা তত সহজ নয়।

২। আলোচনাও সহজ হয়

দ্বিদলীয় ব্যবস্থাতেই সুসংবদ্ধ সরকারী দল ও শক্তিশালী বিরোধী দল গড়িয়া উঠে। বহু দল থাকিলে অধিকাংশ সময় কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না; ফলে সম্মিলিত সরকার (coalition government) গঠন করিতে হয়। সম্মিলিত সরকারের কোন সুদৃঢ় নীতি থাকে না। পদে পদে মীমাংসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই ইহাকে শাসনকার্য চালাইতে হয়। অপরদিকে সরকারের বিরোধী যে-সকল দল থাকে তাহারাও ঐক্যবদ্ধ হয় না বলিয়া বিরোধিতাও শক্তিশালী হয় না।

৩। সরকারী দল এবং বিরোধী দল সুগঠিত হয়

অবশ্য বহুদলীয় ব্যবস্থার সমর্থনে বলা যাইতে পারে যে, লোকের যে বিভিন্ন মতামত থাকে তাহা বহু দলের মাধ্যমে সম্যকভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। দুইটি মাত্র দলের কোনটির নীতির সহিতই যদি আমার মতের মিল না হয় তবে আমি গত্যন্তরবিহীন। বহু দল থাকিলে একটি না একটি নীতির সহিত মিল হইবেই।

বহুদলীয় ব্যবস্থা সকল মতামতের প্রতিফলনের সহায়ক

তবুও সকল দিক বিবেচনা করিলে দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে সমর্থন না করিয়া পারা যায় না। বহুদলীয় ব্যবস্থায় কোন দল এককভাবে সরকার গঠন করিতে পারে না বলিয়া সকল সময়ই বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্ষমতা অধিকারের ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে। ফলে সরকারের ঘন ঘন পতন ঘটিয়া শাসন-ব্যবস্থাকে দুর্বল করিয়া তুলে।

তবুও দ্বিদলীয় ব্যবস্থা সমর্থনীয়

ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক দল (The Indian Political Parties):

স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক দল প্রধানত দুইটি ভিত্তিতে সংগঠিত হইত —(ক) জাতীয়তাবাদ, এবং (খ) ধর্ম। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সংগঠিত দল ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, এবং ধর্মের ভিত্তিতে মুস্‌লিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

স্বাধীনতার পর ধর্মের ভিত্তিতে দল-গঠনের দিন চলিয়া গিয়াছে। ফলে সাম্প্রদায়িক দলগুলি কোনমতে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে বলা যায়। স্বাধীনতার ফলে জাতীয়তাবাদের দিনও একরূপ শেষ হইয়াছে। কিন্তু তবুও কংগ্রেস দলের প্রভাবপ্রতিপত্তি কমে নাই। ইহার কারণ হইল, বর্তমানে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নহে—অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতেই সংগঠিত। বস্তুত, বর্তমান দিনের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এই অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তিতে ছাড়া অন্যভাবে দল-গঠন করা চলে না। তাই এইভাবেই ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি গঠিত হইতেছে।

ধর্মের ভিত্তিতে দল-গঠনের দিন চলিয়া গিয়াছে

১৯৬২ সালের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে পাঁচটি রাষ্ট্রনৈতিক দলকে সর্ব-ভারতীয় দল বলিয়া অভিহিত করা যাইত। ইহারা

ছিল (ক) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, (খ) কমিউনিস্ট দল, (গ) স্বতন্ত্র দল, (ঘ) ভারতীয় জনসংঘ, এবং (ঙ) প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল।* ইহার মধ্যে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের বিলুপ্তি ঘটিয়া উহার স্থলে উদ্ভূত হইয়াছে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল। নিম্নে এই পাঁচটি দলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

বর্তমানে পাঁচটি প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দল

(ক) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস: নানা কারণে ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির মধ্যে কংগ্রেসের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতালাভের পর জাতীয়তাবাদী দৃষ্টি-ভংগি অচল হইয়া পড়ায় কংগ্রেস অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রী ও শান্তির আদর্শ গ্রহণ করে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রচার করা হয় যে, (১) কংগ্রেস ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নসাধন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; (২) আন্তর্জাতিক শান্তি ও সৌহার্দ্যের জন্য কংগ্রেস বিশেষ চেষ্টা করিবে কিন্তু কোন শক্তিজোটে (power bloc) যোগদান করিবে না; (৩) ধর্মবিষয়ে প্রত্যেকের স্বাধীনতাকে কংগ্রেস স্বীকার করে, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতাকে ঘৃণা করে; (৪) সুনাগরিক গড়িয়া তোলা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।

কংগ্রেসের বর্তমান আদর্শ

ইহার পর কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা (Socialist Pattern of Society) গঠনের নীতি গ্রহণ করে এবং এই নীতির ভিত্তিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সমাজতন্ত্রের উপর কংগ্রেস আরও গুরুত্ব আরোপ করে, এবং সমাজসেবা, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া চলে। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সীমান্ত রক্ষা, ভারতের বক্ষ হইতে বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তিকে বিতাড়ন প্রভৃতি হইল কংগ্রেসের আদর্শ।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলে পূর্বের তুলনায় কংগ্রেসের কিছুটা শক্তি হ্রাস ঘটিয়াছে। লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাসমূহে এই দলের অধিকৃত আসনসংখ্যা ১০০-র মত কমিয়া ২২৮০-তে দাঁড়াইয়াছে। তবুও কংগ্রেস-অধিকৃত আসনসংখ্যা অন্য যে-কোন দলের আসনসংখ্যা হইতে অনেক অধিক। উপরন্তু, একমাত্র কংগ্রেসই দেশের সকল আইনসভায় আসন অধিকার করিয়া আছে। এই দিক দিয়া একমাত্র কংগ্রেসকেই 'প্রকৃত সর্ব-ভারতীয় দল' বলিয়া অভিহিত করা চলে।

প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসই একমাত্র সর্ব-ভারতীয় দল

(খ) কমিউনিস্ট দল: বর্তমানের কমিউনিস্ট দল পূর্বে জাতীয় কংগ্রেসের একটি অংশমাত্র ছিল। পরে কংগ্রেস হইতে বাহিরে আসিয়া কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ পৃথক দল প্রতিষ্ঠা করেন।

কমিউনিস্ট দল

---

* নির্বাচন-কমিশন (Election Commission) অবশ্য তৃতীয় নির্বাচনের সময় হইতে সরকারীভাবে 'সর্ব-ভারতীয় দল'—এই আখ্যা কোন দলকেই দিতেছে না।

কমিউনিস্ট দলের চরম উদ্দেশ্য ভারতে এক শ্রেণীহীন বর্ণহীন সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। অবশ্য বর্তমানে এই দলের লক্ষ্য হইল ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি বিরোধিতা ঘোষণা, কমনওয়েলথের বাহিরে আসা, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, ভূমির পুনর্বণ্টন কার্য দ্রুত সম্পাদন এবং শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকদের অধিকার প্রদান এবং পাট শিল্প, চা শিল্প প্রভৃতি বৈদেশিক পুঁজির অধীন শিল্পসমূহ ও বৈদেশিক বাণিজ্যকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা। এই সকল বর্তমান লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারিলে ধীরে ধীরে সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে বলিয়া কমিউনিস্ট দলের ধারণা।

কমিউনিস্ট দলের বর্তমান লক্ষ্য

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলে কমিউনিস্ট দলের শক্তির বিশেষ তারতম্য ঘটে নাই। তবে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের প্রশ্নে এই দল বর্তমানে অন্তর্দ্বন্দ্বের দরুন কিছুটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

(গ) স্বতন্ত্র দল: স্বতন্ত্র দল ১৯৫৭ সালের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর গঠিত হয়। গঠনে অনুপ্রেরণা যোগান শ্রীরাজাগোপালাচারী। স্বতন্ত্র দল 'পরতন্ত্র' বা সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে। এই দলের মতে, সরকারী নিয়ন্ত্রণ আর্থিক ও সামাজিক জীবনে মোটেই সুফল প্রসব করে না; ভারতের স্থায় স্বল্পোন্নত দেশে এই নিয়ন্ত্রণ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতেও পারে। সুতরাং কৃষককে উদ্যোগের স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে, শিল্প-বাণিজ্যকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ হইতে যথাসম্ভব মুক্ত করিতে হইবে, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানা সংকুচিত করিতে হইবে, সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে এবং আইনসভার সদস্যগণ যাহাতে দলীয় নিয়ন্ত্রণের বাহিরে আসিতে পারেন তাহাও দেখিতে হইবে। এইভাবে ব্যক্তিকে নিজের অধীন বা স্বতন্ত্র করিয়াই ভারতের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহের সমাধান করা এবং দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় নির্বাচনের পর গঠিত হওয়ার জন্য স্বতন্ত্র দল তৃতীয় নির্বাচনে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই দল সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়। ইহা লোক-সভায় ১৮টি এবং রাজ্য বিধানসভাসমূহে ১৭০টি আসন অধিকার করিতে সমর্থ হয়।

(ঘ) ভারতীয় জনসংঘ: ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠা হয় প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময়। স্বর্গীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর জনসংঘ কিছুটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহা আবার শক্তিবৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে এই দল প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল অপেক্ষা লোকসভায় বেশী আসন অধিকার করিয়াছিল।

(৬) **সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল**: সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের উদ্ভব ঘটে ১৯৬৪ সালের মধ্যভাগে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল ও সমাজতন্ত্রী দলের সংযুক্তির ফলে। এই সংযুক্তির মূলে অন্যান্য কারণের মধ্যে ছিল প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের প্রখ্যাত নেতা শ্রীঅশোক মেহতা কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের সহ-সভাপতির (Deputy Chairman) পদ গ্রহণ। ইহার দরুন প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল দুর্বল হইয়া পড়িলে কিছুদিন হইতে যে সংযুক্তির কথা চলিতেছিল তাহার পথ সুগম হয়।

পূর্বতন প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল এবং সমাজতন্ত্রী দলের মিলিত কর্মসূচীই হইল সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের কর্মসূচী। ইহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে করা হইতেছে।

সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের লক্ষ্য প্রকৃত সমাজতন্ত্রের (real socialism) প্রতিষ্ঠা। ইহার জন্য, এই দলের মতে কৃষকের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন করিতে হইবে, ব্যাংক-ব্যবসায় খনি প্রভৃতিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনয়ন করিতে হইবে, বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং রোপণ শিল্পসমূহকেও (plantation industries) রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে হইবে, ধনীদের সম্পদ ও ব্যয়ের উপরে কর ধার্য করিতে এবং মন্ত্রী উপমন্ত্রী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী প্রভৃতির মাহিনা কমাইয়া সামাজিক উৎসাহের সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহা ছাড়া, দেশের প্রতিরক্ষাকল্পে সকলকে অস্ত্রধারণের অধিকার দিতে হইবে।

কর্মসূচী

শক্তির দিক দিয়া সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল অন্যান্য অনেক দলের উপরে। কয়েকটি রাজ্যে সংযুক্ত দল এককভাবে বিরোধী দল (Opposition) গঠন করিতে সমর্থ।

উপসংহার: উপরি-বর্ণিত পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্রনৈতিক দল ছাড়া আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আছে। ইহাদের মধ্যে হিন্দু মহাসভার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকারময়। মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে ভারতে তিন-চারিটির অধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকিবে না। ফলে তখন ত্রিদলীয় বা চতুর্দলীয় ব্যবস্থা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিবে।

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান দিনের প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে দলপ্রথা অপরিহার্য। রাষ্ট্রনৈতিক দল রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সমমতাবলম্বী ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়। রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন বলিতে বুঝায় জাতীয় কল্যাণবৃদ্ধি।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—১। দলের সভ্যগণ একমতাবলম্বী হয়, ২। দল জাতীয় কল্যাণে সচেষ্ট থাকে, এবং ৩। ঐ উদ্দেশ্যে শাসনক্ষমতালাভের চেষ্টা করে।

কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে জাতীয় কল্যাণ সর্বাধিক হইবে সে-সম্বন্ধে মতভেদ থাকে বলিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রনৈতিক দলকে 'উপদল' বা 'চক্রীদল' হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক দল জাতীয় স্বার্থসাধন করে; উপদল দলের সভ্যগণের স্বার্থসাধনে সচেষ্ট থাকে।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলী: রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—১। সমস্যা-নির্বাচন; ২। সমস্যা-সমাধানে সহায়তা করা; ৩। প্রতিনিধি নির্বাচনে সাহায্য করা; ৪। জনমতের গঠন ও প্রকাশে ভূমিকা গ্রহণ করা; ৫। শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া নীতিকে কার্যকর করিতে চেষ্টা করা; এবং ৬। স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কার্য করা।

দলপ্রথার গুণ: ১। দলপ্রথা বিশৃংখলার মধ্যে শৃংখলা আনয়ন করে; ২। ইহা গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় রাখে; ৩। রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার বিস্তার করে; ৪। ইহা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ; ৫। ইহা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সংস্কারসাধন সম্ভব করে; ৬। শাসন বিভাগ ও ব্যবস্থা বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করে; এবং ৭। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারের মধ্যেও সমন্বয়সাধন করে।

ত্রুটি: বলা হয় ১। দলীয় ঐক্য কৃত্রিম; ২। দলপ্রথা ব্যক্তিত্বের বিনাশ করে; ৩। নানাভাবে জাতীয় স্বার্থের হানি করে; ৪। অনেক সুযোগ্য ব্যক্তিকে শাসনকার্যের বাহিরে রাখে; ৫। হিংসা দ্বেষ মনোমালিন্য প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া জাতীয় কল্যাণের হানি ঘটায়।

দ্বিদলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থা: গণতন্ত্র একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল ব্যতীত চলে না। সকল দিকের বিচারবিবেচনা করিয়া বহুর পরিবর্তে দুইটি দলের সপক্ষেই মত প্রদান করিতে হয়।

স্বাধীন ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে দল-গঠনের দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তিতেই দল গঠিত হয়। ১৯৬২ সালের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল অনুসারে পাঁচটি প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দল হইল: (ক) কংগ্রেস, (খ) কমিউনিস্ট দল, (গ) স্বতন্ত্র দল, (ঘ) ভারতীয় জনসংঘ, এবং (ঙ) প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল। বর্তমানে অবশ্য প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের স্থানাধিকার করিয়াছে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল।

কংগ্রেস: অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসের আদর্শ। সমাজতন্ত্রী ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা গঠন কংগ্রেসের নূতন গৃহীত নীতি।

কমিউনিস্ট দল: কমিউনিস্ট দলের চরম লক্ষ্য ভারতে এক শ্রেণীহীন বর্ণহীন সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমানে ইহা অবশ্য কয়েকটি রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত।

স্বতন্ত্র দল: ইহা শ্রীরাজাগোপালাচারীর অনুপ্রেরণায় নবগঠিত দল; ইহা সরকারী নিয়ন্ত্রণের মাত্রা কমাইয়া দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিতে চায়।

ভারতীয় জনসংঘ: স্বর্গীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত এই দল চতুর্থ সর্ব-ভারতীয় দল।

সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল: প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল ও সমাজতন্ত্রী দল মিলিত হইয়া এই দল গঠিত হইয়াছে। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল ভারতে প্রকৃত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে চায়।

প্রশ্নোত্তর

1. What is meant by a Political Party? Are Political Parties inevitable in a Democracy? Give reasons for your answer. (C. U. 1951)

রাষ্ট্রনৈতিক দল বলিতে কি বুঝায়? গণতন্ত্রের পক্ষে রাষ্ট্রনৈতিক দল কি অপরিহার্য? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন কর। [১৩৪-১৩৭ পৃষ্ঠা]

2. Define Political Party. Describe the functions of Political Parties in a modern Democracy. (C. U. 1957 ; P. U. 1961 ; En. 1961)

রাষ্ট্রনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আধুনিক গণতন্ত্রে তাহারা যে যে কার্য সম্পাদন করে তাহার ব্যাখ্যা কর। [১৩৪-১৩৫ এবং ১৩৬-১৩৭ পৃষ্ঠা]

3. What is a Political Party? Distinguish between a Party and a Faction.

রাষ্ট্রনৈতিক দল কাহাকে বলে? রাষ্ট্রনৈতিক দলকে উপদল হইতে পৃথক করিয়া দেখাও। [১৩৪-১৩৬ পৃষ্ঠা]

4. Define Political Party and indicate its merits and demerits.
(C. U. 1959, '62)

রাষ্ট্রনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর ও গুণাগুণ বর্ণনা কর। [১৩৪-১৩৬ এবং ১৩৭-১৪০ পৃষ্ঠা]

5. What do you mean by Political Parties ? Discuss the relative advantages of Multi-party and Bi-party System. (C. U. 1954 ; B. U. 1961)

রাষ্ট্রনৈতিক দল বলিতে কি বুঝ ? বহুদলীয় ও দ্বিদলীয় ব্যবস্থার গুণাবলীর তুলনামূলক আলোচনা কর। [১৩৪-১৩৬ এবং ১৪০-১৪১ পৃষ্ঠা]

6. Give a brief description of the main Political Parties of India.

ভারতের প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [১৪১-১৪৪ পৃষ্ঠা]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার

(Democracy and Suffrage)

নাগরিকগণের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করার দিন চলিয়া গিয়াছে বলিয়া বর্তমানে গণতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক দল ও ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয়। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক দলের গুরুত্ব ও কার্যাবলী ব্যাখ্যার পরই ভোটাধিকারের ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভোটাধিকারের ভিত্তি কি হইবে তাহা লইয়া মোটামুটি দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রথম মতবাদ অনুসারে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককেই ভোটাধিকার প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থাকে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (Universal Adult Suffrage) বলে। ইহার সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হয় :

ভোটাধিকারের ভিত্তি

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সপক্ষে যুক্তি

গণতন্ত্র যখন জনগণেরই শাসন (rule of the people) তখন সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত। নতুবা গণতন্ত্র মুষ্টিমেয়ের শাসনে পরিণত হইয়া মিথ্যায় পর্যবসিত হইবে। বলা যায়, গণতন্ত্রে ভোটাধিকার নাগরিকের জন্মগত অধিকার।

দ্বিতীয়ত, শাসননীতির ফলাফল যখন সকলকেই ভোগ করিতে হয় তখন ঐ নীতি-নির্ধারণের ভার সকলের উপরই থাকা উচিত। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, যাহাদের ভোটাধিকার নাই তাহাদের অভিযোগে কেহই কর্ণপাত করে না—তাহাদের দাবি উপেক্ষিতই হইতে থাকে। সুতরাং সর্বসাধারণের মংগলসাধন যদি গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হয় তবে উহাকে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি গ্রহণ করিতেই হইবে।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্র সাম্যকে সমর্থন করে বলিয়াও সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া লইবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। একমাত্র বয়স

ছাড়া অন্য কোন কারণ বা অজুহাতে নাগরিকগণকে ভোটাধিকার প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে বৈষম্যকে সমর্থন করা হয়। ফলে গণতন্ত্রও অলীক প্রতিপন্ন হয়।

দ্বিতীয় মতবাদে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের বিরোধিতা করিয়া বলা হয় যে যোগ্যতা না থাকিলে এই অধিকার কাহাকেও দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মিলের মতে, শিক্ষাই যোগ্যতার মাপকাঠি বলিয়া সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পূর্বে সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষেই ভোটদানের অধিকারী হইবার জন্য কিছুটা পড়িবার, কিছুটা লিখিবার ও কিছুটা অংক কষিবার জ্ঞান অর্জন করা চাই। একথা স্বীকার্য যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, এবং উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা নাগরিককে উন্নত স্তরে লইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ লোকে যদি সুযোগসুবিধার অভাবে অশিক্ষিত থাকিয়া যায় তাহার জন্য দায়ী হইল সমাজ-ব্যবস্থা, এবং অশিক্ষার অজুহাতে যদি জনসাধারণকে ভোটাধিকার বা নির্বাচিত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে রাষ্ট্র কোন সময়ই শিক্ষাবিস্তার ও জনকল্যাণসাধনে আগ্রহান্বিত হইবে না। ইহা ছাড়া নির্বাচনের সমস্যা বুঝিবার জন্য স্কুলকলেজে শিক্ষার্জনের প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই কাম্যভাবে ভোটাধিকারের ব্যবহার করিতে পারে। এমনও দেখা যায় যে উচ্চশিক্ষিত লোক—যেমন, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বা প্রখ্যাত বিজ্ঞানী—রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন এবং নীতি ও বুদ্ধিমত্তার পথে ইহার সমাধান করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত নন। সুতরাং শিক্ষাকে ভোটদানের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।

বিপক্ষে যুক্তি

শিক্ষার যুক্তি

আবার অনেকের মতে, শিক্ষা নহে সম্পত্তির মালিকানাই ভোটাধিকার অর্জনের মাপকাঠি হওয়া উচিত। কারণ, যাহাদের সম্পত্তি নাই, দেশের প্রতি তাহাদের দরদ থাকে না এবং তাহাদের বিশেষ কর প্রদান করিতে হয় না বলিয়া তাহাদিগকে সরকারী অর্থের অপব্যয়ের প্রশ্রয় দিতে দেখা যায়। সম্পত্তিকে ভোটদানের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার নীতি অন্যতম সামন্ততান্ত্রিক (feudal) নীতি। সামন্ততান্ত্রিক যুগে মাত্র সম্পত্তির অধিকারিগণকেই ভোটাধিকার প্রদান করা হইত। বর্তমানে এই নীতিকে কেহই সমর্থন করেন না, কারণ সম্পত্তির মালিকানার সহিত নাগরিকতার গুণের কোন সম্পর্ক নাই। সম্পত্তিকে ভোটাধিকারের ভিত্তি করিলে ধনীরাই নিজেদের স্বার্থে শাসনকার্য চালাইবে।

সম্পত্তির যুক্তি

উপসংহারে বলা যায়, জাতি-ধর্ম, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক বলিলাম এইজন্য

যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের রাষ্ট্রীয় সমস্যা বুঝিবার বা জানিবার মত যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে না। আমাদের দেশে কোন নাগরিকের একুশ বৎসর বয়স না হইলে সে ভোটাধিকার পায় না। এইভাবে সর্বত্রই ভোটদানের বয়স নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। ইহা ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যাহারা বিকৃত মস্তিষ্ক, দেউলিয়া-গ্রহণকারী বা রাষ্ট্রদ্রোহী তাহাদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, কারণ তাহারা দেশের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রখিয়া ভোটাধিকারের ব্যবহার করিতে অপারগ।

উপসংহার: বর্তমানে সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার প্রদানের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে

ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার: স্বাধীন ভারতের সংবিধানে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার নীতি মানিয়া লওয়া হয়; ব্রিটিশ আমলের ন্যায় সম্পত্তি আয় শিক্ষা প্রভৃতির ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান না করিয়া সকল প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়কেই নির্বাচনাধিকার দেওয়া হয়। ফলে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক ভারতবাসী নির্বাচকমণ্ডলীভুক্ত হয়।

এই সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পর পর তিনটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে কোনরূপ বিশৃংখলা ত ঘটেই নাই, বরং দেখা গিয়াছে যে অশিক্ষিত হইলেও ভোটাধিকারের যোগ্য ব্যবহারের দ্বারা গণতন্ত্রকে সার্থক করিয়া তুলিতে তাহারা সম্পূর্ণ সমর্থ। বস্তুত, ভারতের দৃষ্টান্ত প্রমাণিত করে যে অশিক্ষার অজুহাতে জনসাধারণকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা অযৌক্তিক। ইহাতে গণতন্ত্র মিথ্যায় পর্যবসিত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হইলেও এই অধিকারটি লইয়া বিশেষ মতবিরোধ আছে। অনেকের মতে, সকলকে ভোটাধিকার দেওয়া উচিত নয়; হয় শিক্ষা না-হয় সম্পত্তিকে ভোটদান-যোগ্যতার মাপকাঠি করা উচিত। এই নীতি বর্তমানে মানিয়া লওয়া হয় না। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে সকলের ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার: ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার-ব্যবস্থা সফল হইয়াছে; ফলে ভারতীয় গণতন্ত্রও সার্থক হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

1. **Discuss the case for and against Universal Adult Suffrage.** (P. U. 1962, '64; C. U. 1963)

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর। [১৪৬-১৪৮ পৃষ্ঠা]

2. **State the arguments in favour of adult suffrage.** (C. U. 1961)

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সপক্ষে যুক্তিগুলি বিবৃত কর।
[১৪৬-১৪৭ এবং ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠার উপসংহার অংশ]

3. **Give arguments for and against Universal Adult Suffrage. Has it worked satisfactorily in India? Give reasons for your answer.** (En. 1962)

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। ভারতে কি ইহা সফল হইয়াছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। [১৪৬-১৪৮ পৃষ্ঠা]

PRE-UNIVERSITY EXAMINATION (*C. U.*)

1961 : Group A

1. Describe the advantages of division of labour and point out its limitations.

2. What is capital? What are the factors upon which the accumulation of capital depends?

3. Distinguish between elastic and inelastic demand. Is the demand for the following elastic or inelastic?

(*a*) rice, (*b*) diamonds and (*c*) motor cars.

4. Explain how price is determined in the market under conditions of competition.

5. State the functions of a Central Bank.

6. What are the aims and objectives of India's Five Year Plans?

Group B

7. What do you mean by the following terms?

(*a*) State, (*b*) Government, (*c*) Nation and (*d*) Nationality.

8. Distinguish between Democracy and Dictatorship. Which of these two would you prefer, and why?

9. Describe the rights and duties of citizens.

10. Distinguish between Parliamentary and Presidential forms of Government. Indicate their respective merits and demerits.

11. Which would you prefer, a unicameral or a bicameral legislature? Give reasons for your preference.

12. Define Political Party. Describe the functions of political parties in a modern democracy.

1962 : Group A

1. How do you define and determine the national income of a country?

2. Describe the relative advantages and disadvantages of large-scale and small-scale production.

3. What is money? Describe the functions of money.

4. Explain how price is determined under conditions of monopoly.

5. Show how wages are determined.

6. Describe the progress of the Indian economy under the Second Five Year Plan.

Group B

7. Explain the characteristics of the State. How would you distinguish the State from the Government?

8. Distinguish between Unitary and Federal forms of Government. What are their respective merits and drawbacks ?

9. Explain the theory of separation of powers. How far is a strict separation of powers practicable and desirable ?

10. Explain the meaning of 'liberty', and point out its relation to law.

11. What is meant by Public Opinion ? Describe the chief agencies for forming public opinion in modern times.

12. Discuss the case for and against universal adult suffrage.

1963 : Group A

1. Describe the main features of a joint-stock company. Indicate the strength and weaknesses of such companies.

2. Explain how the price of a commodity is determined under conditions of perfect competition.

3. Indicate the effects of a rise in the level of prices upon, (*a*) wage earners, (*b*) businessmen and (*c*) persons with fixed incomes.

4. Explain how the rate of interest is determined.

5. Distinguish between direct and indirect taxes, and indicate their respective merits and demerits.

6. Describe the objectives of India's Third Five Year Plan.

Group B

7. Distinguish between Parliamentary and Presidential forms of government. Which do you consider to be better, and why ?

8. What are the advantages and disadvantages of the bicamerai form of legislature ?

9. Describe the functions and utilities of Political Parties in a democracy.

10. Define a citizen. What are the hindrances to good citizenship ?

11. What is a Nation ? Explain the principle : 'One nation, one state'.

12. State and explain the social contract theory of the origin of the state.

1964 : Group A

1. Explain and illustrate the advantages of division of labour.

2. Distinguish between 'elastic' and 'inelastic' demand. Is the demand for the following elastic or inelastic ?

(*a*) Rice, (*b*) Motor cars, and (c) Salt.

3. What is meant by 'monopoly' ? Show how price is determined under conditions of monopoly.

4. Explain the functions of central banks.

5. Indicate the progress of agriculture during the First and Second Five Year Plans of India.

6. Write on the difficulties faced by small-scale industries in India. Indicate how the Government of India is assisting the development of these industries.

Group B

7. Define the term 'State'. Are the following States? (*a*) West Bengal, (*b*) Canada, and (*c*) Nepal. Give reason for your answer.

8. Describe the merits and demerits of democracy as a form of government.

9. Explain the theory of Separation of Powers.

10. Explain the meaning of 'law' and point out its relation to 'liberty'.

11. Discuss the case for and against universal adult suffrage.

12. Explain briefly the rights and duties of citizens.

UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION (*B. U.*)

1961 : Group A

1. Explain the concept of 'National Income'. How is such income calculated ?

2. What is elasticity of demand ? Distinguish between elastic and inelastic demand. What are the factors which influence such elasticity ?

3. How is price determined in a market under conditions of perfect competition ?

4. Distinguish between 'money wages' and 'real wages'. Upon what factors do real wages depend ?

5. Briefly outline the main features of India's Second Five Year Plan.

Group B

6. Distinguish between Democracy and Dictatorship. What are the conditions for the success of democracy of the country ?

7. Defire Liberty. What are its main safeguards ?

8. Define political party. What are the functions of such parties in a democracy to-day ?

9. Point out the distinction between Parliamentary and Presidential Government. What form of Government prevails at the centre under our new constitution. Discuss fully.

10. What is public opinion and what are its principal organs.

1962 : Group A

1. State the Law of Demand. Explain why a rise in price tends to decrease demand and a fall in price tends to increase it.

2. What is the Central Bank ? Discuss its functions.

3. Define Rent and examine the factors that determine rent.

4. What do you mean by a Direct and an Indirect Tax ? Discuss the merits and demerits of Direct and Indirect Taxes.

5. Explain the importance of Cottage industries in Indian economy. Discuss the steps that have been suggested for their development in the Second Five Year Plan of India.

6. Give a brief outline of India's Third Five Year Plan.

Group B

7. What do you mean by the term State ?

Are the following States ? (*a*) The State of West Bengal, (*b*) A College Union, (*c*) The United Nations.

8. Distinguish between Unitary and Federal forms of Government. Give at least one illustration in each case.

9. What is a Bi-cameral legislature? Discuss its merits and demerits.

10. What are the hindrances to good citizenship? State briefly how they can be removed.

11. Give arguments for and against Universal Adult Suffrage.

Has it worked satisfactorily in India? Give reasons for your answer.

12. Write short notes on: (*a*) Nation, (*b*) Nationality, (*c*) United Nations, (*d*) Right of Self-determination, (*e*) Parliamentary Government, (*f*) Dictatorship.

1963 : Group A

1. Define capital and explain the part played by capital in production.

2. Explain briefly the advantages of Large-scale production.

3. Distinguish between Real Wages and Nominal Wages and say how wages are ordinarily determined.

4. Explain briefly the advantages of Paper Money.

5. Name some of the more important cottage industries of India and say what steps have been taken for their development under the Five Year Plans.

6. Explain briefly the functions of a Central Bank.

Group B

7. Define State and distinguish between State and Government.

8. Explain briefly the "Social Contract" Theory of the origin of the State.

9. Explain the advantages of a Democratic Government over a Dictatorship.

10. Explain the function of a Political Party in a Democracy.

11. What do you mean by Public Opinion? How is Public Opinion created?

12. What is exactly meant by Liberty? How is liberty related to Law?

1964 : Group A

1. State the Law of Demand. What are the factors which govern the demand for a commodity?

2. Explain briefly the advantages and limitations of Division of Labour.

3. Discuss the functions of money. What will be the effect of a change in the quantity of money on the general price level?

4. Distinguish between a direct tax and an indirect tax. Discuss the arguments in favour of direct taxation.

5. Write notes on any *two* of the following : (*a*) The Law of Diminishing Returns, (*b*) Advantages and disadvantages of the Joint stock Company, (*c*) Price determination under competition, (*d*) The Ricardian Theory of Rent.

6. Give a brief account of the Community Development Project in India.

Group B

7. Explain the points of difference between the State and other associations.

8. Examine the 'Force' theory of the origin of the State.

9. Distinguish between : (*a*) Unitary Government and Federal Government, (*b*) Parliamentary Government and Presidential Government.

10. What do you mean by the right of Self-determination What are its limitations ?

11. State and criticise the theory of Separation of Powers.

12. Discuss the hindrances to good citizenship.